ম ভাগ। (Registered No C 344.) অগ্রহায়ণ, ১৩১২।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এটর্ণি য়্যাট-ল-সম্পাদিত।

কলিকাতা, ৩৪নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে
শ্রীহরিপদ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ সিকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵১০ আনা।

সূচী।

মদন ভস্ম।

অবসর।

১২শ ভাগ। } অগ্রহায়ণ। { ৪র্থ সংখ্যা।

রেণুকণা।

(শেষাংশ)

(৬)

প্রায় এক বৎসর পরে স্বামি-ঘর করিতে আসিয়াছি। এখন আর আমার ছেলেমানুষী নাই, আমি একটু বেশ গম্ভীর হইয়াছি। সংসার বেশ লাগিতেছে; তবে ক্ষুধা পেলে, ঘুম এলে মাকে যেমন বলি, শাশুড়ীকে তেমন বলিতে পারি না। শ্বশুর, শাশুড়ীর বয়স হইয়াছে—তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করি, সংসারের কাজ দেখি—সবই আমার উপর ন্যস্ত। ঝি নাই, গরুর সেবাও আমায় করিতে হয়। আমার কিন্তু তাতে কোন কষ্ট হয় না, বরং বিশেষ আনন্দ অনুভব করি। স্বামী গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করেন, মাহিনা ৬০৲ টাকা, তাঁহার উপরই সংসার নির্ভর করে। স্বামীর নাম করিতে নাই, তবে গ্রামের সকলে বলিতেন, 'ললিতের মত ছেলে আজ কাল "শতে এক"।' বলিতে লজ্জা নাই স্বামী আমার বড় শান্ত, ধীর। সংসারের কাজ করিতে আমি কত অন্যায় করি—তিনি একটি উঁচু কথাও বলেন না, বরঞ্চ আমি অপ্রস্তুত হই ভাবিয়া আমাকে সান্ত্বনা করেন, বলেন "তুমি ছেলেমানুষ,—সংসারের সব কাজ করিতে হয়, তোমার বড় কষ্ট হয়"। তাতে আমার দ্বিগুণ উৎসাহ হয়, রাত্রি দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কাজ করিতে ইচ্ছা যায়।

শ্বশুর মধ্যবিত্ত ব্যক্তি। দু'খানি শোবার খোড়ো ঘর, একখানি গোয়াল, বাড়ীর গায়ে একটি ছোট পুকুর, একটি ছোট বাগান। আমি মায়ের গৃহ-

প্রাঙ্গণে যেমন ফুলগাছ পুঁতিতাম। এখানেও পুঁতিয়াছি। একটু জায়গা পরিষ্কার করিয়া শাক্ সবজী দিয়াছি—তরকারি-পাতির খরচ আমাদের নাই বলিলেও হয়। পুকুরে মাছ আছে, ঘরে দুধ আছে। যদিও আয় অল্প, তবু আমাদের এক প্রকার সুখেই দিন যাপন হয়।

আমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড় ভাল লাগে, দেবতা তাহা মাপাইয়াছেন। একটু দূরে পলাশ গাছের সার আর ইছামতী নদী—আঁকিয়া বাঁকিয়া, হেলিয়া দুলিয়া বহিয়া গিয়াছে। কবিরা বলেন 'কোকিল বসন্ত দূত'—আমাদের এখানে কিন্তু শরৎকালেও কোকিল ডাকে, আর কত রকম ছোট ছোট পাখী ভোর হ'লে গান গায়, শীস্ দেয়। আমি শুনি—শুনে শুনে অন্যমনস্ক হয়ে গাছের পানে শূন্যদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। একদিন স্বামী পিছু হইতে আস্তে আস্তে বলিলেন 'পাখীরা দেবতার নাম লইয়া দিনের কার্য্যে যাইতেছে।' আমরা মনে করি মানুষ দেবতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট-জীব—মানুষ কিন্তু অতি কষ্টে না পড়িলে দেবতার নাম লয় না আর কত মানুষ আছে, তাহাদের দ্বারা দেবতার কার্য্য কিছুই হয় না। পাখীরা ভোরে, সাঁঝে বিভু-গান ধরে—এমন কি গাছেরাও দেবতার পূজার জন্য ফুল, ফল দেয়, পান্থকে ছায়া দেয়, পাখীদের বাসা দেয়। মানুষ সংসারে এসে নিজের উদর পূর্ত্তি করে, নিজের ঐহিক উন্নতির (?) জন্য সদাই বিব্রত—পাছু ফিরিয়া ভায়ের অবস্থা কি হইয়াছে তাহাও দেখিবার সুযোগ পায় না।

আমি দিনের কার্য্য সারিয়া সন্ধ্যার সময় ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখাই—গৃহ-প্রাঙ্গণে তুলসী-মঞ্চ আছে; উহার এক কোণে একটি মৃৎপ্রদীপ জ্বালাইয়া দি,—তার পর শ্বশুর, শ্বাশুড়ীর কাছে বসি, মায়ের পায়ে হাত বুলাই, আর পিতার মুখে সতী সাবিত্রীর কথা শুনি—শৈব্যা, ফুল্লরা, সীতার কাহিনী শুনি—শুনিয়া দুঃখ হয়, আবার আনন্দ হয়। স্বামী স্ত্রীর দেবতা—দেবতার জন্য আমাদের ত এই রকমই করিতে হয়, তাহাতে গর্ব্ব নাই—পরন্ত না করিলে খর্ব্ব হই। বৃদ্ধ পিতার মুখে সতী-কাহিনী বড় ভাল লাগে, শুইবার পূর্ব্বে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করি, আর প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করি—আমাকে যাহা এজীবনে দিয়াছেন, তাহা যেন জন্ম-জন্মান্তরেও পাই।

(৭)

বিন্দু দিদি একবার নিরুকে ধর না ও আমায় বড় বিরক্ত কর্‌ছে। মা অনেকক্ষণ স্নানে গেছেন, ফেরবার সময় হয়েছে এখনও তাঁর পূজার জায়গা

হয় নি। কে রেণু? এই বলিয়া রমণী আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। খোকাকে দেখিয়া "বেশ হইয়াছে" বলিয়া কত আদর করিল, তারপর কাঁধে করিয়া বেড়াইতে গেল। রমণীমোহন হরিমোহন কাকার ছোট ছেলে কলিকাতায় বি, এ, পড়ে, ৺পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে। সে আমার চেয়ে ছয়মাসের বড়। বেশ্ ভাল ছেলে, যখনই আসে আমাদের বাড়ীতে এসে মাকে প্রণাম করিয়া যায়। আমরা ছেলে বেলায় একসঙ্গে খেলা করিতাম—আমায় সে বড় ভালবাসে।

আজ আশ্বিনমাসের ১১ই—আর দু'দিন পরে পূজা—সকলের আনন্দ। যাহারা একবেলা একমুষ্টি আহারে প্রাণধারণ করিয়া থাকে, তাহাদের পরনেও আজ নূতন বস্ত্র। এযে শারদোৎসব—মানুষের আনন্দ, পশু পক্ষীর আনন্দ, আকাশ, পাতাল, তরুলতায় আনন্দ—মা আনন্দময়ী আসিতেছেন—এ উৎসবে দশ্ দিক্ বিভোর। আকাশ নির্ম্মুক্ত, কোথাও এক কুচা মেঘ লাগিলে অমনি এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া ধুইয়া যাইতেছে। ভোরে গাছের পাতা স্থয্যির কিরণ মাখিয়া কেমন নাচিতেছে, দুলিতেছে,—পাতার ভিতর বসিয়া পাখীরা গান ধরিয়াছে, যেন দশদিক্ হইতে আমার দশভুজা মায়ের আবাহন গীত গাহিতেছে। সরোবরের নীল জলে পদ্ম ফুল ভাসিতেছে, হাসিতেছে। শুধু আমিই নীরব। ২টা বাজিয়াছে, মায়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে—আমি মায়ের কাছে বসিয়া খোকার জামাটী সেলাই করিতেছি। মন শূন্য, কেন দেব! পূর্ব্ব জন্মে কি পাতক করিয়াছি, যে এমন স্বামী আমার পিতা মাতাকে ফেলিয়া, নিরুকে ভুলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। যে রাত্রে চলিয়া যান সে রাতের কথা আমার মনে অহরহঃ জাগে। পূর্ণিমা রাত্রি, জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া গিয়াছে—যেন ফটিক্ ফুটে আছে। রাত্ দুটোর পর আর স্বামীকে দেখিলাম না। মাকে গিয়া বলিলাম—মা বাবাকে বলিলেন। প্রভাত হ'লে বাবা লোক পাঠাইলেন, কিছু সন্ধান হ'ল না। আজ প্রায় ৩ বৎসর স্ত্রীলোকের সার-ধর্ম্ম স্বামি-সেবা হইতে আমি বঞ্চিতা। আমি সাত পাঁচ ভাবিতেছি, খোকা মায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার গণ্ড বহিয়া অলক্ষ্যে এক ফোঁটা জল পড়িল। বাহিরে কি শব্দ হইল, পিয়ন ডাকিতেছে খোকা চিঠি আছে—খোকাকে চেনে না দেশে এমন কেহ নাই—মা, খোকা বেশ ঘুমাইতেছেন—আমি দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলাম, তারপর আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে চিঠিখানা খুলিলাম। চিঠিখানিতে লেখা আছে—

রেণু!

আজ প্রায় ৩ বৎসর পরে তোমাদের সন্ধান লইতেছি। আমি বেশ আছি। আশা করি—মা, বাবা, নির্ম্মল, তুমি বেশ ভাল আছ। আমি তোমার নিকট হইতে মনে মনে বিদায় লইয়া অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি। আষাঢ়মাসে কামরূপে কামাখ্যা দেখিয়াছি। তারপরে দুইমাসে কাশী, বৃন্দাবন, কন্‌খল্‌, হরিদ্বার, গোমুখী দর্শন করিয়াছি। যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন এ সব তীর্থ দর্শনের লালসা মনে জাগিয়াছিল। তখন আমাদের গ্রাম হইতে যাঁহারা তীর্থে যাইতেন, তাঁহাদের দর্শন করিতাম। আমার মনে হয় তীর্থস্থান দর্শন অভাবে তীর্থ-যাত্রী দর্শনেও প্রচুর পুণ্য আছে। আমি বৈকুণ্ঠে যাইতে পারিব না বলিয়া কি বৈকুণ্ঠের পথে যাত্রী নারদোদ্দেশে প্রণাম করিব না!

আজ ৬ দিন হইল আমি হিমাচল-বক্ষে। কত হরিণশিশু খেলা করিতেছে। তুমি তপোবন দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে; তাই মনে হয় এস্থান একবার তোমায় দেখাইতে পারিতাম! সূয্যি ওঠে চাঁদ ডোবে আবার চাঁদ ওঠে, সূয্যি ডোবে; কেমন সুন্দর, কেমন মনোরম—কেমন নয়ন-তৃপ্তিকর! ঝরণার জল পর্ব্বতগাত্র বহিয়া যায়,—আমি অঞ্জলি পূরিয়া তৃষ্ণায় জল খাই। আবার সন্ধ্যা হ'লে পাখীর গান শুনি, ছোট ছোট ঝরণার জল-শব্দ কাণে আসে—যেন চতুর্দ্দিকে শান্তি।

শকুন্তলার কবি বলিয়াছেন, মানুষ যে সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া বা মধুর স্বর শুনিয়া অধীর হয় তাহার অর্থ—'পূর্ব্ব-জন্মের প্রিয়-বিরহে প্রাণের আকুলতা'। আমার মনে হয়, এ সুন্দর পট মধু-বৃন্দাবনের তাই সুন্দর দৃশ্য দেখিলে মন চঞ্চল হয়—এমধুর সুর শ্যামের বাঁশরীর, তাই মিষ্ট স্বর শুনিলে মন উতলা হয়। যমুনার জলোচ্ছ্বাস ও কালিন্দীর কলোল্লাসে মন মাতিয়া উঠে, মনে হয় নিকুঞ্জ-বনে ব্রজরেণু মাখিতে আসিয়াছি। এই পার্থিব দেহে আত্মার গান * শুনা যায়—তবে সে ক্ষণিকের জন্য—যেমন সন্ধিক্ষণে মায়ের চক্ষু উন্মেষ হয়, তেমনি পলকের জন্য সে ভাব হয়—সেই পলকের মধ্যে প্রাণের দেবতা "বৃন্দাবনে রাধাশ্যাম" দেখি,—তাই ক্ষণিকের তরে মনে বিপুল শান্তি আসে—আমি মর্ত্ত্যে নাই এই ভাব ভাসে। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

* বোধ হয় এই জিনিষটাকেই Browning সাহেব Music of the soul' বলিয়াছেন।

আমি রাখাল বালক, আমি রাধা, আমি নটবর, আমি বৃন্দাবন—আমি বৃন্দাবনের সব।

পিতামাতাকে প্রণাম দিও, আসি।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীললিতমোহন মিত্র।

চিঠি পড়িয়া ভাবিব কি—ভাবিবার শক্তি রহিল না। মায়ের পার্শ্বে শুইয়া পড়িলাম। কখন ঘুমায়ে পড়িয়াছি মনে নাই—মা ডাকিলেন—তখন ঝিকিমিকি রদ্দুর—কিছু পরেই সন্ধ্যা হ'ল।

(৮)

রাতে আহার শেষ হ'লে মায়ে ঝিয়ে অনেক গল্প হ'ল—মাকে স্বামীর পত্রের কথা বলিলাম। মা অনেক দিন মন-মরা হইয়া ছিলেন, আজ একটু আহ্লাদ করিলেন কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। মায়ের বয়স হইয়াছিল। তার উপর এই সব মানসিক কষ্ট। রাত্রে মায়ের খুব জ্বর, সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া হইল। ভোরে বিন্দু দিদিকে শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে পাঠাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। তিনি আসিয়া মায়ের বাড়ী বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা আনিলেন। ৭।৮ দিন একরূপেই চলিল। ডাক্তার আসে টাকা নেয়, আর প্রত্যহ একবার করিয়া আশ্বাস দিয়া চলিয়া যায়। বিন্দুদিদি আমিও মায়ের কাছে থাকি, একটু সময় করিয়া রন্ধন সারিয়া লই। খোকা একটু শান্ত হইয়া থাকে—ছেলে হ'লেও সে বোধ হয় সব বুঝিয়াছে, মার অসুখ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ১৩ দিনের দিন সন্ধ্যার সময় মায়ের প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল, পাড়ার সম্পর্কীয়েরা শবদেহ লইয়া গেল। আমি, বিন্দুদিদি কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত ভোর করিলাম। বিন্দুদিদি আমার চোখ্ মুছিয়া দেয়, বিন্দুদিদি আমার কে? মায়ের পেটের বোন্‌ও ত এমন করে না। কি জানি বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে সে আমার খুব আপনার জন ছিল, ৪ দিনে চতুর্থী হইল। শ্বশুর, শাশুড়ী উপস্থিত থাকিয়া দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। দেনার দায়ে মায়ের গৃহখানি বিক্রয় হইয়া গেল—মায়ের বাড়ীর আমার সব শেষ হ'ল। আমি শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে স্বামি-ঘরে ফিরিলাম।

(৯)

শরতের পূজা আসিল। সমস্ত বাঙ্‌লা—হাহাকার ভরা বাঙ্‌লা আজ আনন্দ-হিল্লোলে ভাসিতেছে। আমার হৃদয়ে কিন্তু দাবানল জ্বলিতেছে।

স্বামী নিরুদ্দেশ, মা ফেলিয়া গিয়াছেন, যখন অসহ্য যন্ত্রণা হয় খোকাকে বুকে ধরি, তার সঙ্গে খেলা করি, কথা কই—একটু উপশম পাই।

দেখিতে দেখিতে ৮মাস কাটিল। ইহার মধ্যে আর স্বামীর সংবাদ পাই নাই।

* * * * *

৬ দিন হ'ল বাবার খুব জ্বর, আবোল্ তাবোল্ বক্‌ছেন। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন—আমি কপালে জলের ন্যাকড়া দিয়া মাথার চুল টানিয়া দিতেছি। মা বৃদ্ধা—বাবার কাছে বসিয়া আছেন। রমণীমোহন (হরিকাকার ছেলে) অষুধ আনিয়া দেয়। আজ তাকে ডাক্তার বলিয়াছে—জ্বর ছাড়িবার সময় কি হয় বলা যায় না, এধারে পয়সারও কষ্ট। তখন স্বামী চাক্‌রী করিতেন, ভাবিতে হইত না। আমি মায়ের অগোচরে আমার হারগাছটী রমণীকে দিলাম। সে ১৫০৲ টাকা আনিয়া দিল। ডাক্তারকে ৩।৪ দিন খরচ দেয়া হয়নি, সমস্ত চুকাইয়া দিয়া ৩৫৲ টাকা হাতে রহিল।

আজ ১১ দিন। বৈকালে বাবার জ্বর ১০৫ উঠিয়াছিল। সন্ধ্যা থেকে জল নেমেছে। ১১টা রাতে বেশ একটু জোরে জল পড়লো—বিদ্যুৎ হান্‌লো—মেঘ কড়্ কড়্ কর্‌ল। আমি বাবার পায়ে হাত বুলাইতেছি। মা খোকাকে নিয়ে মেঝেতে ঘুমাইয়াছেন। দুয়ারে কি শব্দ হ'ল—আমি সে দিকে তাকাইলাম—কিছুই নয়। কিছু পরেই আবার টক্ টক্ শব্দ হইল। আমি বিছানা হইতে উঠিলাম। মা, মা বলিয়া কে বাহিরে ডাকিল—সে স্বর চেনা—অনেক দিনের চেনা—প্রাণ কাঁদান স্বর—চির-আরাধ্য দেবতার স্বর—জীবনে কি ভুলিতে পারি? এ স্বর আত্মার—দেহের নয়—দেহীর। আমি দ্বার খুলিলাম। আমারি স্বামী—তবে অঙ্গে গেরুয়া বসন। পায়ে জোর পাইলাম না—দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা চোখ তাকাইয়া দেখিলেন—যেন কত দিনের সতৃষ্ণ নয়ন প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন। বিছানায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন পারিলেন না। মাকে ডাকিলেন—মা তাকাইলেন—তার পর বুঝি আঁধারে ঘেরিবার পূর্ব্বে একবার চন্দ্রমা বিকাশ হইল। অসুস্থ অবস্থায় মনের তীব্র-বেগ সহিল না। মা শুইয়া পড়িলেন, বাবার কথা বন্ধ হইল। তখন ১টা রাত্রি—স্বামী ভিজিতে ভিজিতে ডাক্তার আনিলেন—বৃথা আনা। স্বামী শিশুর মত কাঁদিলেন—আমি আষাঢ়ের বরষা-আঁধার বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিলাম। পিতা মাতা স্বামী স্ত্রী একত্রে শ্মশান-শয়নে শুইলেন। চিতা-ভস্ম বায়ুভরে উড়িয়া অনন্তে মিশিয়া গেল।

ভাই গেল, মা গেছেন, শ্বশুর শাশুড়ী গেলেন—তবে স্বামী ফিরিয়াছেন। স্বামী এপারের সঙ্গী-ওপারের সঙ্গী—এ বন্ধন অমর-অক্ষয়।

বিপদ একা আসে না। এখনও ৬ মাস হয়নি। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি একা বসিয়া আছি, হরিমোহন কাকা আসিলেন—তাঁর মুখে শুনিলাম—৪ দিন হো'ল বিন্দুদিদি মারা গিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার কথা, খোকার কথা অনেক বলেছিল। রমণী মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিল। সব বলিয়া পকেট থেকে একখানা কাগজ বাহির করিলেন—বলিলেন 'বলিতে কষ্ট হয় কিন্তু কি করি, আমার ত সম্পত্তি ঠিক রাখিতে হইবে! তোমার বিবাহের পূর্ব্বে তোমার শ্বশুর শাশুড়ী আমার কাছে এই বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন। এই সেই বন্ধকী-খত। তারপর দু'এক কথায় জানাইলেন যে ২।৪ দিনের মধ্যে আমাদের এ বাড়ী ছাড়িয়া নিজের স্থান দেখিয়া লইতে হইবে। তিনি চলিয়া গেলেন,—রাত্রি ৮টার সময় স্বামী ফিরিলেন। তাঁহাকে সব বলিলাম—তিনি হাসিলেন আমার ভয় হইল। তিনি বুঝিলেন—বলিলেন ভয় কি? ভগবান আছেন—তিনি রক্ষাকর্ত্তা, তিনি আমাদের নিরাপদে রাখিবেন। আমি মেয়ে মানুষ ভাল বুঝিলাম না। স্বামীর সঙ্গে গাছের তলেও বাস করিতে পারি, কিন্তু স্বামীর অঙ্গে এখনও গেরুয়াবস্ত্র তাই এত ভয়!

(১০)

সন্ধ্যা হইয়াছে, আঙ্গিনায় জ্যোছনা ভরে গেছে। স্বামী কাছে আছেন। আমি বলিলাম, কাল আমাদের এ গৃহ ছাড়িতে হইবে। স্বামী উত্তর করিলেন তা বেশ! তবে স্নেহ বিজড়িত গৃহ-উদ্যান! ছেলেবেলায় ঐ পুকুরে কত সাঁতার দিয়াছি,—ঐ ফুলগাছ তোমার হাতের পোঁতা তা কি করিবে? তিনি দিয়াছিলেন তিনিই লইবেন, আমাদের ত নয় আমরা চলিয়া গেলে আবার একদল লোক আসিবে, তারা গেলে অপর একদল আসিবে—যাওয়া আসা, এত পান্থ-নিবাস; এত শান্ত-আশ্রম, তপোবন নয়—সে ওপারে যেখানে তুমি আমি সবাই যাব। কেমন সুন্দর সে পার! কেমন মনোরম! স্বামী থামিলেন, দ্বারে শব্দ হইল রমণী একখানা কাগজ লইয়া আসিয়াছে। আমি ঠিক মনে করিলাম এ সেই বন্ধক-নামা, পূর্ব্বে যেখানি তার পিতা হরিমোহন কাকা আমায় দেখাইয়া ছিলেন। রমণী কাগজখানি আমার হাতে দিয়া খোকাকে কোলে নিল। এত বন্ধকী খত নয়! বাঃ এ যে বিন্দু-

দিদির উইল! বিন্দুদিদি তার বাড়ীখানি খোকার নামে উইল করিয়া গিয়াছে। আমি স্বামীর হাতে কাগজখানি দিলাম। বিন্দুদিদি তুমি আমাদের কে ছিলে?

আমরা আজ ৫।৬ বছর বিন্দুদিদির বাড়ীতে আছি। আমার বাবার বাড়ী শ্বশুর বাড়ী ও বিন্দুদিদির বাড়ী পাশাপাশি গ্রামে। এখন বিন্দুদিদির বাড়ীই আমাদের ঘর। আমার স্বভাব—আবার কত রকম ফুলের গাছ পুঁতেছি। ছোট ছোট পাখী এসে গাছে বসে—বসে বসে শীস্ দেয় সে কেমন? নির্ম্মল এখন স্কুলে যায়—তার উৎপাত নাই তবে খুকীর দৌরাত্ম্যের শেষ নাই। স্বামী স্কুলে মাষ্টারী করেন—৮০ টাকা বেতন পান। দেবতার আশীষ ও গুরুজনদিগের আশীর্ব্বাদে আমরা এখন বেশ সুখে আছি।

শ্রীফণিভূষণ মুস্তফী বি এ।

যুবকের ব্যথা।

কইগো তোমার আকুল করা মৃদু মধুর ডাকা—
বাজিয়ে চাবি কিম্বা কভু নাড়িয়ে হাতের শাঁখা?
কোন্‌টি হতে কইগো তোমার লুকিয়ে চেয়ে থাকা,
শুন্‌তে কথা কইগো তোমার কাণটি পেতে রাখা?
বুক দুর-দুর আস্‌লে বাড়ী সন্ধ্যা ঘুরে গেলে,
মান অভিমান কতই করা কতই কথা বলে!
সে সব এবে উঠে মনে মেঘের মত ভেসে,
তুমি যে কোথা পালিয়ে গেছ স্বপ্ন ঘেরা দেশে!
দিনের শেষে চোরের মতন যখন আসে রাতি,
ঘরে তেমন জ্বলে না আর দীপ্ত উজল বাতি।
আঁধার আমার বাহির ভিতর কিবা দিনে রাতে,
আর নাহি চাই শুয়ে প'ড়ে চাঁদটি ঘরে পেতে।
সব যে গেল শুকিয়ে আমার কেবল হতে উষা,
বুকখানি মোর ভেঙ্গে যে গেল মিটিল নাক' তৃষা।
পড়ে আছে সে কাঁকের কলসী আর সেই বান্ধা ঘাট,
নূতন দেশে তুমি যে এবে গড়েছ নূতন হাট!

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ।

আকাশের কথা।

২য় রাত্রি।

১লা কার্ত্তিক সায়ংকাল দে গাঁর থুব পৃষ্ঠে
দণ্ডায়মান গুরু-শিষ্য।

গুরু। আজ তোমাকে অসুর ভাগের শ্রেষ্ঠ ৮টী তারা চিনাইব।

শিষ্য। তারা-জগতের ৩য় তারা সর্ব্বের আগে কোথায় ফুটিবে?

গুরু। আকাশের দঃ পঃ কোণে চোখ রাখ। তারা-জগতের ৩য় তারা সর্ব্বের আগে তথায় ফুটিবে।

শিষ্য। ক্ষিতিজের সন্নিহিত বলিয়া স্পষ্ট দেখা যায় না।

গুরু। শ্রাবণ ভাদ্রমাসে সায়ংকালে ৩য় তারা মধ্য রেখার (Meridian) সন্নিহিত থাকে, তখন তাহাকে বেশ ফুটিতে দেখা যায়। এই তারার নাম "জয়"।

শিষ্য। এবার কোন্ তারা কোথায় ফুটিবে?

গুরু। এবার আকাশের উঃ পঃ কোণে মুখ ফিরাও। জাফরাণ বর্ণ স্বাতিনক্ষত্র তথায় ফুটিবে।

শিষ্য। অতি মনোহর তারা। ইহার দুই পাশে দুইটী তারা ইহার চির নিশান। এবার কাহার পালা?

গুরু। উত্তর মুখ হও, তারা-জগতের ৭ম তারা ইস্পাত-নীল অভিজিৎ নক্ষত্র উত্তরে ফুটিবে। ইহার তলস্থ তারাময় সমান্তরাল ক্ষেত্র ইহার চির নিশান।

শিষ্য। বুঝি বা জগতের "নীলকান্তমণি" হইবে। এবার কোন্ তারা কোথায় ফুটিবে?

গুরু। জয় তারার উঃ পঃ ভাগে জয় তারার জুড়ী বিজয় তারা ফুটিবে; বিজয় তারা ১২শ তারা।

শিষ্য। ক্ষিতিজ লগ্ন বলিয়া স্পষ্ট দেখা যায় না।

গুরু। শ্রাবণ ভাদ্রমাসে সায়ংকালে মধ্য রেখায় থাকিবে। তখন বেশ দেখিবে।

শিষ্য। এবার ১৪শ তারাকে ফুটিতে হইবে।

গুরু। ঠিক্ বলিয়াছ। আকাশের দঃ পঃ কোণ পানে চাও। আকাশের ১৪শ তারা হিন্দু জ্যোতিষের জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ফুটিবে। বিলাতে এই তারাকে এণ্টেরিস্ (Antares) অর্থাৎ "মঙ্গল সম" বলে। ইহার দুই বগলে দুই ছোট তারা জ্যেষ্ঠার চির নিশান।

শিষ্য। এবার ১৫শ তারা কোথায় ফুটিবে এবং তাহার নাম ও বিলাতী নাম কি ?

গুরু। উত্তর মুখ হও। ঐ দেখ জ্যেষ্ঠার দূর উত্তরভাগে শ্রবণা নক্ষত্র ফুটিতেছে, ইহার দুই পাশের দুই ছোট তারা ইহার চির নিশান। বিলাতে এই তারাকে অলটেয়ার (Altair) অর্থাৎ পক্ষী বলে।

শিষ্য। এবার ১৭শ তারা কোথায় ফুটিবে এবং ইহার নাম কি ?

গুরু। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের সুদূর পশ্চিমে "মৎস্যমুখ" তারা ফুটিবে। জ্যেষ্ঠা ও মৎস্যমুখ তারার যোজকরেখা ভূমিরেখা হইলে শ্রবণা নক্ষত্র ত্রিভুজের শীর্ষকোণে থাকিবে।

শিষ্য। ২১শ তারা কোথায় ফুটিবে। এবং তাহার নাম কি।

গুরু। অভিজিৎ নক্ষত্রের অদূর পঃ উঃ কোণে ২১শ তারা ফুটিবে। বিলাতে উহাকে ডেনেব (Deneb) অর্থাৎ "পুচ্ছতারা" বলে, এখন দেদার তারা ফুটিবে। অসুরভাগেও তিন হাজার তারা ফুটিবে।

শিষ্য। অসুর ভাগেও এক ছায়াপথ ফুটিল। অসুরভাগের শ্রেষ্ঠ ৮টী তারার মধ্যে কেবল মৎস্যমুখ বাদে—বাকী ৭টী তারা ছায়াপথের মধ্যে বা পাশে আছে।

গুরু। এখন তুমি আকাশের শ্রেষ্ঠ ২১টী তারা দেখিলে। সাত সায়ংকাল অনুশীলন করিলে ইহাদিগের সহিত বেশ পরিচয় হইবে। আকাশের যেখানে সেখানে দেখিলেও চিনিতে বাকী থাকিবে না। ইহারাই গগনের নিশান। নিশানগুলি ঠিক রাখিতে পারিলেই তারার হাটে তুমি দিশাহারা হইবে না।

শিষ্য। কৃত্তিকা নক্ষত্র সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং ধ্রুব তারা চিনিতে চাহি।

গুরু। রাত্রি ৯টা বাজিয়াছে। ঐ দেখ উদয়গিরির উপরে বিজলিবর্ষণ করিতে করিতে কৃত্তিকা নক্ষত্র উঠিতেছে, এক ঝাঁক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা। এই তারা গুচ্ছক ধীবরগণের তিত পুঁটীর ঝাঁক, কৃত্তিকা তারা-গুচ্ছকের শিরো-

মণি। চম্পকবর্ণ বলিয়া উপন্যাসে কৃত্তিকাগণ "সাতে ভাই চাম্পা" হইয়াছে। লৌকিক ভ্রম সপ্তর্ষিমণ্ডলে "সাতে ভাই" দেখিতে চাহেন।

শিষ্য। সপ্তর্ষিমণ্ডল কোথায়?

গুরু। ভোর বেলা পূঃ উঃ আকাশে সপ্তর্ষি দেখিতে পাইবে। মঘা নক্ষত্রের উত্তরে সাত তারা উঠিবে, যেন হাতী জলে বসিয়া আছে।

শিষ্য। এখন ধ্রুব দেখিব।

গুরু। সপ্তঋষির উত্তরে নির্জ্জনে ছোট তারা দেখিতেছ। আকাশের সকল তারা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিতেছে। কেবল ধ্রুব তারা অচল অটল ভাবে সারারাত স্থির হইয়া থাকিবে।

শিষ্য। দেবভাগের তারাগুলি আজ কখন দেখিতে পাইব?

গুরু। ভোরবেলা সায়ংকালের আকাশ অদৃশ্য হইবে, দেবভাগ দৃশ্য হইবে।

শিষ্য। প্রহরকি তারা (Royal Stars) চারিটী কোন্ কোন্ তারা।

গুরু। রোহিণী মঘা এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র এবং মৎস্য মুখ তারা এই চারিটী প্রহরকি তারা। ক্রমশঃ।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

শিথিল।

আঁটতে গিয়ে— শিথিল করি
নিত্যি নূতন কাজে—
কত মানুষ বিশ্ব-মাঝে—
বদ্ধ বেকুব সাজে।

দীর্ঘ দিবস নয়ন দুটী
প্রিয়স্পর্শে মাতিয়া—
বাঁধনগুলি শিথিল করে
অলস হৃদয় পাতিয়া।

হৃদয় থেকে 'শিথিল'টাকে
তাড়িয়ে দিতে তাই—
নয়ন হ'তে মাঝে মাঝে
আড়াল থাকা চাই।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

গণেশের গল্প।

পশ্চিমে গণেশের পূজার ভারি ধূম। বিশেষতঃ মাড়ওয়ারীরা গণেশের পূজা না করিয়া কোন কাযই করে না। শুভ কাযই হউক, আর মালী-মামলাই হউক, আগে গণেশের পূজা করা চাই। তা' যার যেরূপ ক্ষমতা সে সেই রমকই মানসিক করে।

একবার গ্রামে একজন মাড়ওয়ারীর এক মোকদ্দমা বাধে। বড় যা' তা' মোকদ্দমা নয়; লক্ষ টাকার মোকদ্দমা। মাড়ওয়ারী বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। কি হইবে কি না হইবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না, তায় আবার আসামী ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রাণে অশান্তির অবধি নাই। কি করিবে,—অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিল, "কাল কোর্টে যানেকা আগাড়ি গণেশজীউকা পূজা মান্‌সিক্ কর্‌কে যায়গা। আবিশ্ব মেরি মামলা জিত হোগা।"

পরদিন আদালতে যাইবার সময়, গণেশের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল। একটি দীর্ঘ প্রণাম করিয়া জোড়হস্তে মানসিক করিল—"গণেশজীউ, মেরি মাম্‌লাঠো আজ জয় করায়ে দেও; ঘর্‌মে লৌঠ্‌নেকা বখৎ আপকো একঠো পাঁন্‌শও রূপেয়াকা ডালী চড়ায়ে যাগা।" আর একটি টানা প্রণাম করিয়া মাড়ওয়ারী আদালতে চলিয়া গেল।

বাস্তবিক গণেশ যেন তার পূজা খাইবার জন্য লোলুপ হইয়াছিলেন। কাছারীতে পৌঁছিবামাত্রই মামলার ডাক পড়িল। আসামীও হাজির ছিল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই একটি সওয়াল-জবাব করিতে না করিতেই, বিচারক মায় খরচা পূর্ণ ডিক্রি দিলেন। আর ডিক্রির টাকা কোর্টেই চুকাইতে হুকুম করিলেন। কিন্তু আসামীর কাছে তখন টাকা ছিল না। "কল্য ফরিয়াদিকে পঞ্চাশহাজার টাকা দিব আর বাকী টাকা চারিদিনের মধ্যে মিটাইয়া দিব" বলিয়া প্রার্থনা করিল, হাকিম আর্জ্জি মঞ্জুর করিয়া মামলা শেষ করিলেন।

সেদিন আর মাড়ওয়ারী সময় অভাবে গণেশের মানসিক শুধিতে পারিল না। বাটী ফিরিয়া আসিল। পরদিন প্রাতেই মাড়ওয়ারি আসামীর বাটীতে গিয়া হাজির; আসামী তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকার মোহর গুণিয়া

দিল। মাড়ওয়ারী মোহর গুলীন গেঁজের মধ্যে পুরিয়া ক'সে কোমরে বাঁধিয়া গণেশের মন্দিরাভিমুখে চলিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন সবে মাত্র মন্দিরের দরজা খোলা হইয়াছে। সেবাইত ব্রাহ্মণ পূজার পাত্রাদি ধোয়া-পোঁছা করিতেছেন। তখনও ধোয়া-পোঁছা শেষ হয় নাই দেখিয়া মাড়ওয়ারী চটিয়া গিয়াছে; গণেশকে তাড়াতাড়ি একটি প্রণাম করিয়া মন্দিরের দরজার দুই পাশে দুই হাত দিয়া দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণকে বলিল,—"আরে এ ঠাকুর, আব্বিতক্ তেরা মন্দিরকা কাম্ নেহি হুয়া হায়? জলদি বরতন্-উরতন্ ধো-ধায় লেও।"

ঠাকুর। আচ্ছা, আপ থোড়া আরাম করো, তুরন্ত্ কাম্ করলেতা হায়।

মাড়ওয়ারী। হাঁ, ঝট্ পট্ কর্‌লেও, বয়েট্‌তা হায়।

ঠাকুর এ রকম গরম মেজাজে কিছু আশ্চর্য্য হইলেন; তা ছাড়া আর কি হইবেন? একে গরিব ব্রাহ্মণ, তায় পূজারি হট্ করিয়া ত আর গরম হইতে পারেন না! মনে মনে গণেশকে জানাইলেন,—বাবা, আজ কার মুখ দেখিয়া আসিয়াছি, সকালেই চোখ রাঙ্গানী খাইলাম। সারাদিন ভাগ্যে কি আছে তা জানি না। মাড়ওয়ারী কোনও উত্তর না পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"আরে তোম্ কেয়া বাত নেহি সম্‌ঝাতা হায়?"

ঠাকুর। হাঁ জী! আপকো বাত সম্‌জায়া হায়। আপকো কুছ কাম্ হায় মেরি সাত।

মাড়ওয়ারী। আরে তোমারা সাত কাম্ কুচ নেহি হায়; তোম্ ঝট্‌সে মন্দিরকা কাম্ কর্ চুকো।

ঠাকুর। মন্দিরকা কাম্‌কো সাত আপকো কেয়া কাম্ হায় বাবুজী?

মাড়ওয়ারী। আরে তোম্ ক্যায়সা পূজারি হায়? হাম্ জল্‌দি ডালী চড়ানে মাংতা হায়!

ঠাকুর। কেত'নাকি ডালী দেনা মানসিক হায়?

মাড়ওয়ারী। পান্‌শও রোপেয়াকা এক ডালী!

ঠাকুর। আচ্ছা সাহেব! আপ্ দালানপর বইঠো, হাম্ আব্বি সব কাম্ ঠিক্‌সে কর্দ্দেতা হায়।

"হাম্ বয়েটতা হায়, তোমারা কাম্ তোম্ পহেলা কর্‌লেও।" এই বলিয়া মাড়ওয়ারী দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন ব্রাহ্মণ কিছু সন্তোষের সহিত তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে লাগিলেন। প্রাণে সন্তোষের মাত্রাটা একটু বেশী রকম হইয়াছিল। একেবারে পাঁচশত টাকার ডালী; যাহা গণেশের মন্দির হইয়া অবধি হয় নাই। রোজ কোথায় দুই আনা, চারি আনা না হয় ছয় আনার পূজা জুটিত, আর আজ এক নৈবেদ্যে রোক পাঁচ শত টাকার পূজা হইবে। অবশ্য ব্রাহ্মণের আহ্লাদের মাত্রা বেশী হইবে বৈকি? তা ব্রাহ্মণ মনে করিতেছেন, এ অবশ্য গণেশেরই দয়া; দয়াময় ত প্রত্যহই আমার দুঃখ দেখিতেছেন। বেলা ৩টা পর্য্যন্ত ওঁর সেবা করিয়া বাটী যাই, চারিটার পূর্ব্বে কখনও আহার জোটে না, আহারও তৃপ্তির সহিত হয় না। একেত অভাব, তার উপর অভাবের জন্যই ব্রাহ্মণীর তাড়না, চোখের জল চোখে মারিয়া, গঞ্জনার সহিত দুই মুটা পেটে দিয়া থাকি! আজ পাঁচ শত টাকার ডালী; ব্রাহ্মণীও খুব খুসী হইবে, আর আমারও ভোজনটা বেশ হইবে। ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কার্য্য প্রায় সারিয়া আনিয়াছে। মাড়ওয়ারী বসে নাই, পাছে ঠাকুর দেরি করিয়া ফেলেন, তাই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ নিজের কার্য্য ঠিক করিতেছেন; মাড়ওয়ারী বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে। তার পক্ষে এক এক মুহূর্ত্ত, এক একটি প্রহর বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল—"কেয়া ঠাকুর, তোমরা কাম্ আজ শেষ হোগা নেই হাম্ দেকতা হায়। যো খুসী হোয়ে করো, হাম্ আউর ঠাহর্ণে সেক্তা নেই, চল্তা হায়।"

ঠাকুর। নেই বাবু সাহেব, মেরি কাম্ সব হো চুকা। মেরি কাম্ সব্ হো চুকা হায়। আপ্ আউর থোড়া বইঠে, আব্বি হাম্ ডালী চড়ায়ে দেতা।

মাড়ওয়ারী। আউর কেত্না বের হোগা?

ঠাকুর। নেহি, কুছ নেহি! বের আউর নেই হায়।

মাড়ওয়ারী। সব কাম্ হোগিয়া হায়?

ঠাকুর। হাঁ জী! সমুচা হো দেখিয়ে না।

মাড়ওয়ারী। আচ্ছা, তব্ যাও, ফুর্ত্তিসে ভালা দেক্কে ফুল-উল লেয়াও। হাম্ এই রক্পর বট্তা হায়।

ঠাকুর। বহুৎ আচ্ছা। আপ্ বয়ঠে। হাম্ ফুল্কা ওয়াস্তে যাতে হিঁ।

বাহ্মণ সাজি হস্তে ফুল আনিতে গেলেন।

মন্দিরের চারিদিকে চওড়া করিয়া রক গাঁথা ছিল। মাড়ওয়ারী তদুপরি

মন্দিরের দরজার ঠিক পাশে বাসিয়া, টাকা উপায়ের ফন্দি করিতে লাগিল।

এখন হর-গৌরী কৈলাস হইতে মর্ত্তে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। এদিক ওদিক বেড়াইতে বেড়াইতে, গণেশের মন্দির বরাবর আসিয়া পড়িলেন। গৌরী হঠাৎ থতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন। কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বড়ই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। গৌরীকে চিন্তিতা দেখিয়া হর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাবছ? এস না, পা ব্যথা ক'রছে নাকি?

গৌরী। না, মনটা কেমন যেন বিচলিত হ'য়ে গেল। গণেশকে অনেক দিন হ'লো দেখা হয় নি, কেমন আছে—

হর। তা বেশত! চল না, দেখে আসা যাক; আর বেশী দূরও ত নয়। এই যে নিকটেই, এই বাগানটা পার হ'লেই গণেশের মন্দির।

গৌরী। হাঁ, যাই চল।

উভয়েই গণেশের মন্দিরে আসিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই গৌরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গণেশ! কেমন আছ বাবা?"

গণেশ। আপনার আশীর্ব্বাদে মা ভাল আছি। আপনারা ভাল আছেন?

গৌরী। হাঁ বাবা! আমরা বেশ আছি। তুমি সুখে থাক। আমরা এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম। তোমার জন্য মনটা কেমন কর্ত্তে লাগল, তাই একবার দেখতে এলাম।

গণেশ। আমার পরম সৌভাগ্য, আজ সুপ্রভাত, পিতা মাতার শ্রীচরণ দর্শন পেলাম; আমারও অনেক দিন হ'লো আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন হয় নাই, তা— আপনারা কখন বেরিয়ে ছিলেন?

হর। এই সকালেই; বেশী দূর ত যাই নাই, এদিক পানে আসতেই গৌরী তোমায় দেখবার জন্য ব্যাকুলা হ'লেন। এই বাগানটার উপর দিয়া অমনি চলে এলাম।

গৌরী। হাঁ বাবা গণেশ! ঠাকুর তোমার বেশ করে যত্ন-টত্ন করে ত? সেবার কোনও অযত্ন হয় না ত?

গণেশ। না মা; আমার কোনও কষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণ বড়ই ভক্তি করে; অতিশয় প্রাণের সহিত আমার পূজাদি করে, কিন্তু মা ব্রাহ্মণ বড় গরিব। দৈনিক আমার পূজায় যা কিছু পায়, তাতে ওদের স্ত্রী-পুরুষের

চলে না। বোধ হয় দু'বেলা পেট ভরাও হয় না। আমার ইচ্ছা করে, আপনি কিছু ব্রাহ্মণকে দেন।

গৌরী। বটে! তা তুমি এত দিন ত আমায় কিছু বল নাই? তা বেশ; আজ ঠাকুরকে এক লক্ষ টাকা দিও। আমি পাঠাইয়া দিব।

গণেশ। যে আজ্ঞা।

গৌরী। হ্যাঁ তবে দিও, আমরা এখন আসি।

গণেশ। আচ্ছা মা আসুন।

এই বলিয়া হর-গৌরীতে চলিয়া গেলেন।

মাড়ওয়ারী নিঃশব্দে বসিয়া সমস্ত কথাগুলি স্থিরকর্ণে শুনিয়াছে। মনে মনে মতলব ভাঁজিতে লাগিল! ই-ক্যায়া তাজ্জ্যব্ কি বাত,—স্বয়ং হর্‌গৌরী মন্দির্‌সে নেকাল গিয়া; ভিতরমে গণেশকো সাথ্ আধা ঘণ্টেকে উপর বাত্-চিত হুয়া হায়। গৌরী মাইনে খোদ বাভন্‌কো লাখ্ রোপেয়া দেনেকো বোল গিয়া, ই-বাত কভি ঝুটা হোনে নেহি সেঁকতা। বাঃ! ধন্যেয় গণেশজীউ—মেরা নসিবকো কেয়া তেজ! এ রোপেয়া হাম্‌কোই মিল্‌নেকোওয়াস্তে সব্ বাত্-চিত হুয়া। লেকিন মত্‌লব্ আবি ই-হায়— বাভন্‌কা তো ইস্‌ব্বাত কুছ মালুমমে আয়া নেই। উ বেসাই আয়েগা ওসাই উন্‌কো পুছেগা, তোম আজকো—ও শ্বশুরিয়া আগিয়া।

ব্রাহ্মণ ফুল লইয়া আসিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিতেই,—মাড়ওয়ারী শশব্যস্তে মন্দিরের দরজার স্যামনে আসিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল— "ঠাকুর আচ্ছা ফুল উল্ মিলা?

ঠাকুর। হাঁ জী, মিলা হায়।

মাড়ওয়ারী। আচ্ছা বেশ। বহুত আচ্ছা। তও জল্‌দি পূজামে বয়ঠো।

ঠাকুর। হাঁ; হাত-পাঁও ধোকে বয়েটতা হায়।

ব্রাহ্মণ সত্বর হাত পা ধুইয়া আসন পাতিয়া পূজায় বসিলেন।

মাড়ওয়ারী। দেখ ঠাকুর, আজ আউর কৈকা ডালী-উলী হায়?

ঠাকুর। নেই; মালুম নেই। গণেশজীউকো মর্জ্জি হোয়ে তো আউর্‌ভি আনে সেকতা।

মাড়ওয়ারী। আচ্ছা, দেখো—তোম্ এক কাম্ করো। আজ্‌কো পূজামে যো কুচ্ আবেগা সব হাম্‌কো বিকো। তোম্ ইস্‌ওয়াস্তে কেত্তা টাকা মাংতা ব'লো?

ঠাকুর। আপ্ কেয়া বোল্‌তা হায়, হামারি সমজ্‌মে আতা নেই।

মাড়ওয়ারী। শুনো, হাম্ বোল্‌তা হায় এই বাত্-যো আজকো ভর্‌দিনমে, যো কুছ পূজাকা ডালী-উলী, ফল্-উল্, কেয়া পয়সা-কড়ি ভি আবেগা, হাম্ সব্ মোল লেনে মাংতা। উস্‌কিওয়াস্তে তোম্ কেত্‌না দাম লেনে মাঙতা হায়। বোলো, জল্‌দি বোলো, বের হো যাতা হায়।

ব্রাহ্মণ কি বলিবেন কিছু ঠিক করিতে পারিতেছেন না। এ একটা সম্পূর্ণই নূতন ধরণের কথা। কত দামই বা বলিবেন, পূজাই বা কত যুটিবে, আজ মাড়ওয়ারীইবা হঠাৎ এ রকম কথাই বা বলিল কেন, কিছু ভাল বুঝিতে পারিলেন না। অগত্যা চুপ করিয়া রহিলেন।

মাড়ওয়ারী কোনও উত্তর না পাইয়া অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মনে করিতে লাগিল,—কেয়া মুস্কিল, বাভন্ হামরা বাত্‌কো জবাব্ নেই দিয়া। কেয়া করে, আবি রূপেয়া দেখতা আযাগা আনে সেই ভামন্ সব্ লেলেগা। হাম্‌রা মতলব্ তো খাট্টা হো যাগা। এই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের উত্তরের অপেক্ষা আর করিল না। নিজেই তখন দর হাঁকিতে স্থির করিল। ব্রাহ্মণকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল—কেয়া ঠাকুর—একটা দর-ভাও বাত্‌লাও। আরে ঝট্‌সে বোলো না—কেত্‌না মাংতা হায়; আচ্ছা যাও —দশহাজার লেও।

ব্রাহ্মণ কি বলিবেন! চুপ্।

মাড়ওয়ারী। পনের হাজার লেও। আচ্ছা বিশ্ হাজার—যাও।

ব্রাহ্মণ বিশ হাজার শুনিয়া আত্মহারা হইয়া চুপ। কোন উত্তর নাই।

মাড়ওয়ারী, ব্রাহ্মণ বিশে রাজি নয় বুঝিয়া, আরো হাঁকিল—ক্যায়া পঁচিশ হাজার, ত্রিশ হাজার, পঁয়ত্রিশ হাজার, চল্লিশ হাজার লেও।

ব্রাহ্মণ তখন প্রায় অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন। মাড়ওয়ারী বুঝিতে না পারিয়া, মনে করিল বাভন্ বড়া চালাক। কেয়া করে—কেয়া করে—দেখতা রূপেয়া আ গেল। আতা হায় হোগা, যো শালা সব মাট্টিহোনে যাতা হায়—আউর ক্যায়া? দেখেতো কেসা বাভন্ হায়—এ ঠাকুর, তোম কেয়া বোলতা হায়, বোলোনা। কেয়া উস্‌মে তেরা দিল উট্‌তা নেই? তব্ যাও, পূরা পঁয়তাল্লিশ হাজার লেও, যাও, যাও, পঁচাশ হাজারই লে লেও। আও মোহর গুন্‌তি কর লেও। রূপেয়া মেরি পাস নেহিকে। সব্ মোহর হায়—দরজার সামনে বসিয়া সেই গেঁজেটী কোমর হইতে খুলিতে লাগিল।

এদিকে ব্রাহ্মণেরও ঠিক পাইবার সময় হইয়াছে কিনা। ব্রাহ্মণও আর চুপ করিয়া না থাকিয়া "আচ্ছা" মোহরই দেও বলিয়া মাড়ওয়ারীর সামনে বসিলেন।

মোহরগুলি গুণিয়া কাপড়ে, "এই নামাবলীতে" বাঁধিয়া ঘর্ পরসে জল্‌দি আতা হায়, বলিয়া, চলিয়া গেলেন।"

মাড়ওয়ারী, ঠিক সেই রকেতে গিয়া দরজার পাসেই বসিল। কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—হাম্ কেয়া ভুল চুকা! বহত্ গল্‌তি কিয়া। ক্যায়া করেগা। পহেলাই ইস্‌মে ফের্ পড়্ গিয়া। পান্-শওকা ডালী মান্‌সিক্ কর্ণা উচিত নেই হুয়া, থোড়া কম্‌তি কর্কে বোল্‌না ঠিক থা। এক দেড় শওকা ডালী ফুকর্ণা ঠিক থা! বাভন্‌কো আউর্ পান শ দেনা পড়েগা। অঃ হো—নেই—নেই দেখ মেরা কেসা ভুল হো যাতা, উ পান শও তো হাম্ মোল্ লিয়া হায়। ঐ পচাশ্ হাজারকো ভিতর; যোঃ—যানে দেও, তব্বি মেরা পচাশ হাজারকো লোফা হোয়েগা। এই রকম হিসাব নিকাসে সময় কাটাইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ মোহর লইয়া মতলব করিতে করিতে যাইতেছেন; আজ বাড়ী গিয়া একবার বামণীকে দেখিব। চিরকালটা বিবাহের দিন হইতে, কি গঞ্জনাটাই না দিয়াছে। কেবল টাকা পয়সা, টাকা পয়সা, গহনা-গাঁটি, কাপড় চোপড় এই লইয়া দুই বেলার এক বেলাও সুখে আহার করিতে দেয় নাই। আর নিজেও কখন সুখী হয় নাই।

বরাবর সদর দরজায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সেইখান হইতেই বামণী! বামণী! বলিয়া চিৎকার শব্দে ডাকিতে ডাকিতে বাটীর ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন। চীৎকার শব্দ শুনিয়া, ব্রাহ্মণী কিছু গরম হইয়া উঠিলেন, চেঁচাইতেছে কেন, এ রকম করিয়া কখন ত চিৎকার করে না, আজ কি হইল! ক্ষেপিয়া উঠিল নাকি! কি! কি! হ'য়েছে কি? এমন ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন? এই বলিয়া, ঘরের ভিতর হইতে উঠানে আসিয়া ব্রাহ্মণের সামনে দাঁড়াইলেন।

ব্রাহ্মণ একবার স্ত্রীর রেগো মুখখানির দিকে তাকাইয়া, নিজে একটু ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন—এই নে, এই নে, রাগ্‌ছিস্ কেন? দেখনা কত মোহর এনেছি! এবার তোর অনেক গহনা হ'বে।

ব্রাহ্মণী, হাসি মুখে আহ্লাদে তেরখানা হইয়া "কৈ কৈ দেখি" বলিয়া

তাড়াতাড়ি সেই নামাবলী বাঁধা পুঁটুলীটি ধরিয়া নিজেই উঠানেতেই খুলিয়া ফেলিলেন। মোহর দেখিয়াই ব্রাহ্মণী স্তম্ভিতা হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ না ও নাও, শীঘ্র নাও। এখনও গণেশের পূজা করা হয় নাই, বলিয়া তাড়া দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন হাঁ গা! এত মোহর কোথা পেলে গা? কাকেও মেরে টেরে ফেলনি ত?

ব্রাহ্মণ। আরে না না। কি বলছিস্!

ব্রাহ্মণী। তবে, কোথায় পেলে? কারু চুরি চামারি ক'রে আননি ত, তা হ'লে দরকার নেই। এ জন্মে ত এই দুঃখ, আর কেন, সুখের জন্য চুরি চামারির দরকার নেই।

ব্রাহ্মণ। না, তা নয়, গণেশ দিয়েছেন। তাঁর রোজ সেবা করি, তিনি তোমারই দুঃখ মোচনের জন্যই দিয়েছেন, কৈ এত দিন ত আনি নি। মোহর কি আর রাস্তা-ঘাটে, বস্তা বস্তা পড়ে আছে যে, বোমা মেরে বার ক'রে নিয়ে এলুম।

ব্রাহ্মণী। তবে ঠিক ক'রে বল না, কোথায় পেলে! কি করে পেলে। আমার শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হ'চ্চে!

ব্রাহ্মণ পিছন দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া বলিলেন—যাও, আগে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এস, খোলা রয়েছে। কেউ হঠাৎ এসে টেঁসে পড়বে।

ব্রাহ্মণী। না, এমন সময় আমাদের বাড়ীতে কে আসবে? কেউ আসবে না;—বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

ব্রাহ্মণ। এখন নাও, এগুলো রেখে দাও। আমি যাই, অনেক বেলা হয়ে গেছে, পূজা করা হয়নি।

ব্রাহ্মণী। তা হোক, তুমি খপ করে বলে যাও কোথা পেলে?

ব্রাহ্মণ। এখন থাক, পূজা ক'রে এসে বলবো এখন।

ব্রাহ্মণী। না---তুমি ব'লে যাও।

ব্রাহ্মণ। আঃ, চুরি-টুরি ক'রে আনিনি, এক মাড়ওয়ারী আজ পূজো দিতে এসেছিল, সে এখনও ব'সে আছে, আমি গেলে তার পূজা হবে। সে সকালেই এসে বল্লে, ঠাকুর আজ আমি পাঁচশ টাকার পূজো দেবো, তুমি শীগ্‌গির ক'রে ভাল দেখে ফুল-টুল নিয়ে এসোগে। আমি তাকে মন্দিরে রেখে ফুল আনতে এলুম, সেই যে ফুল নিয়ে গেলুম, মনে হচ্ছে না?

ব্রাহ্মণী। হাঁ হচ্ছে! সেই যে নিয়ে গেলে।

ব্রাহ্মণ। ঐঃ—সেই ফুল নিয়ে যেতেই, মাড়ওয়ারী বাবুটি বল্লেন,—ঠাকুর আজকের পূজোর পালাটি আমায় বেচে ফেল। কত টাকা দিতে হ'বে বল। আমি চুপ ক'রে রইলুম। সে নিজেই দশ হাজার, পনের হাজার টাকা দাম হাঁকতে লাগল। আমি ত আর রোকা নই! অত টাকা শুনেই আরও বাড়বে ভেবে চুপ করেই থাকলুম। শেষ সে নিজেই পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার্য্য ক'রে, টাকা ছিল না ব'লে, গেঁজে থেকে এই মোহরগুলি ঢেলে গুণে দিলে, আমিও অমনি নামাবলীতে বেঁধে নিয়ে, আসছি ব'লে—সটান একেবারে তোমার কাছে এসে হাজির, শুনলে ত? তবে সে কেন যে আজ পূজোর পালা কিনলে, তা ব'লতে পারিনি। এখন নাও বেশ ক'রে রেখে দাও আমি চল্লুম। ব্রাহ্মণ আর দেরী করিলেন না—চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণী অনেকক্ষণ ধরিয়া মোহরগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া, ঘরের এক কোণেতে পুঁতিয়া রাখিলেন।

ব্রাহ্মণ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। তাড়াতাড়ি হাত পা ধুইয়া আসন লইয়া পূজায় বসিলেন। মাড়ওয়ারী ব্রাহ্মণের পাশে বসিয়া পূজা দেখিতে লাগিলেন।

বেলা ৩ টা পর্য্যন্ত পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। প্রসাদ যাহা কিছু ছিল এবং আর আর যাহা কিছু পূজায় পাইয়াছিলেন, সমস্তই গুছাইয়া লইয়া মাড়ওয়ারীকে ডাকিয়া বলিলেন,—বাবুজী আজকো পূজামে মিলা হায়—পান-শ তিন দেড় আনা রূপেয়ামে, আউর ফল চাউলমে চার পানসের তক্‌ হ'গা। আপ সব লিজিয়ে, বখত বহুত হুয়া, মন্দির বন্দ-কর্‌কে হাম্‌ ভোজন করনে যাগা।

মাড়ওয়ারী। হাঁ, তোম যাও, রুটী-উটী জিম্‌কে আও। হাম্‌ হিঁয়া-পর বয়েটতা হায়, কোন্‌ জানে বোলো? আবি বখত বি হায়, আউর কুছ পূজা-উজা, ডালী-উলী আনে ভি সেকৃতা।

ব্রাহ্মণ। হাঁ' ঠিক হায়। আপকো কহেনেমে ঠিক হায়, মগর গণেশ জীউকা সব চিজ পটর হায়, মন্দিরকা দরজা খোলকে ক্যাসা যাঁউ।

মাড়ওয়ারী। কুছ পরওয়া নেই! হাম খোদ পেহেরামে রহেগা, ভাবনা জিন করো, এক ছিদামভর নেই লোকসান হোগা, যোকুছ ঘাটি পড়েগা হাম দেগা।

ব্রাহ্মণ। আপ হিঁয়াপর ভর্‌দিন বয়েট রহ'গে ?

মাড়ওয়ারী। তো।

ব্রাহ্মণ। রোটি-উটি কুছ নেই জিমোগে ?

মাড়ওয়ারী। ও পিছু দেখা যাগা। আরে তামাম দিন বিত্‌যাতা হায়, আব্বিতক্ শালা মুমে পানি ভি নেই দিয়া হায়।

ব্রাহ্মণ। হঁা জী, ঐ বাততো হাম্ বোলতাই হায়! কেয়া হাম্ আপকো কুছ জল-উল খানেকা বন্দবস্ত করদেগা ?

মাড়ওয়ারীর বেশী কথা কহিতে বড়ই বিরক্ত বোধ হইতেছিল। বামুন বেটা কেবলই দেরী করিতেছে। নড়িবার বেশ আদৌ ইচ্ছা নাই, এদিকে বেলাও হইয়া গিয়াছে,পাছে টাকাটী ওর সামনেই আসিয়া পড়ে; আবার হয় ত কিছু অংশও চাহিয়া বসিবেক। বামনকে তাড়াইতে পারিলেই যেন বাঁচে।

মাড়ওয়ারী। নেই নেই, দরকার নেই। তোম্ যাওনা, কাহে বের-করর্ত্তেহেঁা ? তোম্ যাও—যাও, বের কর জিন।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা সাহেব! হাম্ তব্ চলতা হায়। লেকিন মন্দির আপ্‌কো উপর ছোড় যাতেহিঁ, কুছ লোক্‌সানি হোগা তো আপকো গুণা-গার দেনে পড়েগা। হঁা হাম্ বোল চুকা, পিছু গণ্ডগোল না হোয়ে; আচ্ছা হাম্ যাতা হায়।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। মাড়ওয়ারী সেই দরজার পাসটিতেই বসিয়া রহিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই এই টাকা আসিল—এঁই টাকা আসিল, আর দেরী নাই, আসিয়া পড়িল আর কি। এই আশাই করিতে করিতে সারা দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, তখনও টাকা আসিয়া পৌঁছিল না। মাড়ওয়ারী ক্রমশঃ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছে, সারাদিন আহার নাই, হাত মুখ পর্য্যন্ত ধোয়া হয় নাই, ঠায় সেই এক স্থানেই বসিয়া আছে; আদৌ নড়িতে পারিতেছে না, কি জানি, পাছে সরিয়া গেলে টাকাটি আসিয়া পড়ে, আর গণেশ চাপিয়া রাখেন, কি কোনও রকম গোলমাল হইয়া পড়ে, তাহা হই-লেই ত সব মাটি হইয়া যাইবে। এই সন্দেহে আর নড়িতে-চড়িতে সাহস করিতে পারিল না।

ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার পূজা ও শীতল দিবার জন্য পুনঃ মন্দিরে আসিলেন। দেখেন মাড়ওয়ারী ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া আছে। নড়ে চড়ে নাই, বা একটুও সরে নাই।

মাড়ওয়ারীর মতলব কি ব্রাহ্মণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না, জোর করিয়া উঠিয়া যাও বলিতেও পারিতেছেন না। রোক পঞ্চাশ হাজার টাকার মোহর গুণিয়া দিয়াছে, কি করিয়াই বা বলেন। অগত্যা চুপ করিয়াই গেলেন। আপন পূজাদি সারিয়া বাড়ী যাইবার সময় বলিলেন,—কেয়া আপকি রাত ভোর হিঁয়া রহেগা—ডেঁরামে যাওগে নেই ?

মাড়ওয়ারী। তোমরা কেয়া ? হামরা খুসী। যো বখত্ মর্জ্জি হোগা যায়গা। তোমরা কেয়া ! তোমতো পুরা পচাশ হাজার মার্ লিয়া হায়,—দেখে কো রাতমে কুচ ডালী উলী দেনে আতা কি নেই।

ব্রাহ্মণ। কা ! রাত ভোর মন্দির খোলা রাখে গা ? বাবুজী আপতো সমজদার আদমি হায়, সাম্‌জাইয়ে ক্যায়সা মন্দির ভোর রাত খোল্ ছোড়নে সাকৃতা ?

মাড়ওয়ারী। কুছ হরজা নেই, তোম যাও মন্দির খোলা রহেগে দেও। মন্দিরকা ক্যায়া কৈ জি হাম্ চোরি কলেগা ? যাও, পচাশ হাজার মার লিয়া হায়। তোমরা কেয়া, যো হোতা হাম্ সাম্‌জাতা, আউর সম্‌জানে কৈ নেই হায়, কুছ লোক্‌সান হোনেসে হাম্ দেগা, তোম্ যাও।

ব্রাহ্মণ মাড়ওয়ারীর রাগ দেখিয়া অগত্যা মন্দির খোলা রাখিয়াই চলিয়া গেলেন।

মাড়ওয়ারী বসিয়াই রহিল ; সন্ধ্যা গিয়া, বেশ রাত হইয়া পড়িল। টাকা আসিল না ; রাত প্রায় দ্বিপ্রহর হইল, টাকা আসিল না। প্রভাত হইতে চলিল টাকা আসিল না, ভোর হইয়া গেল ; বেলা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, তখনও টাকা আসিল না, মনে করিল, আউর বের হোগা নেই, আবি আ যাগা নেইতো গৌরীমাই খোদই রোপেয়া লে আবেগা, থোড়া বহৎ বেরকা মারে কুছ ভাবনা নেই। বাভন্‌কা ওয়াস্তেই হাম্ ডেরাতা ; পূজা করনেকা বখত আতা হায়। রোপেয়া আযানেসে মুস্কিল হোগা, ফের উন্‌কো কুছ দেনে পড়েগা, লেও—ঐ বাভন্ আগিয়া।

ব্রাহ্মণ আসিলেন, তাঁর পূজাদি সব সারিলেন, একবার মাড়ওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্যায়া বাবুজী কুছ খাওগে কি নেই ?

মাড়ওয়ারী। নেই, নেই, কুছ নেই খায়েগা ; তোম্ যাও। মন্দির রণে দেও ওসাই।

ব্রাহ্মণ। আব জি খালা রেহেগা ?

মাড়ওয়ারী। হাঁ রহেগা, রাত দিন রহেগা।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, যাতা, বইঠো ; ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

মাড়ওয়ারী রকেতে পাইচারি করিতে লাগিল ; ক্রমশঃ বেলাও গড়াইতে থাকিল ; সন্ধ্যা হইল। রাত্রি আসিল ; টাকা আসিল না। গৌরীও আসিলেন না রাত্রি গভীর হইল, কিন্তু পায়চারি করা বন্ধ হইল না। ভোর হয়, তখনও পাইচারি করিতেছে। সকাল হইল অথচ টাকা আসিল না, মাড়ওয়ারী আর সহ্য করিতে পারিল না। অধীর হইয়া পড়িল ; আর সহ্য করিতে পারিল না, প্রাণ আর মানে না, হাত মুখ ধোয়া নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, এমন কি মল-মূত্রাদিও ত্যাগ নাই, একেবারে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পাগল হইয়া পড়িল। তার উপর পঞ্চাশ হাজার টাকার মোহর বাহির হইয়া গিয়াছে, এদিকে আবার লক্ষ টাকা পাইবার আশা। আর কি সহ্য হয় ? প্রাণটা শেষ গণেশের উপর বিগড়াইয়া গেল, বলিল—কেয়া তাজ্জ্যব কি বাত ! গৌরী খোদ্ বোল গিয়া, হাম লাখ রোপেয়া ভেজদেতা হায়, ও রোপেয়া আব্বিতক্ নেই আয়া ? ই-সব গণেশকা চালাকি, উন্‌কাই মতলবমে ই হোতা হায় ; রোপেয়া লেয়াওতা নেই। আচ্ছা হাম্‌ভি মাড়ওয়ারী, খাস বনিয়াকা বেটা। দেখতা হায় রহো কেসা গণেশ হায়,—এই বলিয়া মাড়ওয়ারী মন্দিরের ভিতরে আসিয়া গণেশের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল,—সেই শ্বেত পাথরের প্রমাণ মুর্ত্তি, গম্ভীর, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ অথচ যেন মুর্ত্তির চোক্ষু দুইটী সতেজ, নড়িতেছে, ফিরিতেছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যেন মোটা পেটটী উঁচু-নীচু হইতেছে, মূর্ত্তিখানি সামনে পিছনে যেন হেলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—এইসেন্ জীউবান্ মুর্ত্তি, আউর হামারি বরাবর ভকত্‌কা সাত এত্তা চালাকি ! দাগাবাজী ! মেরা সাত ! ঠক্‌লাণেকা মতলব ? আজ তিন্ তিন্ রোজসে ভুখান্‌মে মর্ত্তেহি তোম দেখতা নেই ? মেরা রোপেয়া কাঁহা লেয়াওতো ? লেয়াও—তেরা মাতারি যো লাক রূপেয়াকা বাত বোল্ গিয়া হায়। ঐ রোপেয়া জল্‌দি লেয়াও, বের জিন করহ, লেয়াও হাম ভুখন্‌মে মর্ত্তা হায়,—কেয়া নেই মাঙ্গাওগে ? আরে শশুরিয়া হাম্ মেরি গাঁট্‌সে পচাশ হাজার দিয়া হায়, তেরা বাতমে দিয়া—লাক্ রোপেয়া মিল্‌না চাহিয়ে ; হু—বাত নেই শুন্‌তেহ ? আরে বাত নেই সম্‌জমে আতা হায় ? জবাব দেওনা শশুরিয়া—বলিয়াই গণেশের গালেতে টানিয়া এক চড় মারিয়া বসিল ; যেমনই চড় মারিল অমনই

সেই মূর্ত্তিখানি কাঁদেতে হাতখানি কসিয়া চাপিয়া ধরিলেন। আর ছাড়িবেন না। মাড়ওয়ারী ছোড়ঃ, ছোড়ঃ, ছোড়ঃ মেরা হাত ছোড় দেও। ছোড় দেও মেরা হাত, পচাশ হাজার রোপেয়া ভি লেলিয়া, হাত ভি ছোড়তা নেই, ক্যায়া বাত হায়; কেসা বিচার হায়! ছোড় গণেশ জীউ! ছোড় দেও। আঃ—হা—জখম্ হো তা হায় জিউ। কস্থুরি মাপ্ কর্ণা, জখম্ জিন কর হো। গণেশ ত হাত ছাড়িবেন না। বরং মধ্যে মধ্যে এক একবার একটু আধটু অন্তর টিপনী দিতেছেন, আর মাড়ওয়ারী আঃ উঃ করিতেছে। আর ছোড় দেও, বলিয়া চেঁচাইতেছে। আর এক একবার হাতখানি ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

এদিকে হর-গৌরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া গৌরী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হ'য়েছে গণেশ! হয়েছে কি! কি হ'য়েছে! হাত নিয়ে এত টানাটানি হ'চ্ছে কেন, ব্যাপার কি?

গণেশ। না মা ব্যাপার এমন কিছুই নয়, আপনি ব্রাহ্মণকে লাক টাকা দিতে বলে গিয়েছিলেন। তা এই মাড়ওয়ারী পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে, আর পঞ্চাশ হাজার দেয় নি ব'লে, এই হাত ধ'রে রেখেছি।

গৌরী। সেকি গো বাপু। গণেশের সঙ্গে ঝগড়া কেন? অ্যাঁ ছি, ছি, ছেলে মানুষের সঙ্গে কি ঝগড়া করা উচিত। কৈ তোমার ঠাকুরকে ত দেখছি না গণেশ?

গণেশ। ঐ যে মা আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে!

গৌরী। কি গো ঠাকুর! তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছ?

ঠাকুর। না মা! টাকা পাইনি, মোহর পেয়েছি।

গৌরী। তা বেশ, ঐ ভাঙ্গালেই টাকা হ'বে।

ঠাকুর। মা এদের গোলটা মিটিয়ে দিয়ে যান, সকাল থেকে এই রকম গণ্ডগোল, চেঁচাচেঁচি কচ্ছে।

গৌরী। কি গো মাড়ওয়ারী বাবু! আর মিছে মায়া কচ্ছ কেন, বাকী পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্রাহ্মণকে দাও, গণেশ হাত ছেড়ে দেবে এখন। দুঃখ করলে কি হবে বাবু, তুমি এক সময় অনেক মেরেছ, আর এই সে দিন লাক টাকা পেয়েছ, বরং আরও বেশী। আজ না হয় গরিব ব্রাহ্মণকে লাক টাকাই দিলে; যাও বাকী টাকা দাও।

মাড়ওয়ারী। মাই, এ ক্যায়সা আপকো দয়া! আপ্ খোদ গণেশ-

জীউকো বোলকে গিয়া থা, লাক রোপেয়া ভেজেগা। ঠাকুরকো দিও, আবি হাম্‌সে লেতা হায় ?

গৌরী। আমাদের টাকা ত আর স্বর্গে বস্তাবন্দি জমা নেই যে, পাঠিয়ে দেবো। এই তোমার নিয়ে আজ ব্রাহ্মণকে দিলাম, আবার একদিন ব্রাহ্মণের নিয়ে আর একজনকে দেবো। এই রকম করেই টাকা পয়সার ব্যবহার হয়, দেয়াথোয়াও হয়। বুঝলে বাপু ?

মাড়ওয়ারী। হাঁ মা। ঠিক্‌সে সমজায়া হায়। কুচ গল্‌তি নেই।

গৌরী। তা বেশ। তবে এখন যাও, বাকী টাকাগুলি এনে দাও।

মাড়ওয়ারী। বহুৎ আচ্ছা মাতা হুকুম্ দিজে হাত ছোড় দেনে, আবি লেয়ায় দেতে হিঁ।

গৌরী। আচ্ছা, ওকে ছেড়ে দাও গণেশ।

গণেশ। না মা। ছেড়ে দিলে আর আসবে না, ও মাড়ওয়ারী।

গৌরী। না বাবা, আমার কাছে ব'লে যাচ্ছে যখন, নিশ্চয় আসবে কোন চিন্তা নাই।

গণেশ হাত ছাড়িয়া দিলেন। মাড়ওয়ারী বেগে চলিয়া গেল; উদ্দেশ্য টাকাটা গৌরীর সামনেই আনিয়া দিবে। তা আর হইল না, হর-গৌরী তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

মাড়ওয়ারী পরক্ষণেই টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিল। গৌরী মাই চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইল। টাকা সব গণেশের সামনেই গুনিয়া দিয়া গোঁ ভরে চলিয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিল, হর-গৌরী ফিরিয়া আসিতেছেন। গৌরী, মাড়ওয়ারীকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—কি গো ব্রাহ্মণের টাকা সব দিয়েছ ?

মাড়ওয়ারী। দিয়া হায় মাই! আপকো সামনেমেই দেনেকো মুনাশিব থা। লেকিন্ উ হুয়া নেই।

গৌরী। আচ্ছা, তাতে কোন ক্ষতি নেই। এখন কথা হচ্ছে এই যে, তুমি গণেশের সঙ্গে অত দ্বন্দ্ব করলে, তার জন্য কিছু ভেবেছ কি ? এত বড় গর্হিত কাজটা, মহাপাতক করে ফেল্লে—তার প্রায়শ্চিত্ত কি ?

মাড়ওয়ারী। মাই! আপকো আউর পিতাকো স্বশরীরমে দর্শন কিয়া হায়। এক দফে নেই,—দো তিন্ দফে—তবি এ দীন্‌কো পাতক্ খণ্ডন হুয়া নেই।

হর বলিয়া উঠিলেন বেটা কি চালাক। ঠিক ঔষধ ঝেড়েছে।

গৌরী হাসিয়া ফেলিলেন। পাতকনাশের জন্য আর কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। শেষ বলিলেন আচ্ছা বাপু, তুমি বড় হুঁসিয়ার দেখছি। তা এক কাজ কর, শাস্তির স্বরূপ আর পাঁচশ টাকা দিয়ে ব্রাহ্মণকে শীগ্‌গির করে, একটি বাড়ী তৈরী করে দাও; আর ও পাঁচশ টাকাও পূজো মেনেছিলে ত? না হয় পালার মধ্যেই হিসেব করে নিয়েছিলে। যাইহোক, বাড়ীখানি ব্রাহ্মণকে করে দাওগে। আমরা চল্লুম—দেখো আর যেন কিছু গোলমাল হয় না।

হর-গৌরী হাসিতে হাসিতে কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

মাড়ওয়ারীও বিষণ্নমনে হর-গৌরীর বিচার ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ ও বাকী পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া আনন্দে গণেশকে গণ্ডা গণ্ডা প্রণাম করিয়া, গৃহে চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণী আবার অত টাকা পাইয়া পরম আহ্লাদিতা হইলেন। টাকাগুলি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এক সঙ্গে বসিলেই, কেবল গণেশের দয়ার কথাই হইত।

কিছুদিনের মধ্যেই গৌরীর আদেশ মত মাড়ওয়ারী ব্রাহ্মণকে একখানি একতলা বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সমস্ত বিষয়ই গণেশের নামেই উৎসর্গ করিয়া দিলেন। বাটীর সম্মুখে একটী মন্দির করিয়া শ্বেত প্রস্তরের প্রমাণ মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। নিত্য ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উভয়েই গণেশের পূজা করিয়া সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তর পশ্চিম তীর্থ-ভ্রমণ।

(১)

অনেকদিন বেড়াইতে যাইতে পারি নাই, তাই এবার আনন্দময়ীর শুভ আগমনে বিদেশ ভ্রমণেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। কোথায় যাইব, কোথায় থাকিব তাহার কোনরূপ বিশেষ চেষ্টা বা মীমাংসা না করিয়াই বাহির হইলাম। অনেকে বলেন যে, তীর্থে যাইতে হইলে নাকি অনেক অর্থের আবশ্যক হয়; ঠাকুরের পূজা, পাণ্ডার দর্শনী, তীর্থস্থানের ব্রাহ্মণ, সধবা, কুমারী-ভোজন ও নিজেদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার উপযোগী আহার্য্য ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করিতে অনেক অর্থব্যয় হয় বলিয়া, অনেকে ঐ সমস্ত আজুহাতের দোহাই দিয়া বিদেশ গমন, বিশেষতঃ তীর্থ ভ্রমণের নামেই পিছাইয়া পড়েন। কিন্তু বিদেশ-ভ্রমণে একটু অভ্যস্থ হইলে এতটা বলিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষেই তীর্থ দর্শনের সুবিধা বেশী, কারণ অর্থশালী ব্যক্তিগণ যেখানেই থাকুন অপরিমিত অর্থব্যয়ে নিজেদের সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন; কিন্তু গৃহস্থ সম্প্রদায় দুঃখের ক্রোড়েই লালিত-পালিত হওয়ায় সাধারণতঃ কষ্টসহিষ্ণু হইয়া থাকেন; সুতরাং পথশ্রমে বিশেষ কাতর হন না, ও ২।১ দিন আহারের অল্পতা ও অসুবিধা হেতু তাদৃশ কষ্ট অনুভব করেন না। আর এক কথা, তীর্থ দর্শনের খরচ ইত্যাদির উত্তরে বক্তব্য এই যে, যদি পয়সা খরচ না করিলে দেবতার কৃপা না হয়—তবে সাধু সন্ন্যাসীদিগকে পাপী বলিতে হয়, কারণ তাঁহারা যেখানে যান ঠাকুর দর্শন ও প্রণাম করিয়া চলিয়া যান। দর্শনী, পূজা ইত্যাদির জন্য টাকা পয়সা তাঁহারা স্পর্শই করেন না। তবে অবশ্য ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসীর কথা স্বতন্ত্র। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, যাহার বাংলা অর্থ "ইচ্ছা থাকিলেই কার্য্য করিতে পারা যায়," অর্থাৎ কার্য্যের ইচ্ছা চাই, মন চাই। অবশ্য বিদেশে শারীরিক কষ্ট অনেকটা সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে বাস করিয়া পরচর্চ্চা, পরশ্রীকাতরতায়, এর তার বাটীতে গিয়া তাস, দাবা, পাশা ইত্যাদিতে দিনের মধ্যে পঁচিশ ছিলুম তামাক ভস্ম করার চেয়ে বিদেশে সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ২।১০ দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া দেবতা দর্শন করাই সুখের ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। আমার

এই দীর্ঘ দিনের বিদেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, তীর্থে গমন করিলে শারীরিক কষ্টের কথা ততটা মনে হয় না, উপরন্তু মনে নূতন ভাব জাগিয়া উঠে; আর সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়া ক্ষুধাও বেশ প্রবল হয় সুতরাং সুবোধ বালকের মত যাহা পাওয়া যায় তাহাই খাওয়া যায়, আর বিছানা বালিশ মশারির অভাবে নিদ্রারও বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় না।

(২)

একদিন বৈকালে হাবড়ার ষ্টেশনে গিয়া কাশীর একখানি টিকিট করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী যথাসময়ে ছাড়িয়া একেবারে ব্যাণ্ডেল-জংসনে আসিয়া থামিল। ব্যাণ্ডেলে একটী চার্চ্চ বা উপাসনা মন্দির আছে, ঐ চার্চ্চের নামানুসারেই বোধ হয় ষ্টেশনটীর নামকরণ হইয়াছে। এখান হইতে গাড়ী ছাড়িয়া বর্দ্ধমানে পৌছিল। বর্দ্ধমানে সমস্ত গাড়ীই অনেকক্ষণ থামে। দূরের গাড়ীতে ভীড়ও খুব হয়, আমি এই স্থানে নামিয়া গেলাম। বর্দ্ধমান সহরটী খুব প্রাচীন। ষ্টেশন হইতে ২।৩ মাইল দূরে অত্রস্থ মহারাজাধিরাজের বাস ভবন, চিড়িয়াখানা, গোলাপবাগ প্রভৃতি বর্ত্তমান। এখানে জলের কল আছে। গত ১৩২০ সালের বন্যায় বর্দ্ধমানের যে যে, অংশের ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ বন্যার বিষয় অনেক প্রকার গল্পও শুনিতে পাইলাম। এখানে আমার একজন পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু বাস করেন, তাঁহারই সাহায্যে কতক কতক দেখিয়া শুনিয়া লইলাম ও রাত্রি ১০টার সময় পুনরায় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মোকামা প্যাসেঞ্জারে চাপিয়া যাত্রা করিলাম। ক্রমে গাড়ী অণ্ডাল জংসনে পৌছিল। এইখান হইতে ১টী শাখা লাইন বাহির হইয়া লুপ লাইনে সাঁইথিয়ায় মিলিত হইয়াছে ও অপর ১টী লাইন সীতারামপুর জংসনে মিশিয়াছে। এখানে অনেক কয়লার খনি আছে, ঐ সকল খনির কারখানার 'চীম্‌নি' হইতে দিবারাত্রি বহুপরিমিত ধুম নির্গত হয়, একারণ তত্রস্থ অধিবাসীদিগকে অত্যন্ত জ্বালাতন হইতে হয়। বৃহৎ বৃহৎ কয়লার স্তূপে আগুন ধরাইয়াছে,—গাড়ীতে যাইতে যাইতে দেখিতে পাওয়া যায়—বেশ দৃশ্য; কিন্তু ঐ কাঁচা কয়লার ধোঁয়াতে অন্য কিছুই দেখা যায় না। ইহার পর রাণীগঞ্জ ষ্টেশন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এই রাণীগঞ্জ পর্য্যন্তই ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রথম রেলওয়ে লাইন খোলা হয়, তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে রেলওয়ে লাইন ছিল না। হাবড়া হইতে রাণীগঞ্জ ১২৩ মাইল। এই রেলওয়ে লাইন খোলাতে 'সীপাহী-বিদ্রোহ'

সময়ে আহার্য্য ও যুদ্ধোপকরণ বহন করার অনেক সুবিধা হইয়াছিল। ৬১ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে কিছু বেশী একশত মাইল রেলবিস্তৃতি ছিল, কিন্তু এই ৬১ বৎসরে সমগ্র ভারতে প্রায় ত্রিশ হাজার মাইল] রেল বিস্তৃতি হইয়াছে। ধন্য ইংরাজ! তাঁহাদের অসীম, অপরিমেয় ক্ষমতা বলে ক্রমে ক্রমে অসম্ভবও বাস্তবে পরিণত হইবে। এই রাণীগঞ্জে বারণ কোম্পানির (Burn &co) একটি মাটির কারখানা (Pottery workshop) আছে তথায় অতি সুন্দর সুন্দর মাটির জিনিষ তৈয়ার হইতেছে। ইহার পর আসানসোল জংসন ষ্টেশন। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর রেল মিলিত হইয়াছে। সমস্ত ষ্টেশনটি এবং মালগাড়ী দাঁড়াইবার সাইডিং (Siding yard of goods trains) ইয়ার্ড পর্য্যন্ত সমস্তই ইলেকট্রিক্ আলোতে আলোকাকীর্ণ। বড় সুন্দর ও চমৎকার দৃশ্য। এখানে অনেক সাহেবদের ছোট বড় 'বাংলা' আছে। এখানে ৩৫ মিনিট অপেক্ষা করিয়া ট্রেণখানি সীতারামপুর জংসনে পৌঁছিল।

(৩)

পূর্ব্ব হইতেই ইচ্ছা ছিল যে কোনও রকম সুবিধা পাইলেই এক বার কয়লার খনিতে নামিয়া দেখিতে হইবে। আমার এক ভগ্নীপতি এই সীতারাম পুরের অনতিদুরবস্থিত 'বারাবাণী' কোলিয়ারিতে কর্ম্ম করেন। তাঁহাকে পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া ছিলাম; তিনি বারাবাণী ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি সীতারামপুরে অবতরণ করিয়া সীতারামপুর অণ্ডাল লাইনের গাড়ীতে আরোহণ করিলাম ও ৮।১০ মিনিট পরেই বারাবাণী পৌঁছিলাম। শ্রীমান্ ভগ্নীপতিটীর সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার বাসায় পৌঁছিলাম। তারপর যথারীতি আলাপ আপ্যায়ন সমাপ্ত হইলে আহারাদিও সমাপ্ত হইল। তৎপর দিবস প্রাতে উঠিয়া চা পান ও প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া খনিতে নামিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া একটি কপিকলের নিকটে গেলেন। ঐ কপিকলের সাহায্যে ভিতরে নামিলাম। শুধু কপিকল বলিলে সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিবেন না। দশ বার টন কয়লা বোঝাই ছোট মাল গাড়ী সকল ঐ কপিকলের সাহায্যে দুইশত হাতেরও অধিক নিম্ন স্থান হইতে কয়লা তোলা হয়। ঐ গাড়ীতে কয়লা উপরে উঠাইয়া তাহা ক্ষুদ্র লাইন সাহায্যে একেবারে 'সাইডিং' এ ঠেলিয়া দেয় এবং অপর একখানি ঐ ক্ষুদ্র খালি মালগাড়ী নীচে নামাইয়া

দেওয়া হয়। খনির কর্ম্মচারিগণ ও কুলি মজুর প্রভৃতি সকলেই ঐ কপিকল-সাহায্যে নীচে নামা উঠা করেন। ভিতরে খুব অন্ধকার; মাঝে মাঝে সুবৃহৎ কেরোসিন ডিবাতে আলো জ্বলিতেছে। অস্মদ্দেশে মাটিকাটা 'গাঁতি' দ্বারা কয়লার 'চাপ' কাটিতেছে। কতকলোকে ঐ সকল 'চাপ' ঝুড়ি বোঝাই করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত মালগাড়ীতে বোঝাই দিতেছে। উপরে টান দিলেই তাহারা মালগাড়ী ভর্ত্তি হইয়াছে জানিতে পারে ও গাড়ীখানিকে উপরে উঠাইয়া লয়। উপরকার চেয়ে ভিতরে খুব ঠাণ্ডা। এক একটি খনিতে কয়লা উঠাইবার ৩।৪টী দ্বার আছে। কিয়ৎকাল এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইবার পর উপরে উঠিলাম। তারপর বাসায় আসিয়া স্নানাহার সম্পন্ন করিলাম। সন্ধ্যার পর সকলের নিকট যথারীতি বিদায় গ্রহণ করিয়া আসানসোল ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলাম। এখান হইতে আসানসোল রেলষ্টেশন ১০ মাইলের কিছু কম। পদব্রজে রওনা হইয়া রাত্রি ১০টার কিছু পূর্ব্বে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। যথাসময়ে গাড়ী আসিল,—দাঁড়াইল; যাত্রীদের উঠা নামা শেষ হইলে গর্ব্বভরে হুস্ হুস্ শব্দ করিতে করিতে মধুপুরে পৌঁছিল।

(৪)

মধুপুর খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। কলিকাতার ধনকুবেরগণ (স্বাস্থ্য খারাপ হউক বা না হউক) ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ (প্রাণের দায়ে) কর্ম্ম অবকাশ সময়ে ও আরোগ্য হইবার আশায় এইখানে আসিয়া থাকেন। দেশ, পল্লী, ম্যালেরিয়াতে উচ্ছন্ন যাইতেছে—যাক্ সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, কিন্তু ছুটীতে দুদশ দিনও এই মধুপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া বাস করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি করা চাই। এখানে হিন্দু যাত্রীদিগের জন্য নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় হয়। যথাসময়ে এখান হইতে গাড়ী ছাড়িল ও কিয়ৎক্ষণ পরে মোকামা ঘাটে পৌঁছিল। বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলপথের কোথাও যাইতে হইলে এই স্থানে গাড়ী বদল করিয়া পরপারে সেমুরিয়া ঘাটে গাড়ীতে উঠিতে হয়। মোকামা ঘাট হইতে মোগলসরাই ষ্টেশনের মধ্যে বাঁকীপুর ষ্টেশনটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের হেড্ কোয়াটার এই বাঁকীপুর। ঐ প্রদেশের ছোটলাট সাহেব বৎসরের অধিকাংশ সময় ঐ স্থানেই বাস করেন। দিবা ১১টার সময়ে গাড়ীখানি ধীরে ধীরে মোগলসরাই জংশনের প্লাটফরমে পৌঁছিল। আউধ রোহিলখণ্ড ও ইষ্টইণ্ডিয়া

রেলের জংশন এইখানে, এই ষ্টেশনে গন্তব্য স্থানের গাড়ী, ঠিক করিয়া লইয়া উঠা বড় শক্ত ব্যাপার। প্ল্যাটফরমের সংখ্যাও অনেকগুলি। অত্যধিক যাত্রী সমাগম হয় বলিয়া, গাড়ী হইতে নামিবার পর যাত্রীদিগকে 'মোসাফিরখানাতে' (Passengers waiting Hall) সরাইয়া দেওয়া হয়। কলিকাতা হইতে মোগলসরাই ৪১৯ মাইল। এখান হইতে কাশীধাম ১০ মাইল মাত্র, মোগলসরাই ষ্টেশনের অনতিদূরে একটী হিন্দু ধর্ম্মশালা বা পান্থাবাস আছে। শ্রীযুক্ত রাম জি দাস জাঠ মহোদয় এই পান্থাবাসের প্রতিষ্ঠাতা। তিনশত ব্যক্তি এক সঙ্গে এই বাটীতে বাস করিতে পারে এত স্থান আছে। আহারাদির ব্যবস্থা অবশ্য যাত্রীদিগকে নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়। ধন্য সদাশয় মাড়বার জাতি! ধন্য তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জন! অর্থের সদ্ব্যবহার তাঁহারাই শিখিয়াছেন। যাত্রীগণ বিনা ব্যয়ে ২।৪ দিন স্বতন্ত্ররূপে বাস করিতে পারেন। ধর্ম্মশালার বন্দোবস্ত খুব সুন্দর! চাকর, দাসী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান কর্ম্মচারী (Superintendent) পর্য্যন্ত যাত্রীদিগের নিকট খুব বিনয় ব্যবহার করেন। কোনও যাত্রীর কোনও অসুবিধা যাহাতে না হয় সে জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট। বিদেশী পথশ্রান্ত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত যাত্রীরা দুই হাত তুলিয়া, মুক্তকণ্ঠে, সরল প্রাণে ভগবানের নিকট এই সকল সদাশয় ধর্ম্মপ্রাণ মাড়বারদিগের যশ, উন্নতি ও দীর্ঘ-জীবন কামনা করেন। আমি ১ রাত্রি এই পান্থাবাসে কাটাইয়া পরদিন প্রাতে কাশী পৌছিয়াছিলাম।

(৫)

মোগলসরাই ষ্টেশন ছাড়িয়া, আউধ রোহিলখণ্ড রেল পথের রাজঘাট ষ্টেশন। এই ষ্টেশনের নিকটে গঙ্গার উপরে একটি লৌহ সেতু বর্ত্তমান। ভারতেশ্বরীর দশম প্রতিনিধি ও অষ্টাবিংশতিক শাসনকর্ত্তা আর্ল ডাফরিণ (Earl of Duffering) কর্ত্তৃক ১৮৮৭ সালে এই সেতু তৈয়ারী হয়। এই সেতুর দৈর্ঘ্য ১২০০ গজ হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে এই সদাশয় শাসনকর্ত্তা হুগলী ও নৈহাটীর মধ্যে গঙ্গার উপর অপর একটি সেতু তৈয়ার করাইয়াছেন। ইঁহারই শাসনকর্ত্তৃত্ব সময়ে ১৮৮৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎবর্ষ কাল রাজত্ব পূর্ণ হয়। দিল্লীসহরে ইংরাজ অধিকারের পর ১৮৮০ সালে প্রাথমিক রাজদরবার হয় (In the time of Lord Lytton) তাহার পর ১৮৮৭ সালের ১৬ ফ্রেব্রুয়ারী তারিখে দ্বিতীয়

দরবারের অনুষ্ঠান হয়। ইহাই সর্ব্বসাধারণের নিকট জুবিলি মহোৎসব বলিয়া পরিচিত। এই লৌহ সেতুর উপর হইতে সুউচ্চ মিনারদ্বয় (বেণী-মাধবের ধ্বজা) সমন্বিত সমগ্র কাশী সহরটি অতি সুন্দর দেখায়। ভারত-বর্ষের কুত্রাপি এরূপ সুন্দর নয়নবিমোহন দৃশ্য দেখা যায় না। ইহার পরেই বেনারস কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন। এখানে বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথও আছে। এখানে আউধ রোহিলখণ্ড লাইনের, রাজঘাট, কেণ্টনমেণ্ট, বি, এন, ডবলিউ রেলের কাশী ও বেনারসসিটি, এই এতগুলি ষ্টেশন বর্ত্তমান। যাহার যে দিক দিয়া ইচ্ছা, আসিয়া, যে কোন ষ্টেশনে নামিয়া কাশীতে আসিতে পারেন। যথাসময়ে কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে নামিয়া পড়িতেই, অভিমন্যুর সপ্তরথী বেষ্টনের ন্যায় পাণ্ডার দল ঘেরিয়া দাঁড়াইল। এখানকার পাণ্ডারা অতি বদ্‌লোক, তাহা পূর্ব্বেই লোকপরম্পরায় জানা ছিল, সুতরাং বিশেষ সতর্ক হইয়া রঘুলাল নামক এক পাণ্ডার আশ্রয় লইয়াছিলাম।

(৬)

তাহার বাসায় দিবা প্রায় ৮টার সময়ে উপস্থিত হইলাম। কাশীর পাণ্ডাকে গুণ্ডা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খুব সাবধানতা সহকারে, বেশী বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া ইহাদের সহিত ব্যবহার করা উচিত। ইহারা সমস্ত দুষ্কার্য্য করিতে সক্ষম বলিয়া অনুমান হয়। যাহা হউক, যাত্রীদিগকে পাণ্ডা-দিগের বাটী থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পরদিন সকালে উঠিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে গেলাম। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের রাস্তায় সর্ব্বদাই লোকের ভিড়; বিশেষতঃ সন্ধ্যায় ও সকালে অত্যন্ত লোকসমাগম হয়। রাস্তার দুধারে মেয়েরা পূজার ফুল বিক্রয় করিতেছে। বিশ্বনাথদেবের মন্দির ও প্রাঙ্গণ শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত ও ক্ষুদ্রায়তন। প্রাঙ্গণের মেঝেতে রৌপ্যমুদ্রা দিয়া পাথরের উপর বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ৩টি মন্দির। মাঝখানকার মন্দিরের চারিদিকে ৪টি দ্বার। ইহারই দক্ষিণদিকে ১টি ছোট মন্দিরে বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ বিরাজিত। এই মন্দিরের উপরিভাগ সুবর্ণমণ্ডিত। কথিত আছে যে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ এইরূপ সোণা দিয়া মুড়িয়া দিয়াছেন। বিশ্বনাথের লিঙ্গমূর্ত্তি, ফল ফুল ও বিল্বপত্রের চাপে একরূপ অদৃশ্য হইয়াই থাকেন। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার ঠাকুর-দেবতা আছেন। এখান হইতে অন্নপূর্ণার মন্দির খুব নিকটেই। কাশীতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন; অন্য কিছু দেখা হউক বা না

হউক, এই দুইটি প্রথমে দর্শন করিয়া তবে আর সব দেখা না দেখা দর্শকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মন্দির মধ্যে অন্নপূর্ণাদেবীর প্রস্তর নির্ম্মিত সুবর্ণ-মণ্ডিত দেবী-মূর্ত্তি বিরাজিতা; অন্নপূর্ণামন্দির বিশ্বেশ্বর মন্দির অপেক্ষা কিছু বড়; মন্দিরের পশ্চাতে ১টি বৃহৎ গোশালা আছে, তথায় অনেকগুলি গাভী পালিত হইয়া থাকে।

(৭)

কাশীতে অনেক ঘাট বর্ত্তমান আছে। ১ অসিঘাট, ২ শিবালয় ঘাট, ৩ দণ্ডী ঘাট, ৪ হনুমান ঘাট, ৫ শ্মশান ঘাট, ৬ কেদার ঘাট, ৭ রাজা ঘাট, ৮ নারদ ঘাট, ৯ সোমেশ্বর ঘাট, ১০ নন্দ ঘাট, ১১ বাঙ্গালিটোলা ঘাট, ১২ চৌষট্টি যোগিনী ঘাট, ১৩ বালা মহল ঘাট, ১৪ মুন্সী ঘাট, ১৫ অহল্যাবাঈ ঘাট, ১৬ শীতলা ঘাট, ১৭ দশাশ্বমেধ ঘাট, ১৮ প্রয়াগ ঘাট, ১৯ মানমন্দির ঘাট, ২০ ভৈরব ঘাট, ২১ ললিতা ঘাট, ২২ নেপাল ঘাট, ২৩ জরাসন্ধ ঘাট, ২৪ মণিকর্ণিকা ঘাট, ২৫ সিন্ধিয়া ঘাট, ২৬ গণেশ ঘাট, ২৭ ভীম ঘাট, ২৮ ভোঁসলা ঘাট, ২৯ রাম ঘাট, ৩০ পঞ্চগঙ্গা ঘাট, ৩১ দুর্গা ঘাট, ৩২ বিন্দু-মাধব ঘাট, ৩৩ গাই ঘাট, ৩৪ ত্রিলোচন ঘাট, ৩৫ প্রহ্লাদ ঘাট, ৩৬ রাজ ঘাট, ৩৭ বরুণাসঙ্গম ঘাট, ৩৮ পিশাচ মোচন ঘাট, ৩৯ অগ্নীশ্বর ঘাট, ৪০ কষ্টহারিণী ঘাট ইত্যাদি। তন্মধ্যে অসি ঘাট, দণ্ডী ঘাট, কেদার ঘাট, চৌষট্টি যোগিনী ঘাট, অহল্যা ঘাট, শীতলা ঘাট, দশাশ্বমেধ ও মণি-কর্ণিকা ঘাট প্রসিদ্ধ ও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া বেড়ানই উত্তম। সমস্ত ঘাটগুলি বেশ পরিষ্কাররূপে দেখিবার সুবিধা হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমি চাহি না।

আমি চাহিনাকো নাথ, কুল, ধন, মান
আমি চাহিনা হে সুখ সম্পদে।
আমি চাহিনা প্রাসাদ, দাস দাসী জন
আমি চাইগো থাকিতে বিপদে॥

আমি চাই না শুতে খাট পালঙ্কে
কায কি সে সুখ-শয়নে।
আমি চাহি না পোলাও, কোর্ম্মা, কাবাব
চাহি না সে ছার ভোজনে॥
চাহি না ত আমি শাল, দোঁশালায়
চিক্কণ বসন ভূষণে।
আমি কেন তবে বৃথা ভার বয়ে মরি
ধরিয়া সারাটী জীবনে॥
আমি চাহি না আলোক ঝলকেতে যদি
দিশে হারা হয় আঁখি।
আমি আঁধারে লইব খুঁজি নিজ পথ
তোমারে লইব ডাকি॥
আমি মিলনের আশা নাহি পোষি হৃদে
ভাল লাগে মোর বিরহে।
আমি কাঁদিব ডাকিব "নাথ" "নাথ" বলে,
তুমি বধির থেকো না হে॥
তুমি দাও বা না দাও দেখা, মোর মতি
রাখিও ধরম করমে॥
তুমি অন্তরে থাকি, ল'য়ো দীন-অর্ঘ্য
যা' দিব ভকতি কুসুমে॥
আমি "দয়াময় হরি" নামটী পেয়েছি
আর কিছু সাধ নাই হে।
আমি জপিব তাহাই, কিছুই না চাই
(শুধু) স্মরণে তোমারে চাই হে॥

শ্রী, স, ভট্টাচার্য্য।

শিক্ষার দোষ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দ্বিপ্রহরের খর দিবাকর পৃথিবীকে রৌদ্রোত্তপ্ত করিবার জন্য প্রাণপণে করবর্ষণ করিতেছিলেন। সে তাপে পরিতপ্ত হইয়া পৃথিবী ত্রাঁহা ত্রাঁহা করিতেছিল,—পথিক পথ ছাড়িয়াছিল,—পশু-পক্ষী শান্তির জন্য ছুটিয়া বৃক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল। সারমেয়কুল আকুল হইয়া গৃহস্থের গৃহ-চ্ছায়ায় গড়াগড়ি পাড়িতেছিল। চাতক বৃক্ষপত্র মধ্যে দেহ লুকাইয়া ফটীক জ—লে'র করুণার্ত্তস্বরে তাহার কোন্ পূর্ব্বপরিচিতকে সাধনা করিতেছিল।

এই অগ্নি-মধ্যাহ্নে বঙ্গের সহনশীল কৃষকগণ ধূ ধূ প্রান্তরে নীরবে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছিল। তাহাদের গাত্র অনাচ্ছাদিত—মস্তক অনাচ্ছাদিত—উদরও হয় ত পূর্ণ বুভুক্ষু।

চাঁদের হাটের উত্তর মাঠে একদল কৃষক ঐরূপ এক রৌদ্রদগ্ধ ভূমিতে লাঙ্গল চষিতেছিল। সংখ্যায় তাহারা দশ বার জন হইবে।

একজন আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল,—"দেখ্‌না মেঘা, বেলা ঠিক হ'য়েছে;—কেমন? লাঙ্গল খুলা যাক্।"

সেদিন মেঘাই মণ্ডলের পালা। তাহার ক্ষেত্রে সে সকলে লাঙ্গল চষিতে-ছিল। যে সময়ে প্রত্যেক দিন কর্ষণ কার্য্য সমাধা হয়, সেদিনও তাহাই হইবে। কাযেই ক্ষেত্রস্বামীর অনুমতি-সাপেক্ষ।

মেঘাই আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল,—"বেলা ঠিক হ'য়েছে। কিন্তু মামু, আর দুটো পাক ঘুরে এলে দু'য়াড় উঠে যায়।"

দু'য়াড় অর্থে একটা জমিতে দুইবার কর্ষণ করা। কৃষকেরা সে কথার কোন প্রতিবাদ করিল না। যেমন চষিয়া যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল।

প্রায় দুই দণ্ড পরে তাহাদের কার্য্য শেষ হইল; তাহারা বলদের স্কন্ধ হইতে 'ঘুঁয়াল' তুলিয়া লাঙ্গল নামাইয়া অবসর লইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় একজন পথিক আসিয়া সেই ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মাথায় ছাতি—পায়ে চটিজুতা। গায়ে নামাবলী—কিন্তু ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। পথিক কৃষকগণের পরিচিত।

নেপালমণ্ডল সেলাম করিয়া বলিল,—"ঠাকুর মশায়, কোথায় গেছিলেন ?"

ঠাকুর মহাশয় স্মৃতিরত্ন। শ্রান্তির শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন, —"ফরিদপুর গিয়াছিলাম।"

বলদের গলার দড়া খুলিয়া তাহাদিগকে চরিবার উদ্দেশে ছাড়িয়া দিয়া, নেপাল বলিল,—"কেন ঠাকুর মশায়; আপনি আবার ফরিদপুর কেন গেছিলেন ?

স্মৃতি। দয়াল মিত্র যে আমার নামে গোপনে এক মিথ্যা ডিক্রী ক'রেছে।

হানেফ মণ্ডল বলিল,—"শুনিস্‌নি চাচা, মিছে ক'রে গোপনে এক ডিক্রী ক'রে ঠাকুরের যে সব বেচে নিয়ে গিয়েছে।"

নেপাল। না, তা ত আমি শুনিনি। আর শুনেই বা কচ্ছি কি! এদেশে আর মান্‌ষির বাস বসতি করা চলে না। এমন হক্‌ পয়মাল হ'লি চলে কি ক'রে।

নকড়ি। আ'জ দয়াল মিত্তিরির মায়ের ছরাদ না ?

স্মৃতি। হাঁ।

নকড়ি। তানারা শূদ্দুর—মার ছরাদ, কোথায় বামুন-পণ্ডিত দান দেবে, না মিছে ক'রে সব বেচে কিনে নিলে! আর দুপুরে রোদে ঠাকুর যে কষ্ট পাচ্চেন, এ কি যমের খাতায় নেকা প'ড়বে না ? এখনকার মানুষ সব হলোই বা কি!

হানেফ মণ্ডল বলিল,—"এর কি কোন পত্তিকার নাই ?"

স্মৃতি। কে বলিল, প্রতিকার নাই ? ন্যায়বান্‌ বৃটিশের রাজত্বে অত্যাচারীর অত্যাচার টিঁকে না। তবে যতক্ষণ বিচারকের দৃষ্টিগোচর না করা যায়, ততক্ষণ আর কি হইবে ?

হানেফ। কৈ মশায়,—এই যে জমিদারের লোকেরা আর জমিদার আমাদের উপর পশুর মত অত্যাচার ক'রছে—তার প্রতিকার কোথায় ?

স্মৃতি। তোমরা যথোপযুক্ত ভাবে কাজ করিতে পারিতেছ না।

হানেফ। আমরা যে চাষামানুষ মশায়;—আমরা কি সব কাজ বুঝি; না সব কথা গুছিয়ে ব'ল্‌তে পারি ? দেশে এমন মানুষ কেউ নাই যে, গরিবের দিকে হয়। আপনি যদি আমাদের পক্ষে দাঁড়ান, তবে আমরা বাঁচিতে পারি।

নকড়ি বিশ্বাস বলিল,—"আরে ভাই; উনার নিজের জ্বালাতেই উনি

পথ দেখতে পাচ্চেন না। সুমুদ্দির মিস্তির উনাকে ভিঁটে ছাড়া ক'রে তুলেছে।"

স্মৃতি। আমার সর্ব্বস্বান্ত হোক—আমার দেহে যতক্ষণ রক্ত-বিন্দু আছে, ততক্ষণ অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে অত্যাচারিতকে রক্ষা করিবার জন্য আমার দুর্ব্বল বাহু প্রসারণ করিব। আমার গৃহে অন্ন-জল না থাকিলেও মুখের গ্রাস ক্ষুধিতকে দিয়া উপবাসী থাকিব, নিজে শীতাতপ সহ্য করিয়া গাছতলার আশ্রয়টুকুও নিরাশ্রয়ের জন্য ছাড়িয়া দিব। আমি যে বিশ্বহিতৈষী ব্রাহ্মণের বংশধর।

নকড়ি স্মৃতিরত্নের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিয়া বলিল,—"দাদাঠাকুর; এমন বামুন জগতে থাকলে দরিদ্রের কোন ভয় থাকে না।"

স্মৃতি। আমি আমার ক্রোকী সম্পত্তি আদালতে গিয়া মুজাম দিয়া আসিয়াছি—দেখি কি হয়। তোমরা সন্ধ্যার পরে আমার বাড়ী যদি যাইতে পার,—সকল বিষয় শুনিয়া যে পরামর্শ হয়—করা যাইবে।

নকড়ি। আমাদের মধ্যে আবার দলাদলি আরম্ভ হ'য়েছে দাদাঠাকুর।

স্মৃতি। সে কি নকড়ি?—ঐ-ত সর্ব্বনাশের মূল। দলাদলি কি রকম?

নকড়ি। হিন্দু-মুসলমানে। হিন্দু মুরুব্বিরা বলিতেছে, মুসলমানেরা চিরকাল উদ্ধত, ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ো না,—মুসলমানেরা বলিতেছে, হিন্দু বিশ্বাসঘাতক—আমাদের ছোঁয় না, আমাদের ঘৃণা করে—ওদের সঙ্গে এক হ'য়ো না।

স্মৃতি। উভয় দলই বোকা। জমিদার অত্যাচারের আগুণ লইয়া গ্রাম দগ্ধ করিতে উদ্যত—আর তোমরা এই সময় দল পাকাইয়া গৃহ-বিবাদে লিপ্ত? কোন্ আদিপুরুষ তোমাদের কি বীরত্বের কাজ করিয়াছিল,—কবে হিন্দু-মুসলমানে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল,—সে কথা ভাবিয়া নির্জীব আমরা—দরিদ্র আমরা—পথের ভিখারী আমরা—আমরা কি করিব? সীতে বন্ধুর ছেলে রাগ করিয়া যাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, জমিদারের ক্রোধ-বহ্নিতে যাহাদের গৃহদাহ হয়—ছেলেপুলে পথের কাঙ্গাল হয়—তাদের আবার জাতীয় গৌরব? পুঁথি-পাজিতে পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব-গাথা পড়িয়া লাঙ্গুলে চাষা নকড়ি বিশ্বাসের বা ফল কি, আর হানেক মণ্ডলেরই বা লাভ কি? তবে এক লাভ আছে যে,—এ জাতি কি ছিল, আর কি হইয়াছে? যাক্,—এ সময় বোকার কথায় ভুলিয়ো না। মনে রাখিয়ো, এক আইন, এক শাসন,

এক স্বার্থ, এক অভিযোগ উভয় জাতির উপরে বিদ্যমান। জমিদারের অত্যাচারে দগ্ধ হইলে উভয় জাতিই মরিয়া যাইবে। সকলে এক হইয়া ন্যায়বান বৃটিশের বিচারে রক্ষা পাইলে উভয় জাতিই সুখে থাকিবে। আমার খাওয়া দাওয়া হয় নাই,—আমি এখন চলিলাম, সন্ধ্যার সময় তোমরা আমার বাড়ী যাইয়ো।

সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

কল্পনা।

যখন দুঃখ সয়না প্রাণে
কেঁদে উঠি আপন মনে।
তখন তুমি এসে কাছে
বীণা বাজাও নূতন তানে॥
আমার দুঃখ কান্না সকল যায়
শুনি তোমার গান।
চোখ বুজিয়ে স্বপ্ন দেখি
শান্তি পোরা প্রাণ॥
তাই বুঝি মা, দাওগো দেখা
দিতে চরণ ধূলি।
তোমার ধূলি দিয়ে মাথায়
সকল কষ্ট ভুলি॥
গভীর রেতে সবাই ঘুমোয়
(কেবল) জেগে থাকি আমি।
অন্ধকারে যেথায় দেখি
সেথায় দেখি তুমি॥
পাই যেন মা, এমন মায়ের
দেখা চিরকাল।
শেষের দিনে,—মরণ সময়
পূর্ণ যবে আয়ু-কাল॥

শ্রীঅনন্তলাল ঘোষ।

অদ্বৈতবাদ।

অনেকের ধারণা, হিন্দু অদ্বৈতবাদ বুঝে না,—হিন্দুধর্ম্মের অস্থি-মজ্জায় দ্বৈতবাদ মাখান। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়,—একথা হিন্দু-ধর্ম্ম বুঝিতে পারে না,—তাই হিন্দুধর্ম্মে বহু উপাসনা, বহু আরাধনা,—বহু দেবতার পূজা-পদ্ধতি।

বাস্তবিক তাহা নহে। হিন্দু অদ্বৈতবাদ উত্তম রূপই অবগত আছে,—আরও সেই অদ্বৈত ব্রহ্মের বিকাশ বুঝে,—তাই হিন্দু বহু-উপাসক। কথাটা ক্রমে আলোচনা করা যাইতেছে। হিন্দু-শাস্ত্র জানেন,—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্
তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত॥ ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৬।২।১

তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। মহাসাগরে যেমন তরঙ্গ উত্থিত হয়, এই জগত্-প্রপঞ্চও তদ্রূপ সেই ব্রহ্মের তরঙ্গ। তাঁহা হইতে উত্থিত হইয়াছে, আবার তাঁহাতেই লয় হইবে,—আবার উঠিবে, আবার লয় পাইবে। মহাসাগরের তরঙ্গ যেমন সাগর হইতে বিভিন্ন পদার্থ নহে,—ব্রহ্ম-তরঙ্গে সমুত্থিত বিশ্বও তেমনি ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন পদার্থ নহে। ব্রহ্মই বিশ্ব, বিশ্বই ব্রহ্ম।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।
অথাহুঃ ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুবান্ লোকে
পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং
কুর্ব্বীত॥ ছান্দোগ্য উপনিষৎ; ৩।১৪।১

হিন্দুর এই মহাবাক্য—এই মহৎ মীমাংসা সর্ব্ব বর্ণের সর্ব্ব ধর্ম্মের চরম মীমাংসা। ইহার উপরে নূতন কথা, নূতন মীমাংসা নাই,—কেবল এই ব্রহ্মকে নানা দেশে, নানা ধর্ম্মে, নানা ভাষায়, নানা আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে খোদাতালা বলে, কেহ গড্ বলে, কেহ কেহ বা অন্য নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

এখন হিন্দুর বিশেষত্ব এই যে,—হিন্দু তাঁহাকে নির্গুণ ও সগুণ উপাধি

প্রদান করিয়া থাকে। যখন তিনি অপ্রকট, তখন তিনি নিগুর্ণ; এবং যখন তিনি প্রকট অর্থাৎ সাকার, তখনই তিনি সগুণ। হিন্দু-মত, তাঁহার নিগুর্ণ অবস্থা মানবের ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত নহে,—যখন তিনি সগুণ, যখন তিনি সাকার, যখন মহেশ্বর, তখনই তিনি ধ্যান-ধারণা-যোগ্য, এবং প্রভু।

ইহা কি কেবলই হিন্দুর কল্পনা? তাহা নহে। সগুণ ও নিগুর্ণ, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের এই দুইটি ভাব। ব্রহ্মের এই দুইটি ভাবের কথা অস্বীকার করিবার উপায় কাহারও নাই।

বিষয়টা অতি গুরুতর। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যাহা নিগুর্ণ, তাহা সগুণের বুঝিবার উপায় কি,—যে, যে ভাব-বিশিষ্ট, সে সেই ভাবই বুঝিতে পারে। বস্তুতঃ নিগুর্ণ ব্রহ্মই সগুণ,—ভাবান্তর মাত্র। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, তখনই নিগুর্ণ, আবার যখন আত্মস্বরূপ হইয়া মূল প্রকৃতিকে প্রকাশ করেন, তখনই তিনি সগুণ। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ,—সৎ চিৎ আনন্দ তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান। জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই তিনি,—তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। বেদান্ত বলেন, আর যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তৎ সমস্তই তাঁহার মায়া। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ব্রহ্ম মহাসাগর, আর সেই মহাসাগরের তরঙ্গনিচয় এই দৃশ্যাদৃশ্য সমগ্র পদার্থ। অতএব,—"একমেবাদ্বিতীয়ং" এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু আর নাই। ইহাই অদ্বৈতবাদ। এ অদ্বৈতবাদ হিন্দু সুন্দররূপেই অবগত আছে, এবং হিন্দুশাস্ত্র হইতেই তাহার প্রমাণ দেখান হইল।

কিন্তু সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং"—ব্রহ্ম যদি সেইরূপই থাকিতেন, তবে সৃষ্টি হইত না। এই গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত অনন্ত বৈচিত্র্য-পূর্ণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রচনা হইত না,—অনন্ত লোক, অনন্ত সূর্য্য চন্দ্র, অনন্ত সাগর ভূধর, অনন্ত জীবনিচয় দেখিতে পাওয়া যাইত না। ব্রহ্ম সগুণ হইয়াছেন বলিয়া,—প্রকট হইয়াছেন বলিয়া এই সকল হইয়াছে! বেদান্ত বলেন,—এ সকল সত্য নহে, এ সকল মায়া। সাংখ্য বলেন, প্রকৃতি। এ পীঠে যাহা মায়া, ও পীঠে তাহাই প্রকৃতি। মায়াই বল, আর প্রকৃতিই বল, তাহা ব্রহ্মেরই প্রকাশ-শক্তি। শাস্ত্র বলেন,—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। অর্থাৎ এই গুণত্রয়

যখন সমভাবে বা অন্যূনাতিরিক্তভাবে অবস্থান করে, তখনই তাহা প্রকৃতি-পদাভিধেয়। আবার যখন তাহার ন্যূনাধিক্য ঘটনা হয়,—অর্থাৎ একটি প্রবৃদ্ধ হইয়া অন্যটিকে অভিভূত করে, অল্পে অল্পে তখন তাহার নাশ বা পরিণাম আরম্ভ হয়। প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব, দ্বিতীয় পরিণামের নাম অহংতত্ত্ব, তৃতীয় পরিণামের নাম ইন্দ্রিয় ও পরমাণু এবং চতুর্থ পরিণাম জগৎ। স্থূল কথা, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদয়ের মূল স্থূলভূত। স্থূলভূতের মূল সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূতের মূল অহংতত্ত্ব। অহং তত্ত্বের মূল মহত্তত্ত্ব। যাহা মহত্তত্ত্বের মূল তাহাই প্রকৃতি। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ; ৭—৪—৭।

"আমার মায়ারূপ প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত। হে মহাবাহো! এই প্রকৃতি অপরা (নিকৃষ্টা), এতদ্ভিন্ন আমার আর একটি জীব-স্বরূপা পরা (উৎকৃষ্টা অর্থাৎ চেতনময়ী) প্রকৃতি আছে;—উহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদয় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ প্রকৃতিদ্বয় হইতে সমুৎপন্ন হইতেছে,—অতএব আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও আমিই ইহার প্রলয় কর্ত্তা। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই;—যেমন সূত্রে মণিসকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।

অতএব অদ্বৈত হইতে এইরূপে দ্বৈতভাব আসিয়া উপস্থিত হয়,—এবং ইহা বিজ্ঞান ও যুক্তি-সম্মত। এই আদি দ্বৈতভাব পরিত্যাগ বা অস্বীকার করিলে জগদুৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না।

ব্রহ্ম যেমন সৎ চিৎ ও আনন্দময়; প্রকৃতিও তেমনি সত্ব, রজঃ ও তমো-গুণময়ী। সত্বগুণবলে প্রকৃতির নিয়মপরতন্ত্রতা, রজোগুণে গতি এবং তমো-গুণে দার্ঢ্য ও প্রতিরোধ শক্তি। তর্কস্থলে যদি বলা যায় যে, সকল পদার্থই যদি প্রকৃতি, তবে সকল পদার্থেই ঐ তিনগুণ আছে,—কিন্তু তবে প্রস্তরের বা ঐ কাষ্ঠখণ্ডের গতি-শক্তি কোথায়? উহাতে কি রজোগুণ নাই? এ কথার উত্তর দিতে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হইবে না,—বিজ্ঞান-দ্বারাই ইহার নিরাসন হইবে,—প্রস্তর বা ঐ কাষ্ঠখণ্ডে যে পরমাণু আছে, তাহারা প্রত্যেকই নিরন্তর গতিশীল। ঐ গতি অতি দ্রুত, অথচ নিরন্তর সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন,—ইহাকেই বিজ্ঞান শাস্ত্রের মতে স্পন্দনবাদ বলে। যে শক্তি-বলে পদার্থ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহার নাম মায়া বা দৈবী প্রকৃতি। দৈবী প্রকৃতিই পরা প্রকৃতি,—জগতের জীবনস্বরূপ হইয়া এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

প্রকট ব্রহ্ম সগুণ পুরুষ, আর প্রকট শক্তি মূল প্রকৃতি। ইহাই জগতের আদি দ্বৈতরূপ। পুরুষ প্রকাশ ও প্রকৃতি গুণ স্বরূপ। উভয়ে উভয়ের সাহায্যে এই অনন্ত বৈচিত্র-পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিয়াছেন। সেই শক্তি প্রকৃতি বা মায়া, সুতরাং ভগবান্ মায়াবল্লভ।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।
অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূত-ভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ;—১৩।১৩—১৮

"এক্ষণে জ্ঞেয় বিষয় কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর;—উহা বিদিত হইলে

লোকে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। অনাদি ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপ জ্ঞেয়, তিনি সৎও নন, অসৎও নন। সর্ব্বত্রই তাঁহার কর, চরণ, কর্ণ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিরাজিত আছে;—তিনি সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়-বিহীন, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় ও রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণসকল প্রকাশ করেন; তিনি আসক্তি-শূন্য ও সকল বস্তুর আধার,—তিনি নির্গুণ কিন্তু সর্ব্বগুণ-পালক। তিনি চরাচর এবং সকল ভূতের অন্তর ও বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়;—তিনি জ্ঞানীদিগের দূর-বর্ত্তী। তিনি ভূত মধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতে-ছেন। তিনি ভূতগণের ভর্ত্তা; তিনি প্রলয়কালে সমুদয় গ্রাস করেন ও সৃষ্টিকালে নানারূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তিনি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর জ্যোতি ও অন্ধকারের অতীত;—তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞানগম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

মঙ্গলে-মানবের অস্তিত্ব।

মার্কিণ রাজ্যের জনৈক বৈজ্ঞানিক মার্কিণের একখানি সংবাদ পত্রে একটী চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। বিবরণটি নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

বৈজ্ঞানিক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"মঙ্গল গ্রহেও মনুষ্য আছেন। তাঁহারা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ও পরাক্রমে ভূমণ্ডলের মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভূমণ্ডলের মনুষ্যগণকে এখনও রৌদ্র বা বৃষ্টির জন্য প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু মঙ্গলের মনুষ্যগণ প্রকৃতির মুখাপেক্ষী নহেন, বিজ্ঞান-বলে তাঁহারা সকল অভাব পূর্ণ করিয়া থাকেন।

ভূমণ্ডলের মনুষ্যগণের উৎপত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক মহাশয় লিখিতেছেন,—"ভূমণ্ডলের মনুষ্যগণ ঐ মঙ্গল গ্রহের মনুষ্যগণের বংশধর। আদিকালে মঙ্গল ও ভূমণ্ডল ঘুরিতে ঘুরিতে পরস্পরের অতি সন্নিহিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে ভূমণ্ডলের আকর্ষণে কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষ মঙ্গল গ্রহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহারাই ভূমণ্ডলের

বর্ত্তমান অধিবাসিগণের আদিপুরুষ, সুতরাং মঙ্গলের মনুষ্য ও ভূমণ্ডলের মনুষ্য—এক বংশের বংশধর।

মঙ্গলের মানবেরা এ তথ্য অবগত আছেন। তাঁহাদের পুরাণে ও ইতিবৃত্তাদিতে এ সমস্ত কথা প্রকটিত আছে। আমরা যদি কোন প্রকার সঙ্কেতে আমাদের বক্তব্য তাঁহাদের গোচর করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহারাও প্রতি সঙ্কেতে তাহার উত্তর দিতে পারেন। সুতরাং এই সঙ্কেত প্রদানের একটা ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য নহে। ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় সহরে যদি অভ্রভেদী অত্যুচ্চ স্তম্ভগৃহ নির্ম্মাণ করা যায়, এবং সেই সকল স্তম্ভগৃহে যদি অত্যুজ্জ্বল তাড়িতালোকের ব্যবস্থা করা হয়, আর প্রতিরাত্রেই যদি এইরূপ শত শত আলোক ক্রমান্বয়ে জ্বলিতে থাকে, তাহা হইলে দিনকতক পরেই মঙ্গলের বৈজ্ঞানিকেরা সেই আলোক দৃষ্টে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হইবেন। আমরা যে তাঁহাদিগকে সঙ্কেত করিতেছি, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়া প্রতি সঙ্কেত প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

অতঃপর বৈজ্ঞানিক মহাশয় লিখিতেছেন,—মার্কিণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিকোলা তেস্‌লা যে তারহীন তাড়িতবার্ত্তা প্রস্তুত করিতেছেন, তাহাই প্রথমে মঙ্গলে প্রেরিত হইবে। মঙ্গলে পাঠাইবার জন্য তিনি যে তাড়িতযন্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা ৮০ আশী অশ্বের বল ধারণ করিবে। এই যন্ত্র সাহায্যেই অনায়াসে মঙ্গলের সংবাদ ভূমণ্ডলে আনীত হইবে।

তেস্‌লার প্রেরিত তারহীন তাড়িতবার্ত্তার উত্তরে মঙ্গলের বৈজ্ঞানিকগণ অবশ্যই প্রত্যুত্তর দিবেন। প্রথমে মার্কিণ বৈজ্ঞানিক তেস্‌লার সহিত মঙ্গলের বৈজ্ঞানিকগণের সংকেতের আদান-প্রদান চলিবে, অতঃপর ভূমণ্ডলের অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণ তেস্‌লার যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে মঙ্গল ও ভূমণ্ডলের বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় যখন সংকেত পুস্তক প্রচলিত হইবে, তখন মঙ্গল ও ভূমণ্ডলের চারিদিকে তারহীন তাড়িতের টেলিগ্রাফ আফিস প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অবাধে কথাবার্ত্তা চলিবে।

তখন আমরা মঙ্গলের অবস্থা, ব্যবস্থা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব্বতথ্যই অবগত হইব। তখন আমাদের জ্ঞান-পথ যে কিরূপ মুক্ত হইবে, তাহা ভাবিলেও আনন্দে আত্মহারা হইতে হয়। কত যুগ যুগান্তরের পর আবার আমরা আমাদের আদি আত্মীয়গণের সাক্ষাৎলাভ

করিব ; আমাদের গুরুর দর্শন পাইব, তাঁহাদের নিকট নানাবিধ শিক্ষালাভ করিয়া আমরা ধন্য হইব।

মার্কিণ বৈজ্ঞানিক মহাশয় এই স্থানেই তাঁহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। কিন্তু বিলাতের কোন বৈজ্ঞানিক মঙ্গল ও ভূমণ্ডলের মানবগণের মিলন প্রসঙ্গে একখানি নবন্যাস লিখিয়াছেন। তিনি ন্যাসের একস্থানে লিখিয়াছেন,—"মঙ্গলের বৈজ্ঞানিকেরা যখন ভূমণ্ডলের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবেন, তখন তাঁহারা বুঝিবেন যে, ভূমণ্ডলের লোকেরা অতি দুর্ব্বল ; সুতরাং তখন তাঁহারা ভূমণ্ডল-বিজয়ের বাসনা করিবেন। ভূমণ্ডলের মনুষ্য-গণের পক্ষে মঙ্গলযাত্রা অসম্ভব, কিন্তু মঙ্গলের মহাবলপরাক্রান্ত বীরগণ অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রাধিষ্ঠিত হইয়া সহজে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহারা প্রথমেই লণ্ডনে উপস্থিত হইবেন এবং যন্ত্রমধ্যে বসিয়া বিবিধ অদৃষ্টপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক অস্ত্রবলে বিলাতের অধিবাসিগণকে পরাস্ত করিয়া লণ্ডন অধিকার করিবেন ; ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূমণ্ডল তাঁহাদের পদানত হইবে। তখন আমাদের শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিবার বিষয় নহে কি? মার্কিণের তেস্‌লা ও তাঁহার শিশুবর্গ কি তখন মঙ্গলের মহাবল বীরগণের হস্ত হইতে ভূমণ্ডলের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন?"—এই সাহসী ও দূরদর্শী বৈজ্ঞানিকপ্রবর ভূমণ্ডলে মঙ্গলের আবির্ভাব ও আক্রমণকাহিনী এবং লণ্ডনের তৎকালীন শোচনীয় অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া মার্কিণের নিকোলা তেস্‌লা ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ যাঁহারা মঙ্গলের সহিত সম্পর্ক-স্থাপনে সোৎসুক—তাঁহাদিগকে নিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রীঃ——

সম্পদ ও দারি ্য।

কিসে সম্পদ, দারিদ্র্য হ'তে
তুলনা-বিহীন উচ্চ।
ব্যাপিয়া বিশ্ব " মানব-কুল
সকলেই করে তুচ্ছ॥
যদি হয় তার পরশ মন্দ,
অধ-গতি করে চিত্ত,
ধনীর হৃদি সম্পদ শেষে—
করে না কি তাহা নিত্য!

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

মৃতের পুনর্জ্জীবন।

মিঃ লারমণ্ডি ফরাসী গ্রন্থকার-সমিতির একজন সভ্য। তিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার পরিচিত তিন জন ডাক্তার সম্প্রতি একটা মৃত বালিকাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই ডাক্তার তিন জন বড় যে সে লোক নহেন, বৈজ্ঞানিক সমাজে তাঁহাদের নাম সুপরিচিত এবং তাঁহাদের প্রতি সাধারণের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে।

এই বালিকাটীর একটা হাঁসপাতালে মৃত্যু হয়। কি রোগে মৃত্যু হয়, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তিন ঘণ্টা অতীত হইল, ডাক্তারেরা সাবধানে তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন— প্রাণবায়ু অনেকক্ষণ বহির্গত হইয়া গিয়াছে, জীবনের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। অনন্তর তাঁহারা তিন ঘণ্টা কাল সেই দেহে তাড়িৎ সঞ্চালন করিলেন, জলে ডুবাইলেন, সলফিউরিক এসিড অর্থাৎ দহনশীল যবক্ষারযান নামক দ্রাবক দিয়া তাহা দগ্ধ করিলেন,—এইরূপ বিবিধ প্রক্রিয়ার পর (অবশ্য ডাক্তারেরা এই সকল প্রক্রিয়া গোপনে রাখিয়াছেন)—মৃত বালিকা বাঁচিয়া উঠিল ও কথা কহিল।

মিঃ লারমণ্ডি বলিয়াছেন, পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া বালিকা এই সকল কথা বলিয়াছে,—"গত রাত্রে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ হাঁসপাতালে আমি ঘুমাইয়া পড়ি। পুরোহিত আসিয়া আমাকে চরম কথা শুনাইয়া গিয়াছিলেন। আমি বুঝিলাম, আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। ক্রমে বোধ হইতে লাগিল, আমি একটু একটু করিয়া জাগিতেছি, আমার খুব শীত করিতে লাগিল। আমার বোধ হইল, আমার জীবন আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং আমার মস্তিষ্কের এক প্রান্তে আমার মন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পর মনে হইল, আমার দেহ হইতে মন বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর দেখিলাম, আমার শরীর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা জড়বৎ কঠিন হইয়াছে, আমার প্রাণ দেহত্যাগ করিলেও আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে দেহ তখন তুষার শীতল, (cy cold) তাহার পর আমি একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। যেন কেহ বহুদূরে আর্গিন যন্ত্র বাজাইতেছে। যেন আমার দেহে কে শত শত বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত করিতেছে। আমি সেই সময়ের ভাব বর্ণনা করিতে পারি না। আমার দেহ অধিকার

করিবার জন্য দুই দল দৈত্য-দানবে মহাসমর আরম্ভ করিল। আমি এ কথার অর্থ বুঝাইতে পারিব না।"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া মিঃ লারমণ্ডি বলিতেছেন,—বালিকা যখন পুনর্জ্জীবন লাভ করে, তখন সে এতই উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহার উত্তেজনা হ্রাস করিবার জন্য ডাক্তারেরা তাহার দেহে আফিংএর আরক প্রয়োগ করেন। এই আরকের মাত্রা হঠাৎ অধিক হওয়ায় পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির পর বালিকাটী দ্বিতীয়বার প্রাণত্যাগ করিল।

বিজ্ঞান যথাসাধ্য তাঁহার মহিমা প্রচারিত করিলেন, কিন্তু যে মরিয়াছে, তাহাকে কেহই রাখিতে পারে না—ডাক্তারদের কর্ত্তৃক মরফিয়া প্রয়োগে এই সত্যই পরিস্ফুট হইতেছে।　শ্রীঃ——

সে বুঝি আমারে চায় না ?

সময়ে কেন গো তারে পাই না ?
পথ চেয়ে রই,　ব্যাকুলিত হই,
কেন সে আসিয়া দেখা দেয় না ?
জানি না সে জন,　নিঠুর কেমন,
কি দিয়ে গঠিত,　তাহার মরম,
আমি লালায়িত,　যাহার কারণ,
তবে, সে কেন আমারে চায় না ?
যদি কভু আসে,　চকিতে লুকায়,
সৌদামিনী যেন,　জলদের গায়,
দেখা দিয়ে শুধু,　দাগা দিয়ে যায়,
মরমের স্তরে ; কথা কয় না।
কত তোষামোদে,　যদি মুখ ফোটে,
মরমের কথা,　মিশে যায় ঠোঁটে,
প্রাণের বন্ধন,　সব যায় টুটে—
আমার ধৈরয হৃদে রয় না।
"ওগো সে বুঝি আমারে চায় না ?"

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সংবাদ।

চিত্র পরিচয়—অবসরে মদনভস্মের ছবি প্রকাশিত হইল। দাক্ষায়ণী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিলে, মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া শঙ্কর দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। তৎপরে বিষ্ণু-চক্রে সতীদেহ বিচ্ছিন্ন হইলে, মহাযোগী শঙ্কর বিপুল তপস্যা আরম্ভ করেন। সৃষ্টি-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শিবের ধ্যান ভঙ্গ-জন্য সানুচর মদনকে তৎসমীপে প্রেরণ করেন। তখন সতী হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নবোদ্ভিন্ন-যৌবন-শ্রী-ভূষিতা হইয়া শঙ্কর-সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন। মদনের পুষ্পবাণে শঙ্করের ধ্যান ভঙ্গ হইল, কিন্তু মনোবিকারের কারণ জানিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, নয়নোদ্ভূত অগ্নির দ্বারা মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

সেদিন ঢাকা মেডিকেল স্কুলের পুরস্কার বিতরণ সভায় লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সুন্দর একটি বক্তৃতা করিয়া সাধারণকে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

সঙ্গিনীর ভূতপূর্ব্ব-সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলাবতী ঘোষের মৃত্যু হইয়াছে। আমরা দুঃখিত।

গৌহাটী কার্জন-লাইব্রেরী-হলে 'গৌহাটী শাখা-সাহিত্য-পরিষদে'র দ্বিতীয় মাসিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের "মালা" ও 'অন্তর্য্যামী' নামক দুই খানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে। প্রত্যেক খানির মূল্য ৷৷৹ বারো আনা হিসাবে।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের 'ছোট বৌ' বাহির হইয়াছে। মূল্য ।৵৹ আনা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়ের "ঢাকার ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ আড়াই টাকা।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে তত্ত্বনিধির "নাস্তিক ও জাপানী মেলা" বাহির হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

এই তিনখানি পুস্তক অবসরের প্রত্যেক গ্রাহক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উপহার পাইবেন। কেবল অবসরের বার্ষিক মূল্য ১।৹ এক টাকা চারি আনা মাত্র দিলেই এই তিনখানি পুস্তক ও এক বৎসর অবসর পাইবেন। তবে ডাকে পাঠাইতে হইলে উপহারের ডাকমাশুল ও ভিঃ পি খরচা ।৹ চারি আনা গ্রাহকগণকে দিতে হইবে। হাতে লইলে ঐ চারি আনা অবশ্য লাগিবেই না।

ইহার উপর শারদীয় উপহার!

মণি-কাঞ্চন—সংযোগ।

আনন্দময়ী মায়ের আগমনী-উপহার লইয়া গ্রাহক মহোদয়গণকে সাদর আহ্বান করিতেছি। অন্যান্য বারেও এ উপহার দেওয়া হয়, কিন্তু এবার ব্যাপার-বাহুল্য—রত্ন বিতরণ!

প্রেম-লহরী।

প্রেমের সুধা-ধারায় হৃদয় আপ্লুত করিতে হইলে, প্রেমের নির্ঝরসে প্রাণকে অভিষিক্ত রাখিতে হইলে, প্রেমকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তীভূত করিতে হইলে প্রেম-লহরী পড়িতেই হইবে। কি করিয়া ভালবাসার লোককে আপনার করিতে হয়, বশীভূত করিতে হয়, কি করিয়া 'মন যারে চায় তারে' প্রাণের নিকটে আনা যায়—এই গ্রন্থে তাহার বৈজ্ঞানিক উপায় পাইবেন। তা' ছাড়া প্রেমের সকল প্রকার রূপ—সকল প্রকার ভাব—সকল প্রকার ক্রিয়া ইহাতে আছে। আরও ইহাতে প্রেমের প্রবলতা, প্রণয়ের উন্মত্ততা, ভালবাসার মত্ততা, যৌবনের পূর্ণ বিকার, লালসার প্রবল প্রবাহ, কামনার বেগ, রসের ঢলাঢলি, প্রীতির ছড়াছড়ি সকলই আছে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

রক্তারক্তি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

এই পুস্তকের প্রতি ছত্রে রহস্য—রহস্যের উপর রহস্য—এবং বর্ণনা-মাধুর্য্যে সকলেই প্রীত হইবেন। মূল্য ।৹ চারি আনা।

৺পূজার মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, কেবল ।৹ চারি আনা দিলেই ১।৹ মূল্যের দুইখানি পুস্তক উপহার পাইবেন। ইহার মাশুল ৵৹ আনা।

শারদীয় উপহার লইলে সর্ব্বসমেত ১৸৵৹ এক টাকা পনর আনা। হাতে লইলে ১॥৹ এক টাকা আট আনা মাত্র।

যাঁহারা শারদীয় উপহার লইবেন, তাঁহারা অগৌণে তাহা আমাদিগকে লিখিবেন। যাঁহারা লইবেন না, তাঁহাদিগকে কিছুই লিখিতে হইবে না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ।
৩৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] (Registered No C [illegible]) পৌষ, [illegible]

অবসর

মাসিক পত্র

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এটর্ণি য়্যাট্‌-ল-সম্পাদিত।

কলিকাতা, ৩৪নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে

শ্রীহরিপদ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।০ সিক্কা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵১০ আনা।

সূচী।

অবসর—

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সামাজিক উপন্যাস "কনে বউ"এর একখানি ছবি।

"পত্নী-সম্ভাষণে রসিকমোহন!"

অবসর।

১২শ ভাগ। } পৌষ। { ৫ম সংখ্যা।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা।

আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষা-প্রণালীর বাহ্য উন্নতি যথেষ্ট হইতেছে বটে। বহু সংখ্যক বিদ্যালয়ও হইয়াছে; বিদ্যালয়ে দেশীয় শিক্ষকের সংখ্যাও অধিক। আবার তাঁহাদিগের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিই বেশী। কিন্তু তবু আমাদের সুশিক্ষা হইতেছে না কেন? শিক্ষকেরা আমাদিগকে নিরূপণ মত পাঠ্য পুস্তকের অর্থ গ্রহণ ও ভাব সংগ্রহে সাধ্যমত সাহায্য করিয়া থাকেন। আমাদের বালকেরা নিজ নিজ পরিশ্রমের দ্বারা এবং শিক্ষকের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, বি, এ, প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ উপাধিও প্রাপ্ত হইতেছেন। কিন্তু বালকেরা বিদ্যালয়ে থাকিয়া কিম্বা বিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার পর সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াই, বাস্তবিক কি শিক্ষার মধুময় ফল দেখাইতে পারেন? বোধ হয় পারেন না,—বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই না। কারণ শিক্ষা বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা আমাদিগের হইতেছে না। বাস্তবিক আজ কাল-কার শিক্ষিত হিন্দুর ছেলেকে দেখিয়া অনেক সময় চক্ষু ফাটিয়া জল আসে। যদি বলিলে দোষ হয়, তবে সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ মার্জ্জনা করিবেন। আজ কাল শিক্ষিত ছাত্র অপেক্ষা নিরক্ষর কৃষক বালকদিগের চরিত্র বহুল পরিমাণে উন্নত বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুর ছেলের কেন এরূপ হইল? যাহাদের চরিত্র জগতের আদর্শ ছিল, সেই হিন্দুকুলের বংশধরদিগের কেন এমন হইল? তাহার অনেক কারণ আছে। সর্ব্ব প্রধান কারণ এই যে, দেশের বালকগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে একেবারে কোন শিক্ষাই পায় না। মাত্র অর্থকরী বিদ্যা ব্যতীত আর কোন শিক্ষা এদেশে দেওয়া হয় না, সুতরাং পঠদ্দশার পর

যৌবন অবস্থায় সংসারে প্রবেশ করিয়া হিন্দুযুবক স্বর্গীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের পথে চলিতে পারেন না। শুদ্ধ তাহাও নহে, নীতিবিহীন, ধর্ম্মবিহীন শিক্ষার যতদূর বিষময় ফল ফলিতে পারে, তাহা অনেক স্থলেই ফলিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে, সকলে না হউক, অধিকাংশ ব্যক্তিই যদি হিন্দু-নীতি ও হিন্দুধর্ম্মের স্বর্গীয় জ্যোতিদ্বারা হৃদয়-মনকে আলোকিত করিতে পারিতেন, তাহাহইলে বাস্তবিকই আমাদের দেশের এতদূর দুর্দ্দশা হইত না। এখনও আমাদের চৈতন্য হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে যে ভাবে গুরু-গৃহে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত, নানা কারণে সে ভাবে শিক্ষা এখন আর আমাদের মধ্যে হইতে পারে না। তবে চেষ্টা করিলে যে যে উপায়ে এখনও তাহাদিগকে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারা যায়, এখনও তাহাদিগকে প্রকৃত উন্নতির পথের পথিক করিতে পারা যায়, তাহা না করা হয় কেন? ইহার উত্তর কে দিবে তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারেন।

মানব-জীবনে মনের ও হৃদয়ের উন্নতিই যথার্থ উন্নতি। ইংরাজী বর্ত্তমান সময় আমাদিগের অর্থকরী বিদ্যা। মহামান্য ইংরেজ বাহাদুর এখন আমাদের রাজা বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত কায কর্ম্মের সুবিধার জন্য, একপ্রকার বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে ইংরাজী শিখিতে হইতেছে। কিন্তু এই শিক্ষার সহিত যদি ধর্ম্ম ও নীতির মিশ্রণ না থাকে, তাহা হইলে অতি বিপরীত হয় তাহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। অর্থকরী বিদ্যার সহিত ধর্ম্ম ও নীতির মিশ্রণ না থাকাতেই দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইতে বসিয়াছে। সেই জন্য বলি অর্থকরী বিদ্যার সহিত যাহাতে নীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষায় সাফল্য লাভ করে, তাহা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকের সহিত অনায়াসে দুই একখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাত্রদিগকে পড়ান যাইতে পারে, একথা বলাই বাহুল্য।

শিক্ষা-বিভাগের কর্ণধার মহাশয়গণের ইচ্ছা হইলেই পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা বাড়াইয়া দিতেছেন, পাঠ্য বিষয়সকল কঠিন হইতে কঠিনতর করিতেছেন। তাহাতেও কিন্তু শিক্ষকদিগের পড়াইবার এবং ছাত্রদিগের পড়িবার সময় ও সুবিধা হইতেছে। তাহা বাদে কত স্কুলে গীত বাদ্য ও ব্যায়াম বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। আর বোঝার উপর শাকের আটী কি ধরিতে পারে না? একখানি ছোট খাট ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রত্যেক শ্রেণীতে পড়াইবার নিয়ম করা যাইতে পারে না কি? কিন্তু এস্থলে একটী কথা আছে। একজন সচ্চরিত্র হিন্দু-ধর্ম্মপরায়ণ, হিন্দুশাস্ত্রে সুশিক্ষিত লোকদ্বারা এই অধ্যাপনা হওয়া উচিত।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এইরূপ একটী করিয়া থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। গভর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় বাদ দিয়া দেশীয় যে সকল মহাত্মাদিগের বিদ্যা-মন্দির আছে, তাঁহারাও যদি এ বিষয় একটু চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও দশের অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। শুধু ইংরাজী অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আমাদের বালক এবং যুবকগণ বড়ই নীরস হইয়া সংসারে প্রবেশ করেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে অনেক সময় মনে হয়, যেন তাঁহারাও বিদেশী, এদেশ এবং এ দেশবাসীর সহিত যেন তাঁহাদিগের কণামাত্র সহানুভূতি নাই। তাঁহারা যেন উদ্দেশ্য হীন। তাই বলি, তাঁহাদিগের এই নিরাশ ভাব, তাঁহাদিগের এই উদ্দেশ্য বিহীনতা, তাঁহাদিগের এই আপনার দেশে প্রবাসী সাজা—আপনার গৃহে পরের মত থাকা, এই অনুচিত ভাবগুলি দূর করিবার একমাত্র উপায় এই বলিয়াই ত আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থার করা, হিন্দুর ছেলেকে খাঁটী হিন্দু করিবার চেষ্টা করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের হিন্দু সন্তানকে অর্থকরী বিদ্যার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা দিলে দেশের প্রতি তাহাদিগের যত্ন হইবে, মায়া হইবে, "বিলাত আমার দেশ কি ভারত আমার দেশ" এ সন্দেহ-দোলায় আর তাঁহাদিগকে দুলিতে হইবে না। কিন্তু এসকল কথা কি এখন দেশের লোকের শ্রবণ-বিবরে স্থান পাইবে?

শ্রীসুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তর-পশ্চিম তীর্থ-ভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৮)

ত্রিলোচন ঘাটের নিকট কতকটা স্থানের জল খুব নাকি পবিত্র। যাত্রীরা এই স্থানে স্নান করিয়া চরিতার্থ হয়। ইহার নিকটেই গো-ঘাট; এখানে একটী শ্বেত প্রস্তরের গোমূর্ত্তি আছে। বেশ সুন্দর স্থান। সন্ধ্যার সময় সাধু সন্ন্যাসীরা বায়ু-সেবন ও শাস্ত্রালাপের উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া এখানে আসিয়া থাকেন। আমি যে দিন যাই, সে দিন ১টি বাঙ্গালী বাবু ও এক জন সাধুর কথাবার্ত্তা কতক কতক শুনিয়া আসি। সাধু বক্তা, বাবুটী শ্রোতা ও প্রশ্নকর্ত্তা; বিষয়—শাস্ত্র ও ধর্ম্ম। বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন—গুরুজী 'হিন্দু' শব্দের অর্থ কি? স্বামীজী কহিলেন"'হিন্দু' শব্দটী মুসলমান প্রদত্ত নাম-বিশেষ।

"হীনং দুষয়তে যস্মাৎ তস্মাৎ হিন্দুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"।

কামধেনু তন্ত্রে এইরূপ লেখা আছে।

পুনরায় প্রশ্ন হইল, বেদ, স্মৃতি, শ্রুতি, তন্ত্র প্রভৃতির স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা আছে। দয়া করিয়া কিছু কিছু বলুন। উত্তর হইল,—সাম, যজুঃ, ঋক্ ও অথর্ব্ব এই চারিটী বেদ ও এই চারিটীকে শ্রুতি কহে। এই শ্রুতি ও বেদাঙ্গভূত সারতত্ত্ব লইয়া মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি মনীষিগণ যে সকল উপদেশমূলক পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাই স্মৃতি ও তাহাই শাস্ত্র। আর হরপার্ব্বতীর কথোপকথনচ্ছলে উপদেশকে তন্ত্র কহে। এক্ষণে এবং বহু প্রাচীন কাল হইতে 'মনু'ই আমাদের শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'বৈশেষিক' প্রণেতা কণাদ, কপিল প্রণীত 'সাংখ্য', পতঞ্জলির 'পাতঞ্জল', জৈমিনির 'মীমাংসা', গৌতমের 'ন্যায়' 'বেদান্ত' প্রভৃতিকে ষড়দর্শন কহে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া মন হর্ষ বিস্ময় ও ভক্তিতে আপ্লুত হইতেছিল। অপরিচিত স্থানে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকা নিরাপদ নহে বিবেচনায় বাসার দিকে রওনা হইলাম। অপরিচিত লোকের পক্ষে কাশীতে নৈশ ভ্রমণ বেশ নিরাপদ মনে করিতে

পারি নাই। কারণ একে ত' কাশীতে কয়েকটী প্রশস্ত রাজপথ ব্যতীত, অন্য সমস্ত গলি বা 'লেন' অত্যন্ত সংকীর্ণ। রাস্তাগুলি পাথরের বাঁধাই বটে। পদে পদে পথ ভুলিবার সম্ভাবনা আছে।

এখানে শিব মন্দিরও অনেক আছে। কয়েকটীর নাম দিলাম। বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, বৈদ্যনাথ, তারকনাথ, বদরীনাথ, গঙ্গানাথ, পশুপতিনাথ, বৃদ্ধকালেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর, বীরেশ্বর, গরুড়েশ্বর, দশাশ্বমেধেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, রত্নেশ্বর, দুলালেশ্বর, চণ্ডেশ্বর, পার্ব্বতীশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, শঙ্করেশ্বর, বৈকুণ্ঠেশ্বর, বান্ধবেশ্বর, নবগ্রহেশ্বর, ব্রহ্মনাভীশ্বর, চণ্ডেশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, পর্ব্বতেশ্বর, কাশীবাসীশ্বর, বশিষ্ঠেশ্বর, বামনেশ্বর, মঙ্গলেশ্বর, বুধেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, যমেশ্বর, মানেশ্বর, প্রহ্লাদেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়েশ্বর, হুঙ্কারেশ্বর, ওঁকারেশ্বর, গিরিরাজেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, ভূতেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, ক্রোধ-ভৈরবেশ্বর, উন্মত্তভৈরবেশ্বর, কর্দ্দমেশ্বর, নিষ্পাপেশ্বর, কপিলেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, বিশ্বামিত্রেশ্বর, গৌতমেশ্বর, ভরদ্বাজেশ্বর, নারদেশ্বর, বাল্মীকীশ্বর, পাপভক্ষণেশ্বর, লাঙ্গলেশ্বর, কপালমোচনেশ্বর, পাপমোচনেশ্বর, ঋণশোধনেশ্বর, কুরুক্ষেত্রেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, পুষ্করেশ্বর, পঞ্চপাণ্ডবেশ্বর, জ্বরহরেশ্বর, মঙ্গলেশ্বর, গুণেশ্বর, গুণাকরেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, দক্ষেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, মিত্রেশ্বর, ললিতেশ্বর, দিবোদাসেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কোটীবিশ্বেশ্বর, কাননেশ্বর, যোগেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, ব্যাসেশ্বর, গোপেশ্বর, পাতালেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, ঘণ্টাকর্ণেশ্বর, কামেশ্বর, শুক্রেশ্বর, ধ্রুবেশ্বর, ধর্ম্মেশ্বর, নাগেশ্বর, সোমেশ্বর, শুক্লেশ্বর।

সাক্ষী-বিনায়ক, সঙ্কটমোচন, বটুকভৈরব, কালভৈরব, ঢুণ্ডিগণেশ, বড় গণেশ, আদিকেশব, বেণীমাধব, শনৈশ্চর, গোপাল, নেপাল, মহাকাল, নবগ্রহ, হনুমানজীউ, দণ্ডপানি, মহাকাল, আদিদেব, ভূতভৈরব, ভীষণ-ভৈরব, ত্রিলোচন, ভৈরবনাথ॥ এই একশত আঠারটী মন্দির মধ্যে, বিশ্বনাথ, তারকনাথ, তিলভাণ্ডেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, বাল্মীকীশ্বর, শঙ্কটমোচন, কালভৈরব, আদিকেশব, নবগ্রহ, ভীষণ-ভৈরব ও ত্রিলোচন লিঙ্গের মন্দিরগুলি বিশেষ প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য। দশটী দেবী-মন্দির (অন্নপূর্ণা, রাজেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী বা জ্বরেশ্বরী, কাশীদেবী, সতীশ-সিদ্ধেশ্বরী, শঙ্কটা, দুর্গা, শীতলা ও বিশালাক্ষী দেবী) মধ্যে অন্নপূর্ণা, শঙ্কটা, দুর্গা ও বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরই উল্লেখযোগ্য। একটি অনার্য্য মন্দিরও এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে, নাম দ্বারকানাথ।

এখানে কয়েকটী কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে কালকূপ, মণিকর্ণিকা, জ্ঞানবাপী, কাশীকরায়ত, চন্দ্রকুণ্ড, অমৃতকুণ্ড, নাগকুণ্ড, ধর্ম্মকূপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানে পুষ্করিণীও অনেক, কিন্তু কর্ণঘণ্টা, পিশাচমোচন, ভৈরবতলা ও কুরুক্ষেত্রকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড ও মানস সরোবর,—এই কয়েকটি ছাড়া অন্যগুলি উল্লেখযোগ্য নহে।

কাশীতে অনেকানেক দর্শনযোগ্য স্থান আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহম্মদীয় মস্‌জিদ, গঙ্গাতীরের মস্‌জিদ, ভিজিয়ানা গ্রাম রাজ্যোদান, ঐ রাজবাটী, গোপালবাটী, প্রাচীন রাজঘাট দুর্গ, গুরুধাম, লাটভৈরব, আলফ্রেড পার্ক, জয়নারায়ণ কলেজ, টাউনহল, প্রিন্সঅফ্‌ ওয়েলস্‌ হাঁসপাতাল, কুইনস্‌ পার্ক, মান-মন্দির, বেণীমাধব বা বিন্দুমাধবের ধ্বজা ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও অনেক ছত্র, টোল, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি আছে। মেলাও এখানে অনেক। সবুজ-মঙ্গলমেলা, নবরাত্রি মেলা, গোবরমেলা, রামনবমী-মেলা, সপ্তমী-মেলা, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী-মেলা, একাদশী-মেলা, নগর প্রদক্ষিণমেলা, বামন দ্বাদশী-মেলা, বৃদ্ধকাল-মেলা, রামলীলামেলা ইত্যাদি। কয়েকটী বাজার যথা—দশাশ্বমেধ বাজার, বাঙ্গালীটোলা বাজার প্রভৃতি বেশ সুন্দর বাজার। এখানকার পিত্তল নির্ম্মিত বাসন ও রেশম নির্ম্মিত বস্ত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ স্থানের নির্ম্মিত এই সব দ্রব্যসম্ভার সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকাতেও সাদরে গৃহীত হয়। কাশীধাম শিল্পবাণিজ্যের একটী কেন্দ্রস্থল। কাশীর লোকসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ, তন্মধ্যে ৩ ভাগই হিন্দু অপর একভাগ মুসলমান; খৃষ্টানদের সংখ্যা অল্প, কিঞ্চিদধিক পাঁচশত হইবে।

(৯)

এই কাশীর একটু ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এখন যেখানে Dufrin Bridge আছে, তাহার উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে বরুণা ও অসি নামক দুটী ক্ষুদ্র নদী আসিয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে এবং সেই হইতেই ক্রমশঃ বারাণসী নাম হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই নগর শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত। মহারাজা হরিশ্চন্দ্র যখন বিশ্বামিত্রের কোপে পড়িয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন, তখন বিশ্বামিত্র ঋষি হরিশ্চন্দ্রকে তাঁহার অধিকারভুক্ত রাজ্যের বাহির হইতে আদেশ করেন। তাহাতে হরিশ্চন্দ্র কোথায় থাকিব জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বামিত্র

বলেন যে "কাশীধাম শিবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত এবং তাহা বিশ্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে; তুমি তথায় গিয়া বাস কর।" এখানে নাকি ভূমিকম্প হয় না। বহু পুরাকাল হইতেই কাশী ধর্ম্ম-শিক্ষা, সাধনা, যোগ, আরাধনার প্রধান কেন্দ্রস্থল রূপে ভারতে পরিচিত: বুদ্ধদেবের "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" প্রচারের একটী প্রধান ও প্রথম কেন্দ্রস্থল এই কাশী। এখান হইতেই তিনি সুদূর লঙ্কা বা সিংহল, বর্ম্মা, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে তাঁহার শিষ্য পাঠাইয়া নিজ মত প্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে, বৌদ্ধ-প্রভাব কতক পরিমাণে বিনষ্ট হয়, তাহার নিদর্শন স্বরূপ এখনও এখানে বহু পরিমাণে বৌদ্ধমন্দির স্তূপ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসমন্বয়ের কেন্দ্রস্থল এই কাশী। বহু ভাষা-ভাষী বহুপণ্ডিত, সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহী, ধনকুবের, দরিদ্র, ভিক্ষুক, চোর, বদমায়েস, গুণ্ডা এই কাশীতে বাস করেন ও করে। কাশী আরও ৫টী ক্ষুদ্র নদীর সঙ্গম স্থান—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ধূতপাপা ও কীর্ণা এই ৫টী নদী, পঞ্চ-গঙ্গা-ঘাট নামক স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তবে গঙ্গানদী ছাড়া অন্যসবগুলিই অন্তঃসলিলা।

পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভের পূর্ব্বে কাশী এক প্রকার স্বাধীন রাজত্ব ছিল। বাংলার গবর্ণর হেষ্টিংস্ সাহেব কাশীর তদানীন্তন রাজা চৈৎসিংহকে যথোচিত লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন করিয়া এখানকার পূর্ব্বশ্রী অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়াছেন। মুসলমান রাজত্ব সময়ে বাদসাহ আরঙ্গজেবও কাশীর মন্দিরের ও অধিবাসীর অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। অনেক হিন্দুমন্দির নষ্ট করিয়া তথায় মুসলমানদের মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মন্দিরের সুন্দর সুন্দর খোদাই করা মর্ম্মর প্রস্তরগুলিকে খুলিয়া আনাইয়া মস্‌জিদে উঠিবার সোপান করিয়া দিয়াছেন। আরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে হিন্দুদিগের উপর যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন।

এখানে অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর কৃত অনেক কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। মহারাণা জয়সিংহ-প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-বিখ্যাত মান-মন্দির এখনও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এখানকার দুর্গাবাটীতে প্রত্যহ একটী করিয়া ছাগ-বলি হইয়া থাকে, তা ছাড়া সমগ্র কাশীর মধ্যে কুত্রাপি বলি-প্রথা নাই। এখনে বানরের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে, কিন্তু মথুরা বৃন্দাবনের ন্যায় তত

অত্যাচারী নহে। রাস্তা ঘাট বড়ই অসমতল, তবে দার্জ্জিলিং দেরাদুন প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশের ন্যায় নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ক্ষীরের খাদ্যই সমধিক প্রচলিত ও সুস্বাদু।

(১০)

চারি পাঁচ দিনের মধ্যে একপ্রকার মোটামোটি রকমে কাশী পরিদর্শন সমাপ্ত করিলাম। তাহার পর এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী-ত্রয়ের সঙ্গম স্থান এই এলাহাবাদ বা প্রয়াগ। এখানে যাত্রীরা স্নান তর্পণাদি করিয়া থাকেন। এই স্থানকেই যুক্তবেণী (Confleusnce) কহে। হুগলি জিলার অন্তর্গত মগরা ষ্টেশনের নিকটে ত্রিবেণীতে আবার এই নদীত্রয়ের ছাড়াছাড়ি হইয়াছে; তাহাকে মুক্তবেণী কহে। প্রয়াগ-সঙ্গমে স্নান করিয়া অত্রস্থ কেল্লার সংলগ্ন একটী সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষয়-বট দর্শন করিতে হয়। ইহা নাকি অনন্তকাল হইতে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু ১৫।২০ হাতের অধিক উচ্চ নহে। দুটী ডাল আছে। নীচের কতকটা স্থান বাঁধান আছে, তাহার আশে পাশে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত অনেক দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে; সংখ্যায় এত বেশী যে গণিয়া ঠিক করা দুষ্কর। হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতাই বোধ হয় এই গহ্বর মধ্যে অক্ষয়-বটের আশ্রয়ে অনন্তকাল হইতে বাস করিতেছেন। এ স্থানের সমস্ত দেবতার পূজা স্বরূপ প্রণামীর পয়সা দিতে হইলে লক্ষপতিকেও বিচলিত হইতে হয়, আমি তো নগণ্য লোক।

যমুনার ঠিক উপরেই কেল্লা অবস্থিত। নৌকাযোগে দর্শন করিলে বেশ স্পষ্টরূপে দেখা যায়। স্থানে স্থানে শত্রুর গতি রোধার্থ প্রাচীরে কামান সাজান আছে। হাইকোর্ট, (পূর্ব্বেরটী ছাড়া এখন একটী নূতন হাইকোর্ট বাটী নির্ম্মিত হইতেছে) স্কুল, মুরকলেজ, সেনেট বিল্ডিং, খসরুবাগ, আলফ্রেড্ পার্ক এই কয়টীই বেশ সুন্দর ও নয়নাভিরাম। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের হিন্দুপত্নীর গর্ভজাত সন্তান কুমার খসরু, রাজ্য-লোভে অন্ধ হইয়া (কাহারও কাহারও মত যে লোকললামভূতা সুন্দরী সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের আদেশ ও কৌশল ক্রমেই হইয়াছিল) পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর মদ্যপ ও ক্রূর-স্বভাব হইলেও ক্ষীণ হস্তে রাজ-দণ্ড ধারণ করেন নাই। তিনি খসরুর চক্রান্ত জানিতে পারিবামাত্র তাহার প্রতিবিধান করেন ও খসরুকে কারারুদ্ধ করেন। তাহার কিছুকাল পরে

এই এলাহাবাদের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। এইখানেই খসরুর রাজত্ব ও জীবনের অবসান হয়। খসরুবাগ ঐ নামানুসারেই হইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমেয়। বাগানের নানা জাতীয় বৃক্ষের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও তাহার দুই পার্শ্বে খসরু ও তাঁহার মাতার সমাধি-মন্দির। এখানকার রক্ষকদিগকে কিছু দর্শনী দিলে ঐ সমাধি মন্দিরের উপরে উঠিতে পাওয়া যায়। আলফ্রেড পার্ক একটী রমণীয় উদ্যান। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারত ভ্রমণে আসিলে ঐ সময়ে এই উদ্যানটী স্থানীয় ধন-কুবেরগণের টাকায়, যুবরাজের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মিত হয়। হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অনেক বড় বড় সহর অপেক্ষাও এলাহাবাদ সহর সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। বারাণসীতে লোকে ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত বাস করেন। এলাহা-বাদে সর্ব্ব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকই নানা কর্ম্মোপলক্ষে অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত বাস করেন। এখানে একটী পান্থাবাসে পথশ্রান্তি লাঘব করিয়া দুই দিন পরেই কানপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

(১১)

কানপুর সহরটী বহু প্রাচীন কালের East India, C & R R B & N W Ry, Bombay Borada & Central India and Great India Peniusula Railwayর জংশন। সহর ষ্টেশন হইতে বেশী দূরে নহে। এলাহাবাদ ষ্টেশন হইতেও সহর সন্নিকটে অবস্থিত। এলাহাবাদ ও কানপুর উভয় ষ্টেশনেই হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজদিগের প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত থাকে। এলাহাবাদ কলিকাতা হইতে ৫১৪ মাইল ও কানপুর ৬৩৩ মাইল। উভয় স্থানই যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত। এলাহাবাদে তো কেল্লা আছেই। কানপুরেও দেশী ও গোরা সৈন্য আছে। কানপুর, যুক্তপ্রদেশ ও সমগ্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে, বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল বলিলেও যেন খুঁত থাকিয়া যায়। সূতার কল, পশমী বস্ত্র নির্ম্মাণের কল, ময়দার কল, তৈলের কল, পাটের কল ও নানারকমের উৎকৃষ্ট বিনামার কারখানা প্রভৃতি আছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে তুলার চাষ হয়। ১৯০৭ সালের ১১ই মার্চ্চ হইতে এখানে কলিকাতার ন্যায় বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ীর চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার লোক সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। মুসলমান অধিবাসীই অধিক।

কানপুরে দুই একটী হিন্দু-মন্দির ছাড়া অধিকাংশই মস্‌জিদ। এস্থান তীর্থস্থান নহে। প্রধান উল্লেখ যোগ্য স্থান, সহরের পার্শ্বে অবস্থিত উদ্যান ও হত্যা-কূপ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে ভীষণ সীপাহিবিদ্রোহ হয়, তখন বিদ্রোহী শিখ ও পাঞ্জাবীরা অনেক ইংরাজ-মহিলা ও তাহাদের সন্তানদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া এই কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করে। পরিশেষে বিদ্রোহ দমন হইলে এই কূপের চতুষ্পার্শ্বের স্থান ঘিরিয়া দিয়া এই রমণীয় পার্ক বা উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া এক একটী প্রস্তর ফলকে অধিকাংশ মৃত ব্যক্তিদিগের নাম খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখানকার রাস্তা ঘাট, স্কুল কলেজ প্রভৃতি বেশ সুন্দর ও নয়নরঞ্জন। সকালেই এখানে পৌঁছিয়াছিলাম; রাত্রিতে থাকিবারও আবশ্যক নাই, সুতরাং রাত্রির এক্সপ্রেস্‌ ট্রেণে চাপিয়া বাটীর দিকে রওয়ানা হইলাম।

গাড়ীতে ভিড় খুব বেশী হইয়াছিল। অনেক অনুনয়, বিনয়, মিনতি করিয়াও একটু স্থান করিতে পারিলাম না। চেষ্টা করিলে স্থান যে একেবারেই হইত না, এমন নহে। কারণ, হিন্দুস্থানী ফেলো ব্রাদারগণ ডাল রুটীর শ্রাদ্ধ করিতেও যেমন দক্ষ, বৃহৎ বৃহৎ পুটুলি মায় খেংরা পর্য্যন্ত বহন করিতেও সুদক্ষ। এই খোট্টাদের কথায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটী রচনা মনে পড়িয়া গেল। তিনি একস্থানে রেলওয়েতে ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, গাড়ীতে ভিড় বেশী হইলে যদি অন্য কোনও যাত্রী মধ্যপথে উঠিতে চায় ও একটু যায়গা চায়, তাহাহইলে যাত্রীরা হয় তো পা উঠাইয়া উঁচু বসিয়াছিলেন, আগন্তুক যাত্রীর কথায় পা দুটী নামাইয়া স্থানটুকু বেশ পাকাপাকি রূপে অধিকার করিয়া লইলেন; যদি একটু বেশী কৃপা করেন তো তাঁর নিকটস্থিত পুটুলিটীকে ভাল করিয়া গুছাইয়া লইয়া স্থানটুকু অধিকার করিলেন। অধ্যাপকপ্রবর ইহাদিগকে ইংরাজী Relative pronounএর সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। আমার এই সময়কার অবস্থায় এইটুকু মনে পড়িয়া গেল, তাই লিখিয়া দিলাম।

বক্সার ষ্টেশনে একটী বাবু অপর একটী বাবুকে সঙ্গে করিয়া আমাদেরই পার্শ্বস্থিত ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু কারণ জানি না, যে বাবুটী গাড়ীতে উঠিলেন তাঁহার এত কান্না যে, পুরুষ মানুষ একদেশ হইতে অপর দেশে যাইতে হইলে যে এত কান্নাকাটী করিতে পারে, তাহা এই নূতন দেখিলাম। আমি তো অবাক্‌ হইয়া রহিলাম। তাহার

পর আর কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই, সুতরাং নিরাপদে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে পারিয়াছিলাম।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শিরা ও ধমনী।

(From medical Science)

কহে শিরা—লো ধমনী
　　রাঙা রঙে নেচে চল তুমি,—
তোমারি আবিল বহি—
　　চলি ধীরে কাল হ'য়ে আমি ?
আমি যদি কোন দিন চলা করি বন্ধ,
তোমার নাচন যায়, হও তুমি অন্ধ।

"আমা হ'তে জন্ম তব,
　　সাবধানে শিরা কথা কও,
আমার আবিল বহি—
　　বেঁচে আছ, না থাকিলে নও।
ছোট মুখে বড় কথা শোভা নাহি পায় ;
ছোট বড় আমাদের কে না জানে তায়।"

হৃদয় কহিল আসি, ওটা বড় ভুল—
আমি বল তোমাদের জীবনের মূল,
আমার দখিণে শিরা বামে তুমি আছ,
দিন রাত নেচে মরি তাই হ'য়ে বাঁচ।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

আকাশের কথা।

৩য় রাত্রি।

২রা বৈশাখ সারারাত দেগাঁর থুব পৃষ্ঠে

দণ্ডায়মান গুরু-শিষ্য।

গুরু। যে গোলাকার সমতল মাঠ আমাদের পদতলে রহিয়াছে, তাহার নাম ক্ষিতিজ। কড়াইয়ের মত আকাশ ক্ষিতিজকে ঢাকিয়া ও চাপিয়া রাখিয়াছে। দেখ আকাশে কত তারা ফুটিয়াছে। ধ্রুবকে দর্শন কর এবং উদয় গিরি ও অস্তগিরি পানে ৫ মিনিট করিয়া চোখ রাখ, তারার খেলা দেখিতে পাইবে। উদয়গিরির উপরে চিত্রা নক্ষত্র জ্বলিতেছে।

শিষ্য। ধ্রুবকে দর্শন করিয়া উদয়গিরি পানে চোখ ফিরাইয়া দেখি যে, উদয়গিরির উপরের নক্ষত্র অনেক ঊর্দ্ধে উঠেছে। সারি বাঁধিয়া স্বাতি নক্ষত্র এবং বহুতর তারা উদয়গিরির উপর উঠিতেছে। অস্তগিরি পানে চোখ ফিরাইয়া দেখি যে, তথায় সারি বাঁধিয়া কৃত্তিকা নক্ষত্র ও বহুতর তারা ডুবিতেছে।

গুরু। ফের উদয়গিরি পানে চাও, পরে অস্তগিরি পানে চাও, কি দেখিলে বল?

শিষ্য। এখন উদয়গিরি-পরে আর এক সারি তারা উঠিয়াছে। এবং অস্তগিরিতে আর এক সারি তারা—রোহিণী নক্ষত্র ও বহুতর তারা—ডুবিতেছে।

গুরু। প্রথমবার উদয়গিরির উপরে যে এক সারি তারা—স্বাতি নক্ষত্র ও বহুতর তারা—উঠেছিল, সে তারার সারি এখন কোথায়?

শিষ্য। এখন সে তারার সারি স্বাতি নক্ষত্র সহ উদয়গিরির বহু ঊর্দ্ধে উঠেছে।

গুরু। সারারাত তারার গতি দেখ। সন্ধ্যার সময় যে চিত্রা নক্ষত্র উদয়গিরির উপরে ছিল, সেই চিত্রানক্ষত্রের গতি দেখ, আর অস্ত গিরিতে তারার পর তারা ডুবিতেছে দেখ।

শিষ্য। চিত্রা নক্ষত্র সন্ধ্যার পর হইতে ক্রমে উদয়গিরির ঊর্দ্ধে উঠি-

তেছে। রাত্রি দুপুরের সময় আমার মাথার উপর আসিল, ক্রমে পশ্চিমে নামিয়া ভোরবেলা অস্তগিরিতে ডুবিল, সায়ংকালে সোমতারা ও সরমাতারা (Pollux and Procyon) আমার মাথার উপর ছিল। রাত্রি দুপুরের সময় তাহারা অস্তগিরিতে ডুবিল; আবার সন্ধ্যার পর স্বাতি নক্ষত্র উদয়গিরির উপর উঠিয়াছিল, এখন ভোর বেলা সে তারা অস্তগিরির উপর জ্বলিতেছে, এবং অসুর ভাগের ৮টী প্রধান তারা—স্বাতিনক্ষত্র জয়-বিজয় তারা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র, শ্রবণা নক্ষত্র, অভিজিৎ নক্ষত্র, পুচ্ছ তারা ও মৎস্য-মুখ তারা এখন আকাশে জ্বলিতেছে।

গুরু। বেশ কথা। তবেই বুঝিলে যে সায়ংকালে আকাশের দেবভাগ ক্ষিতিজের উপর ছিল, এখন ভোর বেলা আকাশের অসুর ভাগ—ক্ষিতিজের উপরে আসিল এবং দেবভাগ পৃথিবীর তলে গিয়াছে।

শিষ্য। তাই বটে, কেবল ধ্রুব তারা সায়ংকালে যেখানে ছিল, এখন ভোরবেলা ঠিক্ সেইখানেই আছে, নড়েও নি চড়েও নি।

গুরু। সায়ংকালে যে আকাশ-কড়াই ক্ষিতিজ ঢাকিয়া ও চাপিয়া ছিল, তাহার নাম দেবভাগ—এখন ভোরবেলা যে আকাশ-কড়াই ক্ষিতিজ ঢাকিয়া ও চাপিয়া আছে, তাহার নাম আকাশের অসুরভাগ। দুই আকাশ-কড়াই মিলিয়া আকাশ ফাপা ফুটবলের মত হয়।

শিষ্য। তবে আকাশ-ফুটবলের কেন্দ্রস্থানে পৃথিবীপৃষ্ঠে আমরা আছি। কি আশ্চর্য্য! "নক্ষত্র তারাগ্রহসঙ্কুল" অসীম আকাশ অবিরত পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে।

গুরু। এইটী তোমার দৃষ্টিভ্রম। যখন রেলে চল তখন দেখ যে দূরস্থ বৃক্ষাদি দৌড়িতেছে, সে কি সত্য? রেল দৌড়ে। তুমি রেল গাড়ীতে থাকিয়া দেখ যে বৃক্ষ দৌড়ে, কিন্তু দৌড়ে ট্রেণ।

শিষ্য। তবে পৃথিবী ঘুরিতেছে, আকাশ স্থির। কিন্তু আমরা দেখি যেন আকাশ ঘুরিতেছে, এ দৃষ্টি-বিভ্রম আমার বটে।

গুরু। মানবের দৃষ্টিবিভ্রম অনেক আছে, ক্রমে বুঝিবে।

শিষ্য। এখন সূর্য্য উদয়গিরিতে উঠিতেছে, তারাগুলি একে একে সবই লুকাইল কেন?

গুরু। দুপুরবেলা উঠানে প্রদীপ জ্বালিলে ঘর হইতে দেখিতে পাও না। কেন না সূর্য্যের প্রখরতর কিরণে প্রদীপের আলোক তেজোহীন হয়, সূর্য্যের

উদয়ে তারার কোমল আলোক সহজেই তেজোহীন হয়; সুতরাং তারাকুল অদৃশ্য হয়। নতুবা যেখানকার তারা সেইখানেই থাকে। সূর্য্যগ্রহণ কালে সর্ব্বগ্রাস হইলে আকাশে তারা ফুটে।

৪র্থ রাত্রি।

৪ঠা বৈশাখ।

গুরু। আজ তুমি ছায়াপথ ভাল করিয়া দেখ, আকাশের দেবভাগে ছায়াপথের যে অর্দ্ধেক আছে, সায়ংকালে উহা তোমার মাথার উপর দেখ।

শিষ্য। ধ্রুবতারা আকাশের মস্তক হইলে,—ছায়াপথ আকাশের কান্ধে যেন পৈতা ঝুলিতেছে।

গুরু। সমগ্র বিশ্ব বিরাট পুরুষের দেহ। ছায়াপথ তাঁহার দেহের উপবীত, সেই অনুকল্পে দ্বিজগণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন।

শিষ্য। এ আস্পর্দ্ধা দেব শর্ম্মাকে সাজে।

গুরু। দেবভাগের প্রধান ১৩ তারা দেখিয়া বল যে কটী তারা ছায়াপথ সুশোভিত করে।

শিষ্য। উত্তর অংশে ——

ব্রহ্মহৃদয় তারা ছায়াপথের পূর্ব্বভাগে আছে।

মধ্য অংশে ——

সোমতারা (Pollux) এবং সরমা (Procyon) ছায়াপথের পূর্ব্বদিকে এবং রোহিণী নক্ষত্র আর্দ্রানক্ষত্র ও বাণ রাজতারা ছায়াপথের পশ্চিম দিকে আছে।

দক্ষিণ অংশে——

লুব্ধকতারা ও অগস্ত্য তারা ছায়াপথের অদূর পশ্চিমে চক্‌মক্ করিতেছে এবং বিশ্বামিত্র ও ত্রিশঙ্কু ছায়াপথের মধ্যে পড়িয়াছে।

দেবভাগের প্রধান ১৩ তারার মধ্যে কেবল মঘা নক্ষত্র চিত্রানক্ষত্র এবং নদীমুখ তারা ছায়াপথ হইতে সুদূরে আছে। বাকী দশটি ছায়াপথের মধ্যে বা নিকটে আছে।

গুরু। ভোর হইতেছে, আকাশের অসুরভাগ এখন ক্ষিতিজের উপরে আসিয়াছে। অসুরভাগের ছায়াপথ দেখ।

শিষ্য। অসুরভাগের ছায়াপথ মধ্যভাগে ছিন্ন-ভিন্ন।

উত্তর অংশে——

ছায়াপথের মধ্যে পুচ্ছতারা (Deneb)। তৎপরে ছায়াপথের পশ্চিমে অভিজিৎ নক্ষত্র এবং ছায়াপথের পূর্ব্বধারে শ্রবণ নক্ষত্র।

মধ্য অংশে ———

ছায়াপথের মধ্যে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র।

দক্ষিণ অংশে—–-

ছায়াপথের মধ্যে জয় এবং বিজয়—তারা রহিয়াছে।

অসুরভাগের প্রধান ৮ তারা মধ্যে কেবল স্বাতি নক্ষত্র ও মৎস্য-মুখ তারা ছায়াপথের সুদূরে আছে। বাকী ৬টী ছায়াপথের ভিতরে বা নিকটে আছে।

গুরু। ছায়াপথের অসীম বিস্তার এবং সুবিমল কান্তি ঋষিগণের মন মোহিত করিয়াছিল।

ছায়াপথ বেদের কলস, সোমধারা এবং দিব্য সরস্বতী নদী।

ছায়াপথ মহাভারতের "নক্ষত্র মার্গ—"(১)

(নক্ষত্র নির্ম্মিত পথ) এবং আকাশ-গঙ্গা। (২)

ছায়াপথ রামায়ণের স্বাতীপথ (৩)

এবং রঘুবংশের স্বর্গ-পদ্ধতি। (৪)

সকল দেশেই ছায়াপথকে জ্যোতিষ্ক, পথ, সপ্তসমুদ্র (৫) সপ্তনদী, পর্ব্বত, স্বর্গ এবং সেতু কল্পনা করা হইয়াছে।

পুরাণে এই সোমধারা "লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল"-ময় সপ্ত সমুদ্র বলিয়া বর্ণিত আছে। ধরাধামে লবণ সমুদ্র বই আর কি আছে।

শ্রীকালীনাথ শর্ম্মা।

---

(১) "নক্ষত্র মার্গম্-বিপুলম্ সুরবীথী ইতি বিশ্রুতম্"

মহা ৩।৪৩।১২

(২) "এষা দেব-নদী পুণ্যা পার্থ! ত্রৈলোক্য-পাবনী।
আকাশ-গঙ্গা রাজেন্দ্র! অত্র আপ্লুয় গমিষ্যসি"

মহা ১৮।৩।২৮

(৩) "শুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইব অম্বরে"

রাম ৬।২২।৭০

(৪) পীড়য়িষ্যতি ন মাম্ খিলীকৃতা স্বর্গপদ্ধতিঃ অভোগ লোলুপম্।

রঘু ৯।৮৭

৫। সপ্ত প্রবতঃ আ দিবম্। ঋক্ ৯ ৫৪।২

মাতৃভক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীনগর গ্রামের জমীদার হরকুমার রায়ের দুই পুত্র এখন বর্ত্তমান, জ্যেষ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথ। ধীরেন্দ্রের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর। কনিষ্ঠ বীরেন্দ্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর। আজ পাঁচ ছয় বৎসর হইল ধীরেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে এবং তাঁহার একটি চারি বৎসরের পুত্রসন্তানও হইয়াছে, তাহার নাম নলিন। বীরেন্দ্র কলিকাতায় রিপন্ কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়েন। হরকুমার রায়ের স্ত্রীর নাম কল্যাণী এবং পুত্রবধূ সুশীলা। জানি না, সুশীলার পিতামাতা কেন তাঁহার নাম সুশীলা রাখিয়াছিলেন। সুশীলার পিতা এক-জন নামজাদা ব্যারিষ্টার, বোধ হয় সেই জন্য এবং ধনী ব্যারিষ্টারের একমাত্র সন্তান বলিয়া, আমাদের সুশীলাসুন্দরী কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। হর-কুমার বাবু দেখিয়া শুনিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন, কিন্তু সুশীলার আচরণে তাঁহার জীবনে অধিক দিন সুখভোগ সহ্য হইল না। তিনি অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেন্দ্র জমীদারীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। ধীরেন্দ্র একটু দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া পিতা এবং মাতা কনিষ্ঠ পুত্র বীরেনকেই অধিক স্নেহ করিতেন। বীরেনের প্রকৃতি শিষ্ট, শান্ত এবং নম্র; তাহার মাতৃভক্তিতে দেশের লোকে তাহাকে আরও স্নেহ করিত। সে সকলকে সমান ভাবে দেখিত, তাহার বন্ধুত্বে সকলেই মুগ্ধ ছিল, যখন ছুটীতে বীরেন বাটী আসিত, তখন সে ভ্রাতৃপুত্রের জন্য নানা-রকম খেল্না আনিত, কিন্তু নলিনের মাতা সুশীলা তাহা দেখিয়া পুত্রকে বলিতেন, এ কখন কি চোখে দেখিস্ নি? এই জিনিষ নিয়ে আবার খেলা করছিস্! তোর মামার বাড়ীতে যে এরকম কত খেল্না গড়াগড়ি যাচ্ছে, এই বলিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। হায়! সংসার সাগরের একমাত্র গৃহিণী, একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী! তোমাদের উপর না সংসারের সকল ভার অর্পিত হইয়াছে? তোমরাই না হিন্দুর একমাত্র সংসার-জীবনের সার! তবে তোমাদের এ ব্যবহার হইল কেন? হায় দাম্ভিকা রমনী! এই-রূপেই তোমরা সংসারে আগুন জ্বালাইয়া সোণার সংসারকে ছাড়খার করিয়া

দাও, তোমরা সংসারের একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র গৃহিণী হইয়া এ তোমা-দের কি ব্যবহার?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌ ও বৌ—বৌমা! এত বেলা হ'ল এখন রান্না চড়ালে না? খোকাকে আমার কাছে দিয়ে রান্না কর! বৌমা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন—আমি কি এ বাড়ীর রাঁধুনী হইয়া আসিয়াছি? না আমি এ বাড়ীর চাকরাণীরও অধম হইয়াছি? যে, সকল কাযই আমায় করতে হবে? না! নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটু বিশ্রাম করিবারও সময় নাই। নিজেরা কেবল ব'সে ব'সে হুকুম চালাবেন, আর আমি খেটে মরবো! বাবা কেন আমায় এমন ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন! কল্যাণী স্তম্ভিত! তিনি অনেক দিন বৌয়ের মুখ হইতে অনেক কথা শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রবধূর এরূপ উগ্র মূর্ত্তি এবং তাঁহার মুখ হইতে এরূপ মধুর বাক্য তিনি আর কখনও শ্রবণ করেন নাই। তিনি দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলিলেন, কিন্তু বৌয়ের কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া রান্নাঘরে গিয়া ভাত চড়াইলেন। আর তাঁহার পুত্রবধূ সুশীলাসুন্দরী দ্বিতল প্রকোষ্ঠে একখানি খাটের উপর অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় নভেল পাঠে নিযুক্তা হইলেন।

সুশীলা পুস্তক পাঠে নিযুক্তা হইলে ধীরেন্দ্র ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন,কিন্তু তাঁহার পত্নী তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না,—গম্ভীরভাবে সেই অবস্থাতেই রহিলেন। ধীরেন ডাকিলেন সুশীলা! সুশীলা স্থির গম্ভীরা, যেন ভ্রূক্ষেপই নাই। ধীরেন আবার ডাকিলেন, সুশীলা—বলি হয়েছে কি? সুশীলা এবার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—হয়েছে আমার মাথা। দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই, সব সময় হুকুম চালাবেন, কেন? আমি কি এবাড়ীর চাকরাণী! তোমার সংসার, তোমার মা ভাই তুমি নিয়ে থাক, আমি আজই খোকাকে নিয়ে কলিকাতায় চলে যাব। এতক্ষণে ধীরেন সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন, তারপর বলিলেন সুশীলা! তাই ভাল। দিনকতক বাপের বাড়ী গিয়া থাক; এখানে যদি তোমার অসুবিধা হয়, তুমি তাই কর। সুশীলা আবার বলিলেন, নিশ্চয় যাব, তোমার মা ভাই নি'

তুমি সংসার কর, আমার আর কায নাই। এই বলিয়া তিনি বেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, আর ধীরেন্দ্রনাথ মস্তকে হস্ত দিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন, মনে ভাবিলেন—তাঁহার পতিগতপ্রাণা পত্নীর কোন অপরাধ নাই, যত দোষ তাঁহার মাতার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আপনারা বলিতে পারেন, যে এত বড় জমীদার বাড়ীতে একটা বামন বা ঝী নাই কেন? ইহাদের কি অর্থের অভাব? তাহা নহে, কিন্তু যে বাড়ীর গৃহিণী এত দাম্ভিকা বা এত মুখরা, সে বাড়ীতে কে চাকরী করিবে? সকলেই কাযে জবাব দিয়া চলিয়া যায়। কেবল কল্যাণীর জন্য যা দুই একদিন থাকে। এখন কল্যাণীই নিজে রান্না ঘরে গিয়া ভাত চড়াইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, ভগবানের চরণে এমন কি অপরাধ করিয়াছিলাম, যাহাতে আমার ঘরে এমন পুত্রবধূর আবির্ভাব! মাতা রান্না শেষ করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে ডাকিলেন। পুত্রবধূ লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর স্বহস্ত প্রস্তুত অন্নের ধ্বংস করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলেন। যখন সমস্ত সংসারের কার্য্য সমাপন করিয়া কল্যাণী বারেন্দায় আসিয়া একটু বিশ্রাম করিতে ছিলেন; সেই সময় ধীরেন্দ্র সেখানে প্রবেশ করিয়া বলিল,—মা! তোমায় একটা কথা বলি। তুমি রোজ রোজ বৌকে যা ইচ্ছা তাই ব'ল না, ওর শরীর খারাপ। যদি তুমি কায করতে না পার, তা হ'লে বল আমি একটা বন্দোবস্ত করে দিই। রোজ রোজ এরূপ করলে লোকে বলবে কি? কল্যাণী বলিলেন— বাবা! আমি আর কি বলেছি, বেলা হয়ে গেল তাই চাডটী রাঁধতে বলেছিলেম! আর বাবা তোর বৌয়ের মুখে কেউ কি এ বাড়ীতে থাকতে চায়? দেখছিস্ ত' কত চাকর বামন জবাব দিয়ে চলে গেল। ধীরেন্দ্র বলিল—মা! আমি ত বৌয়ের কোন দোষ দেখ্‌তে পাই না। সে হয় 'ত' খেটে খুটে একটু শুয়েছে, তুমি তাকে যা ইচ্ছা তাই বলবে; এতে কি তার রাগ হ'তে পারে না? কল্যাণী বলিলেন—যাক্ বাবা। আমি আর তোর বৌকে কোন দিন কোন কথা বলিব না। আমি আর কত দিন! বুড়োও হয়েছি; আমার এখন তীর্থ-ধর্ম্ম করবার সময়, বীরেন বাড়ী আসুক, তার সঙ্গে একটা পরামর্শ

ক'রে আমি কাশীতে গিয়ে বাস ক'রব। তোদের সংসারে আর আমি থাকৃতে চাই না, তোদের বাড়ী ঘর তোরা নিয়ে থাক্। তোরা সুখে থাক্‌· সেই আমার সুখ। এই বলিয়া মাতা কাঁদিতে লাগিলেন, ধীরেনও সেথান হইতে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাসের শেষ, সহরে ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। এই কলিকাতায় কোন মেসে দুইজন কলেজের ছাত্র পরস্পর গল্প করিতেছে। একজন বলিল, ভাই সুশীল! গ্রীষ্মের ছুটী ত হইল। সকলেই বাড়ী যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। যদিও আমার প্রাণ বাড়ী গিয়া মায়ের শ্রীচরণ দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়াছে, কিন্তু ভাই! তাঁহার শোচনীয় দুঃখের অবস্থা দেখিতে প্রাণ আর চায় না। আমার মা কাঙ্গালিনী নহেন, আমার মা পুত্রহীনা নহেন! আমার মা এককালে রাজরাণী ছিলেন, এখন তিনি রাজ-মাতা। তাঁর উপযুক্ত পুত্র, পুত্রবধূ সকলই বিদ্যমান। তাঁহার কোন দ্রব্যের অভাব নাই। হুকুম করিলে অসম্ভব দ্রব্যও পাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার সব থাকিয়াও তিনি আজ চোরের মত দিন কাটাইতেছেন। এই বৃদ্ধাবস্থায় রাঁধিতে রাঁধিতে তাঁহার হাড় কালী হইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ আমার বৌদিদি; ভাই সুশীল! এ জীবনে মাকে সুখী করিতে পারিলাম না। আমার মায়ের জীবন চির দুঃখেই কাটিয়া গেল। হায়! আমি বড়ই অধম,— কেন মা এই অধম সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল। সুশীল আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিল, ভাই বীরেন! দুঃখ করিও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। সকলই জানিও যে ভগবানের হাত। আর ভগবানেরই বা দোষ দিই কেন? আজকাল আমরা নিজেদের দোষেই সোণার সংসারকে ছারে খারে দিতে বসিয়াছি। ভাই বীরেন, যে সংসারে পুরুষ নারীকে শাসন করতে জানে না, স্বামী স্ত্রীর অনুরক্ত হয়; যে সংসারে স্বামী স্ত্রীর অধীন হয়ে কার্য্য করে; জেন ভাই, সে সংসারে আগুন জ্বলিতে আর বেশী দেরী হয় না। আজকাল আমরা সভ্য হইয়াছি। পত্নীই এখন আরাধ্য দেবতা। পত্নীকে সন্তুষ্ট রাখিবার

জন্য—পত্নীর মন রক্ষার জন্য স্বর্গাদপি গরীয়সী গর্ভধারিণীকেও বাঁদী সাজাইতে কুণ্ঠিত হই না। পত্নীই এখন আমাদের সংসারের সর্ব্বস্ব। আর মাতা! যিনি দশমাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, যাঁহার জন্য আমরা আজ এই ধরাধাম দেখিতে পাইতেছি, যাঁহার সহিত রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ, বাল্যকালে যিনি পুত্রের জন্য অসহ্য ক্লেশকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, সেই জননী—সেই গর্ভধারিণী কি না আজ পথের ভিখারিণী! হায় বঙ্গভূমি, যে বঙ্গে একদিন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মূলমন্ত্র, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, উচ্চ, নীচ, নর, নারী প্রত্যেকেরই হৃদয়-কন্দরে প্রোথিত ছিল; যে মাতার এক বিন্দু অশ্রুজল প্রত্যেক সন্তানকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিত, সেই মাতার অশ্রুজল কি না আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে ধারারূপে প্রবাহিত হইতেছে! তথাপিও কুলাঙ্গার সন্তানগণের হৃদয় ক্ষণকালের জন্য একটুও দ্রবীভূত হইতেছে না! জননীর শত অশ্রুবিন্দুও প্রিয়তমা স্ত্রীর একবিন্দু অশ্রুতেই ভাসিয়া যাইতেছে। হায়, স্ত্রৈণ কুলাঙ্গার নব্যশিক্ষিত সন্তানগণ! তোমরা কি একবারও ভাবিতেছ না যে, তোমার মাতার একবিন্দু অশ্রু ভূপতিত হইলে, তাহা নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া তোমার সমস্ত উন্নতি-সৌধকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে!. তোমরা কি দেখিয়াও দেখিতেছ না যে, মাতার প্রতি দীর্ঘ নিশ্বাস আজ বঙ্গভূমিকে ছারখার দিতে বসিয়াছে! তোমাদের আজ এত অবনতি কেন? তোমরা আজ এত অল্পায়ু কেন? বলিতে পার কি? তোমরা এখন শিক্ষিত হইয়াছ, সভ্য হইয়াছ—সমাজ-সংস্কার করিতে শিখিয়াছ। স্ত্রীই এখন তোমাদের সংসারের কর্ত্রী হইয়াছেন। তোমরা মিতব্যয়ী হইয়াছ,—চাকরাণী রাখিয়া আর বেশী অর্থব্যয় কর না। সেই চাকরাণীর ভার এখন বৃদ্ধ মাতার উপরেই ন্যস্ত করিয়াছ। মাতৃভক্তি এখন তোমাদের পত্নীর মাতার প্রতি বর্ত্তাইয়াছে। ধন্য তোমাদের শিক্ষা, ধন্য তোমাদের সভ্যতা, ধন্য তোমাদের সমাজ-সংস্কার! দেখ ভাই বীরেন! সব সংসারেই আজকাল এইরূপ করিয়াই আগুন লাগিয়াছে। সব সংসার আজকাল এইরূপেই ছারখার যাইতে বসিয়াছে। বিশেষতঃ তোমার দাদা অত্যন্ত স্ত্রী-পরবশ। জানি না, তিনি এত স্ত্রৈণ হইয়া কি করিয়া বিষয় কর্ম্ম দেখেন! বীরেন বলিল,—ভাই! আমাদের সংসারে আগুন লাগিয়াছে। সংসারের সব সুখ এক বৌদিদির জন্যই ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। আমি বার মাসই বিদেশে থাকি, মায়ের অবস্থা স্বচক্ষে না দেখিলেও

মায়ের প্রতি পত্রই আমাকে একেবারে জ্ঞানশূন্য করিয়া দেয়। পত্রের প্রতিছত্রে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁহার কি এক দুঃখ-কাহিনী বলিয়া দেয়। তখনি ভাবি, ছুটিয়া গিয়া মাকে সঙ্গে করিয়া আনি। মায়ের সেই দুঃখ-কাহিনী, মায়ের সেই পত্রের প্রতি অক্ষর মনে হইলে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। ভাবি, সেই পাপ সংসার—সেই পাপপুরী পরিত্যাগ করিয়া কোন একস্থানে মাকে লইয়া গিয়া, আমার মাকে আমার হৃদয়াসনে বসাইয়া তাঁর সেই শ্রীচরণ দু খানির পূজা করি। জানি না তাহা অদৃষ্টে আছে কি না! জানি না মায়ের শ্রীচরণ পূজা করিয়া এ হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারিব কি না? মা! মা গো! জানি না তুমি কত কষ্ট পাইতেছ! জননী আমার, স্নেহময়ী মা আমার! আহা! ভাই সুশীল, মা নাম কতই মধুর, মধু হইতে কত মধুময়! মা বলিয়া ডাকিলে যেন প্রাণ গলিয়া যায়! মা নামে হৃদয়ের সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়। সামান্য আঘাতেও যেন হৃদয়তন্ত্রী মা নামে পুরিয়া যায়। তাই বোধহয়, পূর্ব্বে বঙ্গ সন্তানগণ প্রতিবর্ষে মাকে দশভুজা রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার আশে পাশে সন্তানগণকে সাজাইয়া তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি, সেই স্নেহ মাখান, সেই বাৎসল্য রসের প্রস্রবণ মূর্ত্তিখানিকে দূর্ব্বা পুষ্প বিল্বদল দ্বারা হৃদয় খুলিয়া পূজা করিয়াও তৃপ্ত হইত না। মাকে নানা-রূপে কল্পনা করিতে ভাল বাসিত। কখনও মাকে দুষ্ট সন্তানশাসন-কারিণী খড়্গমুণ্ডধারিণী করালবদনা কালীরূপে কল্পনা করিত। কখন বা শিষ্ট সন্তান-পালিনী অন্নবিতরণকারিণী অন্নপূর্ণারূপে কল্পনা করিয়া মাকে পূজা করিত। আজ কি না সেই মা ভিখারিণী! পুত্রের তিরস্কারে,—মা লক্ষ্মী পুত্রবধূগণের শতমুখী-প্রহার-পুরস্কারে জর্জ্জরিতা! হায় কালের কুটিল চক্র! ভাই সুশীল! শুধু মায়ের জন্য—শুধু মাতৃপদ সেবার জন্য আমি এবার দেশে যাব, তিনি কি অবস্থায় আছেন দেখবার জন্য দেশে যাব। সুশীল বলিল,—আর ভাবিয়া কি হইবে? এখন এস, রাত হয়েছে; বড় গরম, ছাদে একটু বেড়িয়ে আসি। তারপর যা হয় পরামর্শ কর্‌ব এখন। এস ভাই! বীরেন বলিল—চল! উভয়ে প্রস্থান করিলেন। আপনারা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইহারা কে! আর ইহাদের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তবে আমার কর্ত্তব্য করিয়া রাখি। বীরেন্দ্র আমাদের ৺হরকুমার রায়ের পুত্র, আর সুশীল বীরেনের সহপাঠী একজন আত্মীয় সম্পর্কীয় বন্ধু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধা কল্যাণীর আজ কয়েকদিন রাঁধিয়া রাঁধিয়া অসুখ হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিবার এবং একটু জল দিবার মত লোক এতবড় বাড়ীর ভিতর কেহ নাই। তিনি একটা ঘরে একাকিনী ছট্‌ফট্ করিতেছেন। উত্থান-শক্তি রহিত। অতবড় জমীদারের স্ত্রী—জমীদারের মাতা হইয়া তাঁহাকে দেখিবার কেহ নাই! আশ্চর্য্য বটে! হায় সংসার! হায় মানব-চরিত্র! পিতা মাতা সন্তানকে পালন করেন কেন? কেন নিজে না খাইয়া পুত্র কন্যাদের খাওয়ান! কেন পুত্র কন্যাদের সুখী করিবার জন্য যত্নবান্ হয়েন? বীরেন বাটী আসিয়া মায়ের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার বড় কষ্ট ও ক্রোধ হইল। সে বিশ্রামের অবসর না লইয়া একেবারে সুশীলার শয়ন কক্ষের দ্বারে গিয়া ডাকিল,—বৌদিদি! বৌদিদি জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন,—কে? বীরেন্দ্র উত্তর দিল—আমি! বৌদিদি দরজা খুলিলেন; বীরেন্দ্র বলিল,—বৌদিদি! এ তোমাদের কি ব্যবহার? বৃদ্ধা মাতা রুগ্নাবস্থায় একটা ঘরে একাকিনী পড়িয়া আছেন, তোমরা তাঁকে শুশ্রূষা করা দূরে থাক্—একবার চোখের দেখাও দেখ না!—একটু জল পর্য্যন্তও দিতে পার না! ছিঃ ছিঃ তোমরা কি মানুষ? সুশীলা গর্জ্জিয়া উঠিল। বলিল,—অতই যদি মাতৃভক্তি, তাহলে বাড়ী এসে মাকে শুশ্রূষা করাই উচিত ছিল। আমরা মানুষ নই, উনিই মানুষ। দুদিন কল্‌কাতায় গিয়ে একটু ইংরাজী পড়ে উনিই মানুষ হয়েছেন। বীরেনের ভয়ানক ক্রোধ হইল। বলিল,—বৌদিদি! মনে ভাবিও না যে আমি কিছু বুঝি না, মায়ের উপর তোমরা যে অত্যাচার করেছ, আমি সবই শুনেছি,—সব এতদিন সহ্য করেছি, কিন্তু জেনো সহ্যেরও একটা সীমা আছে। তোমরা ভারি বাড়িয়েছো। সুশীলা আর কোন কথা না বলিয়া ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। বীরেন তখনই ডাক্তারের উদ্দেশে ছুটিল। যথাসময়ে ডাক্তার আসিলেন। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন,—বড় অসময়ে তাঁহাকে আনান হইয়াছে। আরও পূর্ব্বে আনা উচিত ছিল। এখন বাঁচান যাইবে না, অবস্থা বড় খারাপ। ডাক্তার ঔষধ দিয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু রোগের কোন উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বীরেন্দ্র প্রাণপণে জননীর সেবা করিল, কিন্তু কিছু-

তেই কিছু হইল না। রায়গৃহিণী কল্যাণী তাঁহার পুত্র - পুত্রবধূর অত্যাচারে জর্জ্জরিতা হইয়া অনন্ত শয়নে শায়িত হইলেন। ধীরেন বা তাঁহার পত্নী কেহ একবার বাহিরও হইলেন না; যেন তাঁহাদের কিছুই হয় নাই। বীরেন ধীরেনের কক্ষদ্বারে গিয়া ডাকিল, - দাদা! শীঘ্র বাহিরে আসুন। সব শেষ হইয়াছে, আজ আমরা মাতৃহীন হইয়াছি! কিন্তু তাহার চীৎকারে কেহ বাহির হইলেন না। তখন বীরেন মনে ভাবিল, যে মৃতা মাতাকে একা ফেলিয়া যাওয়া ঠিক নয়। ভাবিয়া বীরেন সেইখানে বসিয়া রহিল, একটু পরেই একজন প্রতিবেশী আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইল এবং বীরেনকে সান্ত্বনা দিয়া লোক ডাকিতে ছুটিয়া গেল। বীরেন আবার ডাকিল—দাদা! দাদা! কোন উত্তর নাই। হায় স্ত্রী-পরামর্শ! হায় অকর্ম্মণ্য পশু-সদৃশ স্ত্রৈণ পুরুষ!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সকলে মৃতাকে লইয়া শ্মশানে চলিলেন। ধীরেন বা তাঁহার পত্নী কেহ এ ব্যাপার চক্ষেও দেখিলেন না। সকলেই মৃতার সৎকার করিয়া গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু বীরেন সেই নির্ব্বাণোন্মুখ চিতা-সম্মুখে বসিয়া মা মা রবে গগন মাতাইতে লাগিল। সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে জমাট বাঁধিয়াছে, চিতার আগুণে শুধু সেই শ্মশানটুকু একটু আলোকিত হইয়া রহিয়াছে। বীরেন অনেকক্ষণ কাঁদিল, তারপর উঠিয়া বলিল,—মা! কোথায় তুমি? কোন্ স্বর্গ-রাজ্যে তুমি! হতভাগ্য সন্তান আমি. তোমায় বাঁচাইতে পারিলাম না। একদিনও তোমায় সুখী দেখিতে পাইলাম না। মা মা, একবার এস! হতভাগ্য সন্তানকে ক্রোড়ে নিয়ে, তার অশান্ত হৃদয় শান্ত করতে একবার এস জননী! দেখে যাও, এ হৃদয় কি অব্যক্ত বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত হইতেছে। একবার এস, তুমি ত কোন দিন এমন নিষ্ঠুর ছিলে না মা! তবে কেন আমার কথায় এখনও আস্‌ছ না। আমি ত তোমার চরণে কোন অপরাধ করি নাই। তবে কেন উত্তর দিচ্ছ না। এস মা, একবার এস! এ অশান্তিপূর্ণ জর্জ্জরিত হৃদয়ে শান্তির পুণ্য জ্যোতিঃ

বিকাশ করতে একবার এস! একবার এস জননী! সন্তানকে একবার তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে টেনে নাও। মা, এ জনমে তোমায় সুখী করিতে পারি নাই। অধম সন্তানের জন্য মা তুমি কত কষ্ট করিয়াছ, কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ, পাঠ্যাবস্থায় বিদেশে অবস্থানকালীন আমার সংবাদ পাইতে একদিন বিলম্ব হইলে, কত চিন্তায় অধীরা হইয়াছ মা! আর ত মা এ হতভাগ্যের জন্য কেহ কোন চিন্তা করিবে না,—আর ত হতভাগ্যের জন্য কেহ এক মুহূর্ত্তও ভাবিবে না,—আর ত মা মা বলিয়া ডাকিতে পাইব না,—আর ত তোমার সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া—সেই শ্রীচরণ দুখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া হৃদয়কে—শুধু হৃদয়কে কেন এ জীবনকে পবিত্র করিতে পাইব না! মা আমার সহসা কোথায় লুকালে! অধম সন্তানকে ছলনা করতে তোমার সেই স্নেহমাখা মূর্ত্তিখানিকে কোথায় লুকালে মা! এস মা—এই হৃদয়-মরুতে তোমার সেই শ্রীচরণ দুখানি স্থাপন কর মা! তোমার সেই স্নেহমাখান কর স্পর্শে অভাগার এই হৃদয়ের চিতানলকে নির্ব্বাপিত করিয়া দেও মা! এস মা জননী! মাগো মা আমার! বীরেন এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এমন সময় অকস্মাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঝড় উঠিল, কিন্তু বীরেন সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ভাগীরথীর দিকে অগ্রসর হইল। বীরেন তীরে দাঁড়িয়ে আবার মা মা রবে কাঁদিতে লাগিল। তারপরে সহসা বসিয়া উঠিল,—মা তবে কি আসিবে না, জন্মের মত হতভাগ্য সন্তানকে পরিত্যাগ করিলে? আমি ত কোন দিন তোমার পদসেবা করিতে পাই নাই, তুমি অনেক সহ্য করেছ জননী! পুত্রের তিরস্কার, বধূমাতার তীব্র ভৎর্সনা কিছুই তোমার অভাব হয় নাই। শেল সম তোমার বুকে বিঁধিয়াছে, কিন্তু আমার মুখের দিকে চাহিয়া সব সহ্য করিয়াছ—সব বিস্মৃত হইয়াছ; কৈ আমি ত তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না। তবে আর এ জীবনে প্রয়োজন কি? আমায়ও তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে টেনে নাও, জননী। ভাগীরথী! আশ্রয় দেমা, তোর কোলে আমায় আশ্রয় দে। এই বলিয়া বীরেন ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিল। ভাগীরথী তার অতল সলিলে মাতৃভক্ত সন্তান—মাতৃ শোকাক্রান্ত হতভাগ্য বীরেনকে তার উত্তাল-তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। ধন্য মাতৃভক্তি!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বীরেন মনের উত্তেজনায় নদীতে ঝাঁপ দিল এবং অজ্ঞান অবস্থায় ভাসিতে ভাসিতে নিকটবর্ত্তী গ্রামের কূলে আসিয়া লাগিল। জ্ঞান হইলে সে দেখিল যে, নদীর ধারে শয়ন করিয়া আছে। তখন তাহার পূর্ব্বের ঘটনা স্মৃতিপথে উদয় হইল। বীরেন উঠিল, উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতেছে, জ্যোৎস্না না থাকিলেও অল্প রাস্তা দেখা যাইতেছে। বীরেন চলিল, একটি গৃহস্থের দ্বারে গিয়া ডাকিল,—কে আছ রক্ষা কর—ভিজে মারা যাই! গৃহস্থ দরজা খুলিয়া দেখিলেন, একটি সুন্দর অষ্টাদশবর্ষীয় বালক গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ সলিলসিক্ত, থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। গৃহস্থ বলিলেন—ভয় নাই, এগিয়ে এস! কি জাতি? বীরেন উত্তর করিল—কায়স্থ। বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, আমায় একটু আশ্রয় দিন, নইলে প্রাণ যাবে। গৃহস্থ বীরেনকে বৈঠকখানায় বসাইয়া একখানি বস্ত্র দিলেন। বীরেন বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং শরীরে আগুণের উত্তাপ লাগাইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল এবং গৃহস্থকে বলিল, যে, রামকৃষ্ণপুর হইতে শ্রীনগর আসিতে পথে নৌকা জলমগ্ন হয় এবং সে জলে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া যায়, যখন জ্ঞান হয় তখন দেখে সে এই গ্রামে লাগিয়াছে। বীরেন সেইখানেই আহারাদি করিল এবং পরদিন প্রাতে শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করিল। বাটী প্রবেশ করিয়া দেখিল—সবই ঠিক আছে, সংসার সেইরূপই চলিতেছে,—কিছু ব্যতিক্রম নাই, কিন্তু তবু যেন শূন্য—তবু যেন একটা কিসের অভাব। বীরেন ধীরে ধীরে ধীরেনের নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল—দাদা! আমি তোমাদের নিকট বিদায় চাই। আমি চির সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিব। তোমরা আমায় বিদায় দাও! আর যদি মাতার সদ্‌গতি করিতে পার, চেষ্টা করিও! আমি বনে বনে ভ্রমণ করিব, দেখি যদি কোথাও শান্তি পাই। ধীরেন এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহার জন্যই এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সে-ই সংসারে আগুণ জ্বালাইয়াছে। ধীরেন বলিল,—না বীরেন তাহা হইবে না। ভাই! আমি অপরাধী! আমি যদি মাতার কথা মত কার্য্য করিতাম—যদি তাঁহার অসুখের সময় একদিনও

তাঁহাকে দেখিতাম, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু হইত না! ভাই, আমায় ক্ষমা কর! আমি নরাধম! আমি কুলের কুলাঙ্গার। বীরেন দেখিল, একদিনের মধ্যে দাদার এবং বউদিদির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ধীরেনের এবং গ্রামবাসীর অনুরোধে বীরেন আর বাটী ত্যাগ করিতে পারিল না। যথা-সময়ে কল্যাণীর শ্রাদ্ধাদি হইল। রায়-পরিবারের ভাগ্যাকাশে আবার সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইল। বীরেন নিজে অর্থব্যয় করিয়া একটি পুষ্করিণী মাতার নামে খনন করাইয়াছে এবং একটি অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই খানে অনেক অতিথি রাত্রিবাস ও ভোজন করিয়া থাকে, কেহ ফিরিয়া যায় না। এই মঠের স্তম্ভগাত্রে লেখা আছে "কল্যাণী মঠ"। সেইখানে প্রতিদিন অতিথি সেবা হয়। বীরেন বাড়ীই থাকিল এবং মাতার একটি প্রতিমূর্ত্তি সেই মঠে গঠিত করিয়া রাত্রিদিন পূজা করিতে লাগিল, কিন্তু ইহ জীবনে বীরেন আর বিবাহ করিল না। ধন্য সংযমী মহাপুরুষ বীরেন্দ্রনাথ! ধন্য তোমার "মাতৃভক্তি"!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু।

সান্ত্বনা।

কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মকরি, কর্ম্ম-অবসানে
যে জন চলিয়া যায় আপনার স্থানে,
সে কত সুখেতে থাকে পেয়ে পরলোক,
আমরা না বুঝে করি তার তরে শোক।

কেন শোক? কেন এই আকুল ক্রন্দন?
কেন বৃথা হাহাকার! অশান্তি ভীষণ!
সে গিয়াছে,—আমরাও যাব এক দিন;
তবে কেন শোকে দুঃখে দেহ কর ক্ষীণ?

এ ধরায় করিলেই জনম গ্রহণ,
একদিন হবে তার অবশ্য মরণ!
ঐ যে ফুটেছে ফুল আলো করি বন;
এ শোভা রবে না,—হবে অবশ্য পতন।

ফুলের মরণে হয় ফলের জনম,
এই বিশ্ব-রাজ্যে দেখি ইহাই নিয়ম।
ফলের ভিতরে বীজ পরিপক্ক হয়,
বীজ হ'লে পক্ক,—ফল পড়িবে নিশ্চয়।

ভাবী মহাবৃক্ষ থাকে সুপ্ত ক্ষুদ্র বীজে ;
কে বুঝিবে বিধাতার এ রহস্য কি যে !
বীজ হ'তে বৃক্ষ যবে অঙ্কুরিত হয় ,
তখন বীজের মৃত্যু জানিও নিশ্চয়।

অল্পদিনে হ'ক কিম্বা শতাব্দীর পরে,
বীজ রাখি সৃষ্টি মাঝে, এ বৃক্ষও মরে।
ইহাই সৃষ্টির ধারা,—বিধির বিধান ;
কেন বৃথা শোকে তবে হও ম্রিয়মাণ ?

এক আসে, এক যায়, চিরকাল তরে
কিছুই থাকে না—এই সংসার ভিতরে।
অজর, অমর, আত্মা, নিত্য, সনাতন ;
কেন শোক ? তাঁর তত্ত্বে হও না মগন।

অগ্নিতে না হ'ন দগ্ধ, বায়ুতে শোষণ,
জলেতে না গলেন এ আত্মা সনাতন।
শৃঙ্খলে না যায় বাঁধা, অস্ত্রে নাহি কাটে,
মৃত্যু তাঁর নাই ভাই এ সংসার নাটে।

পঞ্চভূতে গড়া এই শরীর সুন্দর,
ভূতে ভূত মিশে যা'বে কিছুদিন পর।
তা'র তরে কেন শোক, কেন বা ক্রন্দন,
কেন এত ব্যাকুলতা, যন্ত্রণা ভীষণ !

বৃথা শোক !—ছিন্ন কর মায়ার বন্ধন,
ধৈর্য্য ধর, শান্ত হও, সম্বর ক্রন্দন।
চিরদিন শোকে যদি মুগ্ধ হয়ে থাক ;
তথাপি যে গেছে, তা'কে ফিরে পাবে না'ক।

চিরদিন শোকে যদি কর হাহাকার,—
চিরদিন বহে যদি চক্ষে অশ্রুধার ,—
চিরদিন দগ্ধ যদি হও শোকানলে,
তথাপি পাবে না ফিরে যে গিয়েছে চ'লে !

জীবের এ যাতায়াত হয় কর্ম্মফলে,
কেহ আসে, কেহ হাসে, কেহ যায় চ'লে।
গেছে যে আসিবে, যাবে যে এসেছে আজি ;
দু'দিনের ঘর এই মিথ্যা ছায়াবাজী !

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্ম অবতার ;
করিলেন শিষ্টে সুখী,—দুষ্টের সংহার।
তাঁহারাও গিয়াছেন মৃত্যু-দ্বার দিয়া ;
এ দেখেও শোকে মগ্ন ? শান্ত কর হিয়া।

ধ্রুব, প্রহ্লাদের কথা ভেবে দেখ মনে ;
ভক্তি ডোরে বেঁধেছিল তারা নারায়ণে,
কোথা তারা ? গেছে ঐ মৃত্যু-পথ দিয়া ;
এ দেখেও শোকে মগ্ন ? শান্ত কর হিয়া।

সতী-শিরোমণি সীতা, সাবিত্রী সুন্দরী ;
রাখিলেন কীর্ত্তি ভবে পতি-পদ স্মরি।
তাঁরাও গেছেন চ'লে মৃত্যু-দ্বার দিয়া ;
এ দেখেও শোকে মগ্ন ? শান্ত কর হিয়া।

সাধু, ভক্ত, কিম্বা ঐ দস্যু ও তস্কর ;
এ সংসার-মাঝে নয় কেহই অমর !
সকলেই যাবে ঐ মৃত্যু-পথ দিয়া ;
তবে কেন বৃথা শোক ? শান্ত কর হিয়া !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আশানন্দ।

আশানন্দ ব্রাহ্মণ-সন্তান;—নদীয়া জেলার অন্তর্গত, শান্তিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। আশানন্দ, বিপুল বলে বলীয়ান এবং অতুল বীরপুরুষ ছিলেন। এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-বীর প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে,- খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তে কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে বঙ্গদেশ ভরিয়াই—বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে, দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল; তাহারা প্রায়ই দলে দলে চারিদিকে দস্যুতা করিয়া ভ্রমণ করিত। পশ্চিম বঙ্গের প্রায় দুর্গম, নিবিড় জঙ্গল মধ্যে দস্যুদলের এক একটী "ঘাটি" ছিল; বর্ত্তমান রাণাঘাট,—"দস্যুরাজ রণার ঘাটি।" "ঘাটি" হইতে বাহির হইয়া দস্যুদল মানুষ মারিত, ঘর জ্বালাইত, টাকা লুঠিয়া লইয়া যাইত;—রাজ্য ভরিয়া, নিরন্তরই ঘোর নৃশংস অত্যাচার করিয়া ফিরিত;—তাহাতে কি জমীদার, কি প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি সম্ভ্রান্ত, কি ইতর—কেহই প্রায় নিরাপদে, নিরুদ্বেগে জীবন-যাত্রা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেন না।

বাঙ্গালী বীর আশানন্দ, শারীরিক শক্তি-সাধনায় সিদ্ধ,—তাহাতে অতুল বাহুবলশালিতায়, বিপুল সাহসিকতায়, তেজস্বিতায়—দুঃসাধ্য সাধনে ভীমতুল্য ছিলেন;—বর্ত্তমান "কলির ভীমগণ" হইতে ন্যূন ছিলেন না। আশানন্দ, মানসিক শিক্ষায়—লেখাপড়ায় "মূর্খ" রহিলেও—মানস-শিক্ষা শক্তির সাধনায় অসিদ্ধ হইলেও শারীর শক্তির সাধনায় সিদ্ধপুরুষই ছিলেন, এবং এই শক্তি প্রভাবে ইন্দ্রিয়-বিজয়ীও হইয়াছিলেন। আশানন্দের কর্ম্ম করিতেই নিরন্তর আনন্দ ছিল; তাই তিনি এক মুহূর্ত্তও নিষ্কর্ম্ম রহিতে পারিতেন না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে এক পদও সরিয়া পড়িতেন না। আশানন্দ, নিরন্তর কর্ম্মানন্দই ছিলেন; তাঁহার প্রাণগত বিশ্বাস—কর্ম্মকুণ্ঠ হইলে, পরম ভাগবত সাধনসিদ্ধ বৈষ্ণবেরও বৈকুণ্ঠ লাভ,—বিষ্ণু দর্শন হয় না,—ইষ্ট লাভ ঘটে না। আশানন্দ ঠাকুর, প্রকৃত কর্ম্মবীরই ছিলেন। লাঠি, শড়কি, ঢাল, তলোয়ার, খেলার অস্ত্রশস্ত্র পরিচালন-নৈপুণ্যে সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে সব্যসাচী অর্জ্জুন তুল্য জ্ঞান করিত! তাই তখন তিনি সরদার মণ্ডলে, মণ্ডলেশ্বররূপেও শোভন হইতেন,—"অদ্বিতীয় বীর"

"অদ্বিতীয় খেলাড়ু" খ্যাতিলাভও করিতেন! তখন বর্দ্ধমান, হুগলি ও নদীয়ার প্রধান প্রধান জমীদার সরকারে, সরদার মহলে, তিনিই প্রধান নেতা, প্রধান পরিচালক, জমীদারের সেনাপতি ছিলেন।

আশানন্দের ভোজনশক্তিও অদ্বিতীয় ছিল;—যেমন ভোজন শক্তি, তেমনই শারীরিক শক্তি,—অথবা যেমন শারীরিক শক্তি,তেমনই ভোজনশক্তি; ব্রাহ্মণবীর প্রচুর ভোজন করিতে পারিতেন এবং জীর্ণ করিতেও সমর্থ হইতেন; তাই তাঁহার শক্তি, সামর্থ্য, সাহস, অকুতোভয়তা ও কর্ম্মক্ষমতা নিরন্তর অক্ষুণ্ণ—অকুণ্ঠ ছিল। বস্তুতঃ সেইকালে অনেক বাঙ্গালীই—এই "ভেতো বাঙ্গালীই"—এই "অম্লব্যাধি-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীই"—এই "দুর্ব্বল ভীরু বাঙ্গালীই"—এই "আত্মরক্ষায় অসমর্থ বাঙ্গালীই" প্রচুর আহার করিতে পারিতেন—জীর্ণ করিতেও সমর্থ হইতেন। নীরুজ শ্রীমান্ বলীয়ান্ সাহসী হুঙ্কারে দস্যুদলও তাড়াইয়া দিতেন। সেই বাঙ্গালী অনায়াসে তালবৃক্ষচূড়ে আরোহণ করিয়া "তালের কান্দি" হইতে তাল ছিঁড়িয়া লইতেন। বিনা অস্ত্রে নারিকেলের "ছোবরা" খুলিতেন,—হস্তপেষণে নারিকেল ভাঙ্গিতেন। লাঠির আঘাতে বড় বড় বাঘ তাড়াইয়া দিতেন এবং সেই লাঠি ঘুরাইয়া বন্দুকের গুলিও ফিরাইতেন।

সেইকালে বঙ্গে ভোজন সামগ্রী,—বাঙ্গালীর নৈত্যিক খাদ্য—চাউল, দাইল, তরিতরকারী, ফলমূল, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, দধি, মাখন, ঘৃত, গুড়, চিনি, তৈল, মসলা অতিশয় সুলভ ছিল। তাই ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে অনায়াসে প্রচুর ভোজন-সম্ভার সংগ্রহ করিত। প্রচুর ভোজন করিয়া বিপুল শক্তিমান্ ও অতুল কর্ম্মক্ষমও হইত।

আশানন্দের বাহুবলকাহিনী নানামূর্ত্তিতে, নানারূপে রাজ্য ভরিয়া প্রকটিত ছিল,—এখনও আছে। তবে তখন বঙ্গ-পিতৃ-পিতামহগণ পুত্র-পৌত্রগণ সান্নিধ্যে আশানন্দের বীরত্বকাহিনী যেমন পরমোৎসাহে বলিতেন; পুত্র-পৌত্রগণও তেমন পরমোৎসাহে শুনিতেন—পুনঃ পুনঃ শুনিতেও চাহিতেন। এখন আর সেই যেমন,—তেমন নাই—উৎসাহও নাই; কেহ বলেন না, কেহ শুনেন না;—আশানন্দের কাহিনী বলিতে—শুনিতে কেহও আনন্দলাভ করেন না। নব্য বাঙ্গালীর আশা-আনন্দ ভিন্ন পথে গতিমান্ হইয়াছে।

কোন এক সময়ে আশানন্দ কয়েকজন সরদার সঙ্গে করিয়া খাজনার

টাকা লইয়া জেলায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তখন তিনি দলবল এবং টাকাসহ সন্নিকটস্থ এক আত্মীয়ের বাড়ী উপস্থিত হইলেন এবং নিরাপদে নির্ভাবনায় রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঘোর বিপদ সমুপস্থিত, বিষম ভাবনার আবির্ভাব হইল! যখন আশানন্দ দলবল ও টাকা লইয়া জেলা অভিমুখে গমন করেন, তখন একদল দস্যুও পান্থবেশে তাঁহার অনুসরণ করে এবং আশানন্দের সঙ্গে মিলিত হইয়া আশা-আনন্দে চলিতে থাকে। পথিমধ্যেই সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, তখন আশানন্দ ভিন্ন পথে আত্মীয় বাড়ী অভিমুখে চলিলেন, দস্যুদলও সেই বাড়ীর অনতিদুরে এক জঙ্গলে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। অনন্তর গভীর রাত্রি উপস্থিত,—জনমানব নিদ্রিত, চারিদিক শব্দহীন; তখন দস্যুদল আসিয়া সেই বাড়ী আক্রমণ করিল। দস্যুদলের মশালের আলোকে বাড়ীর চারিদিক আলোকিত এবং ভৈরব গর্জ্জনে, হুহুঙ্কারে, পাড়াপড়সী প্রকম্পিত হইয়া উঠিল; গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; কুকুরের পাল বিকট চীৎকার করিতে লাগিল; চারিদিকে প্রলয়-কলরব উত্থিত হইল; গ্রামের অনেক বলীয়ান সাহসী পুরুষ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দস্যু তাড়াইতে, গৃহস্থের ধন প্রাণ রক্ষা করিতে দলে দলে ধাবমান হইল।

আশানন্দের সঙ্গীয় সরদারগণ বাহির বাটীতে নিদ্রিত ছিল, তাহারা আলোকে এবং নানা বিকট চীৎকারে জাগরিত হইয়া বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে বুঝিয়া ক্ষণমধ্যে সুশিক্ষার অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবে আপনাপন অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া দস্যুদলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহস্থ মহাশয় বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া "যাহা কর আশানন্দ" ভাবিয়া সপরিবারে পলায়মান হইলেন।

তখনও বর্ত্তমানের ন্যায় অনেক স্থানের গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লইয়া দস্যুগণ নির্ব্বিবাদে অক্ষত শরীরে প্রস্থান করিত; তবে এখন যেমন সর্ব্বক্ষেত্রই নিরাপদ, তখন তেমন নিরাপদ ছিল না। আশানন্দের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, বীর সজাগ হইলেন, জানিলেন—বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে এবং বাটীর বাহিরে ডাকাতদিগের সহিত মদীয় সর্দ্দারগণ ভীষণ যুদ্ধ করিতেছে। আশানন্দ বাহির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। স্থির গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া উভয় দলের অস্ত্র-শস্ত্র চালনানৈপুণ্য দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র দেখিয়াই জলদগম্ভীর রবে হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন,—"হট, নতুবা হটা"।

"প্রভো! সহজ নয়, ভাল খেলোয়ার!" "ভাল ভাল"। আশানন্দ বিদ্যুৎ গতিতে বাড়ীর মধ্যে ঢেঁকী-ঘরে প্রবেশ করিয়া ঢেঁকীটি তুলিয়া লইলেন, এবং এক বিকট হুঙ্কার ছাড়িয়া ঢেঁকীটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে দস্যুদলের মধ্যে পতিত হইলেন। তখন দেখিতে দেখিতে সেই ঘুর্ণায়মান ঢেঁকীবরের ঘূর্ণন লীলায় বীরখেলায় আঘাতে আঘাতে দস্যুদলের কতক ভগ্নশির পঞ্চত্ব প্রাপ্ত, ও কতক হস্ত পদ ভগ্ন হইয়া ভূপতিত হইল, অবশিষ্ট দস্যুগণ প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

রাত্রি প্রভাত হইল, গৃহস্থ নিরাশ মনে হাহাকার করিতে করিতে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন সকলই পূর্ব্বমত রহিয়াছে, সামান্য সামগ্রীটিও এদিক ওদিক হয় নাই, কেবল অন্তঃপুরের ঢেঁকীটী বহিঃপুরে রক্তাক্ত কলেবরে রক্তাক্ত দস্যুদল-মধ্যে ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার আশে পাশে সরদার দল বসিয়াছে। গৃহস্থ একান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন! নির্ব্বাক্ হইয়া আশানন্দ পানে কৃতজ্ঞতা-প্রফুল্ল নয়নে আশানন্দের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে আত্মীয় কুটুম্বগণ, প্রতিবেশী-সকল, কিছু পরে চৌকীদার, অনন্তর শান্তিরক্ষক দারগা, জমাদার ও বরকন্দাজগণ সহ উপস্থিত হইলেন। বাড়ীখানি লোকারণ্যময় হইল। দারগা বাড়ীর অবস্থা, সঙ্গে সঙ্গে হতাহত দস্যুগণের অবস্থা এবং দস্যুতার বিবরণ শ্রবণ করিয়া, মৃতামৃত দস্যুগণ লইয়া প্রস্থান করিলেন। গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী আশানন্দের অদ্ভুত বাহুবলের বীরত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া আশানন্দকে "ঢেঁকী" উপাধি দান করিলেন। অদ্ভুত—অপূর্ব্ব বটে! ধন্য দান শক্তি! কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই; যেরূপ অদ্ভুত—অপূর্ব্ব কর্ম্ম, সেই রূপই কর্ম্মফল, অদ্ভুত—অপূর্ব্ব উপাধি-লাভ! বর্ত্তমান কালেও এইরূপ উপাধি দাতৃমণ্ডলী দান করেন, ভিখারী মণ্ডলী লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী বীর সেই হইতেই "ঢেঁকী" হইয়া পড়িয়াছেন। অবশ্য উপাধির প্রভাবেই বটে "ঢেঁকী" এক রমণীর চরণ সেবায়ই রত হইয়াছেন; রমণীর অঞ্চলান্তরাল, তাহাতে চরণাঘাতকেই পুরুষার্থের লীলাফল জ্ঞান করিয়া আশায়ই আনন্দ লাভ করিতেছেন। মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া ধান ভাঙ্গিতেছেন, বাঙ্গালী "ঢেঁকী" হইয়াছেন।

আর একদিন "লাটের" সময় কালেক্টারির খাজনার টাকা লইয়া আশা-

নন্দ কয়েকজন সরদার সঙ্গে বর্দ্ধমানে যাইতেছিলেন। প্রান্তরের মধ্য দিয়া পথ, প্রান্তর চক্রবাল রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বৃক্ষ, লতা, মনুষ্যবাস শূন্য মুক্তবক্ষে ধূ ধূ করিতেছে। সেই প্রান্তর মধ্যে রাত্রি উপস্থিত হইল, তখন আশানন্দ দলবল সহ ত্বরিত পদসঞ্চারে প্রান্তরের সুদীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিতে, সত্বর প্রান্তর পার হইতে—গ্রাম পাইতে ধাবমান হইলেন; কিন্তু সহসা একদল দস্যু উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। আশানন্দ অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; ভাবিলেন—ইহারা কি মাটির মধ্য হইতে আবির্ভূত হইল!—না আকাশ হইতে পড়িল! ইহাদের নিঃশব্দে পশ্চাৎ ধাবন,—নিঃশব্দে আক্রমণ—শিক্ষানৈপুণ্যের প্রতিভা-চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠাই বটে! এই অতি ঘৃণিত, নিন্দনীয় দস্যুই অতি আদরণীয়—প্রশংসনীয় বীর হইতে পারে।

বীর আশানন্দ এক বৃহৎ সুদৃঢ় বংশদণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গীয় "বাছা বাছা" কয়েক জন সরদারের হস্তে সরকারী খাজনার টাকা রক্ষার ভার দিয়া, একাকীই একমাত্র লাঠি সহায়ে দুর্জ্জয় দস্যুদলের মধ্যে আপতিত হইলেন। বীর অকুতোভয়ে, অতুল সাহসে, বিপুল বলে দস্যুদলের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সরদার-রাজ আশানন্দ এমনই সুকৌশলে সেই বংশদণ্ড ঘূর্ণন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে দস্যুদলের, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া,—শরীরে অস্ত্র প্রহার করা দূরের কথা, দূর হইতে প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রও ঘূর্ণায়মান বংশদণ্ডে আঘাত পাইয়া দূরান্তরে গিয়া পড়িতে লাগিল। দস্যুদলের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন বীর আশানন্দ ভৈরব হুঙ্কারে মুক্ত-প্রান্তরের মুক্ত বায়ু-সাগরে মুক্ত তরঙ্গ-গর্জ্জন তুলিয়া দিয়া মুক্ত দিগন্তপারে স্থিত গ্রাম পর্য্যন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। ভীমবলে মুহুর্মুহুঃ দণ্ডাঘাতে দস্যুদিগকে ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন। একে একে দস্যুদলের অনেক ভূতলাশ্রয় করিল। তদ্দর্শনে অবশিষ্ট দস্যুগণ পলায়ন করিল। তখন আশানন্দ ভূপতিত জীবিত দুইজন দস্যু দুই বগলে পূরিয়া সেই নিশাযোগেই জেলায় উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বকালে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আশানন্দের ন্যায় অনেক বলীয়ান্ বাঙ্গালী বঙ্গদেশে অবস্থান করিতেন। গ্রাম নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে দুই চারিজন বাঙ্গালীর আশানন্দ বিরাজমান ছিলেন। তখন বাঙ্গালী অশনে বসনে, শয়নে ভাষণে, আচারে নিয়মে, ভ্রমণে বিহারে, লিখনে পঠনে, ধর্ম্মে

কর্ম্মে, বিশ্বাসে ভাবে, ঔষধে পথ্যে, স্বাস্থ্যে সজীবতায়, শারীরিক মানসিক সর্ব্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ছিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। আশানন্দ দস্যুদ্বয় সহিত কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গত রাত্রের ঘটনা সকল নিবেদন করিলেন। সাহেব বাহাদুর শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালী বীরের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন; এবং আশানন্দকে প্রচুর ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কর্ম্ম।

অচল সম বসে' থাকা,
—তাও একটা কর্ম্ম বটে;
কর্ম্ম—সেটা জন্ম-সাক্ষী,
স্বর্গ নরক তাতেই ঘটে।
অস্ফালন ও কোলাহল—
কর্ম্মের তাহা স্থূলাকার,
মনে মনে যে কর্ম্ম-ইচ্ছা,
সেটা কর্ম্মের সূক্ষ্মাকার।
ক্ষুব্ধসিন্ধু-তরঙ্গ প্রায়
স্থূল কর্ম্ম দেখা যায়,
সূক্ষ্ম কর্ম্ম সমীর সম
নয়ন আড়ে' বহে' যায়।
অভ্র-লেহী আকুল উর্ম্মি
যেমি নাচে প্রলয়-তালে,
বায়ু—তারো শক্তি তেমন,
প্রলয়-লেখা তারো ভালে।
সূক্ষ্ম বলে' স্থূলের চেয়ে
শক্তি তাহার স্বল্প নয়,
সূক্ষ্মতড়িৎ—বক্ষে তারো
মৃত্যু-ভীষণ বজ্র রয়!
স্বার্থ-বিহীন কর্ম্ম যার,
আসক্তি যার নাইকো মোটে,
কর্ম্ম যে তার স্বর্গ-সিঁড়ী,
মর্ত্ত্যে সেই-ই স্বর্গ লোটে।
নিমেষেরি পরের কাজে,
কোটি কল্পের পুণ্য হয়;
স্বার্থভরা বিন্দু কাজেই
পাপের সিন্ধু পূর্ণ হয়। *

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "লুকোচুরি" গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে বর্ণিত উদয় ও কাশীনাথের কথোপকথন হইতে।—লেখক।

কৌতুক-কণা।

(১)

দুই বন্ধুতে রেলে যাইতে ছিলেন—একজন কিয়দ্দূর গিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলেন, তখন অপর বন্ধু তাঁহার পকেট হইতে অতি সন্তর্পণে তাঁহার টিকিট খানি তুলিয়া লইয়া নিজ পকেটে রাখিলেন। গাড়ী বর্দ্ধমানের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে নিদ্রিত বন্ধু সত্বর উঠিয়া বলিলেন—এইখানে টিকিট দেখাইতে হইবে,—তিনি পকেট হইতে টিকিট বাহির করিতে গিয়া টিকিট না পাইয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! টিকিটখানা কোথায় পড়ে গেছে!"

অপর বন্ধু বলিলেন, "তাহাতে হইয়াছে কি? বেঞ্চের নীচে শুইয়া পড়—আমার রেপারখানা এই দিক দিয়া ঝুলাইয়া রাখিতেছি। টিকিট কালেক্টর আসিলে সে তোমায় দেখিতে পাইবে না।"

গাড়ী থামে—আর বিলম্ব নাই—বন্ধু নিমেষ মধ্যে বেঞ্চের নিম্নে অন্তর্হিত হইলেন।

যথাসময়ে টিকিট কালেক্টর আসিলে বন্ধু তাহার হস্তে দুইখানি টিকিট দিলেন। টিকিট কালেক্টর বলিলেন—"আপনি তো একলা দেখিতেছি—আর একজন লোক কোথায়?"

বন্ধু অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন—"বেঞ্চের নীচেয়—উনি ঐ রকম না হইলে রেলে যাইতে পারেন না—বেঞ্চে বসিয়া গেলে মাথা ঘোরে।"

"ওঃ!" বলিয়া টিকিট কালেক্টর অগ্রসর হইলেন—তাহার পর দুই বন্ধুতে কি হইল, তাহা আমরা জানি না।

(২)

একজন সংবাদ-পত্র প্রকাশক কোন লেখককে প্রতি কলমে দশটাকা করিয়া দিতেন—কিন্তু লেখক নিম্নলিখিত ভাবে লিখিয়া অতি শীঘ্রই কলম পূর্ণ করিতেন—তাঁহার উপর গল্প লিখিবার ভার ছিল—তিনি গল্পের প্রায় স্থানে এইভাবে লিখিতেন—

"তুমি তাহার কথা শুনিয়াছিলে?"

"হাঁ।"

"সত্যি!"

"সত্যি।"

"কোথায়?"

"বটগাছের তলায়।"

"কখন?"

"আজ।"

"তা হলে সে বেঁচে আছে?"

"হাঁ।"

"বটে?"

প্রকাশক বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"দেখুন এখন হইতে অক্ষরানুসারে আপনাকে মূল্য দেওয়া হইবে—প্রতি হাজার অক্ষরে আপনি ১০৲ টাকা করিয়া পাইবেন। লেখক অতি ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিলেন—কিন্তু তিনি পরাজিত হইবার পাত্র নহেন—যে গল্প লিখিতেছিলেন—তাহার ভিতর এক তোতলাকে প্রবেশ করাইলেন—প্রকাশক যে কাফি পাইলেন—তাহাতে এইরূপ:—

"আ—আ—আ—আপ—আপ—আপনি—ভু—ভু—ভু ভুল বু—বু—বু—বুঝি—তে—তে—তে—তেছেন,—আ—আ—আ—আমি—এ—এ—এমন কা—কা—কা—কাজ—ক—ক—ক— কখনও—ক—ক—ক—ক—করিতে পা—পা—পারিনে।"

(৩)

এক বেকার ব্যক্তি বহু চেষ্টাতেও কোন চাকুরী জোগাড় করিতে পারিলেন না।—যেখানে যান সেই খানেই শুনিতে পান যে—"না কোন কিছু খালি নাই।" সহসা তাহার একজনের কথা মনে পড়িল। এই ব্যক্তি এক আফিসে চাকুরীর জন্য গেলে সাহেব বলিলেন—"না—কোন কাজ খালি নাই।" তিনি ফিরিতেছিলেন—এই সময়ে দেখিলেন ভূমিতে একটী পিন পড়িয়া আছে—তিনি তাহা সযতনে তুলিয়া লইলেন, তাহা দেখিয়া সাহেব বলিলেন—"দেখিতেছি তুমি খুব সাবধানী লোক—কাল আসিও—তোমায় একটা চাকুরী দিব।

বেকার ব্যক্তি মনে করিলেন "এ ব্যবস্থা করিলে হয়তো চাকুরী জোগাড় হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি হাতের ভিতর লুকাইয়া একটা পিন

লইয়া এক আফিসে প্রবেশ করিলেন। বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া গোপনে পিনটী ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। বড়বাবু বলিলেন "না—কিছু খালি নাই।"

বেকার ফিরিয়া সাবধানে পিনটী তুলিয়া লইলেন—ইহা দেখিয়া বড়বাবু চীৎকার করিয়া ডাকিলেন "চাপ্‌রাশি—চাপ্‌রাশি—এই লোককে এখনই এখান হইতে বাহির করিয়া দেও—যে সামান্য একটা পিন চুরি করিতে পারে, সে সব চুরি কর্‌তে পারে।"

চাপ্‌রাশি গলাধাক্কা দিবার পূর্ব্বেই বেকার আফিস হইতে তিন লম্ফে লম্বা দিয়াছিলেন—সব সময়ে সব খাটে না।

(৪)

দুইজন পল্লীগ্রামের লোক জোড়াবাগানে একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। একজন মালপত্র নামাইয়া লইলেন—অপরে সঙ্কুচিত-ভাবে কোচম্যানকে ভাড়া দিলেন। গাড়োয়ান দেখিল, পল্লীগ্রামবাসী ভুল-ক্রমে পয়সার বদলে দুইটা আধুলি দিয়াছে—ইহা দেখিয়া সে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া সবলে অশ্বে কশাঘাত করিয়া তীরবেগে গাড়ী ছুটাইয়া দিল—কিন্তু পল্লীগ্রামবাসিগণ "রাখ—রাখ" বলিয়া পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল—কোচম্যান বধির হইয়া আরও অধিকতর বেগে গাড়ী হাঁকা-ইয়া দিল—পল্লীগ্রামবাসী দুইজন পাগলের ন্যায় সেই গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—তাহাদের দেখাদেখি আরও অনেকে ছুটিল—শেষ একজন পাহারা-ওয়ালা গাড়ী ধরিল। পল্লীগ্রামবাসিগণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাড়ীর নিকট আসিল—গাড়োয়ান বলিয়া উঠিল "আমাদের গাড়ীতে তোমাদের আর কিছু নাই।"

তাহাদের একজন বলিল—"হাঁ—আছে। তুই আমার বাপকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিস্‌।"

সত্য সত্যই এক বৃদ্ধ গাড়ীর ভিতর বসিয়া আছে,—ভয়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছে। সে ব্যাকুলভাবে পাহারাওয়ালা ও জনতার দিকে চাহিতেছে।

(৫)

মাষ্টার মহাশয় অতি রাগতস্বরে বলিলেন, "রাখাল আবার কথা কচ্চিস্‌?

রাখাল অতি বিনীতস্বরে বলিল, "হাঁ—সার।"

"কি কথা কচ্চিস?"

কোন উত্তর নাই।

মাষ্টার মহাশয় আরও রাগতস্বরে বলিলেন, "শীঘ্র উত্তর দে,—কি কথা কচ্চিলি ?"

রাখাল মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিল, "এই দিকে আয়, বল্‌চি স্যার।

মাষ্টার মহাশয় লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। ক্লাসের সমস্ত ছেলে বিস্ময়ে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া গেল,—মাষ্টার মহাশয়কে বলে, "এদিকে আয় বল্‌চি—কি ভয়ানক !"

মাষ্টারমহাশয় গর্জ্জিয়া বলিলেন, "এখনই ক্লাস হইতে বার হয়ে যা।"

রাখাল বলিল, "কেন স্যার ?"

মাষ্টার মহাশয় ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিলেন, "এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমায় কি না বলে এদিকে আয় বল্‌চি।"

রাখাল অতি বিনীতস্বরে বলিল, "স্যার, আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন আমি কি বলছিলাম,—তাইতো বল্লেম। বিনোদ আমায় এই আঁকটা কিরূপে কসেছি তাই জিজ্ঞাসা কল্লে—আমি বল্লেম এদিকে আয় বল্‌চি।"

ক্লাসময় অস্ফুট হাস্য,—মাষ্টার মহাশয়ের চেয়ার গ্রহণ।

"কবে ?"

দুঃখের মাঝারে যাহা কিছু ছিল
সকলি দেখা ত হ'ল।
সুখ অভিলাষে ছুটোছুটি ক'রে
হৃদয় পুড়িয়া গেল॥
জীবনের শেষ ওই ছুটে আসে
মরণ নামটি যা'র !
তবে "কবে" বল, সে সুখ মিলিবে
বুঝি বা হ'ল না আর॥

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

লর্ড চেম্‌স্‌ ফোর্ড।

বিগত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে দিল্লী হইতে সরকারী ঘোষণা পত্র বাহির হইয়াছে যে, লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড আমাদের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধির কার্য্যকাল শেষ হইলে ভারতের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিবেন। তাঁহার নিয়োগ সংবাদে দেশীয়, বিদেশীয় সমস্ত বিখ্যাত সংবাদপত্র আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ভারতে এ যাবৎকাল যে সমস্ত রাজপ্রতিনিধি আসিয়াছেন, ইঁহার ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভারত বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন। সুতরাং এরূপ অভিজ্ঞ রাজপ্রতিনিধির নিয়োগে আমরা সকলেই যে আনন্দিত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষকে একটী মহাদেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্রিটিশ শাসনাধীনে যতগুলি উপনিবেশ আছে, তন্মধ্যে ভারতই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ভারতের রাজপ্রতিনিধি যেরূপ সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ করেন, জগতের অন্য কোন রাজপ্রতিনিধির ভাগ্যে সেরূপ ঘটে না; সুতরাং যিনি এই পদে অভিষিক্ত হন, তিনি যে ভাগ্যবান্ পুরুষ তাহা সহজেই অনুমেয়। এহেন ভাগ্যবান্ পুরুষের পরিচয় জানিতে সকলেরই উৎসুক হওয়া স্বাভাবিক বিধায় নিম্নে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিলাম।

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে ইঁহার বয়স মাত্র ৪৭ বৎসর। ইঁহার পূর্ণ নাম ফ্রেডরিক জন্ নেপিয়র থেসিগার, ব্যারণ চেম্‌স্‌ফোর্ড। ইঁহার পিতা মেজর জেনারল অনারেবল এফ এ থেসিগার ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশে এডজুট্যাণ্ট জেনারল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লর্ড চেম্‌স্ ফোর্ডের শৈশবকাল তাঁহার পিতার সহিত সিমলায় "ফিঙ্গাস্ক্" নামক প্রাসাদে অতিবাহিত হইয়াছিল। আজি পরিণত বয়সে পদার্পণ করিয়াও লর্ড চেম্‌স্ ফোর্ড তাহার সেই শৈশবের ক্রীড়াস্থল ভুলিতে পারেন নাই। তিনি সিমলায় অবস্থান কালে প্রায়ই এই "ফিঙ্গাস্ক্" প্রাসাদ দর্শন করিতেন।

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড প্রথমে উইন্‌চেষ্টার কলেজে ও পরে অক্স্‌ফোর্ডের ম্যাগ্‌ডালেন কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। এই ম্যাগডালেন কলেজ হইতেই তিনি "বি, এ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ

করেন। অল্পদিনের মধ্যে ইনি আইনের পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি এম-এ উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৯খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি অক্সফোর্ডের অল্ সেণ্ট্স্ কলেজের সদস্য পদ সমলঙ্কৃত করেন। ক্রিকেট্ খেলায় ইনি বিশেষ পারদর্শী। খ্রীষ্টধর্ম্মে ইনি প্রবল অনুরাগী। রাজনৈতিক ব্যাপারে ইনি রক্ষণশীল দলভুক্ত।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লণ্ডন স্কুল বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং চারি বৎসর যাবৎ সেই পদে অভিষিক্ত থাকেন। ১৯০৪ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি লণ্ডন কাউণ্টি কৌন্সিলের সভ্য স্বরূপে কার্য্য করেন। এই কাউণ্টি কৌন্সিল সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। আমাদের দেশের প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাদের যেমন এক একটী মন্ত্রণা-সভা আছে, ইংলণ্ডেও সেইরূপ প্রত্যেক কাউণ্টি বা প্রদেশে এক একটি মন্ত্রণা-সভা আছে। এই সভাগুলি পার্লামেণ্ট মহাসভার অধীন এবং এই কাউণ্টি কৌন্সিল হইতেই যোগ্য ব্যক্তিকে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচন করা হয়। লর্ড চেম্‌স্ ফোর্ড ১৯০৪—৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লণ্ডনের কাউণ্টি কৌন্সিলের সভ্যপদে কার্য্য করিবার পর অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড নামক প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে মনোনীত হন। অতঃপর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউসাউথ্ ওয়েল্‌সের গবর্ণর বা শাসন কর্ত্তার পদ গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন। গবর্ণরেরা সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট কাল কার্য্য করিবার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন—ইহাই নিয়ম। কিন্তু লর্ড চেম্‌স্ ফোর্ডের কার্য্যকাল কুইন্‌স্-ল্যাণ্ডে শেষ হইলে তাঁহাকে পুনরায় নিউ সাউথ্ ওয়েল্‌সে গবর্ণর করিয়া পাঠান হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, লর্ড চেম্‌স্ ফোর্ড অতি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ শাসক। কারণ অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশ সমুহের মধ্যে নিউ সাউথ্ ওয়েল্‌স্ই অতিশয় জনাকীর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। এহেন প্রদেশের শাসনভার যে সে ব্যক্তির হস্তে কখনই অর্পিত হয় না। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডাড্‌লীর অনুপস্থিতিকালে ইনি অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণর জেনারল রূপে অস্থায়ী-ভাবে কার্য্য করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পুনরায় কাউণ্টি কৌন্সিলে সভ্যের কার্য্য আরম্ভ করেন। ইনি কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ডে অবস্থানকালে "কে, সি, এম জি" এবং নিউ সাউথ্ ওয়েল্‌সে অবস্থানকালে "জি, সি, এম, জি" এই উপাধি লাভ করেন। ইহা ছাড়া "Knight of Grace of the order of St. Topu of Terusalem" এই উপাধিও লাভ করিয়াছেন।

লর্ড ও লেডী চেম্‌স্ ফোর্ডের ছয়টী পুত্র ও চারিটী কন্যা। ইউরোপখণ্ডে সমরানল প্রজ্বলিত হইবার অব্যবহিত পরে তিনি স্বেচ্ছায় সৈনিক বিভাগে কাপ্তেন (Captain) পদ গ্রহণ করতঃ ভারতে আগমন করেন। গত অষ্টাদশ মাস কাল তিনি ঐ পদে কার্য্য করিতেছিলেন। সিমলার নিকট জুটল্ নামক স্থানে তাঁহার সৈন্যগণ অবস্থিতি করিতেছিল। তিনি আঠার মাস হইল ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, এই আঠার মাস যাবৎ লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত সতত থাকিয়া তিনি ভারত শাসনের ব্যবস্থাদি স্বচক্ষে পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। গত বড়দিনের মধ্যে ইনি কলিকাতায় আগমন করিয়া বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের অতিথি-স্বরূপে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। লর্ড কারমাইকেল যখন ভিক্টোরিয়ার গবর্ণর ছিলেন, লর্ড চেম্‌স্ ফোর্ডও তখন নিউ সাউথ্ ওয়েল্‌সের গবর্ণর ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা উভয়ে পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধু।

লর্ড চেম্‌স্ ফোর্ড সুবক্তা এবং দেখিতে শক্তিমান্ ও সুপুরুষ। তিনি ভারতের ভাবী রাজপ্রতিনিধি বলিয়া ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

লক্ষ্মীর ঝাঁপি।

(১)

জোড়াবাগান বস্তির এক ক্ষুদ্র খোলার ঘরের ক্ষুদ্রতম গৃহে একটী বালক ও একটী বালিকা বাস করিত। বালকের বয়স প্রায় দ্বাদশ বৎসর, বালিকা এখনও নবম বৎসর উত্তীর্ণা হয় নাই; তাহারা দুটীতে ভাই বোন্,—তাহাদের মা-বাপ কেহ নাই।

যখন তাহারা খুব ছেলে মানুষ, তখন তাহাদের পিতা মাতা তাহাদের লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বহুদিন হইল পিতার মৃত্যু হইয়াছে,—মাতা দাসীবৃত্তি করিয়া একরূপ দুঃখে-কষ্টে পুত্র-কন্যার লালন-পালন করিতে-

ছিলেন। প্রায় একবৎসর হইল, তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে; শৈল ও সুধীর পিতৃ-মাতৃ-শূন্য হইয়া এই ক্ষুদ্র খোলার ঘরে বাস করিতেছে।

সুধীর রাস্তায় খবরের কাগজ বেচিয়া, এ সে কায করিয়া যাহা পাইত, তাহাতেই সে অতি কষ্টে ভগিনীকে আহার দিয়া রাখিয়াছিল; শৈলই তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

সন্ধ্যার সময় সুধীর ঘরে আসিয়া সহাস্য বদনে বলিল, "শৈল, আজ তোর জন্যে দেখ কেমন দুই রসগোল্লা এনেছি!"

শৈল আহ্লাদে হাততালি দিয়া উঠিল। সুধীর বলিল, "আরও আছে,—দুধ, মুড়কি, কলা।"

শৈল বলিল, "সব আজ খাব।"

সুধীর বলিল, "হাঁ—আজ যে লক্ষ্মী-পূজা?"

এই কথায় শৈলের মুখ হইতে হাসি তিরোহিত হইল, তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। গত লক্ষ্মী পূজার দিন তাহাদের মা বাবুদের বাড়ী হইতে কত খাবার দাবার তাহাদের দিয়াছিলেন।

সে বলিল, "দাদা, আজ এত পয়সা কোথায় পেলে?"

সুধীর বলিল, "আজ সব খবরের কাগজ বিক্রি হয়ে গেছে। এক বাবুর বাড়ী হতে ট্রাম গাড়ীতে তাঁর ব্যাগ তুলে দিয়েছিলাম, তিনি বার পয়সা দিয়েছিলেন। এক সাহেবের ছাতি ট্রাম গাড়ী থেকে পড়ে গিয়েছিল, ছুটে গিয়ে তাকে ছাতিটা দিতে, তিনি একটা দোয়ানি দিয়েছিলেন।"

শৈল আহার করিতে উদ্যত হইয়া সহসা নিরস্ত হইল, বিষণ্ণ স্বরে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা,—তুমি না বল্লে আজ লক্ষ্মী-পূজো?"

"হাঁ শৈল।"

"মা ঘরে লক্ষ্মীর ঝাঁপি রেখেছিলেন,—আমরা আজ রাখব না?"

জননীর মৃত্যুর পর হইতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি ঘর হইতে কোথায় গিয়াছিল, তাহা তাহারা জানে না। শৈলের মনে কষ্ট হয় সুধীর তাহা কখনও করিত না। নিজে সহস্র কষ্ট পাইয়াও সে শৈলকে সুখে রাখিতে দিন রাত্রি চেষ্টা পাইত। সুধীরের চক্ষুও জলে পূর্ণ হইল, সে কোন কথা কহিতে পারিল না। শৈল বলিল, "দাদা আমি কাঁদব না।"

সুধীর বলিল, "শৈল কি কর্ব্বো, আর তো পয়সা নেই!"

শৈল বলিল, "মা হয় ত রাগ কর্ব্বেন।"

সুধীর আর সহ্য করিতে পারিল না, বলিল, "ঠিক মনে পড়েছে, কানা গৌরের একটা লক্ষ্মীর ঝাঁপি আছে, চাইলে সে সেটা আজ রাত্রের জন্য দিতে পারে।"

কানা গৌর ভিক্ষা করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু সে লোককে এমনই ভয়ানক গালি দিত যে, সকলেই তাহাকে দেখিয়া ভয় করিত, কেহ সহজে তাহার কাছে আসিত না। সুধীরদের পাশের ঘরে গৌর বাস করিত। শৈল বলিল, "সে—সে দেবে না,—যে গাল দেয়!"

সুধীর বলিল, "আমি তার হাত ধরে অনেক দিন তাকে বাড়ী এনেছি, দাঁড়াও দেখে আসি।"

(২)

সুধীর কানা গৌরের ঘরে গিয়া দেখিল, এক জঘন্য বিছানায় গৌর পড়িয়া আছে। তাহার মুখ বিবর্ণ,—রক্ত শূন্য,—তাহাকে দেখিয়া সুধীরের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, গৌরের যে পীড়া হইয়াছে, তাহা সে জানিত না। এ সকল স্থানে কেহ কাহারও সন্ধান লয় না।

সুধীরের পদ শব্দ শুনিয়া গৌর ক্ষীণস্বরে বলিল, "তুই কে কি চাস্?"

সুধীর বলিল, "আমি সুধীর, শৈলর ভাই। গৌর দাদা, তোমার কি অসুখ করেছে?

গৌর কর্কশ স্বরে বলিল, "তা না হলে আমি পড়ে আছি কেন, বদমাইশ, খুব জানিস যে আমার অসুখ হয়েছে, না হলে এখানে আস্‌তে সাহস কর্ত্তিস্ নে। আমার যথা-সর্ব্বস্ব লুঠ কর্ত্তে এসেছিস্,—ওঃ বদমাইশ——"

সুধীরের মুখ ক্রোধে লাল হইল, সে বলিল, "কানা গৌর, তোমার কাছ হইতে আমি কি কখনও এক পয়সাও নিয়েছি?"

"না—তাতে কি! এখন কি চাস্ তাই বল্!"

"আমার জন্য না—শৈল—"

"কি শৈলের জন্য?"

"যদি আজকের জন্য তোমার লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা দাও—"

"কি! কি!"

"আজ লক্ষ্মী-পূজা, মা—লক্ষ্মী-পূজোর দিন লক্ষ্মীর ঝাঁপি রাখতেন—"

গৌর বিকট হাসি হাসিল, তাহার পর কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল, ক্রমে সে অতি কাতরে গোঁগড়াইতে লাগিল, সুধীর তাহার নিকটে আসিয়া বলিল,

"গৌর দাদা, তোমার কি ভারি কষ্ট হচ্চে ? দাঁড়াও, আমি তোমার জন্য খাবার আনচি !"

সুধীর ছুটিয়া নিজেদের ঘরে আসিল, তাহাকে দেখিয়া শৈল বলিয়া উঠিল, "দাদা লক্ষ্মীর ঝাঁপি পেয়েছ ?"

সুধীর বলিল, না—গৌরের ব্যারাম হয়েছে—বোধ হয় ক্ষুধা পেয়েছে, আমার রসোগোল্লাটা তাকে দিয়ে আসি।"

শৈল বলিল, "তুমি কি খাবে ?"

"আমি আর একদিন খাব।"

এই বলিয়া সুধীর রসোগোল্লা লইয়া ছুটিল। সে গৌরের গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র গৌর বলিয়া উঠিল, "তুই কোন বদ্‌মাইশ ?"

সুধীর বিনীতস্বরে বলিল, "আমি সুধীর, আমি তোমার জন্যে একটা ভাল রসোগোল্লা এনেছি।"

গৌর বলিল, "ও বদ্‌মাইশ, ও রসোগোল্লা খেতে পারি - ওঃ"—

"একটু দুধ খাবে ?"

"নিয়ে আয়—নিয়ে আয়—এখনই নিয়ে আয় তৃষ্ণায় মরি !"

সুধীর ছুটিয়া নিজ ঘরে আসিয়া বলিল—শৈল, গৌর ঐ রসোগোল্লা খেতে পাল্লে না, দুধ খেতে চায়।

শৈল দুধের বাটি লইয়া বলিল, "আমি দিয়ে আসিব ?"

"হাঁ, যাও"।

শৈল দুধ লইয়া চলিল, সুধীর তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।"

গৌর বলিল, "তুই"—

"আমি শৈল, সুধীরের বোন, তোমার জন্যে দুধ এনেছি।"

"দে, দে, শীঘ্র দে।"

শৈল গৌরের মুখের ভিতর দুধ ঢালিয়া দিল, গৌর বলিল, "আরও দে—আরও দে।"

"আমাদের আর নেই, একটা রসোগোল্লা খাবে ?"

গৌর কোন কথা কহিল না, সুধীর ও শৈল বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার পর সুধীর বলিল, "তবে আমরা এখন যাই।"

প্রকৃতই তাহাদের ভয় হইতেছিল। তাহারা গমনে উদ্যত হইলে গৌর বলিল, "আমি একলা আছি—একটু থাক।"

শৈল ও সুধীর তাহার বিছানার পার্শ্বে বসিল, বহুক্ষণ গৌর আর কোন কথা কহিল না; সহসা সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোদের মা বাপ কোথায়?"

সুধীর বলিল, "আমাদের ছেলে বেলায় বাপ মরে গেছেন, মা এক বছর হলো মারা গেছেন।"

"তোদের আর কে আছে?"

"মা বলেছেন,—বৰ্দ্ধমান বলে একটা জায়গায় আমার দিদিমা থাকেন, আমি কিছু পয়সা রোজগার করে রেলভাড়া যোগাড় কর্ত্তে পাল্লে'ই তাঁর কাছে যাব।"

গৌর কথা না কহিয়া যন্ত্রণায় অস্ফুট আৰ্ত্তনাদ করিল, শৈল তাহার মুখের বিকট ভাব দেখিয়া ভীত হইল, সে দাদার কাণে কাণে বলিল, "আমার ক্ষুধা পেয়েছে।"

"যাও খাওগে—আমি এখনই যাচ্ছি।" শৈল পা টিপিয়া টিপিয়া পলাইল।

(৩)

সহসা দূরে বাদ্য বাজিয়া উঠিল, কানা গৌর চমকিত হইয়া চাহিয়া বলিল, কিসের বাজনা?"

"আজ লক্ষ্মীপূজা—তাই তোমার কাছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি চাইতে এসেছিলাম। তোমার একটা ছিল।

"হাঁ—হাঁ—কি বলতে যাচ্ছিলাম, কিসের জন্যে তুই এখানে এসেছিলি—হাঁ—হাঁ—"

"মা লক্ষ্মীর ঝাঁপি চাহিতে এসেছিলাম, শৈল আজ রাত্রের জন্য সেটা চায়।"

"হাঁ—হাঁ—তোকে ভাল ছেলে বলে বোধ হচ্ছে।"

গৌর আবার যন্ত্রণায় আৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিল, সহসা সে বলিল, "বিছানার ঐ কোণটা তোল্—তোল্—শীঘ্র তোল্ তুলেছিস্?"

"হাঁ গৌর দাদা।"

নীচেয় যে টালিখানা আছে তোল, একটা গৰ্ত্ত দেখ্‌তে পাচ্ছিস্?"

"হাঁ গৌর দাদা।"

"হাত দে—শীঘ্র—পেয়েছিস্?"

সুধীর মৃত্তিকা নিম্নস্থ গর্ত্তে হাত চালাইয়া দিল, দেখিল গৰ্ত্তমধ্যে কাপড়ে বাঁধা কি রহিয়াছে, সে সেটা টানিয়া বাহিরে আনিল, গৌর বলিল, "পেয়েছিস্—পেয়েছিস্—শীঘ্র শীঘ্র"—

"হাঁ একটা কি কাপড়ে বাঁধা পেয়েছি।"

"হাঁ, ঐ লক্ষ্মীর ঝাঁপি।"

"এটা ভারি—এতে কি আছে?"

"যা নিয়ে যা—মা লক্ষ্মী এই ঝাঁপি পুরে রেখেছেন—যা—যা—কাল সকালে আর আমার ইহাতে কোন দরকার থাকবে না,—যা—যা—নিয়ে যা"—

কানা গৌরের মুখে ভয়াবহ বিকৃতি দেখা দিল, সুধীর ঝাঁপি লইয়া নিঃশব্দে তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল! আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া গৌরের কাপড় ঝাঁপি শৈল মাথায় করিয়া ভক্তিভরে ঘরের কোণে স্থাপিত করিল।

সকালে টাকার শব্দে সুধীরের নিদ্রাভঙ্গ হইল; পূর্ব্বেই শৈল উঠিয়া ছিল, যথার্থ মা লক্ষ্মী রাত্রে তাহাদের ঝাঁপি পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন কিনা দেখিতে গিয়া সে ঝাঁপি খুলিল, তাহার পর ঝাঁপির মধ্যে সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হাত হইতে ঝাঁপি পড়িয়া গেল; গৃহমধ্যে টাকা ছড়াইয়া পড়িল, সেই শব্দে সুধীর জাগিয়া উঠিল।

কানা গৌরের যে এত টাকা ছিল, তাহা কেহ জানিত না, কৃপণ কানা ভিক্ষা করিয়া এত টাকা জমাইয়া গিয়াছে!

সুধীর ভাবিল, নিশ্চয়ই গৌর ভুল ক্রমে এটা তাহাকে দিয়াছিল, সে শৈলকে টাকা কুড়াইতে বলিয়া গৌরের নিকট চলিল, গৌরের টাকা সে গৌরকে এখনই মিটাইয়া দিবে, কিন্তু সে দরজা খুলিয়াই ভীত হইয়া উঠিল, কারণ বাড়ীতে অনেক লোক প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ভিতর দুই এক জন পাহারাওয়ালাও আছে।

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে এক জন বলিল, "কানা গৌর মারা গিয়াছে।" এই কথায় তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, ইহা দেখিয়া এক জন স্ত্রীলোক কর্কশ স্বরে বলিল, "ন্যাকা ছেলে—তার জন্যে আবার কাঁদা হচ্চে?"

সুধীর রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "গৌর দাদা আমায় ভালবাসিত।"

ইন্‌স্পেক্টার গৌরের ঘরে ছিলেন, বাহির হইয়া বলিলেন, "এখানে ভিড় করিও না,—চলিয়া যাও।"

সকলে চলিয়া গেলেও সুধীর যাইতেছে না দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টার বলিলেন, "এখানে নয়,—চলে যাও।"

সুধীর মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিল, "আমি—আমি আপনাকে বলতে চাই, কানা গৌরের টাকা—অনেক টাকা ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টার বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কি—কি।"

সুধীর রাত্রের ঘটনা সমস্ত বলিল, তাহার পর নিজ ঘরে ইন্‌স্পেক্টারকে আনিয়া টাকার ঝাঁপি দেখাইল।

ইন্‌স্পেক্টার ঝাঁপি লইয়া কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন, তখন ভাই বোনে তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া গত রাত্রের অদ্ভুত ঘটনাসকল ভাবিতে লাগিল। শৈলের বিশ্বাস, মা লক্ষ্মী ঝাঁপি টাকায় পূর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন,—সুধীর এ সময়ে তাহার ভুল দূর করিবার চেষ্টা পাইল না।

* * * *

বৈকালে কমিসনার স্বদলে আসিলেন। সুধীর যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য কি না তাহার অনুসন্ধান করিলেন। তাহার কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল,—তখন তিনি শৈল ও সুধীরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। সে রাত্রে পুলিশ আফিসে শৈল ও সুধীর যেরূপ ভোজ পাইল, তাহা জীবনে তাহারা আর কখনও পায় নাই।

খুলিয়া দেখা হইল যে, কানা গৌরের ঝাঁপিতে টাকা ও মোহরে দুই হাজার টাকা ছিল,—সে মৃত্যুকালে শৈল ও সুধীরকে ঐ টাকা দিয়া গিয়াছে, সুতরাং এই টাকা ইহাদের। কমিশনার সাহেব তাহাদের নামে এই টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিলেন, শৈল ও সুধীর দুই জনেই স্কুলে প্রেরিত হইল।

* * * * *

পুলিশ সাহেব বৰ্দ্ধমানে অনুসন্ধান করিয়া শৈল ও সুধীরের মাতামহীকে বাহির করিলেন, তিনি বড় লোক,—তাঁহার একই মাত্র কন্যা ছিল, জামাতা ঝগড়া করিয়া অনেক দিন হইল স্ত্রী লইয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন,—তিনি অনেক চেষ্টায়ও তাহাদের কোন সন্ধান পান নাই।

বলা বাহুল্য, শৈল ও সুধীর এত দিনে তাহাদের দিদিমাকে পাইল, সদ্‌গুণের পুরস্কার চিরকাল ভগবান দিয়া থাকেন। শৈল ও সুধীর কি তাহার দৃষ্টান্ত নহে?

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচাৰ্য্য।

মাসিক সংবাদ।

বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সমস্ত উদ্‌যোগ আয়োজন শেষ হইয়াছে। বৃহৎ পটমণ্ডপ খাটান ও আসনাদি সুপাতিত এবং সমুদয় কার্য্যের বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম, এ, এস, এস, এফ, আর, ই, এস বিরচিত "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "ভারতেশ্বরী ও ভারত-সম্রাট্" নামক পুস্তক বাহির হইয়াছে, মূল্য ১৲ একটাকা।

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সরল বাঙ্গলা ইংরেজী অভিধান" বাহির হইয়াছে, মূল্য ১।৷০ দেড় টাকা।

যুদ্ধে বিপন্ন ও নিহত সৈনিকগণের সাহার্য্যার্থ বোম্বাই নগরে যে সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহাতে চল্লিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদনে "আখ্যান" নামক নূতন ধরণে একখানি মাসিক পত্র আগামী ১লা ফাল্গুন হইতে প্রকাশ হইবে। তাহার জন্যে সবিশেষ উদ্‌যোগ আয়োজন চলিতেছে।

উৎকলদীপিকা—উড়িষ্যার একখানি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক কাগজ। মান্যবর রায় সুদামচরণ নায়ক বাহাদুর এই পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১২শ ভাগ। (Registered No C 341.) মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২২।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এটর্ণি য়্যাট্-ল-সম্পাদিত।

কলিকাতা, ৩৪নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে
শ্রীহরিপদ ঘোষ দ্বারা [illegible] ও প্রকাশিত।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ সিকা। ([illegible] সংখ্যার মূল্য [illegible] আনা।)

সূচী।

আখ্যানের চিত্রলেখা।

দানব-নন্দিনী কামচারিণী চিত্রলেখা ধীরে ধীরে মুদিত নয়নে অনিরুদ্ধের গৃহে প্রবেশ করিতেছে।

অবসর।

১২শ ভাগ। } মাঘ। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পল্লী-সংস্কার।

কেবল কলিকাতা লইয়া বঙ্গ নহে,—কেবল কলিকাতার ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বাঙ্গালার উন্নতি নহে। কেবল কলিকাতার শ্রী-সম্পদ বৃদ্ধি করিলে বাঙ্গালার শ্রী-সম্পদ বৃদ্ধি হইবে না। বহু পল্লীগ্রাম লইয়া বঙ্গভূমি,,—আম্র-পনস-তাল-তিন্তিড়ি ও বেণববাগান-বেষ্টিত পল্লী লইয়া বঙ্গভূমি। যদি বঙ্গভূমির উন্নতি আবশ্যক হয়; যদি ভ্রমর-গুঞ্জরিত, পিক-মুখরিত কুসুমগন্ধামোদিত ধীর মলয়-সেবিত, শ্যামল শস্যশোভিত বঙ্গভূমিকে শ্রীসম্পদ ও বিভব-বিস্তারে সাজাইতে বাসনা হয়, যদি নিজ বাসভূমিকে উন্নত পবিত্র ও শ্রীসম্পন্ন করিতে অভিলাষ হয়,—যদি জননী জন্মভূমি অখণ্ড বঙ্গভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী করিতে চাও,—তবে বাঙ্গালার পল্লীগুলির উপরে লক্ষ্য কর।

লক্ষ্য কর, সোণার বাঙ্গালা কি ছিল, আর কি হইয়াছে। বুঝিবে নন্দনকানন চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে,—বুঝিবে বাসন্তী পূর্ণিমার নীল-নির্ম্মল আকাশে করাল মেঘ ছাইয়া বসিয়াছে। লক্ষ্য কর,—দেখিতে পাইবে, জলবেণীরম্যা বঙ্গপল্লী এখন জলাভাবে হাহাকার করিতেছে; দেখিতে পাইবে, শস্যপূর্ণা বঙ্গপল্লী এখন জঠর-জ্বালায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। লক্ষ্য কর দেখিতে পাইবে,—করাল ম্যালেরিয়ায় বঙ্গপল্লী ছারে খারে যাইতেছে। বঙ্গপল্লীর মানব-মানবী চিররুগ্ন,—ম্যালেরিয়ার কুক্ষিগত—প্লীহা-যকৃত-অম্ল-ক্লেদ উদর পূর্ণ,—জ্বরের যন্ত্রণায় অস্থির; ম্লানমুখে পয়সা প্যাকেটের কুইনাইন আর প্রেতাবিষ্কৃত পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিতেছে। লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে;—বঙ্গপল্লীর জল নিকাশের নালা নাই। বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে বৃক্ষের গলিত পত্র আর পাট পচিয়া সমগ্র বঙ্গপল্লীগুলি নবাবী আমলের বৈকুণ্ঠে পরিণত করিতেছে।

শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, আমাদের ইংরেজ রাজের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা জল্পনা কল্পনা করিতেছেন,—কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে—কি প্রকার ভাবে কার্য্য করিলে, বঙ্গদেশের পল্লীগুলির সংস্কার করা যাইতে পারে! তা' তাঁহারা ভাবুন। কিন্তু আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? যাহারা নিজের বাসভবনগুলি পরিষ্কার রাখিতে পারে না,—যাহারা আত্ম-শক্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রামে একটি সাধারণ জলাশয় স্থাপন করিতে পারে না,—যাহারা আপন পদে ভর করিয়া গ্রামের আধি-ব্যাধি বিদূরিত করিতে পারে না,—তাহাদের উন্নতি সুদূর-পরাহত! "দাদা দেবে ভিক্ষে, তবে প্রাণ রক্ষে"—এ নীতিতে কখনই জাতীয় উন্নতি হইবে না। প্রাণ ভরা পিপাসা—নৈদাঘী-মধ্যাহ্নে হাঁ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া 'ফটিক জল' 'ফটিকজল' করিলে কি হইবে? সাগর ভরা নীল জল রহিয়াছে, একটু পরিশ্রম করিয়া, একটু আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া সে জল পান করিবে না কেন? মেঘের দিকে হাঁ করিয়া থাকিবে কেন? তৃষ্ণায় যে অস্থি-পঞ্জর পুড়িয়া গেল,—কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গেল,—চক্ষু বসিয়া গেল? এখনও প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ করিতেছে,—এখনও আত্মশক্তির উপরে নির্ভর কর।

স্বদেশ স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের উন্নতি করিতে হইলে পরমুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না। ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না,—নিজের উন্নতি নিজে করিতে না পারিলে, অপরে কি প্রকারেই বা করিয়া দিবে! কর্ত্তা শত শত সুন্দর বস্তু আনিয়া দিলেও, গৃহিণী যদি তাহা গুছাইয়া না রাখেন—সাজাইয়া রাখিতে না জানেন,—গৃহের শোভা হইবে কি প্রকারে? আমরা কিছু করিব না—আপনার গ্রাম—আপনার জলাশয়, আপনার রাস্তাঘাট, আপনার পয়োনালা ভাল করিব না,—রাজা সব করিয়া দিয়া যাইবেন,—এই বাসনাও নিতান্ত অসঙ্গত এবং নিতান্ত জড়ের আশা।

জানি যে, ইংরেজ আমাদিগকে সে আশা-ভরসা দিয়াছেন; জানি যে, তাঁহারা আমাদিগের স্বাস্থ্য, যাহাতে বজায় থাকে, যাহাতে আমরা পানীয় জলের অভাব জ্ঞান না করি, যাহাতে আমাদের গমনাগমনের রাস্তাঘাট ভাল হয়, তাহা করিয়া দিবেন বলিয়া বৎসরে বৎসরে চেষ্টা করিতেছেন, কমিশন বসাইতেছেন—অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু আমরা কাজ না করিলে অভাব দূর না করিলে কেবল বাহির হইতে কিছু হইবে না।

মরিতে আর বাকি কোথায়? বঙ্গপল্লীর দিকে চাহিয়া দেখ দেখি,

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রামে সুন্দর জলাশয় ছিল, সুরম্য অট্টালিকাশ্রেণী, নয়নরঞ্জন খড়ের গৃহশ্রেণী বিরাজ করিত,—মানব মানবীর সহাস আনন্দোচ্ছ্বাসে, বালক বালিকার নৃত্য কোলাহলে যে সকল গ্রাম সদা মুখরিত থাকিত,—ধান্য, যব, গোধূম প্রভৃতি শস্যস্তূপে যে সকল গ্রাম নিত্য পূর্ণ থাকিত,—এখন একবার দেখিয়া আইস,—সে শ্মশানপুরে পরিণত! কত প্রাসাদ জনশূন্য হইয়াছে—বাদুর, চামচিকা আর শৃগালের বাসভূমি হইয়াছে। কত খড়ের ঘর পড়িয়া গিয়াছে,—কত বাস্তু ভিটা উজাড় হইয়াছে,—যেখানে গৃহস্থের বাড়ী ছিল, এখন সেখানে ভাইট-আইসসেওড়ার বাগান জাঁকিয়া বসিয়াছে।

কেন হইয়াছে, লক্ষ্য করিতে হইবে, সবিশেষ প্রকারে জানিতে হইবে। চিকিৎসা করিতে হইলে নিদান বুঝিতে হইবে। নিদান পরিবর্জ্জনই চিকিৎসা। রোগের উৎপত্তি কোথা হইতে, আগে তাহা জানিতে হইবে।

বঙ্গপল্লী বিধ্বংসের প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার ভীষণতম আক্রমণে পড়িয়া কত গৃহস্থ নির্ব্বংশ হইয়াছে, কত গৃহস্থ জীবন্মৃত ছেলেপুলে লইয়া সহরের আশ্রয় লইয়াছে,—কাজেই তাহাদের ভিটা উজাড়। যাহারা আছে,—তাহারা যে কি যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বাস করিতেছে, তাহা পল্লীবাসিগণই জানে। তাহাদের ছেলে মেয়ে রুগ্ন, দুর্ব্বল,—মাসে মাসে চাঁদে চাঁদে কম্প-জ্বরাদিতে আক্রান্ত,—একদিনও তাহারা সুস্থ নহে,—একদিনও পিতামাতা তাহাদিগের জীবনাশা করিতে পারে না। এই সকল রুগ্ন বালকবালিকার শিক্ষাই বা দেয় কি প্রকারে,—আর ইহাদের ভবিষ্য-জীবন সংগঠিতই বা হয় কি প্রকারে? বঙ্গপল্লীর স্কুল পাঠশালার বালকবালিকাদের দৈনিক উপস্থিতপুস্তক দেখিলে আমাদের কথার সত্যাসত্য সম্যক্ প্রকারেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্রত্যেক ছেলে বৎসরে কত দিন পীড়িত হইয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারে না,—তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে। প্রাপ্তবয়স্কাগণও এই কালোপম পীড়ায় আক্রান্ত, কাজেই সন্তানের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ ক্ষতি হইতেছে,—যাহারা জন্মিতেছে, তাহারাও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও রুগ্ন। পীড়াক্রান্ত জনক-জননী হইতে জাত সন্তানের মঙ্গলাশা কোথায়? বঙ্গদেশে অত্যধিক পরিমাণে শিশুর মৃত্যুঘটনার ইহাই অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ, জমিদারগণের ঔদাসীন্য। আগে পল্লীগ্রামের জমিদারগণ আপনার এলাকাভুক্ত প্রজাগণকে সন্তানের ন্যায় শাসন-পালন করিতেন।

প্রজাগণের পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতেন, রাস্তাঘাট বাঁধাইয়া দিতেন,—এখন তাঁহারা সহরবাসী। যথোচিত প্রকারে খাজনা আদায় ব্যতিরেকে প্রজাগণের সঙ্গে তাঁহাদিগের অন্য কোন সম্বন্ধ নাই। দুঃখের কথা বলিতে কি, তাঁহারাই আবার কলিকাতায় আসিয়া সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া "স্বদেশ উদ্ধার" ব্রতে ব্রতী হইতেছেন।

তৃতীয় কারণ প্রজা সাধারণ। যখন তোমাদের মুখ চাহিবার কেহ নাই,—অশ্রু মুছাইবার লোক নাই,—এক কথায় ব্যথার ব্যথী নাই, তখন আপনারা আপনাদের কাজ গুছাইয়া করিতে হইবে।

তোমরা বড় বড় কাজের আশায় দিক হইতে দিগন্তে ছুটিতেছ,—সাম্য ও স্বাধীনতার আশায় চীৎকার করিয়া বক্ষঃ বিদীর্ণ করিতেছ, কিন্তু বঙ্গ-পল্লীর দিকে কি একবার চাহিবে না? যাহাদের সুখের জন্য তোমাদের আত্ম-বলিদান, আগে তাহাদিগকে রক্ষা কর। শুনিতেছি সভাসমিতিতে পল্লীসংস্কারের কথাও চলিতেছে,—কিন্তু কথা লইয়া থাকিলে আর চলিবে না —কাজ চাই! ঘরে আগুন লাগিয়াছে, এখন বিলাতে দমকলের ইণ্ডেণ্ট করিয়া কল আসিলে নিভাইতে বলিলে চলিবে না।

সকলে মিলিয়া পরামর্শ কর, কি করিলে আমাদের সোণার বাঙ্গালা রক্ষা পায়, কি করিলে স্বর্গের নন্দনকানন শ্মশানে পরিণত না হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে কাজ কর, দেখিবে বঙ্গ-শ্রী আবার ফুটিয়া উঠিবে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

যুবতীর স্নান।

কুলু কুলু ইছামতী নদী বয়ে যায়,
যুবতী আসিল ঘাটে ঘরে যাবে নেয়ে,
দাঁত মাজে ছাই দিয়া তেলমাখা গায়,
চরণে অলক্ত-রাগ ধুয়ে যায় ঢে'য়ে।

ধ্বনিছে নূপুর পায়ে ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্,
যুবতী চরণ ঘসে, এলো ফেলো চায়,
বাজিছে হাতের বালা টুন্ টুন্ টুন্—
মাঝে মাঝে ঠেকি বুঝি কলসীর গায়

আবক্ষ ডুবায়ে জলে বাঁধা বেণী খুলে—
গা ভাসায়ে তটিনীর নীল স্বচ্ছ নীরে,
পুলকে যুবতী বসি অই নদীকূলে—
গা মুছে গামছা দিয়া ধীরে—ধীরে—ধীরে।

বসনে আবৃত দুটী বক্ষরুহ তার
কল্লোলিনী স্বচ্ছনীরে খুলি আবরণ,
ডলে মলে ভয়ে ভয়ে চাহি চারিধার
কি জানি যদি বা কেহ করে দরশন।

কৃষাণ পটোল ক্ষেতে বসি নদীচরে
কভু চেয়ে না'য়া দেখে, কভু করে কাজ;
কুমীরের ভয়ে ঘেরা খেয়া ঘাট প'রে
আশে পাশে চিক্ দেয় মউরুলা মাছ।

নেয়েদের কত তরী কূলে-কূলে-কূলে
দাঁড় বেয়ে চলে যায় ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্;
কচিৎ কাহারো বুঝি মনে পড়ে ভুলে
কাল জলে অপরূপ রমণীর রূপ।

কোথা বা আরোহী দুষ্ট কিছু দূর গিয়া
দাঁড়ি মাঝি লুকাইয়া পিছু ফিরি চায়,—
একবার কভু যদি কোন ফাঁক দিয়া
ঘেরা ঘাটে এলো চুল ফিরে দেখা যায়।

গুছাইয়া লাজবাস কাচিয়া বসন,
মাথা মুছি খোলা চুলে ঘড়া কাঁকে নিয়ে
যুবতী ফিরিল ঘরে মরাল-গমন—
মাথার কাপড়খানি টেনে দিয়ে দিয়ে।

* * * *

যুবতীর স্নান দেখি নয়ন জুড়ায়;
রসনা জড়ায়ে যায় ভাষা না জুয়ায়।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়

মিলন।

(১)

তখন সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব স্বায়ং-কালীন স্নিগ্ধোজ্জ্বল রক্ত-রশ্মি-ধারায় দিগন্ত পরিপ্লাবিত করিয়া পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন, দিবসের শেষ রশ্মি-টুকু দিকচক্রবালরেখার কোলে ধীরে ধীরে মিশিয়া যাইতেছিল, শীতল বারি-কণা-সম্পৃক্ত সান্ধ্য-সমীরণ সুরভি পুষ্প পরিমল লুঠিয়া ফিরিতেছিল।

দামোদরতীরে চারু ও নলিন উপবিষ্ট। উভয়েই নীরব। চতুর্দ্দিক গভীর নিস্তব্ধতায় পরিব্যাপ্ত। কেবল উচ্ছ্বসিত জলরাশির সান্ধ্য-জলকল্লোল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুত হইতেছিল না। তাহাদের আঁধারঘেরা মলিন মুখ দু'খানি দেখিলেই বোধ হয় যেন মৌন-সন্ধ্যার ধূসর ছায়ার ন্যায় তাহাদের অন্তরেও যেন কিসের একটা নিবিড় ছায়াপাত হইয়াছে। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইয়া গেল। পরে চারু বলিল,—"নলিন, এবার থেকে আমি আর আসতে পারব না।"

চমকিত হইয়া নলিন জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন?"

চারু বলিল,—"বাবা বারণ করিয়াছেন;" ইহা শুনিয়া নলিন চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়াগেল—আর কিছুই বলিল না, শুধু একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

মানবদেহের সাতিশয় ব্যথা-বিশিষ্ট কোন স্থান হঠাৎ হস্ত-স্পৃষ্ট হইলে সে যেমন চমকিত ও বেদনা-কাতর হইয়া উঠে, তেমনি নলিনের দীর্ঘশ্বাস চারুর মর্ম্মস্থল মথিত করিয়া তাহা অধিকতর বেদনা-জর্জ্জর করিয়া তুলিল।

উভয়েই নির্ব্বাক—কালের মৌন প্রবাহে বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে নদী-সৈকত-ভূমি তরল-জ্যোৎস্নায় পরি-প্লাবিত করিয়া চন্দ্র-দেব উদিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে এক বিরাট নিস্তব্ধতা নিখিল বিশ্বের বক্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তখন উভয়ে নীরব গম্ভীর বদনে উপবিষ্ট। অবশেষে সেই অটল মৌনতা ভঙ্গ করিয়া চারু বলিল,—"আজ তবে এখন বাড়ী যাই; রাত হ'য়ে এল, হয়ত বাবা খুঁজতে লোক পাঠাবেন।" এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

নলিন সেই সৈকত-ভূমিতে বসিয়া গণ্ডে হস্ত সংলগ্ন করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তখন পরিপূর্ণ-জ্যোৎস্নালোকের শান্ত-শীতল রশ্মিতে হিমাংশু সারা-জগৎকে স্নান করাইতেছিল। আম্র-কুঞ্জোত্থিত পাপিয়ার মধুর ঝঙ্কার দূরাগত বাঁশরীর মৃদু-আলাপের ন্যায় শ্রবণ পথে আসিয়া পঁহুছিতেছিল। আজ যেন কিসের একটা নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—আজ যেন প্রকৃতির মহা-মহোৎসব। এই মহোৎসবে—এই আনন্দ-কল্লোলিত উৎসবের মধ্যে কেবল সেই তাহার ভগ্ন-হৃদয় লইয়া বসিয়াছিল।

সে ভাবিতেছিল—আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাবিতেছিল—হায়! দিনান্তে একবারও পরস্পর পরস্পরের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিব না? যে অসীম সুগভীর স্নেহ তাহাদের বাল্যের সরল-লীলায় ও হাস্যোচ্ছ্বাসে, কৈশোরের পাঠাভ্যাসে এবং ক্রীড়া-কৌতুকে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, যে স্নেহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অনাহত গতিতে তাহাদের উভয়ের হৃদয়তট প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিতেছিল, তাহা কি আজ মধ্যপথে হঠাৎ চিররুদ্ধ হইয়া যাইবে? আর সে ভাবিতে পারিল না; কেবল দুই বিন্দু অশ্রু তাহার চক্ষের কোণে টলটল করিতে লাগিল। শোকোচ্ছ্বসিত দামোদর তাহাকে—তাহার অন্তরের কোন প্রিয়তম ধনকে হারাইয়া আকুল-আবেগে তাহার চরণতলে আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল। উদাস নৈশবায়ু বুকযোড়া কিসের একটা মহা অতৃপ্তি লইয়া অলস-মন্থর গতিতে বহিয়া গেল।

(২)

চারুর পিতার নাম শ্রীরামরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, দামোদর-তীরোপরি বারুইপুর গ্রামের একজন সঙ্গতিশালী জমিদার। নলিনের পিতা শ্রীযোগেন্দ্র-কুমার রায়, তাঁহার প্রতিবেশী। তিনি মধ্যবিত্ত অবস্থা সম্পন্ন, সরল ও অমায়িক, সকলেরই সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব কথিত বন্ধু-দ্বয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব থাকিলেও উভয় পিতার মধ্যে কিছুমাত্র সৌহার্দ্দ ছিল না।

বাটীর পার্শ্বস্থ একখণ্ড ভূমি লইয়া বহু দিবস হইতে উভয়ের মধ্যে মনো-মালিন্য ঘটিয়াছিল, এই কারণে এবং গ্রামমধ্যে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি দেখিয়া রামরতন বাবু তাঁহার প্রতিকুলাচরণ করিতেন। অবশেষে নিষ্ফল-বোধে তিনি তাঁহার পুত্রের সহিত আপনার পুত্রের মেলা-মেশা এমন কি সাক্ষাৎ অবধি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু চারু লুকাইয়া নলিনের সহিত

দেখা করিত, তজ্জন্য তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু এত সাবধানতা সত্বেও তাহাদের প্রীতির-বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল যে, একবৃন্তে দুটি ফুলের ন্যায় উভয়ের দুটিপ্রাণ প্রভাতের শিশির-সিক্ত সেফালীর ন্যায় হাসির আলোকে ফুটিয়া উঠিতেছিল। রামরতন বাবুর প্রাণে ইহা সহ্য হইত না। তাঁহার একমাত্র পুত্র—তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী অধীশ্বর; সে কিনা একটা সামান্য মধ্যবিত্ত—বিশেষতঃ তাঁহার পরম শত্রুপুত্রের সহিত মিশিবে! তাই উভয়কে একত্র দেখিতে পাইলেই তাহাদের নিভৃত আলাপের মধ্যে তিনি হঠাৎ কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর মত উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া একটা বিরাট হাহাকারের সৃষ্টি করিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইতেন।

এক দিবস দামোদরতীরে সান্ধ্যভ্রমণ-কালে উভয়ে কথোপকথনে নিবিষ্ট-চিত্ত; এমন সময়ে রামরতনবাবু হঠাৎ পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া পড়িলেন। তিনি জমিদারীর কোন কার্য্যোপলক্ষে গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিলেন, এখন তিনি তীর দিয়া আপন আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে চারু ও নলিনের সহিত সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু তখন তাহারা তাঁহার আগমন শব্দ শুনিতে পায় নাই, তাই তাহারা সরল হাস্যোচ্ছ্বাসে সে স্থান মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু রামরতনবাবুর তাহাদের সম্মুখে সশব্দ আকস্মিক আবির্ভাব তাহাদিগকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ রোষপ্রদীপ্ত নয়নে পুত্রকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—"দেখ চারু! তুমি দেখছি যা ইচ্ছা তাই করছ, আমার বারণ গ্রাহ্য করা হচ্ছে না। আমি না তোমায় এর সঙ্গে বেড়াতে বারণ করেছিলুম? ফের তুমি এর সঙ্গে বেড়াচ্ছ?" তৎপরে তিনি নলিনের দিকে ফিরিয়া,—"দেখ বাপু! তুমি আর কখনও এর সঙ্গে বেড়াইও না, আবার যদি আমি দেখি, তা'হলে ভাল হবে না বলে রাখছি।" এই বলিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। নলিনের বোধ হইল যেন পক্ষিমাতার পক্ষপুটাবৃত শাবককে তাহার স্নেহময় বক্ষ হইতে কেহ যেন নিষ্ঠুরভাবে ছিনাইয়া লইয়া গেল। সে বিষাদক্লিষ্ট বেদনা-দীর্ণ হৃদয় চাপিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া আপন চির পরিচিত স্নেহনীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(৩)

মহাকালচক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহুদিবস অতীতের অতলগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বহুকালের অদর্শনে দুই বন্ধুর প্রীতির বন্ধন কিঞ্চিন্মাত্রও

শিথিল হয় নাই, বরং ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়াছে। সুদীর্ঘ বিরহ আসিয়া চিরস্থায়ী প্রেমকে উভয়ের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

ভালবাসা হৃদয়ের জিনিষ। প্রকৃত ভালবাসা—অনন্ত গভীর ও অকৃত্রিম, তাহা সাময়িক উচ্ছ্বাসে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয় না—তাহা স্থির বারিধি-বক্ষের ন্যায় গভীর ও প্রশান্ত। হৃদয় থাকিলে তবে ভালবাসা যায়। যাহারা ভালবাসিতে জানে, তাহারা যেন হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ প্রীতিটুকু জোর করিয়া একেবারে নিঃশেষে পরকে বিলাইয়া দিতে চাহে। কাহারও কাহারও বাহ্য প্রকৃতি হইতে স্নেহ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাহাদের স্নেহ প্রীতির উৎস গাম্ভীর্য্যের কঠিন আবরণে আবৃত থাকে। সে আবরণ একটু নাড়া পাইয়া সরিয়া গেলেই ঝর ঝর করিয়া তাহার স্বচ্ছ-শীতল প্রবাহ উষর-হৃদয় উর্ব্বর করিয়া ত্রিদিবের মন্দাকিনী ধারার ন্যায় বহিয়া যায়। আবার কাহারও বা সমস্ত হৃদয় নিঙড়াইয়াও একবিন্দু স্নেহ পাওয়া যায় না। আমাদের রামরতনবাবুর সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। তাই তিনি স্নেহ-প্রীতি প্রভৃতি মানসিক দৌর্ব্বল্যগুলি হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি উভয়ের মধ্যে এতদূর ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

গৃহকারায় আবদ্ধ থাকিয়া চারুর প্রাণ নলিনের কুটীরদ্বারে ছুটিয়া যাইত আর ভাসমান লঘু খণ্ডমেঘের ন্যায় বাল্যের বহু অতীতস্মৃতি তাহার চিত্তাকাশে উদিত হইত। বাল্যের বহু কথাই তাহার মনে পড়িত—মনে পড়িত বাল্যের সেই সরল হাস্যোচ্ছ্বসিত ক্রীড়া কৌতুক, তাহাদের কৈশোরের পাঠাভ্যাস, নদীতীরে ভ্রমণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে একত্রাবস্থান; তাহাদের সকল কার্য্যের মধ্যে সুপরিস্ফুট প্রগাঢ় স্নেহের ভাব। আর এখন—এখন তাহাদের মধ্যে কত ব্যবধান! বাল্যের সেই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে একটা উদাস দীর্ঘনিঃশ্বাস বক্ষ-পঞ্জর ঠেলিয়া বাহির হইয়া ধীরে ধীরে বায়ুস্তরে মিশিয়া যাইত। কিন্তু এত দূরত্ব—এত ব্যবধান তাহাদের স্নেহ বিন্দুমাত্রও হ্রাস করিতে পারে নাই। উভয়ের অন্তরে তাঁহাদের প্রগাঢ় প্রীতি ফল্গুর অন্তঃসলিল-প্রবাহের ন্যায় ধীর-গতিতে বহিয়া যাইতেছিল।

(৪)

রাত্রি দ্বিপ্রহর। সারা গ্রামখানি সুপ্তিঘোরে মগ্ন। বিশালকায় উন্নত-শীর্ষ বনস্পতি সকল অন্ধকারে প্রকাণ্ড দৈত্যের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দূরাগত ঝিল্লীর অস্ফুটরব বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া আসিতেছিল। চতুর্দ্দিক

নিস্তব্ধ। সহসা দূরে প্রচণ্ড বজ্রনির্ঘোষের মত জলের গভীর গর্জ্জন শ্রুত হইল—সঙ্গে সঙ্গে নদীবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিয়া প্রবল জলস্রোত গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। নদীতে বন্যা আসিয়াছে। ক্রুদ্ধ দামোদর আজ প্রলয়োল্লাসে মাতিয়া উঠিয়া অন্ধ মত্ততায় গ্রামাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। স্তব্ধ-রজনীর গভীর শান্তি ভঙ্গ করিয়া মরণের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে।

স্রোতের প্রবল প্রবাহ সহনে অসমর্থ হইয়া নলিনের বাটীর একাংশ জল-সাৎ হইল। পূর্ব্বরাত্রে নলিন সেই অংশে শয়ন করিয়াছিল। সহসা গৃহে জল প্রবেশের শব্দ শুনিয়া সে লাফাইয়া গৃহ হইতে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। জল কটি পর্য্যন্ত। তাহার কি প্রচণ্ড স্রোত! তাহা হইতে সে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছিল না। সহসা ভীষণ শব্দে তাহাদের শয়নগৃহের চালা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ভাসিয়া চলিল। নলিন এক লম্ফে তাহার উপর আরোহণ করিল। স্রোতের মুখে তাহা প্রবল বেগে ভাসিয়া চলিল।

সহসা দূরে একটা শ্বেতবর্ণ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইল। ওই কেনা মৃত্যুর সহিত যুঝিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে? ও কে? কে ঐ বালক? চারুর মত দেখাইতেছে না? হাঁ, চারুইত! সে এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ে? এই সকল চিন্তা তাহার মস্তিষ্কালোড়ন করিয়া তুলিল। সহসা দেখিল সে চারুর নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে আপন বস্ত্র-প্রান্তভাগ তাহার নিকট নিক্ষেপ করিল। চারু তাহা ধরিয়া কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিল। তৎপরে নলিন তাহাকে চালায় তুলিয়া লইল। তাহার অবসন্ন দেহ নলিনের বক্ষে ঢলিয়া পড়িল।

তাহারা উভয়ে সেই চালা অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া চলিল। বিশ্ব-গ্রাসী মৃত্যু আজি তাহাদের চরণতলে রুদ্র-উচ্ছ্বাসে তাণ্ডবনর্ত্তনে নৃত্য করিতেছিল। ফেনিল জলোচ্ছ্বাস প্রলয় গর্জ্জনে অন্ধ-আবেগে তাহাদের দিকে ছুটিয়া চলিতেছিল। প্রচণ্ড জল-কল্লোল মরণের আহ্বান ধ্বনির মত তাহাদের কর্ণে বাজিতে লাগিল। জীবন মৃত্যুর মহা ব্যবধানে শুধু একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ড! সহসা এক প্রবল জলস্রোত উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাতে আঘাত করিল। সেই জীবন মরণের মহা অবলম্বন—সেই কাষ্ঠখণ্ড হইতে তাহারা চ্যুত হইল। ওগো সব গেল—বুঝি সব গেল! ঐ বুঝি উভয়ে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িল!

(৫)

দামোদর তাহার স্ফীতদেহ সঙ্কুচিত করিয়া বালুকাগর্ভে আশ্রয় লইয়াছে। প্রভাতের নব-অরুণোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এক অমঙ্গল বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। পক্ষীকুল আর অস্ফুট কাকলীতে নূতন প্রভাতকে অভিনন্দন করিল না। প্রভাতবায়ু আর আনন্দোল্লাসে নদীবক্ষে উর্ম্মিভঙ্গে নৃত্য করিয়া ফিরিল না। কি এক অনির্দ্দেশ্য বিষণ্নতায় চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত। বাঁধের পার্শ্ব হইতেই ক্রমনিম্ন তীরভূমি! তথায় বহু গো, মানব, মেন প্রভৃতির মৃত ও অবসন্ন দেহ নিপতিত। চতুর্দ্দিকে বহুবিধ দ্রব্যাদি ইতস্ততঃ বিপর্য্যস্তভাবে পতিত রহিয়াছে।

গত কল্য রাত্রে যখন প্রবল বন্যার জল বাটীর অর্দ্ধাংশ নিমজ্জিত করিয়া গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, তখন যোগেনবাবু আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া পার্শ্বস্থিত রন্ধন গৃহের চাল অবলম্বন করিলেন। কিন্তু পরম্পরাগত বন্যা-তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাত সহনে অসমর্থ হইয়া তাহার দেওয়াল ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছিল; শেষে এমন অবস্থায় দাঁড়াইল যে, যে কোন মুহূর্ত্তে দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া চাল ভাসিয়া যাইতে পারে। তিনি তাহার উপর সেই জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া রাত্রির অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিলেন।

সারারাত পুত্রের দেখা না পাইয়া তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, প্রভাতে জল হ্রাস হইয়া গেলে তিনি তাহার অনুসন্ধানে তাহার শয়ন-গৃহের প্রতি-ধাবিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন যে, তথায় নলিন ও সেই গৃহের চিহ্ন মাত্রও নাই! অন্তরের মধ্যে তাহার প্রাণ আছাড়িয়া পরিতে লাগিল, তিনি তাহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। এ দিকে রাম-রতনবাবুও পুত্রের অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তাহার অন্বেষণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ে দেখিলেন, তাঁহাদের প্রাণাধিক পুত্রদ্বয় চির-সুষুপ্তিমগ্ন! রামরতনবাবুর চক্ষের সামনে কে যেন একখানা অন্ধকার যবনিকা টানিয়া দিল। তিনি কঠিন প্রস্তরের ন্যায় হইয়া গেলেন। তাহার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া আসিল; তিনি দেখিলেন যে তাঁহারই নয়নাভিরাম পুত্র মৃত্যুর কোলে, তাঁহার পরম শত্রুপুত্রের সহিত নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। মৃত্যু-মহিমাদীপ্ত উভয়ের আননে পরিপূর্ণ শান্তির ছায়া সুপরিস্ফুট, ওষ্ঠযুগল হইতে তখনও হাসির শেষ রেখাটুকু মিলাইয়া যায় নাই, প্রভাত-সূর্য্যের নব কিরণ

সম্পাতে তাঁহাদের মুখমণ্ডল মহিমায় দীপ্তোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। রামরতন বাবু ভাবিতেছিলেন,—হায়! তিনিই না তাহাদের মিলনের পথে ঘোর কণ্টক স্বরূপ ছিলেন! তাই বুঝি অন্য কোন সাহায্যকারী না পাইয়া তাহারা মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছে। এখন ত তাঁহারা তাঁহার ক্ষমতার বহুদূরে কোন অজ্ঞাত লোকে প্রস্থান করিয়াছে! সেখানে মানবের সঙ্কীর্ণ প্রভাব পঁহুছিতে পারে না। দুঃখ তথায় অপরিচিত, অশ্রু সেখানকার পথ চেনে না, সেখানে বিয়োগ নাই—আছে শুধু অনন্ত-মিলন! তাঁহার পায়ের তলা হইতে যেন সমস্ত বিশ্ব-সংসারটা ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া গেল। মহাশূন্য! সে সীমাহারা অকূল পাথারে দৃষ্টির নৌকা কোথাও কূল পায় না—চতুর্দ্দিকে গভীর অন্ধকার! রামরতনবাবু চক্ষু মুদিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সহসা তাহার অশ্রু-উৎসের উপরের গুরু প্রস্তরখানা সরিয়া গেল।

আর যোগেনবাবু? তিনিত নির্ব্বাক—নিস্পন্দ! শুধু নির্ণিমেষ নেত্রে তিনি সেই নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ যুগল বন্ধুর মহামিলন দেখিতে ছিলেন। তাঁহার চক্ষু শুষ্ক—তাহাতে অশ্রু নাই।

রামরতনবাবু ভাবিতে লাগিলেন—যোগেনবাবুর প্রতি নিস্ফল আক্রোশেই উভয়বন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া ছিলেন। হায়! তাহারইত বিদ্বেষ-বহ্নিতে তাহারা আপনাদের উৎসর্গ করিয়াছে। এখন তারা কোথায়? এখনত তারা উর্দ্ধলোকে! স্বর্গ হইতে একটা গরিমা নামিয়া আসিয়া তাহাদের মস্তকে দীপ্ত-মহিমার প্রোজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া, সেই আনন্দলোকে বরণ করিয়া লইয়াছে! সহসা তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পরে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পরম শত্রুকে সেই মহা-শ্মশানে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন!

তারপর—তারপর আর কি বলিব? দুই হতভাগ্য পিতার শেষ সম্বল রহিল শুধু কয়েক বিন্দু অশ্রু!

শ্রীইন্দ্রনাথ শেঠ।

উড়িষ্যায় কয়েক দিন।

(ভুবনেশ্বর।)

কয়েক দিন হইল শস্যশ্যামলা, কাননকুণ্ডলা, জাহ্নবী-বিধৌত-চরণা বঙ্গমাতার নিকট বিদায় লইয়া প্রকৃতিরাণীর লীলানিকেতন উড়িষ্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এবার ভুবনেশ্বর দর্শনই উৎকল-যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য, তাই প্রথমে আমরা এইস্থানে নামিয়াছি।

শৈবতীর্থ ভুবনেশ্বর উৎকলের পঞ্চ ধর্ম্মক্ষেত্রের অন্যতম "পদ্মক্ষেত্র" নামে খ্যাত, বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থান ভারতের অন্যান্য প্রধান নগরীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালী ছিল। কিন্তু এখানে সে ঐশ্বর্য্যের সমস্ত চিহ্নই অতীতের অন্ধকারময় গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

প্রায় পঞ্চদশ শত বর্ষ পূর্ব্বে উড়িষ্যায় কেশরী রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময় এইস্থানে তাঁহারা রাজধানী স্থাপন করিয়া ইহার "কলিঙ্গনগরী" নাম দিয়াছিলেন, জীবের সুখ দুঃখ-দায়ক কালের নির্ম্মম হস্তে সেই রাজবংশ এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত; সে রাজধানীর কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ষ্টেসন হইতে মন্দিরে যাইবার পথে "রামেশ্বর" মন্দিরের পার্শ্বে যে ভগ্ন প্রস্তরস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাতত্ত্ববিদেরা তাহাকেই রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রাজা যযাতিকেশরী হীনপ্রভ বৌদ্ধদিগকে বিতাড়িত করিয়া, পুনরায় উড়িষ্যায় হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করেন। তিনিই এই ভুবনেশ্বরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজনের প্রারম্ভেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। অনন্তর তাঁহার মৃত্যুর একশত বৎসর পরে "অনন্তকেশরীর" সময়ে মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়া "ললাটেন্দুকেশরীর রাজত্বকালে ৫৮৮ শকে উহার এবং অপর কয়েকটী মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়।

কপিল সংহিতা, শিবপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্থান "একাম্রকানন" নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তকে ইহার প্রাচীন ইতিহাসাংশ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে আমরা সংক্ষেপে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

এক দিবস মহর্ষি নারদ কথাচ্ছলে ভগবান চন্দ্রমৌলিকে কহিলেন—

লবণ সোদধিস্তীরে নীলশৈল নগোত্তম,
তদুত্তরে চ বিখ্যাতং ক্ষেত্রং একাম্রকং প্রভো॥
তত্র শ্রীবাসুদেবাখ্যো রমানাথো জগদ্ গুরুঃ।
অনন্তেন সহ শ্রীমান্ একাকী বিজনে বনে॥
তৎস্থানং পরমং গুহ্যং ন জানাতি প্রজাপতিঃ।
ভবানপি ন জানাতি দেবতানাঞ্চ কা কথা॥"

নারদের নিকট পরম রমণীয় একাম্রকাননের বিষয় অবগত হইয়া, ভগবান নীলকণ্ঠ ঐস্থানে বাস করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুকচিত্ত হইয়া বাসুদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেবকে স্তব করিতে দেখিয়া বাসুদেব কহিলেন, "তুমি কখনও এস্থান পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাইবে না বলিয়া যদি আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে স্থান প্রদান করিব।" অনন্তর একাম্রকাননবাসে কৃতসঙ্কল্প মহাদেব ঐ প্রকারে সত্যে আবদ্ধ হইলে, বাসুদেব তাঁহাকে তথায় থাকিবার স্থান দিলেন। ইতিমধ্যে শৈলাধিরাজতনয়া পার্ব্বতী মহাদেবের নিকট পিতামহাদির অজ্ঞাত ঐ গুপ্ত ক্ষেত্রের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন –হে• দেব! সেই মনোরম পবিত্র বনভাগ দেখিবার জন্য আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; আপনি আদেশ করুন, আমি সেই কানন দেখিতে যাইব। বিশ্বনাথ পার্ব্বতীর এবম্প্রকার প্রার্থনা শ্রবণে তাঁহাকে একাম্রকাননে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলে, দেবী ভগবতী তথায় গমন করিলেন। অনন্তর দেবাদিদেব স্বয়ং ও তথায় গমন করিলেন।

দেবী ভগবতী সেই বিশালদেহ আরণ্যতরু ও লতাগুল্মাদি পরিশোভিত বিহঙ্গ-কাকলি-সমাকুলিত একাম্রকাননে উপস্থিত হইয়া শিবকথিত এক প্রধান শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। তিনি বিবিধ উপচারে ঐ মূর্ত্তির পূজা সমাপনান্তে ঐ স্থানবাসী "কৃত্তি ও বাস" নামক দুর্দ্দান্ত রাক্ষসদ্বয়কে সংহার করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

ষ্টেসন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির অবস্থিত। যে কালগ্রাসে কেশরী-রাজবংশ ধ্বংস হইয়াছে, যে কালের নির্ম্মম হস্তে রাজনগরী আজ শ্মশানে পরিণত, সেই অখণ্ডনীয় কালের অনন্তশক্তিকে পরাজয় করিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহের অন্যতম, গগন-

স্পর্শাকাঙ্ক্ষী ভুবনবিদিত ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির জগৎবাসীর সমক্ষে তাঁহাদের মহীয়সী কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্য আজিও সদর্পে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এমন্দিরের স্থাপত্য এখনও প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতেছে।

মন্দিরটী ১২০ হাত উচ্চ ও পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা। ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সিংহদ্বার দিয়া মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্তঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে সম্মুখে অরুণস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর ভোগমণ্ডপ; ভোগমণ্ডপের পর নাটমন্দির, তৎপরে জগমোহন ও প্রধান মন্দির। মন্দিরমধ্যে "হরিহর" নামক শিবমূর্ত্তি বিরাজিত, ভুবনেশ্বর মূর্ত্তি লিঙ্গাকার নহে, চক্রাকার, দ্বাদশাঙ্গুল উচ্চ। গৌরী পট্টটী ৯ হাত দীর্ঘ ও ৭ হাত প্রস্থ। মন্দিরগাত্রে খোদিত মূর্ত্তিগুলি দেখিলে মনে হয় যে এখানকার শিল্পী বহুযত্নে প্রকৃতিদৃষ্টে এই সমস্ত শিল্পনৈপুণ্য পূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

এই মন্দিরের পার্শ্বে "নিশাগণেশ" নামক বিরাটকায় গণপতি, কার্ত্তিক ও নিশা পার্ব্বতী মূর্ত্তি বিরাজিত। উঁহাদের অঙ্গের কারুকার্য্যাবলী দেখিলে নয়ন সার্থক হয়। প্রধান মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে পার্ব্বতীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী আকারে ছোট হইলেও উহার শিল্পনৈপুণ্য ও ভাস্কর্য্য অতীব মনোহর। কিন্তু হায়! সংস্কারাভাবে ইহা ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। পুরীর বিমলাদেবীর ন্যায় এখানেও শক্তিরূপা ভুবনেশ্বরী দেবী বিরাজিতা। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। তন্মধ্যে নৃসিংহ, কার্ত্তিকেশ্বর, ভৈরবেশ্বর ও লক্ষ্মীশ্বর-মন্দিরের-কারুকার্য্যাবলী উল্লেখযোগ্য। মন্দির-প্রাঙ্গণে অনেকগুলি কূপ আছে, তন্মধ্যে উত্তরদিকস্থ কূপটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম।

বিন্দুসরোবর।

ভুবনেশ্বরে আটটী সরোবর আছে। তন্মধ্যে বিন্দুসরোবরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা প্রধান মন্দিরের অনতিদূরে অবস্থিত। পুরাণাদিতে এই সরোবর একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে, যাত্রীরা এখানে সঙ্কল্প করিয়া স্নান ও তর্পণাদি করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যস্থলে "জগতী" আছে; প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে ভুবনেশ্বর ও অনন্ত বাসুদেব এবং কপিলেশ্বরদেবের প্রতিনিধি-গণকে নৌকাযোগে সরোবরে ভ্রমণ করান হয় এবং চন্দনজলে স্নান

করাইয়া জগতীর উপরে সিংহাসনে বসাইয়া ভোগ দেওয়া হয়। এই সরোবরের পূর্ব্বদিকে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির, এ মন্দিরের কারুকার্য্যও অতি মনোহর।

দেবীপাদহরা।

ইহা একটী পুষ্করিণী। প্রবাদ যে দেবী ভুবনেশ্বরী কৃত্তি এবং বাস নামক রাক্ষসদ্বয়কে পদদ্বারা এই স্থানে দলিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "দেবীপাদহরা" হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে ১০৮টী ছোট মন্দির আছে; উহাদের মধ্যে যোগিনী মূর্ত্তি বিরাজিতা।

মুক্তেশ্বর, কেদারেশ্বর ও গৌরীদেবী।

মুক্তেশ্বর মন্দির বিন্দুসরোবরের কিয়দ্দূরে অবস্থিত। যদিও এই মন্দিরটী আকারে ক্ষুদ্র, তথাপি ইহার বহির্দ্দেশের কারুকার্য্য ও জগমোহনের চন্দ্রাতপ প্রত্যেক শিল্পামোদী ব্যক্তির দর্শনের উপযোগী। ইহার অন্তঃপ্রাঙ্গণে দুইটী কুণ্ড আছে। একটীর নাম "হলদি কাঠুয়া" ও অপরটীর নাম "গৌরীকুণ্ড"। উহাতে নানাবিধ মৎস্য ক্রীড়া করিয়া থাকে। উহাদিগকে ধরা নিষিদ্ধ। প্রত্যেক কুণ্ডের দুইটি মুখ আছে, একটী মুখ দিয়া জল ভিতরে প্রবেশ করিয়া অপরটী দিয়া বাহির হইয়া যায়। কুণ্ডদ্বয়ের জল কখনও কম হয় না; দেখিলে মনে হয় যে ঐ কুণ্ড দুইটী কোন উৎসের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। মুক্তেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরেই কেদারেশ্বর মন্দির। এই মন্দিরাভ্যন্তরে পঞ্চবক্ত্র কেদারেশ্বর মহাদেব সলিলমধ্যে বিরাজিত। ইহার পার্শ্বেই গৌরী দেবীর মন্দির ও তাহার সম্মুখভাগে একটী কুণ্ড আছে। উহার নাম "গৌরী-কুণ্ড" ইহার জল অতি নির্ম্মল ও সুস্বাদু।

সিদ্ধেশ্বর কুণ্ড।

পাণ্ডারা ইহাকে "মরিচ কুণ্ড"বলিয়া থাকে। জনশ্রুতি ঋতুস্নানের পর উহার জল লইয়া বন্ধ্যা-নারীকে স্নান করাইলে পুত্রবতী হয়, এই জন্য ঐ কুণ্ডের জল পাণ্ডারা বিক্রয় করিয়া থাকে। শুনা যায় যে অশোকাষ্টমীর দিন রথযাত্রাকালে ঐ কুণ্ডের প্রথম এক কলসী জল ১৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

রাজা ও রাণী।

মনোহর কারু-কার্য্যাবলীর জন্য এই মন্দির প্রসিদ্ধ।

মেঘেশ্বর।

ইহা মহাদেব-মূর্ত্তি। উচ্চে প্রায় ১৩।১৪ হস্ত হইবে। মস্তকে পাঁচটী অঙ্গুলির দাগ আছে। স্থানীয় লোকমুখে শুনা যায় যে, উনি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিলেন বলিয়া, নারায়ণ হস্তার্পণ করায় উঁহার বৃদ্ধি বন্ধ হইয়াছে। এইরূপ ভুবনেশ্বরের চতুর্দ্দিকে এখনও প্রায় ৭০০।৮০০ মন্দির বর্ত্তমান আছে। অনেকগুলির অবস্থাই জীর্ণ; তন্মধ্যে কতকগুলি মন্দির আমাদের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর সারজন্ উড্‌বরণ বাহাদুর সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন; পূর্ব্বে ভুবনেশ্বর দেবের সম্পত্তি পাণ্ডাদিগের হস্তে ছিল। কয়েক বৎসর হইল কার্য্যাদির বিশৃঙ্খলতা প্রযুক্ত একটী কমিটী সাধিত হইয়াছে, এক্ষণে সমস্ত সম্পত্তি ও দেবসেবাদির ভার কমিটী নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

ভুবনেশ্বরে আসিলে মনে হয় যেন, আবার আমরা সেই পূর্ব্ব ঋষিগণের শান্তি-নিকেতন আশ্রমভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, মনে হয় যেন আমরা হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থপরতাযুক্ত এ পৃথিবীর নহি; ইহার নীলাচল-বেষ্টিত অত্যুচ্চ বনতরু-পরিশোভিত, শীতল-মলয়-সমীরান্দোলিত পাদপপুঞ্জে অলঙ্কৃত বনভূমি দর্শন করিলে মনে হয়, যেন বিশ্বস্রষ্টা প্রকৃতিরাণীর লীলার নিমিত্ত জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ দ্বারা এই বনভাগের রচনা করিয়াছেন। কিন্তু হায়! একদিন যে স্থান ঋষিদিগের সামগানে মুখরিত হইত, একদিন যে স্থানের দেবদেবীর পূজা ও সন্ধ্যা-সমাগমে আরতির সময় শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর শৃঙ্গাদির বাদ্যধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত হইত, এক্ষণে সেই স্থানে পূজা ও আরতির সময় দুই একটী মাত্র শঙ্খ ঘণ্টার ক্ষীণ শব্দ উত্থিত হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যায়। তপোবন-সুলভ শান্তি-সুখাস্পদ ভুবনেশ্বর এখন আর ঋষিকুলের সামগানে মুখরিত হয় না। আশ্রম পরিবেষ্টিত শান্ত তপোবনের পরিবর্ত্তে সেই ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যের বংশধরেরা এক্ষণে এই স্থান স্বাস্থ্যপ্রদ জানিয়া তাঁহাদের শান্তি-নিকেতন ও বিলাস-ভূমিতে পরিণত করিতেছেন; ইহাতে মনে হয়, অনন্ত শক্তিমান্ কালের পরিবর্ত্তন-চক্রে আজ আমাদের কি শোচনীয় পরিণাম।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈষ্ণবরত্ন।

এ কোন্ পাপের ফল !

মধু বলে—"নাইকো মধু,
বিনা বধূ বঙ্গবালা ;
ধন্য সতী তাঁরাই ভবে,
গুণেতে ভারত আলা।"
যেম্‌নি ছিল তেম্‌নি এখন
হইয়াছে মধু হীন ;
Enlightened nation হ'বে,
ভাবছে বসে নিশিদিন।
ও তার নূতন ঠেলায় ধর্ম্ম পলায়,
কর্ম্ম মারে ধাক্কা তায় ;
কিম্ভূত কিমাকার কেমন
নব ভাবের সভ্যতায়
পিতৃভক্তি—পতিভক্তি—
ছিল যা'তে ভারত সেরা,
সত্যপ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়,
ধার্ম্মিকগণেতে ঘেরা ;
বঙ্গ ছিল রত্ন সম,
ধর্ম্ম ছিল সঙ্গে তা'র ;
ভারত মাঝে রত্ন হেন
সাজিত কিবা চমৎকার !
এখন কেমন তাহার দশা,
ভাব্‌লে ঝরে চক্ষে জল ;
পূর্ব্ব কথা পড়্‌লে মনে,
ভাবি—এ কোন্ পাপের ফল।

শ্রীরসময় সিংহ।

প্রস্তর হইতে সীস-নিষ্কাশন-প্রণালী।

(১)

সোণা রূপা রাঙ্ ও সীস প্রভৃতি তৈজস দ্রব্যের একটি সাধারণ নাম "লোহ"। এই লোহ আবার প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় "অশ্মপুত্র"। অশ্মের পুত্র অর্থাৎ প্রস্তরের পুত্র। সোণা রূপা রাঙ্ ও সীসক প্রভৃতি পদার্থ, বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত প্রস্তর হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া প্রাচীনেরা ঐ সকলকে "অশ্মপুত্র" বলিতেন এবং একই "অশ্মে" ঐ চার প্রকার পদার্থের অবস্থান দেখিয়া তত্তাবতের মধ্যে এইরূপ একটা পরস্পর সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতেন। যথা,—

"সুবর্ণস্য মলং রৌপ্যং রৌপ্যস্যাপি মলং ত্রপুঃ।
জ্ঞেয়ং ত্রপুমলং সীসং সীসস্যাপি চ তন্মলম্॥"

কোন কোন পাথরে কেবল লৌহই পাওয়া যায়, অন্য ধাতু পাওয়া যায় না। পাহাড়ীরা এই শ্রেণীর পাথরকে লৌহের পাথর বলিয়া পরিচয় দেয়। আবার এমন এক শ্রেণীর পাথর আছে, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে সীসা ও অল্প পরিমাণে রূপা ও সোণা পাওয়া গিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পাথর "সীসার পাথর" এই আখ্যায় প্রসিদ্ধ। আমাদের এই প্রবন্ধ সেই সীসার পাথর সম্বন্ধীয় বিবরণ-সমূহ বর্ণনা করিবে, অন্য কোন প্রস্তরের কথা বলিবে না।

সীসার পাথর।

পূর্ব্বে ভারতবাসীরা যে উপায়ে সীসার পাথর চিনিতেন, যে বিধানে সে সকল সংগ্রহ করিতেন এবং যে প্রক্রিয়ায় সে সকল হইতে সীসা নিষ্কাশন করিতেন, সে উপায়, সে বিধান ও সে প্রক্রিয়া জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরাজের বর্ণনায় জানা যায়। অগ্রে সেই পুরাতন উপায়, বিধান ও প্রক্রিয়া বর্ণনা করা যাউক, পশ্চাৎ তদুৎকর্ষে যাহা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যাইবে।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সেনাবিভাগের অধ্যক্ষ ডিক্‌সন সাহেব নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশ করেন। সেই বিবরণীতে তিনি বলিয়াছেন, আজ্‌মীর প্রদেশের নিকটস্থ পর্ব্বত শ্রেণীর ১০০ হইতে ৩৫০ ফিট উর্দ্ধতার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সীসকের খনি আছে। সেই সকল খনিতে সীসকের প্রস্তর-সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া এই সকল খনিতে সীসক নিষ্কাশনের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। বোধ হয় অনায়াসে

খনি খনন করিবার প্রথা এ দেশের লোকদিগের জানা ছিল না; থাকিলেও ইঁহারা সে প্রকারে কার্য্য করিতে যত্নবান হইতেন না। যেন তেন প্রকারেণ খনি হইতে সীসকের প্রস্তর উত্তোলন করিয়া সীস নিষ্কাশনের কার্য্য চালাইতেন। পূর্ব্বকথিত পর্ব্বতস্থ খনিতে ৩ হইতে ৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত পুরু সীসক-বিশিষ্ট প্রস্তরের স্তর সচরাচর পাওয়া যাইত। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যুজ্জ্বল কণিকা দেখিয়া ঐ স্থানের লোকেরা খনির অস্তিত্ব ও সীস-প্রস্তরের অস্তিত্ব অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিত। তৎকালে যে সকল সীসার পাথর পাওয়া যাইত, সে সকলের কতকগুলি অতিশয় উজ্জ্বল, কতক কাল, কতক বহুছিদ্র-বিশিষ্ট এবং প্রগাঢ় রক্তবর্ণ। সাহেব বলেন, খনির স্থানীয় মৃত্তিকার গুণানুসারে এই সকল সীসার পাথরের বর্ণের তারতম্য হয়। অন্যে বলেন, বর্ণের ইতর বিশেষের কারণ সংযৌগিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ স্বাভাবিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বর্ণের ইতর বিশেষ সংঘটন হয়। এই সীসক প্রস্তর গুলিই "গেলিন" বলিয়া অভিহিত হয়। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে এই সীসক প্রস্তরের "গণ্ডুপদ" নাম পাওয়া যায়। সীসকের নাম "গণ্ডূপদভব" এবং সীসক প্রস্তরের নাম "গণ্ডুপদ"।

তৎকালে বারুদের সাহায্যে প্রস্তর কাটান হইত না। সামান্য গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে কাষ্ঠ ও অগ্নি যোগ করা হইত এবং তদ্দ্বারা প্রস্তর কাটান হইত। স্পষ্টই বুঝা যায়, তৎকালের লোকেরা প্রস্তর কাটাইয়া অতি সামান্য সোণার আশা করিত। খনি খনন করিবার বিশেষ বিশেষ যন্ত্রও তৎকালে ছিল না; কেবল কয়েক প্রকার হাতুড়ি, বাঁটালি এবং কয়েক প্রকার গাঁইৎ মাত্র ব্যবহৃত হইত।

খনি খননকারীরা প্রাতঃকালে কার্য্যারম্ভ করিয়া দিবসের অধিকাংশ সময়ই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। কতকগুলি লোক পুরুষানুক্রমে এই কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায়, ইহারা অতি উচ্চহারে সুদ দিয়া টাকা কর্জ্জ করিত এবং কিছুকাল পরে এই দিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় ভালরূপে কার্য্য চালাইবার জন্য খনন-কারীদিগকে বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া আরব্ধ হয়। গবর্ণমেণ্টের এই অনুগ্রহে খনি খননকারীরা দুরন্ত মহাজনদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। এই প্রদেশে তিন বৎসরে যে সকল সীসা প্রস্তুত হইত, তাহার পরিমাণ প্রায় ৪৫০ হন্দর।

সীস প্রস্তুত করিবার তাৎকালিক উপায়।

খনি হইতে প্রাগুক্ত লক্ষণাক্রান্ত "গণ্ডূপদ" বা গেলিনা প্রস্তর উত্তোলন করিয়া, যতদিন না উত্তমরূপ শুষ্ক হয়, ততদিন তাহা গাদা করিয়া ফেলিয়া রাখা হইত। উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে, সে সকল মুদ্গরের দ্বারা পিটিয়া গুঁড়া করা হইত; সেই গুঁড়া ঝুড়িতে সংগ্রহ করিয়া স্রোতের জলে উত্তমরূপে ধৌত করা হইত। এই ধৌতকরণ একটু কৌশলসাপেক্ষ। প্রস্তর অপেক্ষা সীসকের অংশ অধিকতর অংশ উপরে জমাইৎ হয়। এরূপ ক্রমে সীস প্রস্তর হইতে সীসার ভাগ পৃথক্ করা হয়; পুনর্ব্বার তাহা ধৌত করা হয়, ২০ হইতে ৩০ বার ধৌত করার পর সীসকের অংশ সকল লইয়া সমান ওজনের গোময়সহ মিশ্রিত করতঃ তাহা পায়রার ডিমের মত ছোট ছোট গুলি পাকা-ইয়া, সে সকল পুনঃ শুষ্ক করা হয়। গুলি সকল উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে ১১ ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট খাড়া চুল্লীতে স্থাপন করতঃ চুল্লীর নীচে কয়লার আগুন করিয়া তাহাতে হাপরের দ্বারা বাতাস দেওয়া হইত। এই সকল চুল্লীর নীচে গর্ত্ত থাকে, সেই সকল গর্ত্তে সীসক গলিয়া আসিয়া একত্র জমাইৎ হইতে থাকে। গ্রীষ্মকালে এইরূপে এতদ্দেশে সীস প্রস্তত হইত। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সীস-প্রস্তর হইতে শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত সীস পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানকালে সীস প্রস্তুত করণের জন্য বিশিষ্ট উপায় সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা ফলও বিশিষ্ট প্রকারে লব্ধ হইতেছে, বর্ত্তমান উপায়ে সীস প্রস্তুত পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ :—

অনেক প্রকার সীসার পাথর আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুই প্রকার প্রায় সকল দেশে কিছু অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক গেলিনা অপর সেরসাইট। ভূগর্ভস্থ অগ্নির উত্তাপে গন্ধক ও সীসা সর্ব্বাবয়বে মিশ্রিত হইয়া গেলিনা প্রস্তুত হয়, ইহা পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। ইংলণ্ডে ডাক্তার পার্সি (Percy) গন্ধক ও সীসা গলাইয়া এক প্রকার বিশিষ্ট নিয়মে উক্ত পদার্থ শীতলকারক গেলিনা পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা দেখিতে অতিশয় উজ্জ্বল, রং কালো ও খুব ভারি। খুব ছোট এক টুক্‌রা গেলিনা হাতে করি-লেই উহার সমধিক ভারবত্তা উপলব্ধি হয়। গেলিনার ভার জল অপেক্ষা ৮।৯ গুণ অধিক।

স্বাভাবিক গেলিনা প্রায় খাঁটী হয় না। ইহার সহিত আর্সনিক, র‍্যাণ্টি-

মেনি, তামা, রূপা এবং কোন কোন গেলিনায় অতি সামান্য পরিমাণে স্বর্ণ মিশ্রিত থাকে। সীসার সব প্রকার খনিজ প্রস্তর আছে, তন্মধ্যে এই— গেলিনা প্রস্তরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় ও ইহাতেই সীসার ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে। ভাল গেলিনাতে শতকরা ৮৬৬ ভাগ সীসা থাকে, গন্ধক ১৩৪ ভাগ থাকে।—

ভূগর্ভস্থ কন্দরেও কখন কখন স্তরে ইহা পাওয়া যায়। কন্দরে যাহা থাকে, তাহার পরিমাণ তত অধিক নহে। পরন্তু যদি ইহার স্তর পাওয়া যায়, তাহা হইলে স্বর্ণ অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়।

গেলিনার দানা অতিশয় উজ্জ্বল ও ছয় কোণ বিশিষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহার দানা সরু হইলে বেশী রূপা থাকে, আর মোটা হইলে রূপার অংশ কম হয়; কিন্তু ইদানীং নানা প্রকার নমুনা পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে, যে ঐ উক্তি প্রবাদ মাত্র, সত্য নহে। কারণ "ব্রোকণহিল" নামক স্থানে মোটা দানা গেলিনায় আশাতীত ফল হয়।—

সীসায় সেরসাইট্ প্রস্তর।

অঙ্গারযান ও সীসা মিশ্রিত হইয়া এই সেরসাইট উৎপন্ন হয়। গেলিনা পাথর বহুকাল অনাবৃত অবস্থায় রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে পড়িয়া থাকিলে ভূবায়ুস্থিত অঙ্গারযান অল্পে অল্পে ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। তাহাতে তাহার চাকচিক্য নষ্ট হইয়া যায় ও এক প্রকার সাদা রং বাহির হয়। এই নূতন পদার্থের নাম "সেরসাইট"। সেই সেরসাইট পাথর অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু গেলিনা যত পাওয়া যায় তত নহে। খাঁটী হইলে ইহাতে ৭৭৫ ভাগ সীসা থাকে। কিন্তু প্রায় খাঁটী হয় না, ইহারও সহিত রূপা মিশ্রিত থাকে, গেলিনা ও সেরসাইট ব্যতীত আরও অনেক সীসার পাথর আছে, কিন্তু সে সকলে অধিক পরিমাণ সীসা পাওয়া যায় না, সে জন্য সে সকল পাথর অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে।

অতৃপ্ত।

চাঁদ ঢেলে দেয় নিশুতি রাতের তৃষিত বুকে
ভুবন ভুলানো হাসি,
নিঝর সে ঢালে সিন্ধুর ভরা সুনীল বুকে
নিরমল বারি-রাশি।
মেঘ সে আপন বক্ষ চিরিয়া অশ্রু ঢালে
তপ্তধরার শুষ্ক হিয়ার'পর,—
সলিল-সিক্ত ঝিল্লীমুখর শ্রাবণ রাতে,
বকুল করিছে পবন সুরভি-তর।
প্রকৃতি তার পুঞ্জিত ধন রিক্ত করি
ঢালিছে নিত্য শ্যামল বুকের অমল সুধা,
নিখিল বিশ্ব ভাণ্ডার তবু নিঃস্ব কেন
হিয়ার গোপন কোণে তার তবু জাগে কি ক্ষুধা ?

নিত্য তোমার বিত্তে দিতেছ ভরিয়া ঝুলি
হৃদি ভাণ্ডার অমৃতে তোমার দিয়েছ তবে,
হৃদয় রক্তে রঞ্জিত করি ধেয়ান তুলি
এঁকে দিলে মায়া অঞ্জন মোর আঁখির'পরে !
কাঙ্গালের মতো রিক্ত করিয়া ঝুলিটী মোর
তবুও ভিক্ষা মাগি,
তবু তব দ্বারে ফেলি প্রতিদিন নয়ন লোর
আরো বিত্তের লাগি।
সঞ্চয় হীন ফিরি প্রতিদিন ভিক্ষা খুঁজি'
তোমার হৃদয়-দেউলের দ্বারে সকাল সাঁঝে,
নিহিত তোমার চিত্তে ধরার সুধাটী বুঝি,
তাই ঢেলে দাও ক্ষুধিত এ মোর হিয়ার মাঝে।
চিরকাল কি মোর রহিবে কি ওগো সজল আঁখি
ঘুচিবে না কভু প্রাণের গভীর এ আকুলতা ?
লুপ্ত হিয়ার আকাঙ্ক্ষা আজ মিটিবে না কি
অবসান হবে কবে এ হৃদির ব্যাকুল কথা ?

— শ্রীপরমেশপ্রসন্ন নাগ চৌধুরী।

এন্‌কোর।

(গল্প)

অনেক দিনের কথা, একদিন পৌষের শেষ রাত্রিতে শাল মুড়ি দিয়া পথ চলিতেছিলাম। আমার গায়ে একটা "অলষ্টার," পায়ে অতি পুরাতন স্থানে স্থানে সাদা কাপড়ের তালি দেওয়া কাল রংএর মোজা, তার উপর চিনাবাড়ীর সাত সিকা মূল্যের সাদা ক্যাম্বিসের জুতা, আর মাথায় একটা "ব্ল্যাক্‌লাভা" ক্যাপ্‌ ছিল। যদিও ছড়ি লইয়া বাহির হওয়াই আমার চির-অভ্যাস, তথাপি কিন্তু সেদিন ছড়ি লইতে পারি নাই, কারণ পৌষের সে দুরন্ত শীতে শালের ভিতর হইতে হাত বাহির করিবার কোন উপায় ছিল না। তাই কেবল পৃষ্ঠের উপর একটা "গ্ল্যাডষ্টোন" ব্যাগ বাঁধিয়া লইয়াছিলাম। বাহিরে তখন বরফ পড়িতেছিল। তাহার উপর অল্প অল্প শীতল বাতাস বহিতেছিল। সুষুপ্ত সহরের উপর দিয়া আমি চলিতেছিলাম। রাস্তার মোরে একটীও পাহারাওয়ালার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না। চারিদিকই নিস্তব্ধ, চারিদিকই নীরব। কেবল দূরে একটী গৃহের ছাদ হইতে একটী কুকুরের আকুল চীৎকার দূর-দূরান্তরে প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল। কেবল পথিপার্শ্বস্থ একটী বাড়ী হইতে এক সদ্যঃ-পতিবিয়োগ-বিধুরা বালিকার করুণ ক্রন্দন উঠিয়া আকাশ প্লাবিত করিতেছিল।

আমার গন্তব্যস্থল ছিল শিয়ালদহ। যখন আমি ওয়েলিংটন্‌ হইতে বৌবাজার ষ্ট্রীট্‌এ পড়িয়া পূর্ব্বদিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন হঠাৎ পশ্চাৎদিক্‌ হইতে কে বলিয়া উঠিল,—"মাষ্টার মশায় যে, এত রাত্রে ?"

অত্যন্ত চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলাম। তখন রাস্তার গ্যাসের আলো নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছিল। শুক্লা দশমীর চাঁদও অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছিল। দুইধারের বড় বড় বাড়ীগুলির ছায়া পড়িয়া পথটী বহু-পরিমাণে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাহারই মধ্য দিয়া আমি দেখিলাম, একটি লোক সর্ব্বাঙ্গ একখানি কাল কম্বলে ঢাকিয়া আমারি দিকে আসি-তেছে। দেখিতে দেখিতে লোকটী আমার পার্শ্বে আসিয়া আমার পদধূলি লইবার জন্য মস্তক অবনত করিল। আমি কিন্তু আগন্তুককে চিনিতে না

পারিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আগন্তুক কহিল,—"আমায় চিনিতে পারিতেছেন না? আমার নাম কৃষ্ণ।"

আগন্তুকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিছুই স্পষ্টরূপে দেখিতে না পাইলেও কণ্ঠস্বরে তাহাকে অল্পবয়স্ক যুবক বলিয়াই আমার বোধ হইল। আমি বিস্ময়-বিজড়িত-কণ্ঠে আমৃতা আমৃতা করিয়া কহিলাম,—"কৃষ্ণ!—হ্যাঁ—না—কৈ চিনিতে পারিতেছি না ত। কোন্ কৃষ্ণ?" যুবক একটু অনুচ্চ হাসি হাসিয়া ঈষৎ উৎসাহপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল,—"আমি যে অনেক দিন আপনার "প্রাইভেট্ পিউপিল" ছিলাম। আপনি যখন গোবিন্দপুর স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, তখন আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। আমার পিতার নাম ঠাকুর-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।"

শুনিয়া আমার মুখমণ্ডল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি অত্যন্ত আনন্দ-উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিলাম,—"বটে! তুমি সেই কৃষ্ণ? তা বাবা, সে আজ সাত বৎসর পূর্ব্বের কথা। ইহার মধ্যে তুমি যে এত বড় হইয়াছ, তা কেমন করিয়া বুঝিব? তোমাকে যে কত মারিতাম, কত ভর্ৎসনা করিতাম, সে সব কথা এখন স্বপ্নের মত মনে পড়িতেছে। তোমার দাদা বেশ ভাল আছেন ত?"

মুখের আবরণ একটু সরাইয়া পূর্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কৃষ্ণ বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি ভাল আছেন। আপনি এখন কোথায় যাবেন? এত ভোরে যে—"

বাধা দিয়া আমি বিষাদক্লিষ্টকণ্ঠে বলিলাম,—"আমি এখন বড় বিপদে পড়িয়াছি। উপস্থিত আমি গোয়ালন্দ মেলে ঢাকা যাইতেছি। সেখানে বিশেষ জরুরী কায আছে।" কৃষ্ণ উৎকণ্ঠাকম্পিত-কণ্ঠে কহিল,—"সে কি? এমন কি বিপদে পড়িয়াছেন যে, আপনার মত লোককেও বিচলিত হইতে হইয়াছে?" আমি উত্তর দিলাম,—"সে অনেক কথা। এখন তুমি কোথায় যাবে? তুমি এখন কোথায় থাক? কি কর?"

কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"আজ্ঞে, শিবপুরে আমার বিবাহ হইয়াছে। আমি সেখান থেকেই আসিতেছি। আমিও গোয়ালন্দ মেলে কুষ্টিয়া যাইব। সেখানে "বাড়্" কোম্পানীতে কার্য্য করিয়া থাকি।" আমি স্নেহার্দ্র স্বরে কহিলাম,—"তা বেশ হইয়াছে বাবা, চল একত্র যাই।" অতি দুঃখের সময়েও একজন সহানুভূতিসম্পন্ন সঙ্গী পাইয়া, প্রাণের বেদনা

ও দুঃখের কথা শুনিবার একজন লোক পাইয়া যেন আমার মনটা একটু প্রশান্ত, প্রাণটা একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

এই সংসার-ভারাক্রান্ত প্রত্যেক জীবের হৃদয়েই একটা অফুরন্ত স্নেহ-নির্ঝর আছে। ইহাই জীবের জীবনকে বহনীয় করিয়া রাখে। প্রত্যে-কেই স্বীয় স্নেহনির্ঝরের সহিত অপরের স্নেহনির্ঝরের সম্মিলন করিতে চাহে। যাহাকে স্নেহ করিবার, যাহার সন্ধান—সংবাদ লইবার, যাহার কৃতকার্য্যে সহানুভূতি দেখাইবার ইহ জগতে কেহই নাই—রোগশয্যায় সেবা করিবার জন্য, পীড়ার সময় পিপাসার জলটুকু মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্য একখানি স্নেহ-হস্তও যাহার নিমিত্ত প্রসারিত হয় না—বিপদকালে যাহাকে আশা-ভরসা ও উৎসাহ দিবার, অসময়ে দুটা মুখের কথা শুধাইবার এই পৃথিবীতে যাহার কেহই নাই, সেই নিঃসঙ্গ হতভাগার দিন কত বেদনার, কত চোখের জলের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া যায়, তাহা সেই অন্তর্য্যামী ভিন্ন আমিও বিশেষ ভাবে ও বিলক্ষণ অবগত আছি। সর্ব্বদাই মানবের স্নেহ-মমতার প্রয়োজন বড় অধিক বলিয়াই মনে হয়। সদ্যোচ্ছিন্ন লতিকা যেমন একটী আশ্রয়ের জন্য, স্ফুটনোন্মুখ নলিনী যেমন একবিন্দু সুর্য্যকরের জন্য ব্যাকুল হইয়া চারি-দিকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, তেমনি সংসার-ভারক্লান্ত মানবের হৃদয় স্নেহের আশ্রয়, সহানুভূতির আকর খুঁজিয়া থাকে। যে পায় সে কৃতার্থ হইয়া যায়; আর যাহার ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটে না, তাহাকে আশ্রয়চ্যুত লতার মত এই সংসারের ধূলিতলেই লুণ্ঠিত হইতে হয়। যে আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ পরিবেষ্টনের মধ্যে জীবন কাটাইতে পায়—যে আকাঙ্ক্ষিত স্নেহ-ধারায় অভিষিক্ত হইবার অবসর পায়—নানাপ্রকার সাংসারিক বিড়ম্বনায়, ভাগ্য-দেবীর নিদারুণ উৎপাতে এবং কালের কঠোর দংষ্ট্রাঘাতে যাহাকে স্নেহ-বেষ্টন হইতে সুদূরে সরিয়া যাইতে হয় না, ভাগ্যহীন ভিখারীর মত একরত্তি স্নেহকণিকার জন্য যাহাকে দ্বারে দ্বারে, পল্লীতে পল্লীতে ভাষাশূন্য করুণ দৃষ্টিতে ফিরিতে হয় না, যে অপরের নিকটে স্নেহের দাবী করিতে পারে, অপরের নিকট হইতে জোর করিয়া যাহার স্নেহ চাহিয়া লইবার অধিকার আছে এবং বিধির বিধানে বঞ্চিত হইয়া যাহাকে অন্যের নিকট হইতে স্নেহ-লাভ করিবার জন্য উঞ্ছবৃত্তির আশ্রয় লইতে হয় না, সে-ই এ সংসারে সর্ব্ব-সৌভাগ্যের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। সে-ই এ সংসারে ধন্য!

কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত

হইলাম। তখন বেলা পাঁচটা বাজিতে পনর মিনিট বাকী ছিল। পাঁচটার সময় ট্রেণ ছাড়ে। তখনও ঘন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন দিগন্তব্যাপী আকাশ-তলে একটীও পাখী ডাকিয়া উঠে নাই, তখনও পূর্ব্বদিক অরুণরাগে রঞ্জিত করিয়া ঊষা পৃথিবীর উপর একটা প্রহেলিকাময় মায়াজাল বিস্তার করে নাই, তখনও সহরের অস্পষ্ট বাড়ীগুলি ও পথিপার্শ্বস্থ অস্পষ্ট গ্যাসালোকের স্তম্ভগুলি যেন একটা স্বপ্নময় রাজ্য সৃজন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আমি কৃষ্ণের নিকট টাকা দিলাম। সে টিকিট কিনিয়া আনিল। তারপর আমরা উভয়ে ট্রেণের একই কামরায় উঠিলাম। কৃষ্ণ বেশ করিয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিল। আমি ব্যাগটী পৃষ্ঠ হইতে খুলিয়া পাশে রাখিলাম এবং ভাল করিয়া শাল মুড়ি দিয়া বসিলাম। কেবল চোখ দুটা খোলা রহিল। কৃষ্ণ আমার সম্মুখের বেঞ্চের উপর সম্পূর্ণরূপে মুখ খুলিয়া বসিল।

অনেকক্ষণ আমি অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ ট্রেণ ছাড়িবার বংশীধ্বনিতে আমার চমক ভাঙ্গিল। মুখ নীচু করিয়া বসিয়া ছিলাম, মুখ তুলিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ট্রেণ ছাড়িল বুঝি ?"

কৃষ্ণ হাস্যোৎফুল্ল চক্ষে আমার মুখে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হঁ্যা। এইবার ট্রেণ ছাড়িবে।" তারপর একটু থামিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া ভার-ভার গলায় বলিল—"কি বিপদ মাষ্টার মশায় ?" তাহার অর্দ্ধ-উচ্চারিত অর্দ্ধ-অস্ফুট স্বরে বেশ একটু সহানুভূতির চিহ্ন প্রকাশ পাইল; বেশ একটু আত্মীয়তার ভাব দেখা গেল। ট্রেণও হুস্ হুস্ শব্দে চলিতে আরম্ভ করিল।

আমি বিমর্ষভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া গেলাম,—"তোমাদের স্কুলে আমি অনেকদিন কার্য্য করিয়াছিলাম। অরুণকে আমি তাহার শৈশব হইতেই পড়াইতাম। আমার নিজের কোন সন্তান না থাকায় আমি তাহাকে পুত্রের মতন স্নেহ করিতাম—প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম। কোন উত্তম খাদ্যদ্রব্য পাইলে অরুণকে না দিয়া আমি খাইতে পারিতাম না। তাহাদের সাংসারিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। আমি অরুণকে পড়াইয়া যৎসামান্য যাহা পাইতাম, তাহা তাহারই পোষাক-পুস্তকাদিতে ব্যয় করিতাম। কারণ আমি দেখিতে পাইতাম যে প্রায়ই তাহার পায়ে জুতা, গায়ে ভাল জামা থাকিত না, পাঠ্যপুস্তকেরও অনেক অভাব থাকিত। অরুণের পিতা শৈলবাবু মাত্র ৩০৲ টী টাকা বেতনে "ব্যাথ গেট" কোম্পানিতে কার্য্য

করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি পোষ্য ছিল, সুতরাং সংসারে বড় অভাব, বড় কষ্ট সর্ব্বদাই বিরাজ করিত।

কৃষ্ণের হৃদয়ে যেন একটা হিংসার আগুন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে যেন একটু কুটিল চাহনিতে আমার দিকে চাহিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল,—"হাঁ, তা'ত সব জানি। মাষ্টার না রাখিলে ছেলের পড়া হয় না, তাই কোন গতিকে আপনাকে পাইয়া রাখিয়াছিল। আমিও তো চারি টাকা বেতন দিয়া আপনার কাছে অরুণদের বাড়ী পড়িতে যাইতাম। তারক. হরেন, প্রভৃতিও যাইত। অরুণকে উত্তমরূপে পড়াইয়া তারপর আপনি আমাদিগকে পড়া বলিয়া দিতেন। সেই সময় কত কথাই উঠিয়া-ছিল—সব আমার মনে আছে।"

আমি বলিলাম,—"তুমি জান যে চিরদিনই আমি স্বাধীনচেতা—কাহা-কেও তোষামোদ করা বা কাহার মন যোগান আমার স্বভাবে আসে না। তাই যখন স্কুলের কর্ত্তাদের সহিত মতভেদ-জনিত মনোবিবাদ উপস্থিত হইল, তখনও আমি আমার আবাল্যের স্বভাবটুকু পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না, পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। কয়েকদিন অরুণদের বাড়ী থাকিয়া কালী-পুর হাইস্কুলে পুনর্ব্বার মাষ্টারী লইয়া চলিয়া আসিলাম।

অরুণ তখন প্রথম শ্রেণীতে পড়িত। আমার শিক্ষাদানে অক্ষমতা প্রযুক্তই হউক বা কপাল গুণেই হউক, সে প্রথমে আমার প্রতি যেরূপ ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল, পরে কিন্তু ক্রমশঃ তাহার সে ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সে তৃতীয়শ্রেণী পর্য্যন্ত বেশ ছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াই একটু আধটু অবা-ধ্যতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই আমার শিক্ষাপ্রণালীর প্রশংসা করিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি অরুণকে "আপনার" করিতে পারি নাই। তথাপি তাহার উপর আমার যত্ন অণুমাত্র কমে নাই—তাহার উপর আমার প্রাণের ষোল আনা টান ছিল। তাহাকে ছাড়িয়া কালীপুর আসিতে যথার্থ ই আমার প্রাণে বড়ই বাজিয়াছিল।

সদ্ব্যবহার দ্বারা পরকে আপন করা যায় কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার একটা উৎকট ইচ্ছা, একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা আমার মনে অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। কালীপুরে থাকিয়াও অরুণকে সর্ব্বদা পত্র লিখিতাম। সেও তাহার যথারীতি প্রত্যুত্তর দিতে প্রথম প্রথম বেশী বিলম্ব করিত না। কিছুদিন পরে অরুণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। সে সংবাদ শুনিয়া

আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলাম,—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ইহার পর একদিন অরুণ হঠাৎ আমার বাসায় আসিল। কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল,—"বাবা বলিতেছেন আর পড়ার খরচ যোগাইতে পারিব না। তবে আমার আর কি প্রকারে পড়া হইবে?" এই বলিয়া অরুণ কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার প্রাণের ভিতর যে একটা বেদনার ঝড় বহিতেছিল, তাহার হৃদয়মধ্যে যে একটা দুঃখের শেল থাকিয়া থাকিয়া আঘাত করিতেছিল, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম।

অরুণের নিকট তাহাদের সংসারের করুণ কাহিনী শুনিয়া আমি বড় কাতর হইয়া পড়িলাম। লেখা পড়ায় অরুণের যে খুব যত্ন ও মন ছিল, ইহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। তাই তাহাকে মাসিক ১০৲ দশ টাকা সাহায্য করিতে চাহিয়া এবং আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাহার কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্ত্তি হইবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলাম।

কে জানিত তখন সুধার ভিতর গরল থাকে, চাঁদের মধ্যে কলঙ্ক থাকে, মৃণালের উপর কণ্টক থাকে? কে জানিত তখন স্বর্গে বৈতরণী প্রবাহিত হয়, নন্দনকাননে বৈশাখী ভীম প্রভঞ্জন বহিয়া যায়, ইন্দ্রালয়ে পিশাচ পিশাচী প্রবেশ পূর্ব্বক কুৎসিত গান গায়? কে জানিত তখন অরুণ আমার সঙ্গদোষে চরিত্র নষ্ট করিয়া নরকের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে, হিতাহিত জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভুলিয়া আপন জীবনের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিবে, আমার সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া আমাকেই পরিশেষে অশেষ প্রকারে নির্য্যাতন করিবে? বরং বিদায় কালীন তাহার ক্রন্দনলোহিত চক্ষু দেখিয়া, তাহার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহাকে কৃতজ্ঞ বলিয়াই আমার বোধ হইয়াছিল।

যথারীতি আমি অরুণের পড়ার খরচ যোগাইতে লাগিলাম। সে কিন্তু দুই বৎসর পড়িয়া পরীক্ষায় পাশ করিতে পারিল না, এবং সেই রাগে পড়া ছাড়িয়া দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যখন সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িত, তখন হইতেই অল্পে অল্পে আমার অবাধ্য হইতেছিল, এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। আমার শত অনুরোধ পদদলিত করিয়া, শত নিষেধ তুচ্ছ করিয়া হঠাৎ পড়া ছাড়িয়া দিল।

কৃষ্ণনগরে অবস্থান কালে তাহার কয়েকটী কু-সঙ্গী জুটিয়াছিল। তাহা

দের সহিত মিশিয়া তাহাদেরই কু-পরামর্শে অরুণ ঘোর পানাসক্ত ও কদাচারী হইয়া পড়িয়াছিল। কুসঙ্গে পড়িয়া দেবচরিত্র মানবও যে কিরূপ কলঙ্ক-কালিমা গায়ে মাখিতে পারে, অরুণই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত; পরের অবিরত কু-পরামর্শে সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ মানবও যে কতদূর উপকারীর উপকার ভুলিয়া কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে, অরুণই তাহার চূড়ান্ত উদাহরণ! অসৎসঙ্গে পড়িয়া অরুণ যে এমন অধঃপাতে যাইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই; অসৎসঙ্গে পড়িয়া অরুণ যে এমন গুরু-লঘু জ্ঞান হারাইয়া নির্লজ্জের মত —যাহা খুসী তাহাই করিবে, এ ধারণা আমার আদৌ ছিল না; অসৎসঙ্গে পড়িয়া অরুণ যে এমন ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া উঠিবে, এ কল্পনা আমি কখনও করিতে পারি নাই। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

অর্থাৎ উৎকট ইন্দ্রিয়-লালসাই যত অনর্থের মূল, ইন্দ্রিয়-সংযমই যত সম্পদের নিদান। নীতিশাস্ত্রে আরও কথিত আছে,—

বাসো ন সঙ্গঃ সহ কৈর্বিধেয়ো
মূর্খৈশ্চ নীচৈশ্চ খলৈশ্চ পাপৈঃ।

মূর্খ, নীচ, পাপী ও দুষ্টের সহিত কখনও বাস করা উচিত নয়; তাহাদিগকে কখনও সঙ্গী করা উচিত নয়।

সে যাহা হউক, তখনও আমি অরুণের এমন পতনের কথা জানিতে প্যারি নাই। তাই তাহার চাকরীর জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কুলদাপ্রসাদ ঘোষ আমার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু। তিনি তখন ঢাকার ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া আমি ঢাকার খাজনা-খানায় মাসিক সত্তর টাকা বেতনে অরুণের একটী কার্য্যের ঠিক করিলাম। কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার জামীনের দরকার; কে আর জামীন হইবে? আমি নিজেই অরুণের জন্য জামীন হইলাম। কিছুদিন সে বেশ কাযকর্ম্ম করিতে লাগিল। তারপর একদিন আমার সর্ব্বনাশ করিল।

শুনিয়া কৃষ্ণ যেন বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। কৌতুহলপূর্ণ-কণ্ঠে কহিল,— "সে কি! সে আবার আপনার কি সর্ব্বনাশ করিল?" এই বলিয়া কৃষ্ণ কি জানি কেমন একভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যেন একটা

সন্দেহের ভাব আসিয়া তাহার হৃদয়মধ্যে জমাট বাঁধিতেছিল। যেন একটা অসূয়ার আগুন তাহার প্রাণের ভিতর ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

এমন সময় এক ব্যক্তি আমাদের কামরায় উঠিয়া অদূরে অপর এক বেঞ্চের উপর বসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, "নৈহাটী" হইতে ট্রেণ ছাড়িল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর আমি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে বলিয়া গেলাম,—"হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল, অরুণ গবর্ণমেণ্টের পঁচিশ হাজার টাকা ভাঙ্গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে।" শুনিয়া আমি তো চোখে সর্ষেফুল দেখিলাম। পৃথিবী যে ঘোরে, এ কথা আমি বাল্যকালে ভূগোলে পড়িয়াছিলাম, সেই দিন প্রথমে তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। তখন সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছিল। বৃক্ষের মাথার উপর পক্ষীরা উড়িয়া ডাকিয়া ডাকিয়া সূর্য্যোদয়ের সংবাদ প্রচার করিতেছিল। দূরে চাষীর বাড়ী হইতে একটা কুক্কুটের কণ্ঠরব তখনও দিগন্তের কোলে অল্পে অল্পে মিশাইতেছিল। আমি সেই মাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিতে যাইতেছিলাম। এমন সময় এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ "হতভম্ব" হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পরে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া সেক্রেটারীকে ছুটীর জন্য এক পত্র লিখিলাম, এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ঢাকায় রওনা হইলাম।

যথাসময় ঢাকায় উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধানে জানিলাম, অরুণ টাকা লইয়া ত্রিপুরার দিকে পলাইয়াছে। তখন আমি ঢাকা হইতে ত্রিপুরায় যাত্রা করিলাম। তথায় পৌঁছিয়া আবার শুনিলাম, সে "গারো" পাহাড় চলিয়া গিয়াছে। কি করি? নিরুপায় হইয়া তাহার খোঁজে ভয়াবহ অরণ্যসমাচ্ছাদিত বিপদসঙ্কুল "গারো" পাহার উদ্দেশে চলিলাম। এদিকে আসামী হাজির করিয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট আমাকে মাত্র দুই মাস সময় দিয়াছিলেন। নির্দ্ধারিত দিবসে অরুণকে পুলিশের হাতে বাঁধিয়া দিতে না পারিলে আমার যে দুই বৎসর জেল ও আমার সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক হইবে, ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং কালবিলম্ব করিবার বা পথিমধ্যে একদিন একটু বিশ্রাম করিবার অবসর আমার ছিল না। তাহার উপর প্রাণের ভিতর যে কি যন্ত্রণা হইতেছিল, তা কেমন করিয়া বলিব? উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে, ভাবনা ও আশঙ্কায় আমার আহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ হইয়া

গিয়াছিল। দেহের রক্ত অর্দ্ধেক শুকাইয়া উঠিয়াছিল। চক্ষু কোটরগত হইয়াছিল। সুতরাং পথকষ্ট ক্রমে আমার অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল।"

ঠিক এই সময় ট্রেণ আসিয়া "রাণাঘাট" ষ্টেশনে দাঁড়াইল। অপর যাত্রীটি গাড়ী হইতে নামিয়া গেল এবং কৃষ্ণ উঠিয়া সমস্ত জানালাগুলি খুলিয়া দিল। অমনি উন্মুক্ত গবাক্ষপথে নবোদিত সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া আমার গাত্র স্পর্শ করিল। তখন আমি আমার মাথার টুপি খুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া ঠিক হইয়া বসিলাম। কামরার মধ্যে আমরা দুই জন—আমি আর কৃষ্ণ। অনেকক্ষণ অবধি আমরা উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিলাম। শেষে কৃষ্ণ আর থাকিতে না পারিয়া কৌতুহল-বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া বলিল,—"তারপর কি করিলেন ?"

আমি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলাম,—"যখন আমি "গারো" পাহাড়ের সন্নিকটে পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কোন দিকেই সাড়াশব্দ ছিল না—চারিদিকই নিস্তব্ধ। কেবল কি জানি কিসের উন্মাদনায় থাকিয়া থাকিয়া দূরে একটা পাখী তাহার মধুকণ্ঠে কাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। অফুরন্ত দিগন্তস্পর্শী নীলিমাময় নভোমণ্ডল হইতে পূর্ণচন্দ্রমার সুধাসদৃশ কিরণধারা অজস্র ধারায় ঝরিয়া ঝরিয়া পর্ব্বতগাত্র অভিষিঞ্চিত করিতেছিল। সে দিন চন্দ্রকরবিধৌত গগনে বহু নক্ষত্রের সমাগম হয় নাই ; বাতবিক্ষুব্ধ ক্ষুদ্রকায়া পার্ব্বত্য নদীরবক্ষে শত শত চাঁদ মুখ দেখিতেছিল ; তাহাতে যে কি মনোহর ছবির, কি মধুর দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা চোখে না দেখিলে মুখে কি করিয়া বুঝাইব ? সুমন্দ বায়ুতরঙ্গে নৈশফুল্ল বনফুলের অনিন্দ্যগন্ধ চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আমি স্বভাবের এই অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া দুশ্চিন্তাচর্ব্বিত প্রাণেও এক অব্যক্ত আনন্দানুভব করিতে লাগিলাম।

সেই দুরধিগম্য প্রদেশে সে রাত্রে আর আশ্রয় পাইব কোথায় ? একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ যেন পাহাড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য গর্ব্বোন্নত মস্তকে স্থিরনিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান ছিল। তাহারি উচ্চশাখায় আরোহণ করিয়া সে বিনিদ্ররজনী অতিবাহিত করিয়াছিলাম। পরদিন খুব ভোরে প্রাণের মায়া না করিয়া পর্ব্বতশ্রেণীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। আমার পদশব্দে সন্ত্রাসিত হইয়া বন্যজন্তুরা প্রাণভয়ে বনান্তরালে পলাইতে লাগিল। ভয়চকিত পক্ষীগুলি ইতস্ততঃ উড়িয়া উড়িয়া ডাকিতে লাগিল।

ক্রমাগত পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী। কিন্তু এই পর্ব্বতশ্রেণীকে পর্ব্বত না বলিয়া পাহাড় বলাই ভাল, কেননা এই সকল পাহাড় বেশী উচ্চ নয়—হাজার ফিটের অধিক হইবে না। এই পাহাড়গুলি মাটির, কদাচিৎ কোথাও বা ইহার কতক অংশ প্রস্তরময়। ঘনসন্নিবিষ্ট বড় বড় গাছ ও নিবিড় কণ্টক-ঝোঁপ দ্বারা সবগুলি পাহাড়ই সমাচ্ছাদিত। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ীয়াগণের গমনাগমনের জন্য অতি ক্ষীণ অপ্রশস্ত পথরেখা ভিন্ন অন্য কোন পথের চিহ্নমাত্রও তথায় ছিল না। বাস্তবিক এই প্রকার নানাবিধ হিংস্রজন্তুপূর্ণ ভীষণ দুর্ভেদ্য, দুর্গম্য, দুরারোহ পাহাড় সকল স্বচক্ষে না দেখিলে, তাহা কল্পনা করা অসম্ভব।

আমি অতি কষ্টে প্রাণ হাতে করিয়া সেই জনমানবশূন্য ভয়াবহ গম্ভীর অরণ্যের মধ্যে চলিতে লাগিলাম। কয়েক মাইল চলিয়া আমি একটী "বস্তী" পাইলাম। পাহাড়ের উপর জঙ্গল কাটিয়া যে স্থানে পার্ব্বত্য-জাতিরা বাস করে, সেই স্থানকে "বস্তী" বলে। তথাকার অসভ্য মনুষ্যগুলা আমাকে ভিন্ন জাতীয় লোক দেখিয়া প্রথমে মারিতেই উদ্যত হইল। অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিবার পর, তবে তাহারা নিরস্ত হইল। তাকি ছাই তাহাদের কথা বুঝিবার যো আছে! ভাগ্যে একজন স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের পুলীশ সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিল, এবং দোভাষীর কায করিয়াছিল তাই রক্ষা! সেখানে কোন বাঙ্গালীবাবু আসে নাই শুনিয়া আমি আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

কয়েকটা পাহাড় অতিক্রম করিয়া আমি আর একটা পাহাড়ীয়া বস্তীতে উপস্থিত হইলাম। সেখানেও ঐ একই সংবাদ শুনিলাম। এইরূপে আমি পাহাড়ের পর পাহাড়, বনের পর বন, "বস্তীর" পর "বস্তী" ঘুরিয়া ঘুরিয়া অরুণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ কোথাও তাহার কোন সন্ধানই পাইলাম না।

তিন দিন কাটিয়া গেল। আমি আহারের জন্য যে সামান্য চিঁড়া ও চিনি সঙ্গে লইয়াছিলাম, তাহার পুঁটুলীটিও একটী বেত-বৃক্ষের লকলকে কণ্টকাকীর্ণ ডগায় লাগিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ বেতগাছ ঐ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ক্রমে আমি ক্ষুধায় আকুল হইয়া উঠিলাম। কষ্টের আর সীমা রহিল না। পাহাড় হইতে নামিবার সময় প্রতিমুহূর্ত্তে আমার দুর্ব্বল চরণ স্খলিত হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে একরূপ হামাগুড়ি দিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

একবার একটা খুব উঁচু পাহাড়ে উঠিবার সময় আমি হঠাৎ পা পিছলা-ইয়া ৩।৪ হাত নীচে পড়িয়া গেলাম। ভগবানের একান্ত করুণায় সে যাত্রা কোনরূপে প্রাণে রক্ষা পাইলেও আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল,—রুধির-ধারায় সর্ব্ব শরীর সিক্ত হইয়া উঠিল। একে অনাহার-জনিত দুর্ব্বলতা, তাহার উপর রক্ত ক্ষয় হেতু আমার দেহ নিস্তেজ ও অসাড় হইতে লাগিল। দাঁতে দাঁত ঠেকিতে লাগিল,—পদদ্বয় ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এত কষ্ট ও বিপদ অগ্রাহ্য করিয়াও জীবন-মৃত্যুর অতি ক্ষীণ পথরেখার উপর দিয়া একান্ত অধীরভাবে আমাকে চলিতে হইতেছিল। অবশেষে এক অগভীর অপ্রশস্ত খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীর তীরে অরুণকে "সাহেবী পোষাক" পরিয়া একটী বন্দুক হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইলাম।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রাণপণে দৌড়াইয়া গিয়া তাহার পিছন হইতে ক্ষীণ করুণ-কণ্ঠে ডাকিলাম,—"অরুণ"।

হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত হইলে জীব যেমন চমকিত ও ভীত হয়, অকস্মাৎ মৃত্যুকে নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিলে, বিষয়ানুরক্ত সংসারী মানব যেমন অতিমাত্রায় চমকিয়া উঠে, আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া অরুণও ঠিক সেইরূপ চমকিয়া উঠিল। একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—"একি! আপনি এখানে কেমন করিয়া আসিলেন?"

আমি আর মনোবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, কাঁদিয়া ফেলিলাম। অর্দ্ধ ক্রন্দনের সুরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলাম,—"বাবা অরুণ! তুই আমাকে খুন করিতে বসিয়াছিস্?"

অরুণ কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিল,—"কেন, আমি আপনার কি করিয়াছি?"

আমি ঈষৎ উচ্চ গলায় বলিলাম,—"কি করিয়াছ? তুমি গবর্ণমেণ্টের টাকা চুরি করিয়া পলাইয়াছ। আর আমি তোমার জামীন ছিলাম, তাই এখন আমি জেলে যাইতে বসিয়াছি!"

শুনিয়া অরুণ হঠাৎ বিলক্ষণ চটিয়া উঠিল; রক্তচক্ষুতে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—"এ কথা আপনাকে কে বলিল? কে আপনাকে আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য এখান পর্য্যন্ত আসিতে বলিল? আপনি এখনি এখান থেকে চলে যান বলছি,—নচেৎ মান থাকিবে না।" ক্রোধে তাহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল,—চক্ষু বিস্ফারিত ও রসনা শুকাইয়া উঠিয়াছিল, নাসিকা ঘন ঘন শব্দ করিতেছিল।

আমি তাহার ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। যখন আমি অরুণের সন্ধানে বাহির হই, তখন পুলিশকর্ম্মচারী বা অপর কোন লোককে সঙ্গে লই নাই। তাহার কারণ অরুণ যদি টাকাগুলি আমায় দেয় ত আমিই গবর্ণমেণ্টকে ঐ টাকা দিয়া আত্মসমর্পণ করিব, এইরূপ একটা সঙ্কল্প আমি হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়াছিলাম। অরুণ যে চিরদিনই আমার বড় স্নেহের—বড় যত্নের পাত্র। তাহাকে কোনরূপে এ বিপদ হইতে রক্ষা করাই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি তাহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ও সতেজ গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া কিছুতেই রাগ সামলাইতে পারিলাম না। সক্রোধে উচ্চকণ্ঠে কহিলাম,—"কি পাজি! কলির ধর্ম্মই এই? আমি তোর হাতে অপমানিত হইব? এ কথা বলিতে তোর একটু লজ্জাও করিল না? তোকে এখনই আমার সঙ্গে ঢাকা যাইতে হইবে। তোকে জেলে না পুরিয়া আমি জলগ্রহণ করিব না।" এই বলিয়া আমি অরুণের এক হাত ধরিলাম। কিন্তু ক্রোধে ও দুর্ব্বলতায় আমার হস্ত ও পদদ্বয় ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অরুণ সজোরে এক ধাক্কা দিয়া আমায় ফেলিয়া দিল। তারপর আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া অবনত বদনে বসিয়া রহিলাম। বক্ষপঞ্জরে বড় দ্রুতবেগে বিদ্যুৎ চলিতে লাগিল। দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া পড়িবার আয়োজন করিতে লাগিল। অদম্য মনের আবেগে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। আমি চোখের জল রুদ্ধ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইলাম না।

এদিকে হু-হু করিয়া ট্রেণ ছুটিতেছিল। কৃষ্ণ চিত্রার্পিতের ন্যায় আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। খানিক পরে গাড়ী আসিয়া চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে থামিল। তখন কৃষ্ণ কোমলকণ্ঠে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"তারপর কি হইল মাষ্টার মশায়?"

আমি মুখ তুলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম,—"তারপর কেবল মাত্র "তবে রে—এত বড় স্পর্দ্ধা।"—এই কথা কয়টী আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। অরুণ তাহার হস্তস্থিত বন্দুকের গোড়া দিয়া সজোরে ভীষণ ভাবে আমার মস্তকে আঘাত করিল। তারপর যে কি হইল, তাহা আমার মনে নাই। বোধ হয় আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, আমি ময়মনসিংহের সরকারী "হস্পিট্যালে" আছি। ২০ কুড়ি দিন সেইখানে থাকিবার পর তত্রস্থ ডাক্তারবাবুর আন্তরিক যত্নে আরোগ্য লাভ করিয়াছি।

কিন্তু বাঁচিয়া উঠার চেয়ে আমার মৃত্যুই শতগুণে ভাল ছিল। কারণ যেমন আমি একটু সুস্থ হইয়া উঠিলাম, অমনি বিশেষভাবে পুলিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ঢাকায় প্রেরিত হইলাম। সেখানকার হাজত গৃহে যে কষ্ট, যে যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম, তাহা আমি জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না।

সে যাহা হউক, বহু পিতৃপুণ্য-ফলে ও ভগবানের একান্ত করুণায় এবং আমার অন্যতম ছাত্র বিপিনের প্রাণপণ চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে নরক সদৃশ হাজত-গৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাই। গবর্ণমেণ্টের যে টাকা ক্ষতি হইয়াছে, ঐ টাকা ১৫ পনর দিনের ভিতর ঢাকার "ট্রেজারী"তে দাখিল করিতে স্বীকৃত হইয়া এবং অত্যন্ত বলবৎ জামীন দিয়া তবে "হাজত" হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলাম। পঁচিশ হাজার টাকা, কম কথা ত নয় ; তাই ঐ টাকা সংগ্রহ করিতে দেশে আসিয়াছিলাম। এবং আমার পৈত্রিক ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমী, তৈজস-পত্র যেখানে যা ছিল. এমন কি নিজের মূল্যবান বস্ত্রাদি ও ঘড়িটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছি, কেবল মাত্র এই শালযোড়াটী ও এই অলষ্টারটী অবশিষ্ট আছে। এই শাল ও অলষ্টার আমার পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতৃদেব ব্যবহার করিতেন, তাই তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আমি ইহা অতি যত্নের সহিত দেহে ধারণ করিয়া থাকি। আমি জীবিত থাকিতে ইহা কখনও নষ্ট করিতে পারিব না। এত করিয়াও কিন্তু সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, অনেক টাকা দেনা করিতে হইয়াছে। ঋণের মত মহাপাপ আর পৃথিবীতে কিছুই নাই। এক্ষণে ঐ পঁচিশ হাজার টাকার নোট ও গিনি এই ব্যাগটীতে পুরিয়া ঢাকা যাইতেছি। কাল টাকা দাখিল করিবার শেষ দিন। এই বলিয়া আমি ব্যাগটীকে একটু নাড়িয়া চাড়িয়া পূর্ব্ববৎ পার্শ্বেই রাখিয়া দিলাম। তখন ট্রেণ যে ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছিল, সে ষ্টেশনটীর নাম আমার মনে নাই।

আবার অনেকক্ষণ আমরা উভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ট্রেণ যখন আলমডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে হুস্ হুস্ শব্দে ছাড়িয়া দিল, তখন আমি হঠাৎ মুখ তুলিয়া কৃষ্ণকে বলিলাম,—"কৃষ্ণ! আমি জানি তুমি বেশ গান গাহিতে পার—তোমার গলাটী বেশ মিষ্ট।"

কৃষ্ণ তখন আমার ব্যাগটীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। তাহার মুখ-মণ্ডলে কেমন একপ্রকার চিন্তার-রেখা স্পষ্ট প্রতিফলিত হইতেছিল। যেন তাহার মন কোন একটা বিষয় লইয়া তোলা-পাড়া করিতেছিল; তাহার চক্ষু দেখ কোন একটা বিষয়ের আলোচনা লইয়া বড়ই বিভোর হইয়া

পড়িয়াছিল। কি জানি কেন সে বড় অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়াছিল। তাই অকস্মাৎ আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে যেন অত্যন্ত চমকিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে বেশ সামলাইয়া লইল। তারপর কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল,—"আজ্ঞে—হাঁ। আজকাল থিয়েটারে বেরুচ্ছি. সকলেই ত আমায় একটু প্রশংসাই করিয়া থাকে"

আমি স্বাভাবিক স্বরে কহিলাম,—"আচ্ছা, একটা মায়ের নাম শুনাও। মাথা-মুণ্ড আর ভাবিয়া কি করিব? মা যা করিবেন, তাই ত হইবে। মা আমার ভাগ্যে যে বিধান করিয়াছেন, সে বিধানের প্রতিবিধান করিবার শক্তি মা ভিন্ন আর কাহার নাই।"

কৃষ্ণ বেশ একটু গর্ব্ব-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া "প্রসাদী সুরে" গান ধরিল,—

"বাণী" মায়ের শরণ লয়েছি।
আর ভব-ভয়ের ভাবনা কি॥
ত্যজ্য করি ঘৃণ্য স্বভাব,
ভুলে গিয়ে আপন অভাব,
মাতৃপ্রেমে মজব এবার,
মনপ্রাণে এই স্থির করেছি।
দুষ্ট রিপু ছটার কারখানা,
অন্ধকারে এনেছে দিয়ে কুমন্ত্রণা,
"বাণী" প্রেমের আলো কি উজ্জ্বল,
আমি হৃদয় মাঝে তাই জ্বেলেছি।
ভয় কি ভবে অজ্ঞান-আঁধার,
দিয়েছি মায়ের উপর ভার,
মায়ের চরণ হৃদয়ে ধরেছি।
নরেনের আর নাই কোন শঙ্কা
বাজায়ে 'বাণী' নামের জয়ডঙ্কা,
সংসার-সংগ্রাম জয়ে চিন্তা কি॥

গান শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল। বাহ্যজ্ঞান কমিয়া আসিয়াছিল। মন এক অপূর্ব্ব অব্যক্ত ভাবের সন্ধান পাইয়া একত্রে

নৃত্য করিবার জন্য প্রাণকে বড় ঘন ঘন ডাকাডাকি করিতেছিল। কৃষ্ণ বোধ হয় তাহা বেশ লক্ষ্য করিয়াছিল, তাই পূর্ব্বোক্ত গানটী শেষ হইতে না হইতে আবার চট করিয়া গান ধরিল —

পাষাণে নির্ম্মিত হিয়া,
পাষাণ-নন্দিনী-বালা!
নেহারি নয়ন-জল,
হয় না তাই হৃদয়-গলা।
পড়িয়া মায়ার ঘোরে,
মা মা বলি ডাকি কত;
তবু তাতে রাখ মোরে,
শোন না ক্রন্দন যত;
বুঝা গেছে মায়া দয়া,
স্নেহের কথা যায় না বলা॥
ভাল ভাল "বাণী" বলে,
ডাক্‌ব না আর কভু মাগো;
বল্‌ব না আর এস এস,
হৃদয় মাঝে সদা জাগো;
পদে অর্ঘ্য দিব না আর,
পূজায় দিব না কলা॥
নরেনের কুরাল কি মা,
জন্মের মতন মা মা বলা॥

গানটী আমার এত মধুর লাগিয়াছিল যে, আমি জীবনে কখন তাহা ভুলিতে পারিব না। আমি চক্ষু মুদিয়া গান শুনিতেছিলাম। গান যে কখন থামিয়া গিয়াছিল, সে দিকে আমার মোটেই হুঁস ছিল না। অনেকক্ষণ অবধি গানের সুমধুর সুরটী আমার কর্ণে থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিতে-ছিল। আমি এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, চক্ষু মুদিয়াই অনুচ্চস্বরে কহিলাম,—"এন্‌কোর"। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া চক্ষু চাহিয়া দেখি-লাম; তখন সবে মাত্র ট্রেণ পোড়াদহ হইতে ধীর মন্থর-গতিতে ছাড়িয়া-ছিল। কৃষ্ণকে আমি আর সে কক্ষে দেখিতে পাইলাম না, এবং সেই সঙ্গে

আমার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয়লব্ধ পঁচিশ হাজার টাকাপূর্ণ ব্যাগটীও আর খুঁজিয়া পাইলাম না। বোধ হয়, পোড়াদহ ষ্টেশনে ট্রেণ প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণ সঙ্গীত দ্বারা আমাকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়া আমার ব্যাগটী লইয়া ট্রেণের গতি অপেক্ষাকৃত মৃদু হইয়া আসিলে 'চম্পট' দিয়াছিল। তারপর আমার ভাগ্যে যে কি ঘটিয়াছিল, তাহা আর বলিয়া কায কি?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সতীর তেজ।

বিজন গহন-মাঝে
ভ্রমিছে বিদর্ভ-বালা,
হারায়ে পতির সঙ্গ
বিষাদিনী শোকাকুলা;
এলায়িত কেশ-পাশ
যেন ঘন-কাদম্বিনী,
নিদাঘ কুসুম সম
বিশুষ্ক বদনখানি।
নয়নে কালিমা-রেখা
অনাহারে অনিদ্রায়;
ফিরিছে নিষধ-রাণী
শোকে উন্মাদিনী-প্রায়,
সহসা সম্মুখে হেরি
মহাকায় বিষধর,
বিস্তারি বিশাল ফণা
গ্রাসিবারে অগ্রসর।

থমকি দাঁড়াল, বালা
হেরিল মুহূর্ত্ত পরে,
বিচ্ছিন্ন উরগ-শির
লুঠিছে ধরণী 'পরে,
নির্ভয়ে চলিতে সতী
পথ আগুলিয়া হায়,
দাঁড়াল নিষাদ এক
জিজ্ঞাসিল পরিচয়।
কাঁপে হৃদি দুরু দুরু
ভাসি নয়নের নীরে,
বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দেবী
উত্তরিলা ধীরে ধীরে;
"বিদর্ভ-নৃপতি-সুতা,
নিষধের রাজরাণী,
'দময়ন্তী' মোর নাম
এ কাননে একাকিনী;

ভ্রমিতেছি গ্রহ-দোষে,
দ্যূতে হারি রাজ্যধন,
নিষধের অধীশ্বর
এসেছিলা ঘোর বন
আমারে সঙ্গিনী করি,
কিন্তু হায় ! ভাগ্যদোষে
কাল-নিদ্রা এসেছিল
অভাগীর আঁখি-পাশে ;
সেই অপরাধে প্রভু
গিয়াছেন ছাড়ি মোরে,
আকুল হৃদয়ে তাই
ফিরি বন বনান্তরে
তাঁর অন্বেষণ করি
জান কি বারতা তাঁর ?
জান যদি কহ বৎস !
রাখ প্রাণ অবলার"
ভ্রুকুটী-কুটিল হাসি
ব্যাধ ধায় দ্রুতগতি,
স্পর্শিতে পবিত্র অঙ্গ
শিহরিল ভয়ে সতী !
কিন্তু সে ক্ষণিক ভীতি
করি গর্ব্বে তিরোহিত,
পবিত্র সতীত্ব-বহ্নি
হল যেন প্রজ্বলিত
বৈদর্ভীর অক্ষকুটে—
মলিনা মূরতি মরি !
নিমিষে হইল যেন
তেজোময়ী ভয়ঙ্করী
কহিলা গর্ব্বিত স্বরে
"ওরে দুষ্ট পাপমতি !
নলের বনিতা আমি
কি আছেরে তোর শক্তি ?
স্পর্শিতে কেশাগ্র মম,
কায়মনোবাক্যে যদি
নলের চরণ-পদ্ম
সেবে থাকি নিরবধি,
যদ্যপি গগন-পটে
দিবাকর শশধর
এখন উদিত হন
তবে আজি রে পামর !
ভস্মীভূত হবে দেহ—
না ফুরাতে শেষ কথা
সহসা উঠিল কাঁপি
কাননের তরু, লতা !
গর্জ্জিল পর্জ্জন্য ক্রোধে,
ভীম বেগে প্রভঞ্জন
কাঁপাইল দশ দিক্,
বাহিরিল হুতাশন—
সতীর নয়ন হতে,
পলকে প্রলয় মত
মুহূর্ত্তে 'মৃগায়ু'-দেহ
ভস্মে হল পরিণত—
আবার ছুটিল ভৈমী
পতি-অন্বেষণ তরে
ভাসিল বসুধা রাণী
নয়নের নীর-ধারে ॥

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মজুমদার।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
সামাজিক উপন্যাস "কনে বউ"এর একখানি ছবি।
"পুকুর-ঘাটে মহিলা-মজলিস্ !"

অবসর।

১২শ ভাগ। } ফাল্গুন। { ৭ম সংখ্যা।

আত্মদৃষ্টি।

ভাই, অতি স্নেহের ভাই আমার, আর কতকাল এমনভাবে সুষুপ্তের ন্যায় অলস অঙ্গে পড়িয়া থাকিবে? জাগ্রত হও! স্বপ্ন-প্রহেলিকা বা মোহ-মদিরা-বশে অঘোর নিস্পন্দ ও আত্মবিস্মৃত হইও না! দেখিতেছ না, জীবন-গগনের পূর্ব্বপ্রান্ত কেমন নব-অরুণ-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে? অমানিশার সে গাঢ় অন্ধকার কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছে, বহু অনুসন্ধানে তাহার চিহ্ন-মাত্রও পরিলক্ষিত হইতেছে না! দেখ ভাই দেখ, আবার বলি একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, সারা বিশ্ব আনন্দ-কোলাহলে কেমন মুখরিত হইয়াছে কেবল তুমিই আমার বড় আদরের ভাইটী, এখনও যেন অবসাদ-ক্ষীণ, শক্তি-হীন ও কর্ম্মবিহীন ভাবে সংসারের একপ্রান্তে নিভৃতে পড়িয়া আছ! ও কাল-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া একবার উত্থিত হও, উপবেশন কর, তোমার জীবন্তের ভাব একটীবার অন্তরে উপলব্ধি কর!

কি বলিলে,—উঠিতেছ; বেশ ভাই, আর বৃথা কাল-বিলম্ব করিও না! সময় তোমার জন্য তিলমাত্রও অপেক্ষা করিতেছে না, সে পলকে পলকে তোমারই জীবন হরণ করিয়া পলাইতেছে, তুমি-ত তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছ না! কেমন করিয়াই বা জানিবে বল! তুমি যে এখনও আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছ! যখন জাগিয়াছ, তখন তুমি কে, তাহা একবার জানিবার জন্য চেষ্টা কর, তোমার চির-আচরিত পরমুখাপেক্ষিতা পরিত্যাগ কর, তোমার ভিক্ষাবৃত্তি ভুলিয়া যাও। অন্যের ব্যর্থ ভ্রূকুটী দেখিয়া ভীত হইও না, আপনার কর্ত্তব্য হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া মহাজন-নির্ণীত পথে আপন মনে

চলিয়া যাও,—সুপথ পাইবে, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া সময়ে নিশ্চয়ই নির্ব্বিঘ্নে সফল-মনোরথ হইবে।

আত্মীয়, স্বজন, সমাজ কাহারও প্রতি তোমার আর এখন দেখিবার প্রয়োজন নাই, সকলেই অন্যমনস্ক ও অব্যবস্থিত কর্ম্মানুরত পাগলের ন্যায় আপন ভাবে বিভোর হইয়া আছে, তোমার কার্য্যে তাহাদের কিছুমাত্রই লক্ষ্য নাই, তোমার প্রতি তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছে; এরূপ অবস্থায় তাহাদের ডাকিয়া তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি তাহাদের উন্মাদ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়োজন কি? তুমি যাহা করিতেছ, আপন মনে তাহাই করিয়া যাও, কেহ কোন কথা বলিবে না, নির্ব্বিঘ্নে কাজ করিতে পারিবে। বাঁশের সাঁকোয় পার হইতেছ ঘাটের ধারে কোথায় এক পাগল আপন মনে কি করিতেছে, অতিরিক্ত সাবধানের আশায় তাহাকে ডাকিয়া যদি বল,—"পাগল, দেখিস্ আমি পার হইতেছি, যেন সাঁকো নাড়িস্ না", তাহা হইলেই বিপদ! সে ত আপন মনে আপনার কার্য্যেই অনুরত ছিল, সেত তোমার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই, কিন্তু এখন তোমারই আহ্বানে সে তোমাকে দেখিতেছে, তোমার সাঁকোর ভাবনাই ভাবিতেছে, তুমি সাঁকোয় উঠিয়াছ, সে তাহা লক্ষ্য করিতেছে, তাহার পূর্ব্ব-ভাবনা সে ভুলিয়া গিয়াছে, এখন সে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া তোমার সাঁকোর বাঁশ ধরিয়া নাড়া দিবে, তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিবে, কি করিবে বল, তাহার ত আর উপায় নাই!

পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, তুমি যেই হও না, তুমি যে কার্য্যই কর না, সৎ অসৎ সকল কর্ম্মেই সমাজের কেহ না কেহ এইরূপ পাগলের মত তোমায় বাধা দিবে। তুমি সমগ্র সমাজের পরামর্শ লইয়া কোন কর্ম্মই করিতে পারিবে না, সর্ব্ববাদী সম্মত রূপে কেহ কোন কোন কর্ম্ম করিতে পারিয়াছে বা পারিতেছে বলিয়াও ত মনে হয় না। তাহার কারণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বধর্ম্ম-পরায়ণ প্রকৃত সমাজের অস্তিত্বও যে নাই। যাহাকে তুমি সমাজ বলিতেছ, মনে মনে ভয়ও করিতেছ,সে কি ঠিক তোমার সমাজ,না সেই সমাজের একটী প্রেতমূর্ত্তি বা বিকারগ্রস্ত কতিপয় উন্মাদ রোগীর সমষ্টি; যাহারা কেবলই স্ব স্ব মনোরথ-সিদ্ধির উপাদান বা যন্ত্র-স্বরূপ এই সমাজ নামের অভিনয় করিতেছে! উন্মাদ রোগীর প্রলাপের কোন মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাকে অনেক সময় ভয় না করিয়াও থাকা যায় না। সে কখন কখন এমন প্রবল রোগাভি-

ভূত হইয়া ভীষণ হইয়াও উঠে যে, তখন বিনা কথায় অন্যকে সহসা আক্রমণ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়, সে পক্ষে তোমার একটু সাবধান হইয়া কর্ম্ম করা সঙ্গত নহে কি ?

তুমি জাগ্রত হইয়াছ, এখন নানা সৎকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে, তোমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্বদেশবাসী, আপনার বলিতে তোমার যত দূর মনে হয়, সকলকে লইয়া সংসারে উন্নতি লাভ করিবে, ইহা ত তোমার নিত্যধর্ম্ম, সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ বা তোমার জীবন-ব্রতের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ও উদারতার বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আত্মোন্নতি, কল্পে তাহা যে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে বলিয়া বোধ হয় না ভাই! তুমি দল বাঁধিয়া সকলকে লইয়া মুক্ত হইবার আশা করিয়াছ, তাহা এখন ভুলিয়া যাও। সকলকে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে নিজের উপদেশের কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখ, নিজেকেও একটু উপদেশ দাও। অন্যের রোগানুসন্ধানের পূর্ব্বে তুমি স্বয়ং নীরোগ এবং প্রকৃতিস্থ আছ কি না, ভাবিয়া দেখ; তোমার দিনান্তে এক মুষ্টিরও ঠিকানা নাই, তুমি কিনা সদাব্রত খুলিতে বসিয়াছ; ইহাকে তোমারও উন্মত্তের প্রলাপ ব্যতীত আর কি বলিব? তাই বলিতেছিলাম, ওসব এখন পরিত্যাগ কর। ইহ-সংসারে এখন তুমি আর আমি, এই দুটী ব্যতীত আর যেন কেহই নাই;—এস ভাই, তোমার কর্ম্ম আমি দেখি, আর আমার কর্ম্ম তুমি দেখ; বাহিরে তুমি, আর অন্তরে আমি; দুটীতে কেবল মুখোমুখী করিয়া বসিয়া থাকি, আর নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় শুদ্ধ আপনার উন্নতি-কার্য্যে আত্মদেহে নূতন বল বা শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দুই জনে প্রাণপণে যত্নবান হই!

ভাই, ঋষি-বাক্য কি স্মরণ নাই? আত্মজ্ঞান লাভের জন্য এই নশ্বর ধন জন, জীবন যৌবন, সকলই যে অলীক-স্বপ্নসদৃশ, তাহাই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে যত্ন কর; আর তোমার ঐ সমাজ, সে ত তাহারই প্রভাব-সমষ্টি, সে কথাও সঙ্গে সঙ্গে অনুভব কর! সুতরাং সংসারের সার নিত্যবস্তু সচ্চিদানন্দ-ময় পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই ত নাই, তাহাতেই চিত্ত নিয়োগ করিতে হইবে। ভাইরে, তোমায় পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, যদি আনন্দ চাও, তবে আর আত্ম-প্রবঞ্চনা করিও না; যাহা জ্ঞান-গুরুর কৃপায় সৎ বলিয়া অন্তরে অনুভব করিতেছ, তাহা উদ্‌ভ্রান্ত ও নশ্বর সমাজের ভয়ে পরিত্যাগ বা পদ-দলিত করিও না।

যিনি যতই জ্ঞানী গুণী বা সম্মানী হউন না, এ উচ্ছৃঙ্খল সমাজের নিকট

কাহারই নিষ্কৃতি নাই; তা তিনি বিদ্যারত্ন, বিদ্যাসাগর, ন্যায়-বেদান্তাদির রত্ন অথবা ডাক্তার, সরস্বতী, শাস্ত্রী, স্বামী, পরিব্রাজক বা পরমহংস যে কেহই হউন না, সমগ্র সমাজ তাঁহাকে একবাক্যে বা সর্ব্ববাদী-সম্মত ভাবে আদর করিবে না, সকলেই তাঁহার আদেশ উপদেশ অবনত মস্তকে পালন করিবে না। কেহ কেহ বা তাঁহার একান্ত অনুগত ব্যক্তিবর্গই তাঁহাকে সম্মান করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অপরিচিত অনেকেই তাঁহাকে সাক্ষাতে বা পশ্চাতে গালি দিবে; দোষ গুণের কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই তাহারা গালি দিবে, তাহাদের কোন স্বার্থ না থাকিলেও, তাহারা গালি দিবে, ইহাই বর্ত্তমান সমাজের যেন অপরিত্যজ্য রীতি! বাস্তবিক যে গালি দেয়—সে আত্মবিচার করে না, সে আত্মশক্তির পরিমাণে বা পরিচয়ও লয় না, যাহাকে গালি দেয় তাহারও শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় রাখে না, সে দশের মাঝে পাগলের মত আপনাকেই বড় দেখে, আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে বা তাহার ভাণ করে, আর ঠিক 'দুই কাণকাটা' জীবের ন্যায় বিকট হাস্যে অতি নির্লজ্জভাবে নৃত্য করে, তাহাতে সে প্রকৃত মজা দেখে কি সংসারের আর পাঁচ জনকে মজা দেখায়, সেই জানে। আমরা একালে এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, যেখানে 'বড়'র সম্মান করিতে ভুলিয়াছি, গুণীর আদর করিতে ও ধনীর মর্য্যাদা রাখিতে নিতান্তই কাতর হই বা তাহা যেন জানিই না। আমরা যাহা আজ করিতেছি, আমাদের পরবর্ত্তী যাহারা, তাহারা যে কাল সুদ-সমেত আমাদেরই প্রতি সমস্ত আদায় দিবে, তাহা এক মুহূর্ত্তের তরেও আমরা ভাবিয়া দেখি না!

বুনিয়াদি ঘরের নিঃস্ব সন্তান যেমন আপনাকে কখনই হীনদশাগ্রস্ত বলিয়া পরিচিত করিতে চায় না, তাহার পরিবর্ত্তে সে যেন তাহার স্বনাম-ধন্য পূর্ব্বপুরুষগণের অপেক্ষাও গুণে, জ্ঞানে ধনে মানে বিদ্যা ও বুদ্ধি আদি সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতম, এইরূপ ভাবেরই ভাণ করিয়া থাকে। সে মর্ম্মে মর্ম্মে তাহার হীনতা ও দীনতার বিষয় অনুভব করিলেও অন্যের নিকট যেন তাহার ছিন্ন ভিন্ন বিবর্ণ অসংখ্য, গ্রন্থি ও তালিযুক্ত পৈত্রিক জীর্ণ শালখানির আবরণে আপনাকে অতিসাবধানে গোপন করিয়া, তাহার লুপ্ত আভিজাত্য ও কুল-গৌরবের প্রভা প্রকাশ করিতে যত্নবান হয়। পাছে কেহ তাহার প্রকৃত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলে, সেই ভয়ে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই পরকুৎসা ও অন্যের হীনতা প্রচার করিয়া অলক্ষ্যে আপনার গৌরব-

বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যের মুখবন্ধ করিবার প্রয়াস পায়, জ্ঞান ও গুণের তুলনায় কাহাকেও বড় হইতে দেখিলে অমনি বিব্রত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে, তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য, তাহাকে লোকসমাজে হেয় ও অপদস্থ করিবার জন্য কতই না ঘৃণ্য ও জঘন্যবিধ কৌশলের কল্পনা বিস্তার করিতে থাকে। পবিত্র দুগ্ধও বিকৃত হইলে নিষ্ঠার ন্যায় দুর্গন্ধ হইয়া যায়, তাহাতে তখন কৃমি কীট উৎপন্ন হইয়া কত নারকীয় দৃশ্যের অভিনয় করিতে থাকে; কিন্তু সেই কীট পবিত্র দুগ্ধের বিকৃতিজাত হইলেও সুগন্ধ পুষ্পস্তবকে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, সে সেই পুরীষ-সদৃশ বস্তুতেই আত্মসমর্পণ করিতে অভিলাষ করে, সে ভিন্ন-পথাবলম্বী বা পূর্ব্ব পথাভিমুখী কাহাকেও দেখিলে, তাহাকে পুনরায় নিজদলভুক্ত করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে চায়, সে ক্রমে সেই হীনতম সমাজের মধ্যেই অধিপতিরূপে কর্ত্তৃত্ব করিয়া পৈত্রিক মর্য্যাদা-গৌরব বজায় রাখিতে চায়। বল দেখি ভাই, এমন অবস্থায় যথার্থ আত্মোন্নতির চেষ্টা কিরূপে ফলপ্রদ হইবে? কেবল তুমি আমি ব্যতীত আর সকলেরই যে এই দোষ আছে, তাহা নহে, কাহাকেও এই ভাব হইতে একেবারে বিমুক্ত দেখিতে পাইবে না; তবে কেহ নির্ব্বোধ, সে আবরণ আদৌ রাখিতে পারে না, খোলাখুলি সব বলিয়া ফেলে; আর কেহ বা চতুর, সে অতি সাবধানে আবরণ উন্মুক্ত করিতে দেয় না, আপনার মনের ভাব কাহাকে জানিতে দেয় না, অন্তরে অন্তরে সে অন্যের সর্ব্বনাশ করিতে সতত যত্ন করে। তাই বলিতেছিলাম, আত্মোন্নতি করিতে হইলে, এখন কোন পথ ধরিতে হইবে, একান্তে বসিয়া তাহাই নির্দ্ধারণ কর। জ্ঞানগুরুর কৃপায় পরচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া আত্মানুসন্ধানেই রত হও, আপনার ভাবনাই ভাবিতে থাক, ক্রমে সচ্চিদানন্দে চিত্ত নিয়োগকর—অচিরে পরমানন্দ লাভ করিবে।

তুমি নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় কেবল আত্মোন্নতির জন্য প্রয়াস করিলে বা সেই সাধনায় কিঞ্চিন্মাত্রও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে দেখিবে, আর তোমার আপনার জন্যও চিন্তা করিতে হইবে না, তোমার 'তুমি' বা 'আমি' তখন সম্পূর্ণ আত্মীয়রূপে তোমারই অনুগত হইয়া তোমার কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিবে, তোমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব বা তাহার সমষ্টিস্বরূপ তোমার সমাজ কাহারও জন্য আর তোমায় স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিতে হইবে না, তাহাদের উন্নতির জন্য তোমার তিলমাত্রও স্বতন্ত্র প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না। তখন দেখিবে, তোমার সমাজের মূল-পরমাণু-সদৃশ তোমার আত্মশক্তি ও

আত্মীয়-স্বজন যেন ব্যষ্টিভাবে তোমারই কর্ম্মানুকরণে নিরত রহিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, অত শত এখন পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপনার ভাবনাই ভাবিতে থাক, আপনিই সুস্থ ও সবল হইতে যত্ন কর, আত্মশক্তি বৃদ্ধি করিতেই সমগ্র প্রয়াস নিয়োজিত কর; প্রয়োজন হইলে বিষদুষ্ট প্রত্যঙ্গের ন্যায় আত্মীয় সমাজকে আত্ম-অঙ্গ হইতে ছেদন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইও না, তাহাদের এখন ভুলিয়া যাও।

"স্বার্থপরতা" শব্দ উদারভাবের ভাবুকের পক্ষে অত্যন্ত শ্রুতি-কঠোর হইতে পারে; পার্থিব ভোগ-সুখের দিক দিয়া দেখিলে, বাস্তবিকই তাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও উপেক্ষার বস্তু; কিন্তু পরমার্থ-সুখপ্রদ আত্মোন্নতি ব্যাপারে তাহা বড়ই শ্রুতিমধুর; সে পক্ষে তাহা ত ঠিক 'স্বার্থপরতা' নহে, তাহাই যে প্রকৃত "পরার্থ-পরতা"! বল দেখি ভাই, যে নিজেকেই নিজে চিনিতে পারে না, সে অন্যকে চিনিবে কেমন করিয়া? সে যে আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বেই আপনাকে কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। তোমার সেই হৃতসর্ব্বস্ব আত্মারই অনুসন্ধানের জন্য তোমায় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি। ভাই আমার, আবার বলি, দশের ও দেশের মঙ্গল কামনার পূর্ব্বে একবার আপনার মঙ্গল কামনা কর, একটিবার আপনার দিকে ফিরিয়া চাও!

শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা।

অন্তিম বাসনা।

কোকিলের কুহুগানে
তটিনীর কুলুতানে
যেথা মুখরিত;
মলয় সমীর মরি'
ফুলের সৌরভ হরি'
বহে অবিরত।
যেথা তরু কুসুমিত
বিতরে সুবাস স্বতঃ
স্নিগ্ধ উষাকালে;
যেথায় সৌরভে মাতি
গাহি পাখী দিবারাতি
কর্ণে সুধা ঢালে।

রবির উদয় দেখি
যেথায় নলিনা আঁখি
মেলে সলাজেতে;
যেথায় পেখম ধরি
নাচে শিখী শাখোপরি,
হরষেতে মেতে;
সেই স্বপনের দেশে
মোর জীবনের শেষে
রচিত সমাধি মোর;
অভিলাষ এ জীবনে
আমি সেথা নিরজনে
ঘুমাব হইয়া ভোর।

শ্রীভূপতিভোষ রায়।

প্রাচীন ভারতে রাজ্যশাসন-প্রণালী।

প্রাচীন ভারত চিরদিনই রাজশক্তি দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু রাজা কখনও যথেচ্ছাচারী বা প্রজাপীড়ক ছিলেন না এবং ইচ্ছা থাকিলে হইতেও পারিতেন না। রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য রাজার প্রধানতঃ দুইটী সভা থাকিত। একটী সভার নাম মন্ত্রীসভা এবং অপরটীর নাম অমাত্য-সভা। আধুনিক অভিধানে মন্ত্রী ও অমাত্য প্রায়ই একার্থবোধক হইলেও, উভয় সভার কার্য্যের মধ্যে বিভিন্নতা ছিল, তাহা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিলেই জানা যায়। মন্ত্রিগণ রাজাকে রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন সম্বন্ধে সুমন্ত্রণা প্রদান করিতেন। অমাত্যেরাও যে মন্ত্রণা দিতেন না, তাহা নহে। পরন্তু তাঁহারা রাজ-মন্ত্রণাকে কার্য্যে ও পরিণত করিতেন।

আজি কালিকার ভাষায় বলিতে গেলে, মন্ত্রীসভা, বিচারক ও ক্যাবিনেট (Cabinet) তুল্য এবং অমাত্যসভা কার্য্যকারী সভার (Execuli e Counsil) তুল্য ছিল। এতদ্ব্যতীত রাজাকে ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইবার জন্য একটি ঋত্বিক্‌সভাও থাকিত। রাজকার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত এই তিনটী সভা ব্যতীত অধীন রাজন্য (Nobles) এবং প্রজাবর্গের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণেরও একটী সভা ছিল। রাজ্য সম্বন্ধে কোনও পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিতে হইলে, অথবা রাজ্যে ঘটিত কোনও গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হইলে, রাজন্য ও প্রজাবর্গের এই সভাও রাজকর্ত্তৃক আহূত হইত এবং রাজা তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করিতেন। এই সভাগুলি রাজ্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকায়, রাজা কখনও যথেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন না। অধিকন্তু প্রজারঞ্জনের ইচ্ছা থাকিলে রাজাকে, প্রজাবর্গের মতামত মান্য করিয়াই চলিতে হইত। বেণ নামক নৃপতি প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজা দশরথ কৈকেয়ীর সত্য পালনার্থ রামচন্দ্রকে দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্ব্বাসিত করিলে, প্রজাবর্গ বাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষোভিত হইয়া উঠিয়া ছিল; এবং অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুদূর গমন করিয়াছিল। পরিশেষে রামচন্দ্র কৌশলক্রমে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, উপায়ান্তর না দেখিয়া, তাহারা ক্ষুণ্ণমনে অযোধ্যায়

প্রত্যাগত হইয়াছিল। প্রজাবর্গের স্বাধীনমত না থাকিলে, তাহারা যে কখনই এরূপ আচরণ করিতে সাহসী হইত না, তাহা বলাই বাহুল্য। ভগবান রামচন্দ্র বনবাস কাল অতিক্রান্ত করিয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলে প্রজাবর্গের মতামত উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই নিরপরাধা জানকীকে বনে নির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীনকালে প্রজাবর্গ মূক পশুপালের ন্যায় বাস করিত না। প্রজাবর্গই যে, রাজ্যের মূলভিত্তি এবং তাহাদের কল্যাণেই যে রাজ্যের কল্যাণ, এই তত্ত্বটী প্রাচীনকালে হিন্দুরাজগণ যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, এরূপ আর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। আধুনিক কালের নির্ব্বাচন, সেকালে প্রচলিত না থাকিলেও মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ এবং রাজন্য ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ প্রজা-সাধারণের তথা রাজার এবং রাজ্যেরও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতেন। মহারাজ দশরথের মন্ত্রীও অমাত্যনিচয় কি প্রকার ব্যক্তি ছিলেন, তাহা মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই, পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন।

"ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি মহাত্মা দশরথের মন্ত্রজ্ঞ ও হিতকারী আটজন অমাত্য ছিলেন; ইহারা সকলেই শুচি এবং রাজকার্য্যে নিয়োজিত। বৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয় সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও অর্থবিৎ সুমন্ত্র এই আটটি অমাত্য। ঋষি-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বামদেব রাজার ও প্রজার ঋত্বিকরূপে বৃত ছিলেন; এইরূপ অন্যান্য ঋষিগণও মন্ত্রিত্ব করিতেন। এতদ্ভিন্ন সুযজ্ঞ, জাবালি, কশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘজীবী, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষিও মন্ত্রিপদ অধিকার করিয়াছিলেন। নৃপতির পুরুষানুক্রমিক মন্ত্রিগণ ঐ সকল মহর্ষির সহিত সম্মিলিত হইয়া, রাজকার্য্যের সহায়তা করিতেন। ইহারা সকলেই বিদ্বান্, বিনীত, লজ্জাশীল ও জিতেন্দ্রিয়। ইহাঁরা দেখিতে সুশ্রী, শাস্ত্রনিপুণ, বিপুলবিক্রম ও কীর্ত্তিমান। ইহাদের তেজঃ ক্ষমা ও যশঃ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সকলেই বলিবাঁর পূর্ব্বে হাস্য করিতেন, ক্রোধ বা দুরভি-সন্ধির বাধ্য হইয়া ইহাঁরা মিথ্যা কথা কহিতেন না। তাঁহাদের রাজ্যবিষয়ে কিছুমাত্র অজ্ঞাত ছিল না, স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে, যে কার্য্য করিতেছে বা করিবে, তাঁহারা চরমুখে সে সকল জানিতে পারিতেন এবং ইহাঁরা ব্যবহার-কার্য্যে নিপুণ ছিলেন।

"নৃপতি প্রথমে ইহাঁদের সৌহৃদ্যের পরীক্ষা করিয়াছেন। পুত্রগণ দোষী

হইলেও, ইঁহারা দণ্ডবিধানের ত্রুটী করেন না। রাজ্যের কোষবৃদ্ধি ও সৈন্য-সংগ্রহে ইঁহারা বিলক্ষণ যত্নবান্ ছিলেন। শত্রুর প্রতিহিংসা করা ইঁহাদের স্বভাব নহে, ইঁহারা সকলেই সমুৎসাহী, বীর, বিপক্ষদলনক্ষম ও কীর্ত্তিপরায়ণ ছিলেন। এই মন্ত্রিগণ দোষীর শক্তি বিবেচনা করিয়া তাহাকে দণ্ড প্রদান করিয়া, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের প্রতিহিংসার পরিচয় না দিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিতেন। নির্ম্মলবুদ্ধি, একমতাবলম্বী মন্ত্রীদিগের বিচারকালে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রে কোন মিথ্যাবাদী অসৎ স্বভাব ও পরনারী-পরায়ণ ছিল না। অধিক কি, রাজ্যমধ্যে কেহ দুর্ব্বৃত্ত বা অসৎ প্রকৃতির লোক ছিল না; সুতরাং শান্তি বিরাজিত ছিল। রাজমন্ত্রিগণ সর্ব্বদা পবিত্র পরিচ্ছদে সুশোভিত থাকিতেন এবং নৃপতির হিতসাধনার্থ সর্ব্বদা চক্ষু বিস্তার করিয়া থাকিতেন। তাঁহারা গুরুজনের গুণভাগ গ্রহণ করিতেন, আপনাদের বিক্রম প্রভাবে বিখ্যাত ছিলেন। ভিন্ন দেশের ঘটনাবলী ইঁহাদের নিকট প্রকাশিত থাকিত। অধিকন্তু ইহারা বুদ্ধিমান বলিয়া সর্ব্বত্র প্রথিত ছিলেন। ইহারা নানাগুণে সুপণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু সত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণে হীন ছিলেন না। ইহারা সন্ধিবিগ্রহ-নিপুণ এবং সৌহৃদ্যের আস্পদ ছিলেন। ইহাদের গূঢ় মন্ত্রণা-শক্তি যেরূপ প্রবল ছিল, তদনুরূপ সূক্ষ্মবুদ্ধিও ছিল। ইহারা নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সতত প্রিয়বাদী ছিলেন। এইরূপে রাজা দশরথ ঈদৃশ গুণবান অমাত্য-সংবেষ্টিত হইয়া বসুন্ধরা শাসন করিতেছিলেন।" বালকাণ্ড, ৭ম সর্গ।

উদ্ধৃত বৃত্তান্তে পাঠকবর্গ, অমাত্য ও মন্ত্রিবর্গের যে যে গুণের পরিচয় পাইলেন, তাহাতে তাঁহারা যে, কখনও প্রজাপীড়ক ছিলেন তাহা নিশ্চয় স্বীকার করিবেন না। যে রাজ্যে এরূপ অমাত্য ও মন্ত্রী থাকেন, সে রাজ্যে প্রজাবর্গের স্বার্থ যে সুরক্ষিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি প্রজাবর্গেরও সভা ছিল। সেই সভাও রাজাকে বিশেষ বিশেষ সময়ে রাজ-কার্য্যে সহায়তা করিত। এই প্রজাসভার যৎসামান্য বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা অদ্যকার প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মহারাজ দশরথ বার্দ্ধক্য-প্রযুক্ত বানপ্রস্থ অবলম্বনে ইচ্ছুক হইয়া রাম-চন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন। তদনুসারে তিনি মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"আমার শরীরে জরার আধিপত্য হইয়াছে, অন্তরীক্ষে গ্রহনক্ষত্রাদির মূর্ত্তি সকল প্রকাশিত এবং ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব নির্ণিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে। এই কারণে পূর্ণচন্দ্রানন রামচন্দ্রকে

যৌবরাজ্য প্রদান করা আমার অভিপ্রেত। বোধ হয় ইহা রামের ও প্রজা-গণের অনভিপ্রেত হইবে না।"—২।১ বালকাণ্ড।

রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত এই অংশটী পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ প্রাচীন ভারতের প্রজাবর্গের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। দশরথ রামকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতে কৃতসংকল্প করিয়া তাঁহার অধীনস্থ "নানা দেশীয় ও নাগরীয় প্রধান লোকদিগকে আনাইলেন এবং তাঁহাদিগকে সভ্রমানুসারে বাসভবন ও নানা অলঙ্কার প্রভৃতি প্রদান করিলেন।" ২।১ বালকাণ্ড।

অনন্তর সকলে সভাগৃহে যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলে, "রাজা দশরথ দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর অথচ রাজযোগ্য মধুরস্বরে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পারিষদ্‌বর্গকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন,—"আপনারা অবগত আছেন যে, মদীয় পূর্ব্বপুরুষগণ পুত্রবৎ এই বিশাল সাম্রাজ্য পালন করিয়াছেন। * * * আমিও পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আত্মসুখভোগ-বিরত হইয়া যথাশক্তি এই রাজ্য পালন করিয়াছি। নিখিল লোকের মঙ্গল কামনায় শ্বেতাতপত্রের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। * * * আমি জীর্ণ দেহে শান্তি-সুখ-ভোগ করি, এই আমার অভিপ্রায়। এক্ষণে দ্বিজাতিদিগের অনুমতি গ্রহণান্তে পুত্রের প্রতি প্রজাপালন-ভার সমর্পণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে বাসনা করি। পরবলঘাতী মদাত্মজ রামচন্দ্র বীর্য্যে পুরন্দর তুল্য এবং সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। আমি এই ধার্ম্মিক-চূড়ামণি রঘুমণিকে প্রাতঃকালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। * * * যদি আমার এই প্রস্তাব আপনাদের অনুকূল হয়, তবে এ পক্ষে অভিমতি প্রদর্শন করুন। আর যদি আপনাদের নিকটে আমার এই প্রস্তাব প্রীতিকর বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে এতদপেক্ষা যাহা হিতকর, তদ্বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করুন।" ২।২ বালকাণ্ড।

বলা বাহুল্য যে, মহারাজের প্রস্তাব শ্রবণমাত্র সভাস্থ সকলে তুমুল হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অনন্তর দ্বিজাতিগণ ও সেনাপতি সকল পৌর ও জানপদের সহিত ধর্ম্মজ্ঞ নৃপতির অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন এবং রাজাকে কহিলেন,—"মহারাজ, আপনার প্রাচীন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, অতএব আপনি এক্ষণে রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আমরা মহাবীর রামচন্দ্রকে প্রকাণ্ড হস্তীতে আরূঢ় ও তদীয় আসন-ছত্রাবৃত দেখিতে অভি-লাষী হইয়াছি।" তখন নৃপতি তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া যেন, কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপভাবে প্রশ্ন করিলেন—আপনারা আমার

প্রস্তাবে রামকে যে, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে আমার মনে একটী সন্দেহ জন্মিয়াছে, অতএব আপনাদের অভিপ্রায় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করুন! আমি জীবদ্দশায় যখন ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিতেছি, তখন কি কারণে রামকে রাজা করিতে আপনাদের প্রবৃত্তি হয়? তখন নৃপতিগণ, পৌরগণ, জানপদগণের সহিত বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ আপনার পুত্র রামচন্দ্রের নানা প্রকার সদ্‌গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আপনার নিকট সেই অমিতগুণশালী রামচন্দ্রের গুণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।" ২।১ বালকাণ্ড।

এই বলিয়া তাঁহারা রামের গুণাবলী কীর্ত্তন করিলেন এবং পরিশেষে কহিলেন,—"ইন্দীবর শ্যাম রামের রাজ্য প্রাপ্তি আমাদের সকলেরই প্রার্থনীয়। হে বরদ! আপনার নিকটে প্রার্থনা আপনার আত্মজ রামচন্দ্রকে প্রসন্নচিত্তে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।" অনন্তর মহারাজ দশরথ, পৌরবৃন্দ, জানপদসমূহ ও নৃপতিগণের বদ্ধাঞ্জলি ও শিষ্টাচার দর্শন করিয়া, তাহাদিগকে হিতকর প্রিয়বাক্যে কহিলেন,—"আমি আপনাদের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। আপনারা যে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আমার যে কি প্রকার আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।" (২।৩) তৎপরে তিনি মন্ত্রিবর্গকে রাজ্যাভিষেকের সামগ্রীচয় সংগৃহীত করিবার আদেশ প্রদান করিয়া রামচন্দ্রকে সভামধ্যে আনয়ন করিতে সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন। দশরথ রামকে মণিকাঞ্চনভূষিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট করাইয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার কথা কহিলেন এবং রাজ্যপালন সম্বন্ধীয় উপদেশ প্রদান করিতে করিতে কহিলেন,—"বৎস! যিনি অভিমত প্রকৃতিবর্গকে অনুরাগী রাখিয়া রাজ্যপালন করিতে পারেন, অমৃতলাভে দেবগণ যেরূপ প্রীত হন, তাহার ন্যায় মিত্রগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব হে পুত্র! তুমি এইরূপে আত্মসংযম করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধন করিতে থাক।" রাজাজ্ঞা শ্রবণপূর্ব্বক পুরবাসিগণ সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মহারাজকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া প্রাচীন ভারতে রাজ্যশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

বাসিব ভাল পরাণ খুলিয়া।

দূর আকাশের প্রান্তে,—
মিশে থাক শরতে বসন্তে,
পিক-কুহরিত-কুঞ্জে,
পশ তুমি মুকুলিত মুঞ্জে,
থাক না লো কমলে ভুলিয়া,—
সেখানে বাসিব ভাল পরাণ খুলিয়া।

নির্ঝর শিকর সনে
মধু ভরা কুসুমিত বনে,
তরু-মর্ম্মরিত ছায়,
তটিনীর উদ্বেলিত কায়,—
থাক তুমি সতত মিলিয়া ;—
সেখানে বাসিব ভাল পরাণ খুলিয়া।

শান্ত সুনীল গগনে
জ্বল চন্দ্র তারকার সনে,
থাক শ্যামল প্রান্তরে,
দীপ্তি-হীন স্তব্ধ অন্ধকারে,
তুঙ্গ শৃঙ্গে থাক লো ভুলিয়া,—
সেখানে বাসিব ভাল পরাণ খুলিয়া।

যোজন ব্রহ্মাণ্ড 'পরে—
থাক তুমি অনন্ত গহ্বরে,
ভাস সাগর-সঙ্গমে,
মিশে থাক স্থাবর জঙ্গম,
যেথা রবে মর্ম্ম নিপীড়িয়া—
সেখানে বাসিব ভাল পরাণ খুলিয়া।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

ভৌতিক কাণ্ড।

বিলাতে 'অকল্ট রিভিউ' নামক একখানি ভুতুড়ে কাগজ আছে; এই পত্রিকায় ভৌতিককাণ্ড সম্বন্ধে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প প্রকাশিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি মিঃ এইচ. মেইন ইয়ং নামক একজন সাহেব উক্ত পত্রে তাঁহার এক বন্ধুর ভূত-ভীতি সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিয়াছেন। গল্পটা কৌতূহলোদ্দীপক ও উল্লেখযোগ্য।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইয়ং সাহেবের উক্ত ভারতপ্রবাসী বন্ধু একবার মৃগয়া করিতে যান। অনেক ঘুরিয়া সাহেব অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং স্নানের জন্য একটী পুষ্করিণীতে নামিতে উদ্যত হন। সেই সময় এক ফকীর আসিয়া তাঁহাকে সেই জল স্পর্শ করিতে নিষেধ করেন; ফকীর বলেন, সেই পুষ্করিণীতে একজন নরহন্তা আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে;—যদি তিনি সেই জল স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিপদ ঘটিবে।

সাহেব ফকীরের কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি সেই জলে স্নান করিলেন। কিন্তু তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার ফল ফলিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে উক্ত শিকারী এক কার্পাসক্ষেত্রে শিকার করিতে যান। সেই সময় তিনি দেখিতে পান, একটা জ্বলন্ত মশাল দূর হইতে হেলিয়া দুলিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সাহেবের সঙ্গী বলিল, "ঐ ভূত আসিতেছে!" ভূতের ভয়ে তাহারা পলায়ন করিল। সাহেব ভূতের ভয় করিতেন না, তিনি ভূত-সন্দর্শন কামনায় সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ঘোড়া আর একপদমাত্রও অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না; চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহার রাইফেল উদ্যত করিয়া মশালের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই অবসরে তাঁহার অশ্ব পলায়ন করিল।

সাহেবকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে হইল না, মশাল শীঘ্রই তাঁহার সম্মুখে আসিল। সাহেব দেখিলেন, একটা লোক মশাল লইয়া আসিতেছে। সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—আর এক পা অগ্রসর হইলেই তোমাকে গুলি করিয়া মারিব। যেখানে আছ, সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাক।

সাহেবের কথা শুনিয়া মশালধারী ভূত কিছুমাত্র ভীত হইল না; সে

মশালহস্তে পূর্ব্ববৎ সাহেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে সাহেবের কয়েক গজ মাত্র দূরে আসিয়া দাঁড়াইলে সাহেব দেখিলেন, মশালধারীর দেহে রক্ত মাংসের সম্বন্ধ নাই। কঙ্কালসার দেহ, দাঁতগুলি খটমট করিতেছে, চক্ষুর গহ্বর শূন্য, মস্তকে দীর্ঘ কেশ, মাংসহীন দীর্ঘ হস্তে এক লম্বা মশাল! দেহের অন্যান্য অংশ যেন ধূসর বর্ণ কুয়াসায় আচ্ছন্ন!

ভূত ক্রমে সাহেবের দশ বারো হাত দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব বন্দুকের ঘোড়া টিপিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ভূতটা হঠাৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। সাহেব সেইস্থানে গিয়া দেখিলেন, ভূতের ভূগর্ভ প্রবেশের কোনও চিহ্নই নাই, কেবল মশালের আগুন দুই এক টুক্‌রা পড়িয়া আছে। সাহেব তাহাতে হাত দিয়া দেখিলেন, হাত পুড়িয়া যায়; তিনি তাড়াতাড়ি তাহা ফেলিয়া দিলেন।

সেই পল্লীর লোক সাহেবকে আর সেস্থানে শিকার করিতে নিষেধ করিল। একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও সেই ভূতটীকে দেখিয়াছিলেন। তাহার ফলে একটা বাঘ সেই সাহেবের তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বধ করে, সেই দেশের একজন লোক সেই ভূতাক্রান্ত পুষ্করিণীর জলপান করিয়াছিল, কে তাহাকে রাত্রে খুন করিয়া যায়।

উল্লিখিত শিকারী সাহেব গ্রামবাসীদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া শিকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—তাহার ফলে সাহেব এক ভল্লুকের হাতে পড়িয়া মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে গুরুতর আহত হইতে হইয়াছিল, অনেকদিন কষ্টভোগ করিয়া তিনি সারিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, যদি তিনি মশালধারী ভূতটাকে দেখিয়া ভয় পাইতেন কি তাহার চক্ষুর দিকে চাহিতে সাহসী না হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আরও বেশী বিপদে পড়িতে হইত, আর যদি তিনি সেই ভূতের অঙ্গস্পর্শ করিতেন—তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ যাইত। শ্রীঃ——

চাটনি।

প্র। জগতে বন্ধু কে?

উ। যে ধার দিয়ে চাইতে ভুলে যায়।

প্র। ভাল ডাক্তার কে?

উ। যে আঁধারে ঢিল মারে এবং শতকরা ৯৯টী কাবার করিতে পারে।

প্র। সখের প্রাণ কার?

উ। যে রাগ্‌লে কুরুক্ষেত্র করে এবং মনে একটু দুঃখ হইলে আফিং খেতে যায় বা গলায় দড়ি দেয়।

একজন নব্য বাবুর বৈঠকখানা হ'তে একটি মূল্যবান বাঁধান হুঁকা চুরী যায়। হুঁকাটী বাবুর বড়ই সখের; কাজেই চোর গ্রেপ্তারের জন্য কড়া তদন্ত আরম্ভ হ'ল; তদন্তের ফলে এক ব্যক্তি চোর সন্দেহে ধরা প'ড়ে আদালতে প্রেরিত হ'ল। যথাসময়ে মামলা উঠ্‌ল। নব্য বাবুটীর একজন মোসাহেব প্রধান সাক্ষিরূপে আদালতে হাজির হলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"এইটীই কি আপনার বাবুর হুঁকা?"

সাক্ষী উত্তর দিলেন, "হুঁকা সেই, একে খোল্‌টা আর নলচেটা ব'দলে এনেছে!"

পণ্ডিত শিবরাম শাস্ত্রী হরিহরপুরের টোলের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক। একদিন তাঁর কোন শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"গুরুদেব, 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ কি?"

গুরু। আ, কুষ্মাণ্ড! ধর্ম্ম শব্দের অর্থ জান না?

শিষ্য। আজ্ঞে, যদি জান্‌ব, তাহলে আপনার কাছে আস্‌ব কেন?

গুরু। 'ধৃ' ধাতুর অন্যতম প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ—ধরা? সুতরাং যে ধরে, সেই ধর্ম্ম।

শিষ্য। যে ধরে, সেই ধর্ম্ম?

গুরু। হাঁ রে গণ্ডমূর্খ।

বিজ্ঞ শিষ্য গুরুর মুখে ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য শুনে বড়ই তুষ্ট হলেন; তিনি ভাবলেন, যখন ধর্‌লেই ধর্ম্ম হওয়া যায়, তখন আর পড়া শুনার দরকার কি? ধর্ম্ম হবার চেষ্টা দেখাই ভাল।

এইরূপ স্থির করে শিষ্যবর একদিন একটা নদীর তীরে গুপ্তভাবে আশ্রয় নিলেন। সেই সময় একটা স্ত্রীলোক নদীতে জল নিতে আস্‌ছিল, শিষ্য তাকে দেখ্‌বামাত্র হঠাৎ স্ত্রীলোকটীর সম্মুখে আবির্ভাব হয়ে তাকে দৃঢ়রূপে ধর্‌লেন। স্ত্রীলোকটী এই ব্যাপারে আর্ত্তনাদ আরম্ভ কর্‌লে। কিন্তু সুবিজ্ঞ শিষ্য বল্‌লেন, "কেঁদোনা, তোমাকে ধরেই যে আমি ধর্ম্ম হলুম!"

রাধারাম মিত্রের নিবাস কলিকাতার কড়েয়া অঞ্চলে। রাধারাম ভয়ানক মাতাল। এক রাত্রে রাধারাম মাতাল অবস্থায় শয্যায় শয়ন করেছে, পার্শ্বে তার বালিকা স্ত্রী। মদের গন্ধে অস্থির হয়ে বালিকাটী স্বামীকে একটু স'রে শোবার জন্যে অনুরোধ কর্‌তে লাগ্‌ল; স্ত্রীর এই অন্যায় অনুরোধে রাধারামের রাগ চড়ে গেল; সে তৎক্ষণাৎ বিছনা ছেড়ে একেবারে শিয়ালদহের ষ্টেশনে হাজির? তখন রাত ১২টা, রাত্রের শেষ ট্রেণখানি ছাড়ে আর কি! রাধারাম তৎক্ষণাৎ ট্রেণে উঠে পড়্‌লে, এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেণ বারাকপুরে উপস্থিত! রাধারাম তখন ট্রেণ থেকে নেমে স্ত্রীর কাছে টেলিগ্রাফ ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আর সরব কি?"

উচ্ছ্বাস।

আজ এই শীতান্তের হিম-স্নিগ্ধ শ্যামল-প্রান্তরে,
দিগন্তের অন্তব্যাপী জাগিছে কি উন্মাদনা গান!
আজ এই সায়াহ্নের বক্ষমাঝে কি সুর সন্তরে
কি যে মধু গুঞ্জনের স্পন্দনেতে ভরা বিশ্বপ্রাণ।
রক্তরাগ রঞ্জনের সান্দ্রমধু আলোক-সম্পাতে,
নিপুণ অঞ্জন আঁকা নীলিমার নয়নের কোণে;
সন্ধ্যার কণকরেণু মাখা আজ কল্লোলিনী-মাথে,—
এ কি বীণা বেজে ওঠে বিহঙ্গের কণ্ঠের শিঞ্জনে!
ওই মৌনা ভাষা বুঝি সাড়া দেয় হৃদয়ের তটে,
সুপ্ত এস্রাজের তারে দিয়ে যায় অপূর্ব্ব ঝঙ্কার,—
আঁকে ছবি অন্তরের গুপ্ততম রক্ত-রাঙা পটে,
ব্যাকুল উচ্ছ্বাস তার গেয়ে উঠে দীপক মল্লার;—
সেই আকুলতা বুঝি ভরা আছে আঁখি জল ঘটে,
হরষে বিরসে সে যে ঢেলে দেয় আনন্দ-সম্ভার।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন নাগ চৌধুরী।

গারোজাতি।

দেশের বিবরণ।

ইহা (গারো) আসাম প্রদেশের মধ্যে একটি অতি বিখ্যাত পার্ব্বত্য দেশ। ইহা গারো পাহাড় নামক পাহারের উপত্যকায় স্থাপিত। গারো পাহাড় একটি ক্ষুদ্র পাহার নয়, বহু পাহাড়মালা একত্রে এই নামে খ্যাত। সুর্ম্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালা হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে গারো দেশ অবস্থিত। এই প্রদেশের অধিবাসী গারো জাতি নামে খ্যাত। ইহারা প্রায় ১৪০০০০ জন এই দেশে বাস করে।

জাতির বিবরণ।

ইহাদের গায়ের রং কটা ও কিঞ্চিৎ ক্লকাল রং মেশান। ইহারা নাতি-দীর্ঘ-খর্ব্বাকৃতি। এইরূপ আকৃতির জন্য ইহাদিগকে বিশেষ কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃত পক্ষে যেমন আকৃতি তদ্রূপ কার্য্যে ইহারা দক্ষ। ইহাদের নাকগুলি চ্যাপটা, ঠোঁটগুলি পুরু ও একটু উঁচু। ইহাদের বড় বড় কটা কটা চক্ষু দেখিলে ভয় হয়। ইহারা দাড়ি রাখিতে মোটেই পছন্দ করে না ব'লে দাড়িগুলি উপাড়িয়া ফেলে। ইহারা কেবল মাথায় লম্বা চুল রাখে ও আমাদের স্ত্রীলোকের ন্যায় খোঁপা বাঁধে, ইহারা "মালকোচা" দিয়া এক-খানা ন্যাকড়া পরে। মেয়েদের কাপড় একটু চওড়া। আমাদের দেশের মতন পুরুষেরা যেমন চাদর ব্যবহার করে, সেরূপ এদেশে মেয়ে পুরুষে উভয়ে চাদর ব্যবহার করে। সম্ভ্রান্ত গারো জাতিরা এইরূপ কাপড়ের পরি-বর্ত্তে "রেওয়া ও মেখলা" পড়ে, রেওয়া ও মেখলা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আসামীদের বিবরণের সময়ে বলিব, তবে সংক্ষেপে এখন বলি। রেওয়া আমাদের দেশে চাদরের মত বটে, কিন্তু আমরা যেরূপে ব্যবহার করি সেরূপ নহে। ইহা মেয়েদের বক্ষঃ আবরণ করিয়া থাকে। 'মেখলা' একখানা কাপড় গাগ্‌রার মতন করিয়া কোমরে পরে।

গাছের ছালের কাপড়।

কেহ কেহ আবার গাছের ছাল পরে। প্রথমে ছালটা জলে ডুবাইয়া রাখে, তারপর টান (tan) করে। ছালের কাপড়ে নানা রকম রং করে। অনেক সময় নানা রকম গাছের পাতার পাড় বসায়।

গহনা।

মেয়ে পুরুষে উভয়ে গহনা পরে। ইহাদের গহনা পরা মজ্জাগত অভ্যাস। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের ন্যায় ইহারা মেয়ে পুরুষে পিতলের মাকড়ি পরে। বংশ-মর্য্যাদানুসারে গোহাড় পরে। গোহাড় এক প্রকার পিতলের অনন্ত—কনুইয়ের নীচের গহনা। মাথায় সুতা দিয়া একখানা পিতলের পাত বাঁধে। ইহা একপ্রকার গহনার শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। ইহার নাম মেরিস্। মেরিস্ হারাইলে শ্বশুর নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়াছে বুঝিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরা কাঁচের ও সীসার হার পরে। আমাদের দেশের ন্যায়, এদেশে "সাতনবী" ও "পাঁচনবী"র প্রচলন বড়ই অধিক। আবার মণিপুরবাসীদের ন্যায় এদেশের স্ত্রীলোকেরা মাকড়ি পরিতে বড় ভাল বাসে। মাকড়িতে স্ত্রীলোকের কাণ কাটিলে বড়ই সুখ্যাতি ও সেই স্ত্রীলোকই সতীর আদর্শ স্থানীয়া হন।

খাদ্য।

গারোরা গোমাংস খুবই খায়। আমরা বাঘের নাম শুনিলে গ্রাম ছাড়িয়া পালাই, ইহারা বাঘকে ধরিয়া বধ করে ও সেই মাংস অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া আনন্দের সহিত খায়। ইহারা কুকুর; সাপ, ব্যাঙ, মহিষ, উল্লুক ও বন-বরাহ খাইয়া থাকে। ইহাদের উপাদেয় খাদ্য কপিত্তর অর্থাৎ পায়রা। ইহারা দুধ মোটেই ভালবাসে না। ইহারা তাম্রকূটপায়ী। ইহারা এক প্রকার উদ্ভিদ নির্য্যাস উৎপন্ন মদ্য ব্যবহার করে ও বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিন পান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। গাঁজা, আফিম, চরস, চণ্ডু, কোকেন ইহারা মোটেই পছন্দ করে না ও স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না।

সামাজিক রীতি।

এখানে Females rule the nation স্ত্রীলোকেরাই হর্ত্তা-কর্ত্তা ও বিশেষ সম্মানিত হইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন ও অনেক সময়ে দাস,ভাবে ব্যবহার করেন। এখানে পুরুষেরা উত্তরাধিকারী স্বত্বে বিষয় পায় না—স্ত্রীলোকেরা পাইয়া থাকেন। পুরুষ বিবাহ করিলে সেই স্ত্রীলোকের বিষয়ের অর্দ্ধভাগী হয়। এখানে ভ্রাতৃবধূ অন্য ভ্রাতৃ-স্ত্রী হইতে পারে। পুরুষেরা স্ত্রীসহ পিতামাতার সহিত বা বাড়ীতে বাস করিবার অধিকার পায় না।

গারোরা মৃতদেহ পোড়ায় ও ভস্মটা একটা পাত্রে করিয়া বাড়ীর দরজায়,

কাছে পুঁতিয়া রাখে। মৃতদেহ সৎকার করিবার সময়ে কুকুর বলি দেওয়া হয়, কারণ ইহাদের মনে বিশ্বাস যে ঐ কুকুরযোনি প্রেতাত্মাকে পথ প্রদর্শন করে। তৎপরে শ্রাদ্ধের দিবসে শ্রাদ্ধ দ্রব্যাদি এক স্থানে রাখিয়া দেয়, কারণ ইহারা বলে যে, প্রেতযোনি ঐ দিবসে আসিয়া আহার করে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এস্থানে নরবলি খুবই প্রচলিত ছিল। যাহার ঘরে বলির বেশী মাথার খুলি পাওয়া যাইত, তাহাকে শ্রেষ্ঠত্ব পদ দেওয়া হইত। সৎকারের দিবস হইতে শ্রাদ্ধের দিবস পর্য্যন্ত ঐরূপ বৃক্ষ নির্য্যাস মদ্যপান প্রশস্ত বলিয়া শ্রাদ্ধের দিবস ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মুহূর্ত্তে মদ্য পান করে।

অস্ত্র-শস্ত্র।

গারোরা বর্ষা, তলোয়ার ও বাঁশের ঢাল ব্যবহার করে। বাঁশের ঢাল এক প্রকার অদ্ভুত অস্ত্র, ইহা বাঁশের খুব পাতলা পাতলা বাখারি একত্রে জুড়ে তৈরী করা হয়। ইহা এতো কাছে কাছে লাগান থাকে যে বর্ষার খোঁচা কিছুতেই সৈনিকের গায়ে লাগিতে পারে না। ইহারা শড়কীই ব্যবহার করে। ইহারা খালি পায়ে যুদ্ধ করে। অনেক সময়ে স্ত্রী পুরুষে এক সঙ্গে যুদ্ধ করে। বিজেতাকে হত্যা বা নিগ্রহ করে না।

শাসন-প্রণালী।

এখন ইহা বৃটিশ অধিকৃত। কুইটন সাহেব এই দেশেও যান। এখানে একজন কমিশনার আছেন। ডিপুটি কমিশনার ও ৪।৫ জন একস্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনার আছেন, ইঁহাদের হস্তে এই প্রদেশের শাসন ভার ন্যস্ত। এখানে নন্ রেগুলেটিভ প্রোভিলিয়স আইন প্রচলিত। এখানে রাজস্ব আদায় খুব কমই হয়, তবে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী। এখানে Resue Force'ও আছে।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

আমি নিরীহ যেমন জগত মাঝারে
মাতৃ-পিতৃহীন শিশু
আমি কুৎসিত যেমন মানস-জগতে
ঘৃণিত কলুষ পাংশু।

আমি অপবিত্র যেন চণ্ডাল-সমান
পূত পণ্ডিত-সমাজে,
আমি মলিন যেমন পাথরের কুঁচি
অনন্ত হীরক-মাঝে।
আমি লজ্জাহীন যেন কুলটা ঘরণী
সভ্য-সমাজ ভিতরে
আমি দুঃখিত যেমন নব শোকাতুরা
স্নেহের পুত্রের তরে।
আমি নিন্দিত যেমন ধর্ম্ম পরিত্যক্ত
নব্য-যুবকের প্রায়
আমি কুটীল যেমন সরলে গরল
কুলটা-কটাক্ষ-প্রায়।
আমার কথাও তিক্ত যেন, কচি নিমপাতা
বসন্তের আগমনে
আমি প্রপীড়িত যেন নিশার কামিনী
নীরব নিঃস্ব ভবনে।
আমি কঠিন যেমন প্রস্তর সমান
পর্ব্বত-কন্দর-কোণে
আমি অকাম্য যেমন অতি দীন হীন
ধনীর প্রমোদ-বনে।

সমপ্রাণ দয়াময়! উচ্চ নীচ অভেদে
পড়ে সংসারে তোমার করুণা ছড়িয়া,
নীরব প্রকৃতি ধরি সজীবের তানে
যশস্বী গায় তব যশোগান পরাণ খুলিয়া।
আমি মিশিতে তোমার সনে মরণ-দুয়ারে
ওহে দয়াময় সে আশায় চলেছি ছুটিয়া;
দাও নিত্য নব বেশে, তবু অজানা, নীরবে
প্রভু বারেক মাতিতে প্রাণে তোমারে ডাকিয়া।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়।

ভূতপূর্ব্ব।

(১)

চিরদিন ছেলে পড়াইয়া ও মাসিক পত্রিকায় কবিতা লিখিয়া জীবনের গোণা দিন কয়টা কোন রকমে কাটাইয়া দিব ;—কখন বিবাহ করিব না, এমন একটা কল্পনা হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়াছিলাম। আমার আত্মীয়-স্বজন ইহার জন্য কত অনুযোগ ও ভৎর্সনা করিতেন, কত অনুনয় ও অনুরোধ করিতেন, কত আশা ও প্রলোভন দেখাইতেন ;—সময়ে সময়ে কত প্রভাত-পবনে বিকশোন্মুখ শিশির-সিক্ত গোলাপের মত, কত সুনীল নির্ম্মল শারদাকাশে পূর্ণচন্দ্রিমার মত সুন্দরী কুমারীগণের সন্ধান আনিয়া দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব না হউক, বেশ দু'পয়সা প্রাপ্তিরও সংবাদ শুনাইয়া দিতে ভুলিতেন না। আমি কিন্তু কিছুতেই সম্মত হইতাম না। মানুষের জীবনে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম না ; একজন সঙ্গিনী না হইলে যে জীবনে সুখলাভ হইতে পারে না—জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না, এমন কথা আমি স্বীকার করিতাম না ; কখন বিশ্বাসও করিতাম না ; তাই এই কৌমার্য্য ! তাই এই কমনীয় কল্পনা !

বাল্যাবধি আমি অত্যন্ত ভ্রমণ-প্রিয়। ভ্রমণে আমার অশেষ আনন্দ। তাই গ্রীষ্মের ছুটীতে ভ্রমণার্থে পুরী যাইবার সঙ্কল্প করিয়া আমি আমার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলাম। আমার সঙ্গী হইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বন্ধু ও আমি এক স্কুলেই কার্য্য করিতাম।

যথাসময়ে স্কুল বন্ধ হইলে বিদেশী শিক্ষকগণ যে যাঁহার গৃহে একে একে চলিয়া গেলেন। আমার সেই বন্ধুও এই সুদীর্ঘ অবকাশে প্রিয় পরিজনাদি-পরিবৃত হইয়া সংসার-সাগরে সুখ-সাঁতার দিবার বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীরস বালুকাময় সমুদ্রতটে বেড়াইতে যাওয়া আর পছন্দ করিলেন না। নব-পরিণীতা প্রেয়সীর কর-কমল-বিনির্ম্মিত তাম্বুলের রসাস্বাদন তাঁহার নিকট একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হওয়ায়, তিনি কিছু সঙ্কুচিতভাবে, কিছু উদাসস্বরে কহিলেন,—"বাড়ী হইতে পত্র আসিয়াছে, শীঘ্র বাড়ী না যাইলেই নয়। এবার আর তোমার সহিত পুরী যাওয়া হইল না।"

তাঁহার সেই উদাস অথচ তাচ্ছিল্য ভাবপূর্ণ কথা শুনিয়া কি জানি কেন যে আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। কে যেন হৃদয়ে বড় আঘাত করিল, যেন বুকের মধ্যে একটা বিস্ময়-বিষাদের—একটা ভয়-কাতরতার প্রলয় প্রবাহিত করিয়া দিল!

পরদিন বন্ধুকে ভোরের গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া তিনি একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"কিছু যেন মনে ক'রো না।" যেখানে অধিক প্রীতি, অধিক ভালবাসা, সেইখানেই মান-অভিমান, বিচ্ছেদ বিরহ। মধ্যে মধ্যে মধুর বিরহ-বিচ্ছেদ না ঘটিলে, ভালবাসার বাহার খুলে না—প্রীতির পূর্ণাহুতি হয় না! পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক যেমন বাহার,—মৃণালের কণ্টক যেমন সৌন্দর্য্য, প্রীতি-ভালবাসায় বিচ্ছেদ-বিরহ তেমনিই সৌন্দর্য্য! তেমনিই বাহার!!

সন্ধ্যার পর বাসায় আসিলাম। আমার বাসাটী গ্রামের এক প্রান্তভাগে এক নির্জ্জন স্থানে ছিল। তাহার পার্শ্ব দিয়া ক্ষীণকায়া সরস্বতী অতীত গৌরবের স্মৃতিটুকু শুধু বক্ষে ধারণ করিয়া বহিয়া যাইত। তাহার উপর একটী প্রকাণ্ড বাঁধান ঘাট কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে বিরাজ করিতে-ছিল। আমি সেই ঘাটের উপর একটা কম্বল বিছাইয়া বসিয়া পড়িলাম। চন্দ্র-করদীপ্ত মন্দবায়ু সঞ্চারিত সরস্বতীর স্বচ্ছ সলিলের ক্ষুদ্রবীচিমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, এইত বিবাহিত জীবন! যে জীবনে অধিকার করিয়া তাহা পালন করা যায় না, যে জীবনে বাক্য দিয়া তাহা রক্ষা করা যায় না, যে জীবনে মানুষ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতেও কোন কুণ্ঠা বোধ করে না, কিম্বা চির বন্ধুত্বের বাঁধন মানে না, সেই জীবন মানবের কাছে এত মধুর, এত বাঞ্ছনীয়! মানুষ তাহারই জন্য পাগল, ধিক্।

(২)

কয়েক দিন পরে আমি একাই পুরী রওনা হইলাম। তখন "রথযাত্রা" নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। সুতরাং গাড়ীতে ভিড়ের অন্ত ছিল না—প্রতি ষ্টেশনে ভিড় বাড়িতে ছিল। আমি কোন রূপে ভিড়ের ভিতর দেহটাকে মাত্র রক্ষা করিয়া চলিলাম। গাড়ী খড়্গপুর আসিয়া থামিলে, আমাদের ছোট কামরা-টীতে যখন লোক কিছুতেই ধরিতে ছিল না এবং ট্রেণ ছাড়িবারও বড় বিলম্ব ছিল না, তখন একটী ভদ্রলোক সঙ্গে বহু মালপত্র ও দুইটী স্ত্রীলোক লইয়া তাড়াতাড়ি আমাদেরই কামরায় উঠিয়া পড়িলেন।

ইহাতে গাড়ীতে প্রবল আপত্তির একটা কোলাহল পড়িয়া গেল! অনেকেই ভদ্রলোকটীকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, অত্যন্ত রূঢ় কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি কিন্তু কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোক দুটীও অতিশয় লজ্জিত হইয়া এক পার্শ্বে একটু আশ্রয় লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভদ্রপরিবারের সেই অবস্থা দেখিয়া আমি বিচলিত হইয়া তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক সকলকে বুঝাইতে লাগিলাম। উচ্চকণ্ঠে বলিলাম,—"দেখুন, সকলকেই যখন যাইতে হইবে তখন অল্প অসুবিধার জন্য ভদ্রলোককে অন্যায় অপমান করা আপনাদের ন্যায় ভদ্রলোকের উচিত নয়। আর একটু পরেই ত কে কোথায় নামিয়া যাইবে, এবং বেঞ্চ কয়খানি কেবল পড়িয়া থাকিবে—কেহ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন না।"

আমার কথায় গাড়ীশুদ্ধ লোক থামিয়া গেল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভদ্রলোকটীকে কহিলাম,—"আমার এই স্থানটুকুতে আপনারা যে কেহ এক জন বসুন। আমি অনেকক্ষণ বসিয়া আছি, এখন দাঁড়াইয়া বেশ যাইতে পারিব।" তিনি যেন কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া আমার দিকে চাহিলেন। তারপর একটু হাসিয়া কহিলেন,—"মহাশয়ের নিবাস?"

উত্তরে কহিলাম,—"নদীয়া জেলায় ভগবতীপুর গ্রামে।" শুনিয়া তাহার কাঁচাপাকা দাড়ি বিশিষ্ট মুখমণ্ডল যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। খানিকটা থামিয়া বলিলেন,—"সেখানকার সারদাচরণ রায় আমার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে কি চিনিতেন?"

আমি অবিচলিতভাবে বলিলাম,—"তিনি আমার পিতা।"

ইহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"য়্যা, সারদার ছেলে তুমি? তাই আমাদের প্রতি তোমার এত যত্ন, এত ভালবাসা, এত স্বার্থত্যাগ? সারদা যে আমার অনেক দিনের বন্ধু, অতি শৈশব হইতে উভয়ে আমরা সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকিতাম—এক মুহূর্ত্তও পরস্পর পরস্পরকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। কর্ম্মজীবনে ও একত্রে একই স্থানে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। কি বিধি—!" বলিতে বলিতে তাঁহার বড় বড় চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। গলা ধরিয়া আসিল, নাসিকায় ঝড় বহিতে লাগিল।

আমি কহিলাম,—"আপনি বসুন।"

তিনি কিন্তু নিজে না বসিয়া কনিষ্ঠা স্ত্রীলোকটীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"প্রভা, তুই বস্।" প্রভা একবার পূর্ণ-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। তাহার চোখ দুটী যেমন সুন্দর, চাহনিটীও তেমনি সরল, তেমনি সকরুণ। তাহার সুবিধার জন্য আমি যে আমার নিজের সুবিধাটুকু স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত, ইহা দেখিয়া সে যেন কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ! তখনও বাহিরে উষার আলো সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয় নাই এবং গাড়ীর ভিতরে গ্যাসের আলোও নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছিল,—তাহারই মাঝখানে প্রভার কাঞ্চনোজ্জ্বল দেহ-কান্তি আলো-আঁধারে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রভা কিন্তু বসিল না, একটু নড়িয়া-চড়িয়া মস্তকে বসন টানিয়া অপর স্ত্রীলোকটীর আরও একটু নিকটে সরিয়া দাঁড়াইল।

(৩)

অনেকক্ষণ আমরা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বায়ুবেগে গাড়ী চলিতে ছিল। রেলপথপার্শ্বস্থ নানা প্রকার বৃক্ষাবলী সুশীতল প্রভাত-পবন-হিল্লোলে ধীরে ধীরে কম্পিত হইতেছিল। লাল, নীল, সাদা, সবুজ, হরিত পাতা-গুলিতে বালার্কের লোহিত কিরণ পড়িয়া এক অতি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছিল। আকাশে নব সূর্য্য উঠিয়া ছিল; রেলপথের দুই ধারে শত শত জলাশয় সহস্র সহস্র সূর্য্য বুকে ধরিয়া হাসিতেছিল। আমি গবাক্ষপথে প্রকৃতি সুন্দরীর এই অপরূপ সুন্দর শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে আত্ম-বিস্মৃতি হইয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে চলিতে ছিলাম। হঠাৎ বিপিনবাবু বলিলেন,—"নীরদ! তুমি কি বেড়াইতে—না তীর্থ পরিদর্শনে—অথবা শ্বশুর বাড়ী যাচ্চ?" আমি উদাসভাবে মৃদু হাসিয়া বলিলাম,—"না, বিবাহ আমার হয় নাই,—তীর্থযাত্রাও ঠিক নয়; বেড়ানই উদ্দেশ্য!"

আমার পঁচিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল, তথাপি বিবাহ হয় নাই, ইহা শুনিয়া বিপিনবাবু নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"কেন? বিবাহ এখনও হয়নি কেন?" আমি কেমন একরূপ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া ঈষৎ বিকৃতস্বরে কহিলাম,—"ইচ্ছা করিয়াই করি নাই,—বিবাহ করিবার কল্পনাও আমার নাই।"

বিপিনবাবু একটু হাসিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন—"আজকালকার ছেলেদের ও একটা রোগ অথবা একটা ফ্যাসান হোয়ে দাঁড়িয়েছে! আমার বোধ হয়, ওটা সম্পূর্ণ "বিদেশী আমদানী"।

আমি কোন কথা কহিলাম না। মুখ তুলিয়া কেবল প্রভার দিকে চাহিলাম মাত্র। সেই মুহূর্ত্তে প্রভাও বিদ্যুৎ-দাম-চকিত-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। সে সুতীক্ষ্ণ অথচ সুকোমল চাহনিতে কি জানি আমি যেন কেমন একরূপ হইয়া গেলাম—কি জানি কেন আমার প্রাণের ভিতর বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। যেন একটা বিদ্যুতের গোলক আমার বুকের উপর দিয়া গড়াইয়া গেল। যেন একটা আগুনের ঝড় হৃদয়ের মধ্য দিয়া অনেকখানি বহিয়া গেল। মানুষের চাহনি যে এত সুন্দর অথচ তীক্ষ্ণ, এত কোমল অথচ কঠোর হইতে পারে এ ধারণা আমার পূর্ব্বে ছিল না। সৌন্দর্য্যের যে একটা মানসমোহিনী শক্তি আছে,—সে শক্তি যে এক অমানুষিক দেব-দুর্লভ আকর্ষণের ক্ষমতায় মানবকে মোহিত করিয়া নিজের কুক্ষিগত করিতে পারে, আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। মানব যে সৌন্দর্য্যের স্বচ্ছতায় আত্ম-প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া একেবারে পশ্বাধমে পরিণত হইতে প্রস্তুত হয়, ইহা আমি কখন কল্পনাও করিতে পারি নাই। অতি সামান্য প্রলোভনের পদার্থ—অতি তুচ্ছ ভোগের বস্তুও সম্মুখে আসিলে মানবের যে আবাল্য-সংযম-সাধনা মুহূর্ত্তের মধ্যে অতল-তলে ভাসিয়া যাইতে পারে, ইহাও আমার চিত্তপটে একদিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্যও উদিত হয় নাই।

রূপের একটা মোহ আছে। সে মোহ চোখে। মোহ হইতেই আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়। এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়াই মানুষ জগতে ঘুরিতেছে। সকলেই আশার দাস। আশা ভঙ্গে সকলেই মনে বড় কষ্ট পায়। সুগভীর সমুদ্রবক্ষোত্থিত অগণন তরঙ্গমালার ন্যায়, অসীম আকাশের অনন্ত তারকারাজীর ন্যায়, অসংখ্য বাসনারাশি মানব-হৃদয়ে উত্থিত হইয়া মানুষকে নিয়ত পরিচালিত করিতেছে। মানব অতি দুঃখের অবস্থাতে কেবল আশাকেই অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকে, কিছুতেই আশা ত্যাগ করিতে পারে না। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং,
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃত-কম্পিত-শোভিতদণ্ডং,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-ভাণ্ডম্॥
দিন-যামিন্যৌ সায়ংপ্রাতঃ,
শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।

কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥

বিপিনবাবু বলিলেন,—"তুমি থাকিবে কোথায় ?"

আমি। কোন একটা হোটেলে। পুরীতে ভাল হোটেল আছে না ?

বিপিন। হোটেলে ? সে কি! তাও কি কখন হয় ? আমি যখন মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাসা করে থাকিব, তখন তুমি গিয়ে একটা হোটেলে থাকিবে, তা কি ভাল দেখায় বাবা ? তুমি যে সারদার ছেলে, তোমাকে আমি অন্য কোথাও থাকিতে দিতে পারি না।

আমি একটা কৃত্রিম আপত্তি তুলিয়া বলিলাম,—"আমার একজন বন্ধুর এখানে পূর্ব্বেই আসিবার কথা আছে। তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া ছুটীর কয়টা দিন কাটাইয়া দিবার ইচ্ছা আছে। আরও—"

বাধা দিয়া বিপিনবাবু বলিলেন,—"তা আমার বাসায় দু'বেলা দুটী দুটী খেলে তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাতের কি ক্ষতি হইতে পারে ? হোটেলের ভাত তোমার খুব ভাল লাগিতে পারে বটে, কিন্তু আমি তোমার কোন কথাই, কোন আপত্তিই শুনিব না—তোমাকে অন্যত্র থাকিতে দিব না।"

তখন তরুণ-অরুণের কনক-কিরণে প্রভার বদন-কমল সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। মাথার কাপড় সরিয়া গিয়াছিল, সে দিকে তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। সম্মুখের অলকাগুচ্ছ প্রভাত-পবনে উড়িয়া আসিয়া মুখের উপর পড়িয়াছিল। আর তাহারি মধ্য হইতে সুগভীর সাগর-সলিলবৎ সুনীল চক্ষুতারকা দুটী আমারই মুখের উপর চাহিয়া ছিল,—যেন আমি কি উত্তর দিই তাহারই প্রতীক্ষা করিতে ছিল। আমি পূর্ব্বেই প্রভার অনেকখানি পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলাম, এক্ষণে এক অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের অনুভব করিয়া কি জানি কেন এক অব্যক্ত নবীনভাবে বড় মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। কি জানি কেন এক চির-অপ্রাপ্ত সৌন্দর্য্য-মোহ-মদিরায় আকুল হইয়া উঠিলাম। তখন আর বিপিনবাবুর প্রস্তাবে ইতস্ততঃ করিতে পারিলাম না, একেবারে উৎসাহের স্বরে বলিয়া উঠিলাম,—"আচ্ছা, তবে চলুন।"

ইতি মধ্যে গাড়ী পুরী ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিপিনবাবু "কুলি কুলি" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু যেন এক বিপুল উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া "কুলি" আসিবার পূর্ব্বেই জিনিষপত্র গুলা নিজেই নামাইয়া ফেলিলাম।

(৪)

পূর্ব্ব হইতেই বিপিনবাবু বাসার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট বাসায় পৌঁছিতে বিশেষ অসুবিধা বা বেশী বিলম্ব হইল না।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় একটু বেড়াইতে বাহির হইলাম। ফিরিয়া আসিলে প্রভা এক থাল খাবার লইয়া আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহাকে আমার চক্ষে সত্যই প্রতিমার মত সুন্দর দেখাইতে ছিল। প্রেমের চক্ষে সকলি কি সুন্দর? সকলি কি মধুর? প্রেম! প্রেম কি? প্রেম একটা বেদনা ও আনন্দের বিচিত্র একত্র সমাবেশ বৈ ত নয়? সমস্ত অন্তরকে মথিত মর্দ্দিত করিয়া পদ্মের সুকুমার রক্তদলের মত প্রেম মানবকে রক্তলোহিত করিয়া তুলে।

বিপিনবাবু বিষয়ী লোক। ব্যবসা বাণিজ্যও আছে। কাশীতে ও কলিকাতায় অনেকগুলি বাড়ী আছে। কয়েক দিন তাঁহার বাসায় থাকার পর, এক দিন সন্ধ্যার সময় বিপিনবাবু আমাকে ডাকাইয়া কাছে বসাইলেন। আমি আগ্রহাতিশয্যে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি ধীরে ধীরে ভবিষ্যতে তাঁহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার আশা দিয়া প্রভাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রভাই তাঁহার একমাত্র সন্তান—সমস্ত বিষয়ের একমাত্র অধিকারিণী। বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া আমি কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হইলাম না, কারণ আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম যে, বিপিনবাবু কতকটা ব্রাহ্ম মতে চলেন এবং প্রভা ষোড়শী হইলেও অনূঢ়া। আমি কিন্তু কি করিয়া বিবাহ করিতে পারি? বহুদিনের কল্পনা, বিবাহ করিব না—বহুদিনের সঙ্কল্প বিবাহ করিব না। বহু যুক্তি ও তর্কের পর যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, আজ এত সহজে ও এত শীঘ্র কেমন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি? তাই হৃদয়মধ্যে আন্দোলনের একটা তুমুল তুফান উঠিল। সংযম ও লালসার ভীষণ সংঘর্ষণে হৃদয়-যন্ত্র সকল ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল। শেষে কিন্তু হায়! জানিনা কোন্ পাপে কার সাঁপে, কোন্ দোষে, কার রোষে, কোন্ সুখের প্রলোভনে অথবা প্রাক্তনের ফলে আমার মতি-পরিবর্ত্তন হইল। আত্মীয়-স্বজনের শত-সহস্র অনুরোধ উপরোধকে পদ-দলিত করিয়া যে সঙ্কল্পের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলাম, সেই সঙ্কল্প আজ তরঙ্গবক্ষে তৃণের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে ভাসিয়া গেল।

বৃক্ষচ্যুত কামিনীকুসুমের পরিমলের মত নিমিষে নষ্ট হইয়া গেল! বিবাহ করাই স্থির হইল। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের দিন স্থিরও হইয়া গেল।

যদি পথিমধ্যে প্রভার সহিত আমার সাক্ষাৎ না হইত, যদি পথিমধ্যে প্রভার হাব ভাব ও প্রতি অঙ্গ চালনায় আমি এক অব্যক্ত সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়া তাহার অতিশয় পক্ষপাতী না হইতাম, যদি প্রভার কোকিল-কল-নিন্দিত কণ্ঠের স্বরলহরী শুনিয়া বড় মুগ্ধ হইয়া না পড়িতাম, তাহা হইলে কখনই আমার এত সহজে এমন পতন হইত না।

ক্রমশঃ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হায়।

আমার মন যে আমার হ'লনা
আমি গো হলেম আপন হারা।
কয়েদীর বেশে দীরঘ প্রবাসে
বাঁধিয়া রেখেছে কি জানি কা'রা॥
গুপ্ত রত্ন যাহা কিছু ছিল
বিদেশে আসি' হারায়ে গেল,
(এবে) মরমের পুরে ঘন বিভীষিকা
চারিদিকে হায় নিরালা ঘেরা॥
স্নিগ্ধ কিরণ লভিতে আসিয়া
মুক্তির পথ গিয়াছি ভুলিয়া
ভোগের পিপাসা গেলনা এখন
জ্ব'লে পুড়ে শেষে পাগল পারা॥
হ'ল নগ্ন আবেশে মগ্ন পরাণ
ভাঙ্গিয়াছে "হায়" সাধের ধেয়ান
শেষে সুপ্তোত্থিত শিশুটির মত
আকুলি ব্যাকুলি কাঁদিয়ে সারা॥

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষার দোষ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিচারে বিদায়।

মিত্র মহাশয়ের মাতার শ্রাদ্ধে অনেক টাকা ব্যয় হইতেছিল,—সমস্ত বাড়ী, সমস্ত প্রাঙ্গণ, সমস্ত পাড়া, সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রিত, আহুত—অনাহুত এবং কাঙালীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মহাসমারোহ কার্য্য—দান-সাগর শ্রাদ্ধ। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাগম অতি সামান্যই হইয়াছিল। কেবল, মিত্র মহাশয়দিগের কুলপুরোহিতগণ চাঁদের হাটের চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের মধ্যে কয়েকজন আসিয়া সকাল হইতে আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এরূপ দানপ্রাপ্তি—দক্ষিণাপ্রাপ্তি কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নহে,—পয়সা বড় না জাতি ধর্ম্ম বড়?

দেশের মধ্যে স্মৃতিরত্ন মহাশয় বড় পণ্ডিত, তিনি আসেন নাই বলিয়া, গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণগণ—যাঁহারা কায়স্থবাড়ী বরাবর নিমন্ত্রণে আসিতেন, তাঁহারা আসেন নাই।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিবস পর্য্যন্ত ইহা লইয়া হৈ-চৈ হইতেছিল। কায়স্থদিগের মধ্যে দুইটি দল পাকাইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে তাহার জন্যে বিশেষ কোন বাধা জন্মে নাই। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই সে সকল কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। এখন ভোজন-ব্যাপার। কিন্তু স্বজাতীয়ের মধ্যে দুই দলে ক্রমেই গোল পাকাইয়া উঠিল,—একদল ভোজনে অস্বীকৃত হইল।

তখন বিচার আরম্ভ হইল। দয়াল বসু কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

হরিবিহারী সরকার দয়ালবাবুর কন্যার শ্বশুর। তিনি উকীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।

প্রায় তিন চারিশত গণ্যমান্য ব্যক্তি সেই বিচার-সভায় উপস্থিত ছিলেন। কথা উঠিল,—ব্রাহ্মণগণ যখন অশৌচান্ন বলিয়া এখানকার অন্ন গ্রহণ করিলেন না, তখন তাঁহাদিগের খাওয়া উচিত কি না।

রামধন ঘোষ একখানি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ ঘটকের পুঁথি কতকগুলি লোক দিয়া লেখাইয়া লইয়া বড় বড় লোকের নিকট টাকা ভিক্ষা করিয়া প্রকাশ করিয়া, 'স্বশ্চভিশ্চসাৎ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন,—তিনি সব্‌জান্তা—তিনি মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। সকলের উপরে কণ্ঠ তুলিয়া বলিলেন,—"আপনারা বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন—আর আমি মহাসাগর, কাজেই আমার ভিতর অনেক রত্ন—অনেক হাঙর-কুমীর আছে—আপনারা বৃথা গোল তুলিয়া জাতীয় অবনতি করিবেন না।" জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে, সকলের উঠিতেই হইবে। অতএব ব্রাহ্মণগণ না আসিলে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। বরং আগাছারূপ ব্রাহ্মণগুলা আমাদের জাতীয়-ক্ষেত্র হইতে দূর হইলে, আমাদের জাতি পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিবে—হে স্বজাতিগণ; চলুন, আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে নির্ব্বিকার মনে আহার করিগে।"

হরিপুরের দত্তমহাশয় মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে হরিবিহারী সরকার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনার কি মত সরকার মহাশয়?"

সরকার। আমার বৈবাহিকবাড়ী—এখানে আমার মতামতে নির্ভর করিবেন না। যাহাতে দশ-কুটুম্ব আহার করেন—কোন গোলযোগ না ঘটে, তাহাই আমার ইচ্ছা।

দয়াল। তথাপি কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে। যাইহোক, ব্রাহ্মণগণ যখন অশৌচান্ন বলিয়া আসিতে স্বীকৃত হন নাই, তখন আমরাই বা সে অন্ন গ্রহণ করি কি প্রকারে?

স্বশ্চভিশ্চসাৎ মহাশয় মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ কি করিতেছেন মশায়? শাস্ত্র মানেন? শাস্ত্র জানেন? কোন্‌ শাস্ত্রগ্রন্থে দেখিয়াছেন, ব্রাহ্মণ না খাইলে সে বাড়ীতে খাইতে নাই?"

দয়াল। না না, শাস্ত্রজ্ঞান আমাদের কোথায়? জমিদারীর টাকা আদায় করা, আর গুরু-পুরোহিতের মুখে দু'টো শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের কথা শুনিয়া আহার-ব্যবহার করা, আমাদের জীবনের কার্য্য।

স্ব। গুরু-পুরোহিত সব ব্রাহ্মণ,—ওরাইত শাস্ত্রের কদর্থ প্রচার করিয়া সমাজের এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে।

সরকার মহাশয় অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণে শাস্ত্রের কদর্থ ঘটাইয়াছে, আর শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে কি কায়স্থে?"

স্ব। কায়স্থ বলিয়া কোন জাতি নাই—কায়স্থ নাম মুখে আনিবেন না—

দ। তবে কি বলিব ?

স্ব। শাস্ত্রমতে আমরা ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় বলিবেন।

দ। আমার পিতা পিতামহ যে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন ? পিতা-পিতামহের দলিল-দস্তাবেজে যে কায়স্থ বলিয়া লেখা আছে ?

রামু গ্রামের শ্যাম মল্লিক একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"হাঁ, মশায় ; সেদিন জজসাহেবের কাছে আমি ঐ জন্যে ভারি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলাম।"

দ। কি রকম ?

রা। আমার একটা উইলের মোকদ্দমা ছিল। আমাদের গ্রামের মনু দত্ত—তিনি আমার মায়ের মামাত ভাই। তাঁর আর কেউ ছিল না,—কিছু সম্পত্তি ছিল। মৃত্যুকালে বাবাকে উইল করিয়া দিয়া যান। তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পরে দুর্ভাগ্যক্রমে বাবারও মৃত্যু হয়, কাজেই 'উইল প্রবিট' জন্য আমাকে জজসাহেবের আদালতে উপস্থিত হইতে হয়। উইলদতা ও গৃহীতা সম্পর্কীয় ব্যক্তি—ঐ দলিলে উভয়ের জাতীর স্থলে কায়স্থ লেখা আছে, আর দাখিলী বর্ণনা পত্র ও সত্যপাঠে আমার জাতীর স্থলে ক্ষত্রিয় লেখা আছে,—জজসাহেব ধরিয়া বসিলেন—কায়স্থের ছেলে ক্ষত্রিয় হয় কেমন করিয়া ? অতএব আমি স্বত্বাধিকার সূত্রে এ উইল গ্রাহ্য করিতে পারিব না।

সর। সে সকল কথা যাক্,—আসল কথা, বেলা অপরাহ্ন হইয়া গেল, আহারের সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে,—এখন সকলে চলুন।

বিপক্ষদল সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন, 'এতদিন কায়স্থগণ ত্রিশদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ বারদিন পালন করিয়াই তের দিনে অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিন কৃত্য সমাপ্ত করিতেছেন। এখন ঐ দিনে তাঁহাদের অশৌচ গেল কি থাকিল,যত দিন তাহার সর্ব্ববাদি-সম্মত মীমাংসা না হইতেছে, ততদিন আমরা কেমন করিয়া ভোজন করিব ? ইহাতে অশৌচান্ন গ্রহণের পাতক স্পর্শিতে পারে।"

স্বচভিশ্চসাৎ মহাশয় বসিয়াছিলেন, লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যঙ্গের হাসির গর্ব্বোত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"ব্রাহ্মণদের কথা বলিবেন না। ঐ জাতিটা চিরকালই আমাদের দুয়ারে—ক্ষত্রিয়দের দুয়ারে —অন্ন মারিয়া ফিরিয়াছে। আমাদেরই নিকটে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ

পাঠ করিয়াছে—আমাদেরই প্রসাদ পাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে। উহারা অতি হেয় জাতি—কেবল আমাদেরই কৃপায় উহারা মানুষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের কোন্ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ? উহাদের মুখ দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। উহাদের কথা শুনিয়া আবার কাজ করিতে হইবে! না আসে আসুক। আমরা পরম পবিত্র ক্ষত্রিয় জাতি—আমাদের বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে অধিকার আছে। অতএব আমরাই পুরোহিত হইব—দশকর্ম্ম করাইব; আমরাই গুরু হইয়া মন্ত্র দিব; আমরাই শাস্ত্রশিক্ষা করাইব—বেদ পড়াইব। আর ব্রাহ্মণগুলোকে এদেশ হইতে অপমান করিয়া বিতাড়িত করিব"—

সরকার মহাশয় দুই কর্ণে হস্তাচ্ছাদন করিয়া "রাম রাম" করিতে করিতে ঘৃণাভরে সেই সভা হইতে উঠিয়া যাইতেছিলেন, একজন তাঁহার কোঁচার কাপড় টানিয়া ধরিয়া বলিল—"কোথায় যান?"

স। যেখানে গুরুনিন্দা হয়, সরকার সেখানে থাকেন না। জগদ্‌গুরু ব্রাহ্মণের নিন্দা যেখানে—ব্রাহ্মণের দাসানুদাস হরিবিহারী সরকার সেখানে তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিবেন কেন? ছাড়ুন মহাশয়, এখানে থাকিলে মহাপাতক হইবে।

স্বশ্চভিশ্চসাৎ মহাশয় ক্রোধ-কুটীল নয়নে সরকার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া গর্ব্বোত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন,—"সরকার মহাশয়, আপনি জানেন, এ আপনার জজসাহেবের কাছারি নয়, এটা জাতীয় সভা। দেশের গণ্যমান্য সমস্ত কায়—থু থু—সমস্ত ক্ষত্রিয় এখানে উপস্থিত; আপনি অমন করিয়া চলিয়া গেলে, আপনাকে এক ঘ'রে করিবেন"—

স। তা' জানি। 'এক ঘরে' কি মহাশয়; আমাকে যদি যমরাজ রৌরবের ভয় দেখান, তবু আমি ব্রাহ্মণের নিন্দা কাণে শুনিতে পারিব না। যেখানে ব্রাহ্মণরূপ গুরুনিন্দা হয় সেস্থানে থাকিতে পারিব না।

সরকার মহাশয় চলিয়া গেলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রায় তিন ভাগ লোক উঠিয়া গেলেন।

সেই উদ্বেলিত, উৎক্ষোভিত—অবজ্ঞাত লোক মধ্যে দাঁড়াইয়া স্বশ্চভিশ্চসাৎ মহাশয় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন,—"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি ছিলে আর কি হইয়াছ? হা ক্ষত্রিয়সমাজ, তোমার কত অধঃপতন হইয়াছে স্মরণ করিতে গেলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমরা মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকার

গণের সংহিতা গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বিধান বাহির করিয়াছি,—বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতের সহী ও সম্মতি লইয়াছি,—তারপরে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, পৈতা লইয়াছি, তথাপি এই,—হাঃ হাঃ ক্ষত্রিয় সমাজ, ওঠ, জাগ—নিদ্রা পরিত্যাগ কর।"

একটা দশ বৎসরের বালক কয়দিন আগে কলিকাতায় থিয়েটারে "হেস্ত নেস্ত" বইয়ের অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ তার একটা গান মনে পড়িয়া গেল। সে বড় দুষ্ট বালক। তখন সেই সভার লোক কেহ উঠিয়া অন্যদিকে যাইতেছিল, কেহ চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, আমরা এ বাড়ীর অন্ন গ্রহণ করিব না। কেহ বলিতেছিল, যখন পৈতা লইয়াছি, ক্ষত্রিয় হইয়াছি—তখন ব্রাহ্মণের ধার ধারি না। কেহ বলিতেছিল, যাই হোক—জঠর জ্বালায় মরি—খেতে হয় খাও, না খাও, বল বাবা বাড়ী গিয়ে খেয়ে বাঁচি। কেহ জলের গাড়ু হাতে লইয়া বাহিরের দিকে চলিয়া যাইতে ছিল; অধিকাংশ জোট পাকাইয়া অদূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তামাকু খাইতেছিল। আর সেই দুষ্ট ছোক্‌রা থিয়েটারের গানটা চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া গাহিয়া সকলের মনোযোগ আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। সে গাহিতেছিল,—

মিন্সেরা ঝগড়া ক'রে বেঁধে ধ'রে
আমাদের গলায় দিলে পৈতে।

বলে বাম্‌নি হবি স্বর্গে যাবি
কথা কইতে কইতে।

পাগ্‌লা পঞ্চু তর্কচঞ্চু পণ্ডিতের প্রধান,
নারীর পৈতে শাস্ত্রে আছে দিয়েছে বিধান,
যেমন যেমন জাতিবর্ণ, প'র্‌ছি পৈতে নানা বর্ণ,
আবার এই কলুর পৈতে কৃষ্ণবর্ণ
শিখ্‌ছে মনুর বইতে।

হাড়ি মুচি ডোম-ডোক্‌লা
নিইচি Holy thread,
Great Estern Hotel থেকে
খাচ্ছি Holy bread.

করি না ঢোল সানাই বাদ্য,
পুরুৎ হ'য়ে করাই শ্রাদ্ধ,
বামুন গুলো হ'লো শূদ্র,
ছিল ভদ্র হ'লো ক্ষুদ্র,
আমরা পৈতা লইতে ॥

ধোবানীর এই নারকোল-কাছি, গেলেই বাঁচি
পারি না আর বৈতে।

আমরা সব দিব্যি আছি, মিলে গেছি
মুড়ি-মিছরি খইতে।

এখন ভাব্‌ছি সবে উঠ্‌বো কবে
স্বর্গে যাবার মইতে ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সান্ধ্য সমিতি।

দয়ালমিত্রের বাড়ীর কুটুম্বভোজন লইয়া সে দিন ভারি গোল হইয়া গেল। সামাজিক নিয়ম-অনুসারে সকলে বসিয়া পংক্তি ভোজন করিবেন, তাহা হইল না। কতক এধারে বসিয়া, কতক ওধারে বসিয়া, কতক লুকাইয়া, কতক প্রকাশ্যে—এইরূপে নিমন্ত্রিত সমাগত কুটুম্ববর্গের অর্দ্ধাংশ ভোজন করিলেন। অপরার্দ্ধের অর্দ্ধাংশ নিকটস্থ গ্রামের লোক.—তাঁহারা অভুক্ত অবস্থাতেই বাড়ী চলিয়া গেলেন, অপরার্দ্ধ সেই গ্রামের মধ্যেই অন্যান্য কায়স্থবাড়ী ভোজন করিলেন।

এই ব্যাপারে কর্ম্মী মিত্রমহাশয় অতিশয় বেদনা অনুভব করিলেন। অবমানিত এবং ক্ষুব্ধও হইলেন। দুঃখ কষ্ট অবমান যাহা হইল, তাহার মূল কারণ স্থির করিলেন—স্মৃতিরত্নকে, এবং মনে মনে আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই কাজ অন্তে তাঁহাকে মশকের মত হাতে দলিয়া মারিয়া ফেলিবেন।

এদিকে সমাজের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা ঐ দলাদলির মীমাংসা করাইবার চেষ্টা করিলেন।

সন্ধ্যার সময় স্মৃতিরত্ন প্রমুখ ব্রাহ্মণগণকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন,—অনেক কায়স্থও সেখানে উপস্থিত থাকিলেন। স্বশ্চভিশ্চসাৎ মহাশয়ও সে সভায় যোগদান করিলেন। সরকার মহাশয়ই অগ্রণী হইয়া এই মীমাংসার দিকে গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

সরকার মহাশয় স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে বিনীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এদেশের প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও ব্যবস্থাদাতা। আপনার মতেই এদেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ মত দিয়া থাকেন। আপনি এবাড়ী আসেন নাই বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই আসেন নাই। আমরা কায়স্থজাতি—

বাধা দিয়া স্বশ্চভিশ্চসাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"ওকি কথা? ক্ষত্রিয়"—

স। থামুন। আমরা কায়স্থজাতি—চিরদিন ব্রাহ্মণের অনুগত—

স্ব। কখনই না,—ব্রাহ্মণই চিরদিন আমাদের অন্নপালিত—

স। স্বশ্চভিশ্চসাৎ মশায়; আপনি বড় জ্বালাতন আরম্ভ করিলেন! কোন্ বীজপুরুষ ক্ষত্রিয় ছিলেন,—ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের কি ব্যবহার ছিল, সে কথা তুলিয়া এখন কি হইবে? বর্ত্তমানে—অন্ততঃ হাজার বৎসর ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজ যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে—এখন তাহাই স্মরণ করুন—

স্ব। কখনই না, কখনই না। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপাচার্য্য পরশুরাম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই করিব।

অনেকেই বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের বক্র-ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে স্বশ্চভিশ্চসাৎ মহাশয়ের দিকে চাহিল। সরকার মহাশয় হো হো করিয়া উচ্চ হাস্ত করিয়া বলিলেন,—"যে কয়জনের নাম করিলেন, তার মধ্যে যে দু'জন ব্যতীত আর সবাই ব্রাহ্মণ!"

স্ব। হ'তেই পারে না। মিথ্যা ভ্রম! অন্ধ কুসংস্কার! ব্রাহ্মণ আবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন কবে?

স। ব্রাহ্মণ সব পারিতেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি,—নৌ-বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, পশুপালন-বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ব্রাহ্মণ সব জানিতেন, আবশ্যক হইলে অতি দক্ষতার সহিত সবই করিতেন,—কিন্তু অনাসক্ত, অনির্লিপ্ত,—বাস ছাড়িয়া বনবাস করিয়াছিলেন, নগর ছাড়িয়া জঙ্গলে

থাকিতেন, বিলাস ছাড়িয়া বহির্ব্বাস পরিতেন। তাইতেত ব্রাহ্মণ জগৎ পূজ্য। তাইতেত ব্রাহ্মণ সকল জাতির গুরু। তাইতে ত ব্রাহ্মণ দেবতারও দেবতা।

স্ব। সে দিন গিয়াছে,—ফোঃ ফোঃ—সে দিন কখনও ছিল না—হয় নাই—হইবে না। আমি তাহার প্রমাণ হাতে হাতে দেখাইতেছি। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইবেন—বশিষ্ঠ প্রভৃতি হিংসুক ব্রাহ্মণেরা তাহাতে ঘোর প্রতিবাদী হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। আর এখনও দেখ—আমরা ক্ষত্রিয় হইতেছি—হইতেছি বলা অবশ্য আমার ভুল—ইহাতে শাস্ত্রকারগণের কিঞ্চিন্মাত্রও ভুল নহে—শাস্ত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে, প্রত্যেক শব্দে শব্দে, এমন কি প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে আছে—কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আছেন ও হবেন,—কেবল স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণই আমাদিগকে নাজেহাল পেসমান করিয়া দিতেছে।

স্মৃতিরত্ন বিনীতস্বরে বলিলেন,—"না মহাশয়, যে ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তাঁহারাই এজাতীয় উন্নতিতে বাধা প্রদান করিবেন না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণেই জানেন, ভারতের জাতিভেদেই কর্ম্ম-ভেদ, এবং কর্ম্মভেদেই বর্ণভেদ;—বর্ণভেদেই স্বধর্ম্মাচরণ রূপ সামাজিক উন্নতি। বর্ত্তমান ভারতে—বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে ধরিতে গেলে, সব একাকার। ব্রাহ্মণ নাই, ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই,—সব শূদ্র। বর্ণভেদ নাই, কর্ম্মভেদ, ধর্ম্মভেদ নাই;—কাজেই আহার, বিহার, পরণ-পরিচ্ছদ কোন ভেদই নাই। সকলেই দাস সকলেই চাকুরে। যদি মঙ্গলময়ের করুণ আশীর্ব্বাদে আবার ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে জাতি প্রতিষ্ঠা হয়,তবে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে। ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—চারি জাতি প্রতিষ্ঠা হইলে, আবার বঙ্গের দুঃখ-দারিদ্র—অভাব অভিযোগ দূর হইবে। তার মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতিই কর্ম্ম-বিভাগের পূর্ণ প্রাণ স্বরূপ। বাঙ্গালার সকল জাতির দিকে চাহিয়া দেখিলে, একমাত্র কায়স্থ জাতিরই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবিই আছে। জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, আচার, অনুশীলন যে দিক্ দিয়াই দেখা যায়—কায়স্থই শ্রেষ্ঠ। তবে হুজুগে মাতিয়া যে ভাবে কাজ করিতেছে—তাতে যে, বড় একটা কিছু হইবে, এমন মনে হয় না।

স্ব। কেন? কি অন্যায় হইতেছে?

স্মৃ। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি—ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা—সব দিক্ সকল বুঝিতে পারি না। তবে মনে হয়, ব্রাহ্মণদিগকে বাদ দিয়া,—ব্রাহ্মণকে দলিত করিয়া,

জাতিপ্রতিষ্ঠা হয় না। বাঙ্‌লার ব্রাহ্মণ-সমাজ বল্লালের আমল হইতে ধ্বংস হইয়া আসিতে আসিতে এখন একবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে—অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। জাতিভেদ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এক একজাতি এক হইয়া—কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইয়া পৈতা লইলেন, যুগী যোগী হইয়া পৈতা লইলেন, সাহা বৈশ্য হইয়া পৈতা লইলেন—বণিক্ বৈশ্য হইয়া পৈতা লইলেন—এমন পৈতায় কিছুই হইবে না, যাদের ছিল—সেই বাঙ্‌লার ব্রাহ্মণেরাই ফেলিয়া দিতেছে—আর যাহারা নূতন লইতেছে—তাহারাই বা তার দ্বারা এমন কি উন্নত হইবে। কলিকাতায় গরুর-গাড়ীর গাড়োয়ানদের গলায়ও পৈতা দেখিয়াছি।

ক্ষ। আপনারা নিমন্ত্রণে আসেন না কেন?

স্ব। অশৌচায় গ্রহণের আশঙ্কায়।

ক্ষ। একমুখে দুই কথা! এই যে বলিলেন,—কায়স্থেরই ক্ষত্রিয় হওয়া উচিত।

স্ব। উচিত ত,—কিন্তু হয়েন কি?

ক্ষ। বাঃ—বাঃ! এই ত হইছি। ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি—পৈতা লইয়াছি—আর বার দিন অশৌচ গ্রহণ করিতেছি।

স্ব। ঐ স্থানেই ত রোগ! ক্ষত্রিয় না হইয়াই বার দিন অশৌচ কেন মহাশয়? স্বীকার করি, আপনাদের আদি পুরুষগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন,—তাঁহারা বার দিন অশৌচ গ্রহণ করিতেন। তারপরে অধঃপতনের প্রবল টানে যখন ক্ষত্রিয়ের গুণ হারাইয়া, শূদ্রবৎ কর্ম্মী হইলেন, তখন বিবেচনা করিলেন, আর কেন,—গুণ লইয়াই জাতি,—অতএব বার দিন অশৌচ গ্রহণ বা উপবীত ধারণ অন্যায় হইতেছে—অগত্যা, সে সকল পরিত্যাগ করিলেন।

ক্ষ। বস্,—তাঁরা যা ভুল ক'রেছেন,—আমরা তা' শুধ্‌রে নিচ্চি—আপনারা শত্রুতা কর্‌বেন কেন?

স্ব। আমরা শত্রুতা করিতেছি না—মিত্রতা করিতেছি। ব্রাহ্মণে জানেন, শূদ্রও কর্ম্মগুণে ব্রাহ্মণ হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ও হইতে পারে। স্বীকার করি, যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়াছেন, তার মধ্যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইবার উপযুক্ত লোক আছেন—কিন্তু সমগ্র জাতিটা যে এখনও শূদ্রাধীন। সকলের অশৌচ যায় কি করিয়া?

স্ব। তবে ব্রাহ্মণগণের যায় কি করিয়া? সব ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণের গুণ-বিশিষ্ট?

স্ম। নিশ্চয়ই নয়। তারা ত অশৌচান্ন ভক্ষণে আপত্তিও করে না। তাদের বিবেকে ত বাধাও দেয় না।

স্ব। এখন একটা মীমাংসা করিয়া ফেলুন।

স্ম। মীমাংসা আর কি করিব? হয় আপনারা সমস্ত কায়স্থ জাতিটাকে আগে ক্ষত্রিয়োচিত আচার-কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া—ক্ষত্রিয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, তারপরে বার দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া, নিমন্ত্রণ করিলে আসিতে পারিব; আর নয়, এখন সমাজ গড়াইতে থাকুন—আর ত্রিশ দিন অশৌচ গ্রহণ করুন।

তারপরে আরও অনেক রকম বাদানুবাদ হইয়াছিল, কিন্তু কোন প্রকার মীমাংসাই হইল না। রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ডের সময় সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সে আমার।

সে আমার আঁধার রাতের দীপ্ত তারকা,
পিপাসায় শীতল জল;
সে আমার ধূ ধূ মরুভূ-তে স্নিগ্ধ ফল্গু
দুরবল শরীরে বল,
সে আমার প্রমোদ কাননের ফুল্ল গোলাপ,
মলয়-ভরে পড়ে হেলিয়া;
সে আমার হৃদয়-বীণার একটী তন্ত্রিকা
ধীরে ধীরে উঠে বাজিয়া,
সে আমার নিশার স্বপনের অপরূপ ছবি,
সদা রহে হৃদে জাগিয়া;
সে আমার চাঁদিনী যামিনীর স্নিগ্ধ মলয়,
নিশা শেষে আসে বহিয়া;
সে আমার বুকভরা প্রেম মুখভরা হাসি,
হৃদয়ে মধুর স্নেহ;

তারি তরে আমি গড়িয়াছি এক
ভকতি-পূর্ণ হৃদয়-গেহ ;

সে আমার নন্দন বনের পারিজাত ফুল,
গন্ধে এ ভুবন ভরা ;

সে আমার পলকে গড়িছে পলকে ভাঙ্গিছে—
এই মনোরম ধরা ;

সে আমার চির-মহিমাময়, মঙ্গল-আলয়,
(তার) সব জীবে সমদৃষ্টি ;

তার রূপের আভায় উজলা এ ধরা
যাহার এ বিশ্ব-সৃষ্টি ;

সে আমার ফুল্ল কুসুমের স্নিগ্ধ পরিমল,
তারকায় তার দ্যুতি,

সে আমার ইন্দু-কিরণের রঞ্জত-সুষমা,
সূর্য্যের প্রখর জ্যোতি ;

সে আমার বারিদের কোলে রম্য রামধনু,
চপলার উজ্জল বিভা ;
বর্ষণ-কালে ক্ষণেক চমকি
ধরে কি মোহন শোভা !

সে আমার অরূপ সুন্দর বিশ্ব-বিমোহন,
আমার মানস-স্বামী ;
তারই রূপের তীব্র নেশায়
সদা মত্ত থাকি আমি।

সে আমার বক্ষের স্পন্দন হৃদয়-শোণিত,—
সঙ্গী মোর সারা জীবনে ;

সে আমার সাধনার ধন পরম রতন,
রহে সদা মোর স্মরণে।

(তবু) পাই নাই তারে চারিটি বেদে,
দর্শন, বিজ্ঞান, সে পুরাণে,

(মম) হৃদয়ে তার সদা অনুভূতি,
(তাই) পেয়েছি তাহারে ধেয়ানে॥

শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ প্রামাণিক।

মাসিক সংবাদ।

বিগত ১৯এ ফাল্গুন রবিবারে 'বাঙ্গালী' দৈনিক কাগজে একটি সংবাদ পাঠ করিয়া দেশের লোক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। সংবাদটির সংক্ষিপ্ত সার এই ;—

বাগেরহাটে শ্রীমতী কিরণবালা দত্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী। এখন,গত শ্রীপঞ্চমীর দিন বিদ্যালয়ের বালিকাগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায়, বাগ্দেবীর চরণার-বিন্দে সভক্তি কুসুমাঞ্জলি দিবে বলিয়া, তাঁহার মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তি আনয়ন করে। খৃষ্টিয়ান মহিলার নিরাকার উপাসনার প্রাণে এ দৃশ্য ঘোরতর কুরুচি ও কুপ্রথা জ্ঞান হইল, ক্রোধে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল—তিনি বালিকাগণের কত ভক্তির—কত উৎসাহের—কত প্রাণমাতান উদ্যম—আনন্দের আহৃত সেই সসজ্জ কর্পূর-কুন্দ-ধবল মাতৃ-মূর্ত্তির অঙ্গে পদাঘাত করিলেন!

বালিকাগণ বড় ব্যথিত-বক্ষে ছল ছল চক্ষে বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক, বাগের হাট ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে গিয়া, এই কাহিনী বিবৃত করিল। তিনি শ্রীমতীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু শ্রীমতী গ্রাহ্য করিলেন না। তখন সেক্রেটারি মহাশয় অগত্যা কয়েকজন ভদ্রলোক সমভিব্যহারে শ্রীমতীর নিকটে গমন করিলেন। ঘটনা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় শ্রীমতী তখন দোষ স্বীকার করিয়া একখানা ক্ষমাপত্র দাখিল করিলেন। বাস্, সব চুকিয়া গেল!

সেক্রেটারি মহাশয়ের দেখা উচিত ছিল, শ্রীমতী যখন প্রতিমা-অঙ্গে পদাঘাত করেন, তখন তাঁহার পায়ে জুতা ছিল কি না; জুতা না থাকিলে যে বড় বাজিয়াছে,—সে কোমল চরণে যে ব্যথা লাগিয়াছে! তার কি করিলেন?

মেদিনীপুরের সাহিত্য-সমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। জজ ডেলিভেঞ্জ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট মার সাহেব প্রভৃতি সে সভায় উপস্থিত থাকিয়া দেশের লোকের প্রীতি ও ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্পাদিত "আখ্যান" নামক মাসিক পত্র ফাল্গুন হইতে প্রকাশ হইতেছে।

এষ্ট্রোলজিকেল্, সোসাইটী

অফ্ বেঙ্গল

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

দেশের অধিকাংশ গণ্য মান্য বিদ্বান ও সজ্জনবর্গের
অনুমোদিত, আজীবন সভ্য ও ছাত্র সভ্যগণ
ইহার পৃষ্ঠপোষিত।

১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গের উজ্জ্বল গৌরব কেতন, স্বনামখ্যাত জ্যোতিষাদি বিবিধ
শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিধান পঞ্জিকা, পুরাতন পঞ্জিকা, মাসিক
পঞ্জিকা, জ্যোতীরত্ন কল্পতরু, কোষ্ঠী বিচার, সরল
জ্যোতিষ শিক্ষা, অদৃষ্ট দর্পণ, নানাবিধ জ্যোতিষ-
গ্রন্থ ও যন্ত্রাদি প্রণেতা কলিকাতা কোষ্ঠী
সংস্কার সমিতি ও নব্য সংস্কার
জ্যোতিষচতুষ্পাঠীর অধ্যাপক
নারায়ণগঞ্জ এষ্ট্রোলজিকেল
সোসাইটীর সম্পাদক

পণ্ডিত শ্রীকালীপ্রসন্ন জ্যোতির্ভূষণ

কর্ত্তৃক

এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটি হইতে
প্রকাশিত।

১৩২২।

সম্পাদক মহাশয়ের নিবেদন।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসরঃ নিবেদন মেতৎ—

ঢাকা জিলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ সব্‌ডিবিসনের উপর এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর জন্মস্থান। কলিকাতা ই, বি, রেলওয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ ষ্টেশন হইতে ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ পৌছান যায়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৩/১৫ মাত্র।

বর্ত্তমান ১৩২৩ বঙ্গাব্দের সঙ্গে সঙ্গে এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ১৩১১ বঙ্গাব্দে ৺রামরতন শীরোমনী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা হয়। আজ দ্বাদশ বর্ষ কাল সভ্যগণের আন্তরিক উদ্যমে নিজ উদ্দেশ্য প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই সভ্য আছেন। দেশের অধিকাংশ গণ্যমান্য বিদ্বান ও সজ্জনবর্গ ইহার সভ্য। বাঙ্গালার বাহিরে বিহারে উড়িষ্যায় আসামে ব্রহ্মে মাদ্রাজে বোম্বাইয়ে আমেরিকায় ইহার সভ্য আছেন। বঙ্গের ধনাঢ্য শ্রেণী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যার এই এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইহার সভ্য পদ গ্রহণ করিয়া ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এক কথার আজ কাল ভারতবর্ষে এত অধিক সভ্য আর কোন সোসাইটীতে নাই। এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীতে বহুকালের পুরাতন গ্রন্থ ও বিদেশীয় বহুমূল্যের যন্ত্রাদি সংগৃহীত হইতেছে। করুণাময় জগদীশ্বরের কৃপায় এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর বিশিষ্টসভ্যগণের মতানুক্রমে আগামী বর্ষের বসন্তাগমে সংস্কৃত সর্ব্ববিধ প্রকারের আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার স্থান প্রতিষ্ঠা করা হইবে। মহাশয়, আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও আমার একান্ত বাসনা যে আপনিও আমাদের এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর আজীবন সভ্য পদে ব্রতী হইয়া এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীকে গৌরবান্বিত করুন।

PRINTED BY H. P. GHOSH, at the
ABASAR PRESS.
34, Kaliprosad Dutt's Street, CALCUTTA.

এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর-অতীত জীবন।

প্রতিষ্ঠাব্দাঃ ১৮২৬

করুণাময় জগদীশ্বরের কৃপায় ক্রমান্বয়ে ১০ দশ বৎসর কাল যাবৎ অহো-র্নিশি পর্য্যালোচনা দ্বারা বহু যত্নে জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিগুঢ়তত্ব নির্ণয় করিয়া অবৈতনিক ভাবে প্রায় ১০০০ সহস্রাধিক মহোদয়গণের দৈনিক ভাগ্যফল প্রত্যক্ষ করিয়া নানা দেশের খ্যাতনামা কৃতবিদ্য মহাত্মাগণের আন্তরিক যত্নে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গীয় প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া লুপ্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার মানসে এই সোসাইটীর গঠন হয়। তদবধি এতাবৎ দশ বৎসর তাহাদিগের অহর্নিশি অবিরাম পরিশ্রমে বঙ্গে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। এই সোসাইটী সকল বিষয়েই বঙ্গের প্রচলিত প্রথাকে পরাজিত করিয়া সাধারণের এবং অধিকাংশ গণ্যমান্য বিদ্যান ও সজ্জনবর্গের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন যিনি কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চ পিপাসায় তৃপ্তিদান করিতেছে, সেই ভূতভাবন ভগবানের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম করতঃ আমাদের গ্রাহক ও উৎসাহ দাতাগণের দীর্ঘ-জীবন ও পরম শান্তি কামনা করি এবং বর্ত্তমান এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীদ্বারা লুপ্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা করা যায়।

ভূমিকা।

জ্যোতিষশাস্ত্র হিন্দুদের আদরের ধন। প্রগাঢ় ধীশক্তি সম্পন্ন পরমারাধ্য প্রাচীন হিন্দুগণ সেই শাস্ত্র সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। সুতরাং তদ্বিষয়ে অসাধারণ উন্নতি লাভও করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদের সেই পৈতৃক সম্পত্তি ইংরেজ প্রভৃতি অন্যান্য জাতিগণ হস্তগত করিয়া অবিশ্রান্ত আলোচনা দ্বারা কতদুর উন্নতি লাভ করিয়াছেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু আমাদের এমন দুরদৃষ্ট যে, আমাদের সেই পৈতৃকসম্পত্তি পর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছি। তবে সুখের বিষয় আজ কাল অনেকেই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষা আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রই সর্ব্বতোভাবে সকলের নিত্য প্রয়োজনীয় আপনিও সম্ভবতঃ

সেই মতের অনুমোদন করিয়া থাকেন। আমাদের এই হিতকারী জ্যোতিষ বিদ্যা আমাদেরই অনাদরে ধ্বংস হইতেই চলিয়াছিল, অধুনা এদেশ বাসীগণ আবার সেই লুপ্ত শাস্ত্রের সমাদর করিতে শিখিয়াছেন। এই সময়ে উহার সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই আরও অধিকতর আদরনীয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক ও জ্যোতিষ গ্রন্থাভাবে এই নিত্য সন্তোষ-জনক প্রত্যক্ষ জ্যোতিষশাস্ত্রের অধঃপতন হইতে চলিয়াছে, সেই অভাব যত শীঘ্র দূরীকৃত হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর উদ্দেশ্য।

১। লুপ্ত জ্যোতিষশাস্ত্রের বহুল আলোচনা দ্বারা বিবিধ উপায়ে পুনরুদ্ধার।

২। লুপ্ত পৌরানিক ও আধুনিক জ্যোতিষ গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া ও সর্ব্বত্র প্রচার করা।

৩। আবশ্যকীয় জ্যোতিষ গ্রন্থ সকল প্রকাশিত করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে অল্প মূল্যে বিতরণ করা।

৪। জ্যোতিষশাস্ত্র কি? এবং এই শাস্ত্রদ্বারা জগৎ ও জীবনের কি কি কার্য্য সাধিত হয়, তদ্বিষয় আলোচনা ইত্যাদি।

জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যে কোন কার্য্য যাহার আবশ্যক, তিনি জানাইলে প্রত্যেক বিষয় সঠীকভাবে গণনা করিয়া নিয়মিত সময়ে প্রদান করাই এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর মুখ্যোদ্দেশ্য।

এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর-নূতন সৃষ্টি।

১।	সমগ্র গণিতফল কোষ্ঠী,	মূল্য	২৲
২।	বাৎসরিকফল কোষ্ঠী,	”	৫৲
৩।	সাম্মাসিকফল কোষ্ঠী,	”	১০৲
৪।	মাসিকফল কোষ্ঠী,	”	২৫৲
৫।	কোষ্ঠী বিচার,	”	২৲—৪৲
৬।	আয়ুর্দ্দায় গণনা,	”	২৲
৭।	৺নবগ্রহ কবচ,	”	২।০

৮। ৺শনির কবচ " ২৲

৯। রোগীদিগের আরোগ্য ও রোগভোগ হ্রাসের নিমিত্ত ৺নবগ্রহগণকে দৈনিক অর্চ্চনা ও তুলসিদান, মাসিক ৪৲

১০। সরল জ্যোতিষ শিক্ষা ১ম খণ্ড কোষ্ঠী প্রকরণ, ২॥০

১১। সরল জ্যোতিষ শিক্ষা ২য় খণ্ড প্রশ্ন গণনা প্রকরণ " ২॥০

১২। ৩৮ বৎসরের বিশুদ্ধ পুরাতন পঞ্জিকা ২॥০

১৩। জ্যোতি-রত্ন কল্পতরু, কোষ্ঠী বিচার ২॥০

১৪। আজীবন সভ্য " ৫৲

১৫। ছাত্র সভ্য " ৫৲

কোষ্ঠীর প্রকার ও মূল্য।

১। সমগ্র গণিত ফলকোষ্ঠী, পরিমাণ ১৫ ফুট।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

এই কোষ্ঠীতে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি থাকিবে—মঙ্গলাচরণ, ক্ষেত্রকোষ্ঠা চক্র, দিবা ও নিশামান বিভাগ, শুভমস্তু শকাব্দাদি পাঠ, লগ্নমান, তস্য ভোগ্য ও ভুক্তমান নক্ষত্রমান, তস্য ভোগ্য ও ভুক্তমান, জাতদণ্ডমান, ইষ্টদণ্ডমান, রাশিচক্র, জন্মগ্রহকুণ্ডলীচক্র, জন্মলগ্নচক্র, ষাম্নাড়ীচক্র, তৎফল, পূর্ব্বাহঃ, জন্মাহঃ, পরাহঃ, শিশুপতাকীচক্র, তৎফল, গ্রহগণের তাৎকালিক শত্রু-মিত্র-সমচক্র, স্বস্তিত্যাদি পাঠ, লগ্ন স্ফুটশাংদি. ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ত্রিংশাংশ, যামার্দ্ধ, দণ্ডাধিপতি ও বার, তিথি, পক্ষ, যোগ, করণ, কেন্দ্র, তুঙ্গ, গ্রহগণের যোগ বিচার প্রভৃতির ফল, এতদ্ভিন্ন দ্বাদশ ভাব, বিচার ও ফল, তনু, ধন, সহোদর, বন্ধু, পুত্র, রিপু, জায়া, নিধন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয়, ব্যয়, ভাবফল, অষ্টবর্গ, মহাষ্টবর্গ চক্র ও তাহার ফল, সূর্য্য ও চন্দ্রকালানল চক্র, ক্ষেত্রে সিংহাশনচক্র ও ফল, ত্রিপাপ চক্র ও ফল, অষ্টোত্তরীয় দশা ও ফল, এতদ্ভিন্ন রাজযোগ, ধনবান যোগ, সন্ন্যাস যোগ, ভূম্যাধিপতি যোগ, মৃত্যু যোগ ইত্যাদি।

২। বাৎসরিক ফল কোষ্ঠী।

কোষ্ঠীর পরিমাণ ৩০ ফুট, মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

সমগ্র গণিত ফল কোষ্ঠী ও জন্ম বৎসর হইতে মৃত্যু বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরের ফল উল্লেখ থাকিবে।

এতাবৎ জাতকের জন্মের সন, মাস, তারিখ ও সময়ের উপর নির্ভর করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কোষ্ঠী গণনা প্রচলিত রহিয়াছে। তাহাতে সাধারণের অনেকগুলি অসুবিধা ঘটে, প্রথমতঃ ভাষা সংস্কৃত, অনেকে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ হওয়ায় কোনও জ্যোতিষ পণ্ডিতের বিনা সাহায্যে তাহার শুভাশুভ ফল বুঝিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ কোষ্ঠীর শুভাশুভ ফল জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বয়স অনুযায়ী পর পর লিখিত হইয়া থাকে. তাহাতে স্বাস্থ্য, বিদ্যা, ধন, ধর্ম্ম ইত্যাদি সকলই বর্ণিত হয়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকায় কোষ্ঠীর ফল জাতকের স্বয়ং বুঝিতে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে, এস্থলেও বুঝিবার নিমিত্ত একজন জ্যোতির্ব্বিদের দ্বারা সমগ্র জীবনের একটী বিচার (সংক্ষিপ্তসার) করাইয়া লইতে হয়, ফল কথা কোষ্ঠীখানি অধিকাংশ স্থলে জ্যোতিষ পণ্ডিতের সাহায্যে বুঝিতে হয়, আমাদের কোষ্ঠী-সরল বাঙ্গলা ভাষায় স্পষ্ট অক্ষরে প্রতি বৎসরের শুভাশুভ ফল বৎসর বৎসরে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়া থাকে।

৩। ষান্মাসিক ফল কোষ্ঠী।

কোষ্ঠীর পরিমাণ ৬০ ফুট, মূল্য ১০৲ দশ টাকা।

সমগ্র গণিত ফল কোষ্ঠী সমগ্রবাৎসরিক ফল কোষ্ঠী, তাহা ছাড়া প্রতি ছয় মাসের পর পর শুভাশুভ ফল বিশেষ বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়া থাকে।

৪। মাসিক ফল কোষ্ঠী।

কোষ্ঠীর পরিমাণ ৩০০ ফুট, মূল্য ২৫৲ পঁচিশ টাকা।

সমগ্র গণিত ফল ও জন্মমাস হইতে মৃত্যু-মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসে মাসের ফল সরল বাঙ্গলা ভাষায় স্পষ্টাক্ষরে বিষদভাবে লিখিত থাকিবে। এই কোষ্ঠীর সাহায্যে জীবনের সমগ্র শুভাশুভ ফল নিজে নিজেই অবগত হইতে পারিবেন।

কেবল মাত্র পারিশ্রমিক লইয়া এরূপ উচ্চ শ্রেণীর কোষ্ঠী আমরা যে কতদিন বিতরণ করিতে পারিব তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং যত সত্বর পারেন, আপনার পিতার নাম, পিতার কোন পুত্র বা কন্যা উল্লেখ করিয়া জন্মসন. মাস. তারিখ, বার ও সময় পাঠাইবেন, আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। আপনার কত টাকা মূল্যের কোষ্ঠীর আবশ্যক।

৫। কোষ্ঠী বিচার, মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

মানবমাত্রেই ভূমিষ্ঠকাল হইতে দেহাবসান পর্য্যন্ত নিজ নিজ ভবিতব্য ফলজানিতে সতত উৎসুক। একমাত্র জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্বারাই তাহার বিশেষ আভাস পাওয়া যায়, অদ্যকার দিনে প্রত্যেক নগরে নগরে জ্যোতিষী পণ্ডিত গণের অভাব নাই, কিন্তু প্রকৃত সত্য সন্তোষজনক ফলাফল প্রত্যেক বিষয় বলিতে পারে এমন জ্যোতির্ব্বিদের সম্পূর্ণাভাব। অদ্য গত .০ বৎসর যাবৎ অহর্নিশি পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা এক্ষণে লুপ্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধিকাংশ বিষয় উদ্ধার করিয়াছি, কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে পারে অনেকেই কোষ্ঠী বিচার করিয়া সমস্ত ফলাফল সত্যভাবে ব্যক্ত করিতে পারে এমন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত অতি.বিরল। আমাদের বিশ্বাস, অনেকেই স্থল বিশেষে বন্ধুবান্ধবের কথায় কোন কোন নাম করা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট রীতিমত অর্থব্যয় করিয়াও আশাতীত সঠীক সত্যফল অবগত হইতে পারেন নাই। অতএব উক্ত সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত আমরা তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া বর্ত্তমান সময় একটি বিরাট অধিবেশন করিতেছি, অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ (জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রত্যক্ষতা জানিবার জন্য কতবার কত অর্থ দ্বারা প্রতারিত হইয়াছেন) পত্র পাঠ আপনার জন্ম. সন মাস, তারিখ সময় পাঠাইয়া আমাদের নিকট হইতে একবার কোষ্ঠী বিচার করিয়া দেখুন। আমরা জেদ করিয়া বলিতে পারি, ৺জগদীশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, শুভাশুভ সত্যফল অবগত হইতে পারিবে।।

আপনাদের কাহারও কোষ্ঠী বিচার দ্বারা ত্রিকালীন শুভাশুভ ভবিতব্য অবগত হইবার আবশ্যক থাকিলে সত্বর জন্ম, সন, মাস, তারিখ, সময় পাঠাইবেন। জন্ম সময়াদি অবগত না থাকিলে, পুরুষ হইলে দক্ষিণ এবং স্ত্রীলোক হইলে বাম হস্তে কালী লাগাইয়া, কাগজে ছাপ মারিয়া

হস্তরেখার প্রতিকৃতি পাঠাইবেন। কোষ্ঠী বিচার শেষ হইলে আপনার ভূমিষ্ঠকাল হইতে দেহাবসান যাবৎ সম্পূর্ণ ফলাদেশ সরলভাবে লিখিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যাইবে। প্রত্যেক কোষ্ঠী, বিচার সূক্ষ্মভাবে হইবে। আমরা যে সকল ত্রিকালীন গণনা করিব, সমস্ত গণনা সত্য ও সন্তোষজনক হইবে, হস্ত রেখার প্রতিকৃতি পাঠাইলেও শুভাশুভ ফল অবগত হইতে পারিবেন কিন্তু আপনার জন্ম মাস বার অনুমানিক বয়স প্রভৃতি যতদূর স্মরণ আছে, পাঠাইলে বিশেষ নিঃসন্দেহরূপে গণনা করা যাইবে। মহাশয় এই মহাসুযোগ নষ্ট না করিয়া জন্ম সন মাস প্রভৃতি সত্বর পাঠাইবেন। আপনার ঠিকুজি বিচার দ্বারা আপনার ভূমিষ্ঠকাল হইতে দেহাবসান যাবৎ আর্থিক, মানসিক, দৈহিক, সাংসারিক বিস্তারিত ফল অবগত হইতে পারিবেন। প্রত্যেক বিষয় কত বয়সে হইবে, জীবনে কদাপি হইবে কি না, প্রত্যেক বিবরণ বিস্তারিত থাকিবে। তাহা ছাড়া আরও কি কি বিষয় জানিতে পারিবেন, নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

১। আপনার বর্ত্তমান সময় কিরূপ চলিতেছে ?

২। আপনার ভবিষ্যৎকাল কি প্রকার হইবে ?

৩। আপনার বিবাহের ফল কি ? অর্থাৎ আপনি বিবাহ করিবেন কি না ? কয়টী বিবাহ করিবেন ? বিবাহ করিলে সুখী হইবেন কি না ? পত্নী রূপবতী, পতি-ভক্তি পরায়ণা ও বাধ্য হইবে কি না ? বিবাহ কত বয়সে হইবে, স্ত্রী ভাগ্যবতী লোকাদরী হইবে কি না ? রুগ্না কি কান্তিযুক্তা হইবে, স্ত্রী দ্বারা মাতা পিতা প্রভৃতি সুখী হইবেন কি না ? স্ত্রী বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী এবং শিল্পবিদ্যানিপুণা হইবে কি না ? কলহপ্রিয়া হইবে কি না ? স্ত্রী-বিষয় বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

৪। আপনি চাকুরী করিবেন কি না ? (অর্থাৎ আপনি কোন কার্য্য করিবেন এবং কি কাজে আপনার উন্নতি হইবে ? ব্যবসায়াদি কর্ম্মে আপনার কি প্রকার উন্নতি ? করিবে সুখী হইতে পারিবেন কি ? অর্থাগম কত দিনে ? আপনার কার্য্যস্থল দেশে কি বিদেশে হইবে ? দূরদেশে কার্য্য করিলে সম্ভ্রমের সহিত পরিবারবর্গসহ থাকিতে পারিবেন কি না ? আপনি যে কাজ করিতেছেন তাহা কত দিন স্থায়ী ও কত বয়সে শেষ হইবে ? কার্য্যের পরিণাম ফল কি ?

৫। পিতা মাতা, গুরুজনের (অভিভাবকের) সহিত আপনার কিরূপ

সম্বন্ধ থাকিবে? অর্থাৎ পিতা মাতা গুরুজন প্রভৃতির প্রিয়পাত্র হইতে পারিবেন কি না, তাঁহাদিগকে যত্ন করিতে পারিবেন কিনা, কত বয়সে তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারিবেন ও আপনার উন্নতি সময়ে পিতা মাতা জীবিত থাকিবেন কি না ইত্যাদি বিবরণ বিস্তারিত জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

৬। আপনার বিদ্যাশিক্ষার ফল কি? অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিবেন কি না? কত বয়স যাবৎ লেখাপড়া (বিদ্যাধ্যয়ন) করিবেন? বিদ্যার্জ্জনে খরচ অভি ভাবকগণ রীতিমত চালাইবেন কি না, কোন্ বিদ্যায় আপনার উন্নতি হইবে? জীবনে শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত অবগত হইতে পারিবেন।

৭। আপনি পরোপকার করিতে পারিবেন কি না? উপকারের পর প্রত্যুপকারে বঞ্চিত হইবেন কি না? ইত্যাদি বিবরণ।

৮। আপনার বন্ধু বা মিত্র চিরস্থায়ী হইবে কি না? অর্থাৎ মিত্র দ্বারা সুখী হইবেন কি না? আপনাদের গুপ্ত প্রণয় ক্ষণিক কি চিরস্থায়ী? এই প্রণয়ের পরিণাম কি? ইহা দ্বারা কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা আছে কি না? কোন সময়ে কোন মিত্র কিম্বা বন্ধুলোক কর্ত্তৃক অপমানিত, লাঞ্ছিত, শোকসন্তপ্ত বা মনঃকষ্ট, দেহ ও অর্থহানিকর কোন কার্য্য হইবে কি না? ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ।

৯। আপনার অভিলষিত কর্ম্ম উদ্ধার হইবে কি না? আপনি যে কাজে তৎপর আছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য ও যশস্বী হইতে পারিবেন কি না? আপনি কাহাকে কোন কথা বলিলে সে তাহা রাখিবে কি না? আশায় বঞ্চিত হইবেন কি না? নিরাপদে কার্য্যটী শেষ হইবে কি না?

১০। আপনার কারাবাস কিম্বা রাজদণ্ডনীয় যোগ আছে কি না? যদি থাকে তবে তাহা কি কারনে? মোকদ্দমায় আপনার জয় হইবে কি না? যদি এবারে জয়ী না হন, তবে পুনর্ব্বিচারে কিম্বা আপীলে সুফল ফলিবে কি না? আপনার আত্মীয় অংশীদারগণ আপনাকে ঠকাইবে কি না? যদি আপনি জানিতে পান যে তাহারা আপনাকে ঠকাইতেছে, তখন কি উপায় উদ্ভাবন করিলে তাহাদের বঞ্চনা হইতে মুক্তি পাইবেন?

১১। আপনি যশস্বী, সম্মানী, লোকপ্রিয়, কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও উচ্চ পদবিশিষ্ট, এবং ভূম্যধিপতি হইবেন কি না? কোন স্থায়ী কীর্ত্তিলাভে সমর্থ হইবেন কি না? সৎকর্ম্মে কোন বাঁধা বা কোন লোক কর্ত্তৃক কোন প্রতিবন্ধক ঘটিবে কি না?

১২। আপনার ধর্ম্মবল কিরূপ? অর্থাৎ ঈশ্বরের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি থাকিবে কি না? স্বদেশ ব্রতে কৃতকর্ম্মা হইয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন কি না, আপনার তীর্থ পর্য্যটন যোগ আছে কি না? যদি থাকে, তবে তাহা কবে সাধিত হইবে? আশ্রিতকে রক্ষা করিতে, দরিদ্রকে দান করিতে এবং গুরুজনদিগকে ভরণপোষণ, শ্রদ্ধা ও ভক্তিদ্বারা প্রীতি করিতে পারিবেন কি না? ইত্যাদি।

১৩। আপনি যাহাকে ভালবাসেন সে আপনাকে ভালবাসে কি না? অর্থাৎ আপনি যাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী সে আপনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী কি না? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার স্থায়ীত্ব কতদিন এবং ইহার দ্বারা কাহারও কোন অনিষ্টপাতের আশঙ্কা আছে কি না? আপনার লাম্পট্যদোষ প্রভৃতি কোন প্রকারের কলঙ্কদ্বারা কলঙ্কণীয় হইবে কি না? যদি হয়, তাহা কি কোন লোকের পরামর্শে বা নিজ হইতেই উৎপন্ন হইবে? ইত্যাদি।

১৪। আপনার ঘর বাড়ী কি প্রকার হইবে? বহুলোক প্রতিপালন করিতে পারিবেন কি না?

১৫। আপনার মানসিক উদ্বেগ ও অশান্তি দূর হইয়া চিত্ত স্থির হইবে কি না? দুশ্চিন্তার কারণ কি? যাহার দ্বারা চিত্ত চঞ্চল, তাহার দ্বারা আপনার প্রিয় কি অপ্রিয় সাধিত হইবে? যদি হয়, তবে তাহা কবে ভাল হইবে, আর যদি অপ্রিয় হয় তাহাতে আপনার কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হইতে পারে?

১৬। আপনার স্বাস্থ্য কি প্রকার থাকিবে? বর্ত্তমান পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইবেন কি না? যদি পান কতদিনে? আপনার এ রোগের কারণ কি? কোন চিকিৎসায় সত্বর আরোগ্য সম্ভাবনা? এই রোগের সম্পূর্ণ ভোগ কত দিন? কোন্ গ্রহ কর্ত্তৃক আপনি এই পীড়ায় পীড়িত। এবার অব্যাহতি পাইলে পুনঃ এই কিম্বা অন্য কোন রোগাক্রান্ত হইবেন কি না? হইলে কতদিন পর ইত্যাদি।

১৭। আপনার পরমায়ু কতদিন? কোথায় কি রোগে ও কি অবস্থায় আপনার দেহবসান হইবে? স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয়গণের মঙ্গল দর্শন করিয়া মৃত্যু হইবে কি না? আপনার মৃত্যুর পরিণাম কি ইত্যাদি।

১৮। আপনাকে কোন সময়ে কোন কার্য্য বশতঃ ঋণী হইতে হইবে কি না! যদি ঋণী না হন, তবে তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন কি না?

যাহার নিকট ঋণী, সে আপনাকে কোন প্রকারে অপমানিত করিবে কি না? কত দিনে অঋণী হইবেন।

১৯। আপনি সংসারে ভ্রাতা, ভগ্নী, পরিবার ও পুত্র প্রভৃতি দ্বারা সুখী হইতে পারিবেন, কি না? ভ্রাতাগণসহ একসঙ্গে থাকিতে পারিবেন কি না? যদি না থাকিতে পারেন তবে কতদিনে পৃথক হইবেন? তাঁহারা আপনার অংশে কোন তঞ্চকতা করিবেন কি না।

২০। আপনি কাহারও কোন সম্পত্তি পাইবেন কি না? নিজবাহুবলে উপার্জ্জন করিয়া সকলে প্রীতি উৎপাদন পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন কি না? কি উপায়ে অর্থোপার্জ্জনে বিশেষ লাভবান হইবেন, বর্ত্তমানে যে আয় হইতেছে, তাহা বাড়িবে কি না? কমিলে আপনাকে কি কোন প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে। অর্থক্ষীণতায় কাহারও কোন সাহার্য্য পাইবেন কি না।

৬। আয়ুর্দ্দায় গণনা, ২৲ মাত্র।

কোন্ মাসের কোন্ তারিখে, কোথায়, কি অবস্থায়, দেহাবসান হইবে, তাহা নিশ্চয়রূপে অদ্য যাবৎ কোন সুবিজ্ঞ জ্যোতিষী বলিতে সমর্থ হন নাই। কেবল পূর্ণায়ু, মধ্যায়ু, অল্পায়ু, এরূপ অনুমানিক মৃত্যু সময় বলিয়া থাকেন। এ অভাব দূরীকরণার্থে আমি প্রত্যহ গুপ্তভাবে কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট কেম্বেল হাঁসপাতালে ও মেওহাঁসপাতালের প্রত্যেক রোগীদিগের আয়ু গণনা করিয়া ৩ বৎসরের চেষ্টায় করুণাময় জগদীশ্বরের কৃপায় মৃত্যুকালীন সময় নির্ণয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি। এমন কি, কলিকাতার খ্যাতনামা কএকজন লোকের মৃত্যু গণনার দিন স্থির করিয়া রীতিমত প্রসংসাপত্র ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি। সম্প্রতি লাইফ এণ্ড সিফ ইন্‌সিওর কোম্পানির মৃত্যু-গণনার কার্য্যে নিযুক্ত আছি। অতএব আপনাদের কাহারও মৃত্যুকাল নির্ণয় আবশ্যক থাকিলে সত্বর জন্ম সন, মাস প্রভৃতি হস্ত রেখার প্রতিকৃতি পাঠাইবেন।

৭। ৺নবগ্রহ বৈগুণ্য প্রতিকারের নিমিত্ত ৺নবগ্রহ কবচ, মূল্য ২৷০ আনা মাত্র।

নবগ্রহিকা ধাতু ও গ্রহৌষধি এবং বহু মূল্য প্রকৃত রত্নাদি সংগ্রহ করিয়া বিধিমতে বীজ মন্ত্র ও যন্ত্রাদি পুরশ্চরণ পূর্ব্বক ৺নবগ্রহ কবচ প্রস্তুত করা

হইতেছে, আপনাদের কাহারও নবগ্রহ বৈগুণ্য প্রতিকারের আবশ্যক থাকিলে একটী কবচ দক্ষিণ বাহুমূলে ধারণ করিতে পারেন। মানব মাত্রেরই গ্রহ বৈগুণ্য আছে। গ্রহগণ প্রতিকুল হইলে মানবের কি প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতে হয়, তাহা হয়ত অধিকাংশ লোকেই অবগত আছেন। আবার গ্রহগণ সানুকুল হইলে মানবের কি প্রকার সুখস্বচ্ছন্দতা, ভূমি, বিত্ত, অর্থ, আরোগ্য ও যশঃ লাভ ঘটে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। প্রকৃত একটী ৺নবগ্রহ কবচ প্রস্তুত করিতে অনেক অর্থ ব্যয় ও কষ্ট সাধ্য, একত্রে কতকগুলি কবচ প্রস্তুত করিতেছি বিধায় এত অল্প মূল্যে এই কবচ বিতরণ করিতেছি। এই ৺নবগ্রহ কবচ ধারণ করিলে অবশ্যই গ্রহ বৈগুণ্য প্রতিকার হইয়া দুঃসময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ৺নবগ্রহ কবচ গ্রহদোষ শান্তির একমাত্র শ্রেষ্ঠ কল্প। বঙ্গভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই একমাত্র আমাদের প্রস্তুত বিশুদ্ধ ৺নবগ্রহ কবচ ব্যবহার হইতেছে। আপনাদের গ্রহবৈগুণ্য প্রতিকারের নিমিত্ত ৺নবগ্রহ কবচ ধারণের আবশ্যক থাকিলে সত্বর নাম ও গোত্র পাঠাইবেন।

ব্যবহার বিধি ও জটিল নহে; একমাস কাল কবচ ধারণে, দুঃসময়ের পরিবর্ত্তন না ঘটিলে রসিদ সহ কবচ ফেরৎ লইয়া মূল্য ফেরৎ দিব।

৮। ৺শনির কবচ, মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

গ্রহগণ নিজ নিজগতি দ্বারা সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেছেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে মানবের সুখ দুঃখেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; জ্যোতিষোক্ত গ্রহগণের গতির নিয়মানুসারে চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র গ্রহ দ্বারা শুভ ফল, রবি মঙ্গল শনি রাহু, কেতু গ্রহ দ্বারা অশুভ ফল হইয়া থাকে। পুরাণাদি ও ইংরাজি মতে শুভ গ্রহের মধ্যে বৃহস্পতি, পাপ গ্রহের মধ্যে শনিগ্রহ দেবতাকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গ্রহ নিরূপণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গ্রহযামলে, মহানির্ব্বান ও সাধু সঙ্কলিন তন্ত্রে শনিগ্রহ দেবতারই সর্ব্ববিধ প্রকারে শুভ বা অশুভ ফল দান করিবার অধিকার ও প্রতাপ অধিকতর রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ. করিয়াছেন। মানবমাত্রেই সুসময়ের পর হঠাৎ দুঃসময়ে পদার্পন করেন কেন? কেনই বা অন্ন, বস্ত্র, অর্থ কষ্ট না থাকিলেও মনকষ্ট বা দেহকষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন? কেনই বা নিশ্চিত কার্য্যের পণ্ডতা ঘটে? কেনই বা সম্ভবিত কার্য্য অসম্ভবে দাঁড়ায়; কেনই বা আশার নৈরাশ্য হইয়া চিত্তকষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন? কেনই বা সুহৃদ্ভেদ ও প্রত্যুপকারে বঞ্চিত হইতেছেন? উদ্বিগ্নতা অকাল

মৃত্যু, অনর্থ কলহ, স্থায়ী অর্থ নাশ, প্রাপ্য অর্থে বঞ্চিৎ ও যশের অভাব ঋণ দায় জড়িত একমাত্র এই সর্ব্বজন পরিচিত আরোগ্য দাতার প্রিয়পুত্র শনিগ্রহ দেবতা দ্বারাই সংঘটীত হয়।

বলা বাহুল্য নল রাজা, শ্রীবৎস্য রাজা প্রভৃতির বহুবিধ উপাখ্যান দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার শনিগ্রহ সন্তোষ হইলে পূর্ব্ব কথিত বিষয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া সুখ, স্বচ্ছন্দতা, উন্নতি, অর্থাগম, যশঃবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই শনিগ্রহ দেবতাকে সুপ্রসন্ন রাখিতে পারিলেই অপর কোন গ্রহের প্রকোপে কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, সুতরাং শনিগ্রহের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে একমাত্র শনির কবচ ধারণই একান্ত কর্ত্তব্য।

এই শনির কবচ ধারণ করিয়া অনেক সংসারের আশ্চর্য্য দুঃসময়ের পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়াছি। আমাদের প্রতিষ্ঠিত ৺নবগ্রহ দেবতার দৈনিক অনুষ্ঠানের মধ্যে শনিবার দিবসই বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এমন কি শনিগ্রহের এবং তাহার অধিপতি প্রত্যাধিপতি ও ইষ্ট দেবীর অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত প্রতি শনিবারে হইয়া থাকে,পরে হোমান্তে ৺শনিরকবচ প্রস্তুত হয়। সাময়িক ফল অশুভ হইলে তাহার পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত—৺শনিগ্রহের কবচ ধারণ একান্ত কর্ত্তব্য। আপনাদের কাহারও শনিদেবতার প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার আবশ্যক থাকিলে—নাম ও গোত্র লিখিবেন। শনিবার দিবস কবচ প্রস্তুত করিয়া সোমবার দিবস লৌহ নির্ম্মিত শনির কবচ (অগ্রিম টাকা না পাঠাইলে) ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইব।

৯। পীড়িত ব্যক্তিগণের আরোগ্য ও রোগের-ভোগকাল হ্রাসের নিমিত্ত ৺নবগ্রহগণকে তুলসী দান—

রোগের ভোগ গ্রহের প্রকোপে। এই কথা সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর লোককেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। গত বৎসর কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদীয় সম্মিলনে নানা দেশীয় উচ্চ শিক্ষিত চিকিৎসকগণ উপস্থিত ছিলেন, বক্তৃতার স্থলে অনেকেই এক বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রহ বৈগুণ্য হেতু দুঃসময়, দুঃসময় হইতে দুর্ম্মতির সৃষ্টি, দুর্ম্মতি হইতে দুঃস্কার্য্য, দুঃস্কার্য্য দ্বারা পাপের আবির্ভাব, পাপ হইতে রোগ, ভোগ হইয়া থাকে, অতএব যতদিন যাবৎ গ্রহ-গণের অশুভ দৃষ্টি ভোগ হইতে রক্ষা না পাইবেন ততদিন যাবৎ যতপ্রকার

চিকিৎসা করুন না কেন কোন প্রকারেই রোগের আরোগ্য সম্ভবেনা নাই। বরং ঔষধের ফলে রোগ কিছুকাল দমন থাকিতে পারে, কিন্তু রাশিগত গ্রহের ভোগের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকারেই রোগারোগ্য সম্ভবেনা। গ্রহ কর্ত্তৃক মানবের অনেক সময় কোন প্রকার শয্যা সায়িত অশুভ পীড়া না হইলেও সর্ব্বদা অসুস্থ ও দুর্ব্বলতা বোধ করিয়া থাকেন, যে কোন পীড়া হউক না কেন, দীর্ঘকাল ভোগ কষ্টের দায় হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, নবগ্রহগণকে তুলসী দান করা একান্ত কর্ত্তব্য। নবগ্রহগণকে দৈনিক তুলসী দান করিতে হইলে রোগীর নাম ও গোত্র পাঠাইবেন। গ্রহগণকে তুলসী দানের নিমিত্ত মূল্যাদির বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই তবে ন্যূন কল্পে দৈনিক নবৈদ্যাদির জন্য /০ দক্ষিণা /০ হিঃ দিতে হইবে। ৮ দিবস কাল তুলসী দান করিলে রোগীর রোগ আর বৃদ্ধি হইতে পারিবে না—২ সপ্তাহ কাল তুলসী দান করিলে রোগী আরোগ্য হইতে থাকিবে—১ মাসের অধিক কাহারাও রোগারোগ্যের জন্য তুলসী দিতে হয় না। ১ মাস কাল তুলসী দান করিলে যত দিনের ভোগ যুক্ত যে কোন রকম রোগ থাকুক না কেন, নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। তুলসী দানের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসায় ঔষধের ক্রিয়াও আশাতীত করিবে, নানা স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোক নবগ্রহগণকে তুলসীদানের ফলে রোগ মুক্ত হইয়া, বাৎসরিক পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য আমাদের বিশেষ অনুরোধ আপনাদের কাহারও অথবা স্থানীয় বা আত্মীয় ব্যক্তির মধ্যে যে কোন পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তি থাকুক না কেন, নাম ও গোত্র পাঠাইয়া ২ সপ্তাহকাল মাত্র তুলসী দান করিয়া দেখুন, নিশ্চয়ই কঠিন পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তিও আরোগ্য হইয়া সুস্থ ও সবল প্রাপ্তি হইবেন।

১০। সরল জ্যোতিষ শিক্ষা।

আজ কাল জ্যোতিষ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা সকলেরই দেখা যায়, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবেই হউক বা জটিল শাস্ত্র শিক্ষা করিতে পারিবনা এই আতঙ্কেই হউক, ইচ্ছা সত্বেও প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে। যাহাতে অনায়াসে সরলভাবে নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ জ্যোতিষ শাস্ত্রের "কোষ্ঠী প্রকরণ, কোষ্ঠী বিচার ও প্রশ্ন গণনা শিক্ষা করিতে পারা যায়, তদুদ্দেশে সরল জ্যোতিষ শিক্ষা প্রকাশিত করিলাম। যদি ঘরে বসিয়া নিজের ও আত্মীয় স্বজনের ত্রিকালীন শুভাশুভ

জ্ঞাত হইতে চান, তবে সরল জ্যোতিষ শিক্ষা অভ্যাস করুন। আপনি চিন্তা করিতেছেন কেন? আপনার কি জ্যোতিষ শিখিবার অবকাশ নাই? কিম্বা জটিল জ্যোতিষ শিক্ষার শ্রম বোধ হইবে বলিয়া ইতঃস্তত করিতেছেন। আপনি চিন্তা করিবেন না, প্রত্যহ এক ঘণ্টাকাল অধ্যয়ন করিলে এক মাস মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোষ্ঠী প্রস্তুত ও বিচার প্রণালী শিক্ষা করিতে পারিবেন। যে কোন প্রকার সহজ নিয়মে হউক, এমন ভাবে শিক্ষা দিব, যাহাতে আপনার শিক্ষাকালীন পুনঃ প্রশ্ন করিতে না হয়, মনে করিবেন যেন অধ্যাপক মহাশয় সম্মুখে বসিয়া অধ্যাপনা করাইতেছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে বহুবিধ গণনা আছে, তন্মধ্যে কোষ্ঠী গণনা, কোষ্ঠী বিচার গণনা ও প্রশ্ন গণনাই মানবের নিত্য প্রয়োজনীয়। সুতরাং যাহাতে সর্ব্ব সাধারণের নিত্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি বিনা গুরুপদেশে সহজে অবগত হইতে পারেন, তাহা সহজ সাঙ্কেতিক গণনার নিয়মে, অতি সরলভাবে কোষ্ঠী প্রকরণ, কোষ্ঠী বিচার ও প্রশ্ন গণনা শিক্ষা করিতে পারিবেন। ভরসা করি শিক্ষার্থীগণ প্রত্যক্ষ জ্যোতিষশাস্ত্রের জটীল গণনা সকল অল্প সময়ে শিক্ষা করিয়া নূতন একটী মূল্যবান জীবনের সৃষ্টি করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া আপনি আপনার ও মিত্রগণের পরিবার বর্গের প্রত্যেকের জীবন চরিত অন্ধকার কি উজ্জলপূর্ণ তাহা সম্যক প্রকারে যাবজ্জীবন অবগত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ অল্প শিক্ষিত জ্যোতিষী মহাশয় দিগের গণনার ত্রুটী দেখাইয়া সর্ব্বত্র আনন্দ ও যশের অধিকারী হইবেন। নিজেকে নিজে সন্তোষ রাখিতে এবং সর্ব্বত্র সমাদর পাইতে এক মাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রই অত্যুজ্জ্বল রত্ন। সত্বর শিক্ষার্থী শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়া সরল জ্যোতিষ শিক্ষা প্রণালী পত্রিকা গ্রহণ করুন। ৪ সপ্তাহে আপনাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সমগ্র শিক্ষা, করাইব। বহু জটীল গণনা সকল ৪ সপ্তাহে শিক্ষা অসম্ভব কল্পনা করিয়া মূল্যবান লুপ্তরত্ন হেলায় নষ্ট করিবেন না। সমগ্র কোষ্ঠী গণনা কোষ্ঠী বিচার ও প্রশ্ন গণনা শিক্ষা করিতে আপনাকে মোট ৫৲ টাকা খরচ দিতে হইবে। তাহার সমগ্র খরচ আপনাকে অগ্রিম দিতে হইবে না। প্রথমতঃ ২॥০ টাকা খরচে সমগ্র শিক্ষা প্রণালী পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র শিক্ষান্তে ২॥০ (আড়াই টাকা) দিতে হইবে। যদি কোন শিক্ষার্থী অর্থ খরচ করিয়া ঘরে বসিয়া একমাত্র পত্রিকার সাহার্য্যে এই জটিল বিশাল শাস্ত্র বিনাগুরুপদেশে শিক্ষা করিতে পারিব কি না ইতস্ততঃ করিয়া সময় নষ্ট করিতেছেন,

তাহাদিগের নিকট বিশেষ অনুরোধ যে ৵১০ মূল্যের ষ্ট্যাম্প সহ পত্র লিখিলে কোষ্ঠীর আদর্শ ১ম সিট, সংজ্ঞা প্রকরণ বা জ্যোতিষ শিক্ষার ১ম পত্রিকা, যাহা ১ম শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ জটিল তাহা আমি বিনামূল্যে পাঠাইব। শিক্ষার্থীগণ সংজ্ঞা প্রকরণ বা ১ম শিক্ষা পত্রিকা শিক্ষা করিতে পারিলে আর ভবিষ্যৎ শিক্ষার পক্ষে কোন প্রকার কঠিন বোধ হইবে না।

সরল জ্যোতিষ শিক্ষার-সাধারণ বিবরণ।

১। কোষ্ঠীর আদর্শ ১ খানি ডিমাই হাপসিট ৮ কর্ম্মা হরিদ্রা রংএর কাগজ নানা প্রকার চক্রাদিতে রঞ্জিত।

১। সংজ্ঞা প্রকরণ অর্থাৎ কোষ্ঠী গণনা শিক্ষা করিতে কি কি বিষয় পূর্ব্বে অবগত হওয়া আবশ্যক তাহা বিশদ ভাবে সরল বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

৩। কোষ্ঠী গণনা শিক্ষার ১ম খণ্ড। এই খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি থাকিবে।

(ক) গ্রহাধিপতি চক্র (খ) জাতাহঃ পরাহঃ বা পূর্ব্বাহঃ (গ) শিশু-পতাকী (ঘ) শুভমস্ত শকাব্দাদি (চ) দিনমান নিশামান বিবরণ (ছ) বাঙ্গলা সন ও খৃষ্টাব্দ। (জ) লগ্নমান, ভুক্ত প্রাপ্তমান (ঝ) নক্ষত্রমান ও ভুক্ত ও প্রাপ্তমান (ট) ইষ্টদণ্ডমানং (ঠ) লগ্নস্ফুটঃ মানং।

৪। কোষ্ঠী গণনা শিক্ষা,২য় খণ্ড। এই খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে।

(ক) ষন্নাড়ীচক্র (খ) রাশিচক্র গ্রহ সন্নিবেশ (গ) সস্তিত্যাদি পাঠ (ঘ) ষড়্বর্গঅধিপতি গ্রহ (চ) পিতা প্রপিতার নাম (ছ) রাশ্যাশ্রিত নাম (জ) রাশি, বর্ণ ও গণ নির্ণয়।

৫। কোষ্ঠি গণনা শিক্ষা ৩য় খণ্ড। এই খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি আছে।

(ক) ষড়্বর্গ ফল (খ) রাশিফল (গ) নক্ষত্রফল (ঘ) বর্ণফল (চ) গণ ফল (ছ) তিথিফল (জ) বারফল (ঝ) কেন্দ্রফল (ট) ভুক্তফল (ঠ) যোগফল (ড) লগ্নফল (ঢ) গ্রহসংস্থানানুযায়ী ফল (ণ) তাৎকালীক শত্রু মিত্র চক্র

৬। কোষ্ঠী গণনা শিক্ষা ৪র্থ খণ্ড। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে।

(ক) অষ্টবর্গ গণনা (খ) মহাষ্টবর্গ গণনা (গ) অষ্টবর্গের ফল।

৭। কোষ্ঠী গণনা শিক্ষা ৫ম খণ্ড। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে।

(ক) জাতচক্র গণনা (খ) জাতচক্রের ফল (গ) ক্ষেত্র সিংহাসন চক্র (ঘ) চন্দ্রকালানল চক্র ও ফল।

৮। কোষ্ঠী গণনা শিক্ষা, ৬ষ্ঠ খণ্ড। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে।

(ক) সূর্য্যকালানল চক্র ও ফল (খ) পঞ্চস্বরা গণনা ও ফল (গ) সপ্ত-শূন্য গণনা ও ফল (ঘ) ত্রিপাপ চক্র।

৯। কোষ্ঠী গণনা শিক্ষা, ৭ম খণ্ড। এই খণ্ডে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আছে।

(ক) ত্রিপাপচক্রের ফল।

১০। কোষ্ঠী গণনা শিক্ষা, ৮ম খণ্ড। এই খণ্ডে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি আছে।

(ক) শয়নাদি দ্বাদশ ভাব (খ) ঐ ফল (গ) দশা গণনা (ঘ) দশা গণনার ফল।

১১। সরল জ্যোতিষ শিক্ষা।

২য় খণ্ড।

২। প্রশ্ন গণনা।

লগ্ন ও গ্রহগণের যোগাযোগে কোষ্ঠী বিচার দ্বারা মানব জীবনের শুভা-শুভ ঘটনা বিশদ ভাবে অবগত হইতে পারিবেন।

১। কোষ্ঠী বিচার।

প্রশ্ন গণনা দ্বারা ত্রিকালীন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালের শুভাশুভ সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। তাহা ব্যতীত কতকগুলি সাঙ্কেতিক উদ্ভট গণনা শিক্ষা করিতে পারিবেন। যদ্দ্বারা কৌতুক স্থলে বা সমবেত মিত্রবর্গের স্থলে রহস্য জনক প্রত্যক্ষ গণনায় সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের ও আপনার শিক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করিবে। প্রশ্ন গণনার নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি থাকিবে।

(১) বিবিধ গণনা (২) প্রশ্ন গণনা (৩) ফলাফল গণনা (৪) রোগীর জীবন মরণ গণনা (৫) তান্ত্রিক প্রশ্ন গণনা (৬) লাভ ও ক্ষতি গণনা (৭) সুখ দুঃখ গণনা (৮) যুদ্ধে জয় পরাজয় গণনা (৯) গমনাগমন গণনা (১০) জন্ম ও মৃত্যু গণনা (১১) গর্ভসঞ্চার গণনা (১২) যাত্রার শুভাশুভ গণনা (১৩) লাগ্নিক প্রশ্ন গণনা (১৪) শত্রু হইতে জয় পরাজয় গণনা (১৫) কার্য্য সিদ্ধি গণনা (১৬) কার্য্য সিদ্ধির কাল গণনা (১৭) বিবাহ গণনা (১৮) প্রবাসীর কুশল গণনা (১৯) সন্তান গণনা (২০) পুত্র কন্যার সংখ্যা গণনা (২১) পরধন

লাভ গণনা (২২) সধবা বিধবা গণনা (২৩) উত্তম নারী গনণা (২৪) রাক্ষসী বিদ্যানুযায়ী প্রশ্ন গণনা (২৫) দুরদেশীয় অর্থ লটারী গণনা (২৬) সত্যমিথ্যা গণনা (২৭) খেলা দ্বারা অর্থ পাইব কি না গণনা (২৮) মোকর্দ্দমা গণনা (২৯) ব্যবসা করিলে লাভবান হইব কি না (৩০) বিদ্যাশিক্ষা গণনা (৩১) অন্নাধিক প্রাপ্তি গণনা (৩২) মানসিক চিন্তা গণনা (৩৩) যশাপযশ গণনা (৩৪) নষ্টদ্রব্য গণনা ইত্যাদি।

১২। ৩৮ বৎসরের বিশুদ্ধ পুরাতন পঞ্জিকা।

দেশীয় হরিদ্রাবর্ণের কাগজে হস্তাক্ষরে লিখিত ৮৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রতি দিবসের সূর্য্যোদয়াস্ত গ্রহগণের অতিচার, চক্রাতিচার, সঞ্চারগণনা, ইংসন মাস,তারিখ,বাঙ্গালা দিবামান বিভাগ ও দিন চন্দ্রিকা মনে পঞ্চাঙ্গ সধান করা হইয়াছে। পঞ্জিকা খানি জ্যোতিষী পণ্ডিত ও জ্যোতিষশিক্ষার্থীগণের বিশেষ প্রয়োজন। মূল্য ২৷৷৹ টাকা মাত্র।

১৩। জ্যোতী-রত্ন কল্পতরু, কোষ্ঠী বিচার।

১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে মূল্য ২৷৷৹ টাকা মাত্র।

জ্যোতী-রত্ন কল্পতরু—সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়েরর আদরের ধন ও জ্যোতিষ ভাণ্ডারের অত্যুজ্জ্বল রত্ন। ইহা দ্বারা বিনা গুরূপদেশে ভূত,ভবিষ্যত বর্ত্তমান কালের সমস্ত শুভাশুভ ঘটনার নিরূপণ, কোষ্ঠী প্রস্তুত, কোষ্ঠী বিচার দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি গণনা, নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার, কপাল কোষ্ঠী, শাল্যাদ্ধার, রত্নোদ্ধার, বৎসর, মাস, দিন ফল কোষ্ঠী প্রস্তুত, অষ্টাদশ প্রকার প্রশ্ন গণনা, উদাহরণ সহ এবং জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ বিনা গুরূপদেশে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন।

এই পুস্তকখানি ৪৮০ পৃষ্ঠায় ২০ পাউণ্ড ডিমাই কাগজে আট পেজি ২ খণ্ডে ১০ম অধ্যায় সম্পূর্ণ। ১ম অধ্যায় সংজ্ঞাপ্রকরণ ৫০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, ইহাতে প্রত্যেক সংজ্ঞায় সংস্কৃত শ্লোক এবং বিষদ বঙ্গানুবাদ তৎসঙ্গে টেবিল চক্রাদি ৪ প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষার্থিদিগের পক্ষে বিশেষ সরল শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২য় অধ্যায়। লগ্নপ্রকরণ ৫১—৮৪ পৃঃ পর্য্যন্ত লগ্ন সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ

লগ্ন স্ফুটাংশ লগ্নাদির পরিমাণ কি উপায় উদ্ভাবণ করিলে নিশ্চিত লগ্ন বাহির করা যায়; হোরারত্ন মতে লগ্ন ফল, মোট কথা লগ্নাদির বিষয় ৪ প্রকার উদাহরণ সহ বিশেষ সরল ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩য় অধ্যায়। রিষ্টি প্রকরণ, রিষ্টি শব্দের অর্থ চলিত কথায় বিঘ্ন বা ফাঁড়া বলে। রিষ্টি নানাবিধ। তন্মধ্যে যে সকল রিষ্টি দ্বারা জাতকের শারিরিক সুস্থাসুস্থ রোগ, শোক, পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পত্নি, পুত্র, কন্যার রোগাদি ও তাহার কাল নির্ণয় করা যায় তদ্বিষয়ে মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ বর্ণিত হইয়াছে।

৪র্থ অধ্যায় বিবিধ গণনা। ১২০—১৪৪ পৃঃ পর্য্যন্ত। এই অধ্যায়ে জাতকে শুভাশুভ জানিবার নানা উপায় সরল বাঙ্গালা ভাষায় চক্রাদি দ্বারা বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে—তাহা ছাড়া রাক্ষসী বিদ্যানুসারে মানবের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিবার উপায়।

৫ম অধ্যায় ষড়বর্গ প্রকরণ ১৪৫—১৮৮ পৃঃ পর্য্যন্ত ষড়বর্গ গণনার প্রণালী ও তাহার ফলাফল, লগ্ন ও ষড়বর্গ সারণী, চক্রাদি বিস্তৃত ভাবে মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ জন্মরাশি, নক্ষত্র, বার, তিথি করণ প্রভৃতির ফল লিখিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়। ষষ্ঠ অধ্যায় বিবিধ ফল প্রকরণ ১৮৯—২৭২ পৃঃ পর্য্যন্ত এই অধ্যায় ফলিত জ্যোতিষের যাবতীয় ফলাফল লিখিত এমন কি গ্রহগণের শয়নাদি দ্বাদশ ভাব পর্য্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ধনবান যোগ, রাজ যোগ, তীর্থযাত্রা যোগ, মৃত্যু যোগ, অঙ্গহাণি যোগ, ইত্যাদি সরল বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

জ্যোতী-রত্ন কল্পতরু, কোষ্ঠী বিচার
(২য় খণ্ড)

১ম অধ্যায়। এই ২য় খণ্ডের ১ম অধ্যায়ে গর্ভস্থ কোষ্ঠী গণনা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায়, প্রসূতির কি সন্তান,কোন মাসের,কোন তারিখে,কখন কি অবস্থায় জন্মিবে, তদ্বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইছে; গর্ভস্থ কোষ্ঠী গণনা শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীগণ বিশেষ আনন্দিত হইবেন।

প্রশ্ন গণনা ১২৫ প্রকার তাহা ছাড়া খনার বচন সমগ্র লিখিত রহিয়াছে।

২য় অধ্যায়। এই অধ্যায়ে অষ্টবর্গ ও মহাষ্টবর্গ গণনা, অষ্টবর্গ—বিচার দ্বারা সন্তান, আয়ু, ধন, মান প্রভৃতি ফলাফল জ্ঞান।

৩য় অধ্যায়। গ্রহগণের সঞ্চারগত গোচর ফল গণনা। গ্রহগণের শুভা-শুভ নিরূপণ ইত্যাদি।

৪র্থ অধ্যায়। দশাপ্রকরণ, জন্মাবধি মৃত্যুকাল যাবৎ রব্যাদি অষ্টগ্রহের অষ্টোত্তরী মতে বরাহোক্ত নাক্ষত্রিক দশা গণনা ও দশাগত নির্দ্দিষ্ট সময়ের শুভাশুভ ফল বিচার বিশেষ প্রাঞ্জল ভাবে লিখিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্ত-র্দ্দশা প্রত্যন্তর দশার কাল ও ফল এবং বিংশোত্তরী মতে দশা ও অন্তর্দ্দশা গণনা ও তাহার ফল, জ্ঞান, এতদ্ভিন্ন প্রকীর্ণাংশে যোটক গণনা পূরাকালের মহাত্মাগণের জন্মকুণ্ডলী দ্বারা শিক্ষার্থীগণের উদাহরণ সহ বুঝান হইয়াছে।

১৪। এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর আজীবন সভ্যগণের প্রবেশিকা বা এককালীন দান ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর আজীবন সভ্যগণ নিম্নোক্ত কার্য্যাবলী বিনা-মূল্যে পাইতে পারিবেন। ১। জন্ম সন, মাস, তারিখ, সময় পাঠাইলে ১ খানি ৫৲ পাঁচ টাকা মূল্যের বাৎসরিক ফল কোষ্ঠী। ২। ১ খানি যাবজ্জীবনের (৪৲ মূল্যের সূক্ষ্ম কোষ্ঠী বিচার। ৩। ১ম খণ্ড ২৷৷০ টাকা মূল্যের সরল জ্যোতিষ শিক্ষা কোষ্ঠী প্রকরণ। ৪। ১ খানি ।০ চারি আনা মূল্যের ৮ ফর্ম্মা (জ্যোতিষ শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য) আদর্শ কোষ্ঠীর ফারম্।

৫। ১ খানি ২৲ টাকা মূল্যের বিশুদ্ধ আয়ুর্দ্দায় গণনা। ৬। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসরের মধ্যে সভ্যগণের মতানুক্রমে ১ মাস কাল বিরুদ্ধ গ্রহ-দেবতাগণের প্রতিকারের নিমিত্ত তুলসী দান,এবং প্রতি বৎসরে বৎসরে অধি-বেশনের নিমন্ত্রণ পত্র ও এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর মাসিক পঞ্জিকা (জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা পাইতে পারিবেন।

৩০ শে চৈত্র মধ্যে সভ্য শ্রেণীতে ব্রতী না হইলে, এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর মাসিক পঞ্জিকা পাইতে পারিবেন না। সুতরাং আমি আপনাকে অদ্যই এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর আজীবন সভ্যপদে ব্রতী করিয়া আদর্শ কোষ্ঠি ও সরল জ্যোতিষ শিক্ষার ১ম ফর্ম্মা পাঠাইলাম। পরে আপনার অনুমতি পত্র ও জন্মকালীন সন, মাস, তারিখ সময় পাইলে যে অবশিষ্ট সরল জ্যোতিষ শিক্ষা পুস্তক ও পূর্ব্ব কথিত কার্য্যগুলি পাঠাইব। আপনি সজ্জন ও হিন্দু শাস্ত্রানুরাগী সুতরাং ভরসা করি এই মহৎ কর্ম্মে ব্রতী হইয়া সৎকার্য্যে সাহার্য্য করিবেন।

১৫। এষ্ট্রোলজিকেল সোসাইটীর ছাত্র শ্রেণীর সভ্যগণের প্রতি প্রবেশিকা ফিঃ ৫৲ পাঁচ টাকা।

ছাত্র শ্রেণীর সভ্যগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিনামূল্যে পাইতে পারিবেন।

১। সরল জ্যোতিষ শিক্ষার ১ম ও ২য় খণ্ড সমগ্র, ৫৲

৩। কোষ্ঠী লিখার আদর্শ ফারম ৮ ফর্ম্মা— ।০

৪। ৩৮ বৎসরের অর্থাৎ ১৮০০ শকাব্দা হইতে ১৮৩৮ শকাব্দের বিশুদ্ধ পুরাতন পঞ্জিকা ২৷৷০

৫। জ্যোতীরত্ন কল্পতরু গ্রন্থ— ২৷৷০

৬। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান সনের ৩০ শে চৈত্র মধ্যে সভ্য শ্রেণীতে ভুক্ত হইলে মাসিক পঞ্জিকা (জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা) বিনা মূল্যে পাইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর আজীবন সভ্য ও ছাত্র শ্রেণীর সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে ২৷৷০ হিঃ দুই কিস্তিতে টাকা জমা দিতে পারিবেন।

সূচী।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের "মীরকাশিম" নাটকের একটী দৃশ্য।

অবসর।

১২শ ভাগ। } চৈত্র। { ৮ম সংখ্যা।

অচেনা পাখী।

প্রথম প্রবাহ।

সে অনেক দিনের পুরাণো কথা; মনে পড়ে,—পড়ে না। ফাল্গুন মাস প্রকৃতির আহ্লাদের দিন, বেশভূষায় অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছেন। লতা পাতা, শাখী পাখী সকলেই প্রফুল্ল, বন উপবন সুচারু প্রসূনাবলীর মধুর গন্ধে আমোদিত, গন্ধবহ পরিমলভারে কাতর হইয়া ধীরে ধীরে নদী-সৈকতে বেড়াইতেছে, কৃশ তনু গিরিনদী মধুরারাবে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে, সকলেই যেন প্রকৃতির প্রেমে বিহ্বল। একটী স্রোতস্বতী মধুর কল্লোলে কূল বিপ্লাবিয়া চলিয়াছে, কল্লোলিনীর একটী তীর মাত্র নয়নগোচর হয়, অন্য তীর দুর্লঙ্ঘ্য। এ তটিনী কোথা হইতে আসিল তাহারও ইয়ত্তা নাই, কোথায় গিয়া পড়িল তাহারও স্থিরতা নাই। প্রবাহিণী আপন মনে ধীরে ধীরে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে, প্রবাহগতির বিরাম নাই, তপনদেব আকাশে ফুটিয়া উঠিলেন, একটী পাখী নদীর উপর দিয়া তীর পানে ছুটিয়াছে, কখন পাখা নাড়িয়া উড়িতেছে, কখন আবার ধীর বাতাসে ভর করিয়া স্থিরভাবে শূন্যে উড়িতেছে, পাখী বড়ই ক্লান্ত হইয়াছে। পাখার জোর কমিয়া গিয়াছে, বোধ হয় পাখীটী নদীর ওপার হইতে এপারে আসিতেছে, পাখী তীরে আসিল— তীরে আসিয়াই গলা ফুটিয়া মধুর স্বরে দুবার ডাকিল। পাখীর স্বর যদি বুঝিতাম, তবে জানিতাম এই ডাকে কতই মধু, পাখী কোথায় আসিল চিনিল না, চারিদিক দেখিতে লাগিল, পরে একটী তরুডালে উঠিয়া বসিল,

দেখিল নানা তরু ফলভারাবনত হইয়া পড়িয়াছে, পাখী সেই তীরে তরুডালে থাকিয়া ক্ষুধায় সুধাফল, পিপাসায় নদীর জল সম্বল করিল। সেই বিজন কুলে একা সেই পাখী আপন মনে কখন হাসিয়া কখন কাঁদিয়া ভবসংসার চিনিতে লাগিল। তরুলতা ও পাখীর ভাষা বোঝে না। পাখীও তাদের ভাষা বুঝে না। কিন্তু আদরের অবধি নাই। তরুলতা পাখীকে আদর করে, ক্ষুধার সময় ফল দেয়, আবার পাখীও তরুকে ভালবাসে, তাদের ডালে থাকিতে, হেলিতে দুলিতে নাচিতে গাহিতে ভালবাসে; পাখী এই রকমে দিন দিন কতদিন কাটাইতে লাগিল, পাখীর সব নূতন বোধ হইল, পাখীর প্রাণে মায়া-মমতার বন্ধন দৃঢ় হইতে লাগিল। এই নীরব ভাষায় নীরব তটিনী-তটে পাখী দুই বছর কাটাইল, সারাদিন পাখী ইচ্ছামত এগাছ থেকে ওগাছে ঘুড়িয়া বেড়ায়—ক্ষুধার সময় খায়। পাখী অনেক খুঁজিল কিন্তু পাখীর মনের জিনিষ মিলিল না। তার মনের কথা বোঝে এমন লোক পাইল না, পাখীর প্রাণে যাতনা আসিল -ভাবিল এইভাবে আর কতকাল কাটাইব। যেপথে আসিয়াছি আবার সেই পথে উড়িয়া যাই, কিন্তু পাখীর সে আশাও ডুবিল, পাখী এই ভাবিয়া তীরের দিকে ছুটিল—কিন্তু তীর কোথায়? পাখী যত যায়, নদী তীর তত দূরে পলায়, পাখী বুঝিল, পাখীর প্রাণে হতাশ আসিল। আবার কাঁদিল, আর পারিল না—পাখীর বড় ক্ষুধা, তরুশাখে উড়িয়া বসিল। নদী পানে চাহিয়া দেখিল অনেক দূর, পাখী না-জানি কি ভাবিল, পরে আবার হাসিল, আবার কাঁদিল। পাখীর আবার হাসা কান্না কি? কেন? জগতের জীব সকলেই, কেহ হাসিতেছে কেহ কাঁদিতেছে, পাখীর হাসি কান্নায় হাসি আসিবে কেন? বসন্তাগমে প্রকৃতি হাসে, আবার দারুণ হিমানিতে প্রকৃতি অশ্রুজল ফেলায়, তবে পাখীও কখন হাসিবে কখন কাঁদিবে তার আর বিচিত্র কি? তরুশাখে বসিয়া পাখী দেখিল, প্রকৃতির আদরে কোথাও ফলের অভাব নাই, যেখানে সেখানে ফল—পাখী দুই-চারিটি খাইল, ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল। কিন্তু পিপাসার নিবৃত্তি কিরূপে হইবে? পাখী দেখিল প্রকৃতি উপত্যকায় নির্ঝরের শীতল জল রাখিয়াছে, পাখী সেই জলে তৃষ্ণা দূর করিয়া আবার সেই তরুডালে আসিয়া বসিল, বসিয়া নয়নদ্বয় নদীপানে ফিরাইল। দেখিল নদী অনেকদূর—আবার যেন পাখী কি ভাবিল, তোমার এত ভাবনা যদি ওপারে ফিরিয়া যাওয়ার তরে, তাহে এপারে উড়িয়া আসিলে কেন? তুমি নির্বোধ, সময় গেলে কি আর

ফিরে। তোমার সাধের আবাস ছাড়িয়াছ, এখন বিষসের আবাস খুঁজিতেছ। হাতে ধরিয়া বিষ খাইয়াছ, জ্বালা কি কখন দূর হইবে? জ্বালা আরও বাড়িবে। দুঃখ তোমার চিরসুখে ভাগ বসাইয়াছে এখন পাখী দুই কূলের তরঙ্গাঘাত সহিতে হইবে। পাখী চক্ষু ফিরাইল বোধ হয় বুঝিল নদীতীর আর কপালে নাই, ভাবনায় পাখী অস্থির হইল। ক্রমে পাখীর চক্ষে নিদ্রা আসিল। তরুশাখে চক্ষু মুদিল—নিদ্রা গেল।

দ্বিতীয় প্রবাহ।

সময় চিরপরিবর্ত্তনশীল কে না যানে—দিনের পর রাত আসে আবার রাত যায় দিন আসে। একবার চাঁদ ফোটে, তপন ডোবে, আবার তপন হাসে চাঁদ লুকায়। নদী একবার সাগরজলে উছলে, সাগর আবার নদীজলে গা মিশায়। ক্রমে সন্ধ্যা আসে, দেখতে দেখতেই চলিয়া যায়, আবার সেই পূরবাকাশে প্রভাত ফুটিয়া উঠে। দিনকর আসরে আসিলেন,—নীরব গহনকান্তারে চুপে চুপে বাল-রবিকর ফুল-কুল ফুটাইতে লাগিল। সমীরণ সোঁ সোঁ করিয়া পরিমল লইয়া লতাপাতায় বিলাইতে লাগিল। এদিকে তরুশাখায় পাখীরও ঘুম ভাঙ্গিল, হৃদয়ের আঁধার দূরে পলাইল; আলোকে ঘুমের নেশা ছুটাইল। পাখী তরুশিরে উঠিল,—দেখিল নিবিড় বন অতি বিস্তৃত, পাখীর প্রাণে আশা আসিল, এইখানে এত সুখ, না জানি দূরে আরও কত সুখ—এই ভাবিয়া পাখী সেদিক পানে উড়িয়া গেল। অনাহারে সারাদিন উড়িল, পাখাদ্বয় অবশ হইয়া পড়িল, ক্রমে সন্ধ্যাও সমাগত হইল, পাখী দেখিল নিকটে একটী মনোহর লতাকুঞ্জ শোভিত সরোবর, আম জাম ইত্যাদি নানাবিধ রসাল তরুচয় তীরের শোভা বাড়াইয়াছে। পাখী সেই সরোবরের একটা নিভৃত কুঞ্জে যামিনীযাপন করিল। আবার প্রভাতের সুমন্দ পবন ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। না জানি পবন কি আনিল—সহসা পাখীর প্রাণে আতঙ্ক উঠিল, অদূরে পক্ষিকুলের চিৎকার ধ্বনিও বিষাদ-নিনাদ শুনা যাইতে লাগিল, শকুনজাতি ভীত ও ত্রস্ত হইয়া উর্দ্ধে আকাশপানে ছুটিতে লাগিল। পাখী এ সব দেখিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। ব্যাধি-পীড়িত বিহগচয়ের অস্ফুট কাকলীরব পাখী কিছু কিছু বুঝিতে লাগিল, পাখীর এখন গলা খুলিয়াছে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না, আপন মনেই কথা কয়, আপন মনেই

মর্ম্মব্যথা পায়। সরসীতীরে নিকুঞ্জে একা সেই পাখী ক্ষুধার সময়ে সুমিষ্ট ফল এবং পিপাসায় নির্ম্মল জল পাইয়া হরষে সময় কাটাইতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, পাখীর সেই পূর্ব্বস্মৃতি নদীতীর আর মনে পড়িল না। প্রকৃতি সুখের কোলে পাখীকে রাখিল, পাখী সুখ পাইয়া দুঃখ ভুলিয়া ভব-ঘোরের মোহজালে আত্মজ্ঞান হারাইল। বনফল পাখীকে লোভ দেখাইল। পাখী প্রলোভনের ফাঁদ এড়াইতে পারিল না। শাখাকুল পাখীকে আশ্রয় দিল। লতাপাতা আদর করিয়া শীত বরষায় পাখীর প্রাণ বাঁচাইল। অবোধ পাখী সুবোধ প্রকৃতির ছলনা বুঝিল না, আদর পাইয়া মনসুখে চিরদিন সেই নিভৃত কুঞ্জে বাস করিবার বাসনা করিল। কিন্তু পাখীর প্রাণে আশা আছে—সেই সর্ব্বনেশে আশার আবার পাখীর প্রাণে তুফান তুলিল,—পাখী ভাবিল, সে দিন যে অনেকগুলি পাখী উর্দ্ধে উড়িতে দেখিলাম, তাহারা এখানে আসে না কেন; এখানে কি সুখ, বুঝি ওখানে আরো সুখ, এই ভাবিয়া পাখী এক দিন তথায় যাইবার সংকল্প করিল। আশা! তোমার এ কি কাজ? তুমি আবোধকে কুপথে নিয়ে জালে জড়াও কেন? এই সুন্দর বিশ্ব তুমিই বিষময় করিয়াছ। তোমার অনন্ত শক্তি, তুমিই বিশ্বচালক।

জগতের প্রাণী তোমার প্রভাবে কিনা হইতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ কেহ আবার বদ্‌রাগিণীতে জংলা সুরে তান ধরিয়া আপন মনে ভাসিয়া যাইতেছে। এই অবোধ পাখী তোমারই প্রভাবে যন্ত্রণাময় লক্ষপানে ছুটিয়াছে, পাখীর সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবে, ভব-কল্লোলে পাখী মাতিয়াছে – মন ছুটিয়াছে, প্রাণ ছুটিয়াছে, চেষ্টা কেবল বাকী আছে। বোধ হয় পাখীর মনোগতি আর থামিবে না। পাখী, এখনও সময় আছে বুঝিয়া কাজ করিও। তুমি সুখ দুঃখ মাখানো এই ভব সংসারের রঙ্গ দেখনি। এই নূতন দেখিবে এইবার চিনিবে। তুমি নদী দেখিয়াছ, কিন্তু নদীর জ্বালাময় ঢেউ দেখনি, তুমি নদী-পুলিন দেখিয়াছ কিন্তু ভব-পুলিন দেখ নাই। তুমি যেই নদী পার হইয়া আসিয়াছ, সেই নদী আর এই নদী এক রকম নহে, তোমার সেই বিস্মৃত নদী অতি মনোরম, জলে কালিমা নাই—তীরে বিষাদ নাই—কিন্তু এ নদীর জলে ঘোর কালিমা ও বিষ আছে। জলে জীবন জ্বালায়—তীরে বিষাদমাখা গরল আছে, জীবকুল এই গরল পানে আকুল হইয়া তীরময় ছুটিয়া বেড়ায়। পাখী, সাবধান!

তৃতীয় প্রবাহ।

এই সংসারে সহজে একে অন্যের গতিরোধ করিতে পারে না। বাতাস যেমন সহজে জলের গতিরোধে অক্ষম, আবার তেমন বাতাসের গতি ফিরাতেও জলের ক্ষমতা নাই। সেইরূপ মনোগতিও সহজে ফিরান যায় না। মন কি? এই প্রশ্নে আমার উত্তর নাই।

সেই মনের একটী গতি আছে, যে গতিতে এ জগতে জীবকুল স্ব স্ব অভীষ্ট সাধনে মতি ফিরায়। মনের গতি আর বাতাসের গতি প্রায় এক রকম। বাতাস যেমন ধরা যায় না, মনও তেমন, মনের গতিও তেমন। উচ্চ তরু-শিরে বাতাসের গতি প্রতিরোধ হইলে বাতাস যেমন তরুশির কাঁপাইয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ মনের গতি প্রতিরোধ হইলেও প্রাণ আকুল হয়। কম্পিত হৃদয়ে যাতনা আসে। পাখীরও ঠিক সেইরূপ হইল। মনোগতি প্রতিরোধ করিতে পারিল না, অভীষ্টোদ্দেশে প্রস্থানে উদ্যোগী হইল। একদিন নিশা-বসানে প্রভাত-অরুণ আর হাসিল না, জলদজালে পূরবাকাশ ছাইল। দু-এক ফোটা বৃষ্টিজল পড়িতে লাগিল। পাখী আশার ছলনায় সরসীতীরের সুরম্য হর্ম্ম্য ছাড়িয়া বিষমাখা যাতনার প্রবল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত সুখধামপানে যাত্রা করিল। দিন গেল—আবার রাত্রি আসিল—পাখী অনাহারে তরুশিরে নিশাবসান করিল। প্রভাত হইল, পাখী আবার চলিল, পথে নানা বিভীষিকা পাখীর প্রাণে আতঙ্ক তুলিল। কোথাও পাখীর ছিন্ন মস্তক, কোথাও ডানা ইত্যাদি কুচিহ্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। ত্রাসে পাখীর প্রাণ উড়িয়া গেল। পাখী এই ভয়সঙ্কুল পথ ছাড়াইয়া অনেকদূর চলিয়া গেল। দেখিল নানা পাখী স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ কেহ খাদ্য অম্বেষণে এদিক ওদিক উড়িয়া যাইতেছে। কেহ কেহ উদর পূরণ করিয়া তরুশাখার নিশ্চিন্তে ঘুমাই-তেছে, কারো শাবকগুলি চেঁচাইতেছে, পাখী আহার আনিতে দূরে চলিয়া গিয়াছে, পক্ষিণী একা সেইগুলিকে প্রবোধ দিতেছে। কোন কোন পাখী উচ্চতরুশিরে থাকিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে। কোথায় কি আছে, কোথায় গেলে খাবার মিলিবে, এই ভাবনায় চঞ্চলচিত্ত হইয়াছে। কলিকালে জীবের অন্নগত প্রাণ, তাই আহারান্বেষণে সকলেই ব্যস্ত। এ জীবনে দুমুঠো উদরের সংস্থান করিতে পারিলেই, জীবকুল এ সংসারে সুখী বলিয়া মনে করে। ঐহিক পারত্রিক সকল সুখের নিদান এই সংসারে

আত্মতুষ্টি, তাই একা এই পৃথিবীতে উদরের চেষ্টাই প্রবল। পরে অন্য চেষ্টা, প্রত্যেক জীবদেহে এই স্বার্থ আঁধার প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করে। আত্মতুষ্টিই জীবনের মূল। পাখী আরো দেখিল, কোথাও এক পক্ষী অপর পক্ষীকে বাসা হইতে তাড়াইয়া দিতেছে, সামান্য ফলের জন্য কোথাও দুই পক্ষী বিবাদ বাধাইয়াছে। একে অন্যের পালক ছিঁড়িয়া দিতেছে, কোথাও ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে, একে অন্যের প্রাণ বিনাশ করিতেছে। কোথাও সুদৃশ্য কুঞ্জে পাখী পাখিনী প্রণয়াবেশে মত্ত হইয়া ঠোঁটে ঠোঁট দিতেছে। একে অন্যের গা চুলকাইতেছে,—ইত্যাদি। হর্ষবিষাদভরা ধরাধামের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিল। পাখীর এখন ভাষা ফুটিয়াছে, পাখী অনেকটা বুঝিল বটে কিন্তু সব বিষয় বুঝিতে পারিল না। যতদূর বুঝিল তাহাতে পাখীর হৃদয়ে বিষাদ আনিল, পাখী হতাশায় ভাসিয়া ও পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এক তরু'পরে আশ্রয় লইল। বসিবামাত্রই আর এক পাখী আসিয়া পাখীকে তাড়াইল, পাখী ঠোকরভয়ে ছুটিয়া পলাইল ; অনাহারে পাখীর প্রাণ যায় যায় হইয়াছে। পাখী অনেক খুঁজিল, কোথাও ফল মিলিল না, যে সব ছিল অন্য পাখীকুল সে সব উদরসাৎ করিয়াছে। পাখী জল পান করিতে গেল দেখিল জল ঘোলা, জল তত মিষ্ট নহে, তখন পাখীর পূর্ব্বস্মৃতি আসিল, সেই সরোবর-তীরে বিজন লতাকুঞ্জ মনে পড়িল। সেই নির্ম্মল জল, সেই মনোহর আবাস, সেই নীরবতা, সেই বালরবিকর, সেই সুগন্ধপবন, সেই সুমিষ্ট ফল ও প্রকৃতির আদর ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে পাখীর মনে পড়িতে লাগিল। হায়! কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ-জীবকুল আগে কাণ হারাইয়া শেষে আকুল হয়। লোভের টানে যায় যায় করিয়া যায় না। পরে সেই পথ চিররুদ্ধ হয়, আর যেতে পারে না। আশার ছলে করি করি বলিয়া করে না—সময় চলিয়া যায়, পরে প্রাণ দিয়াও অকূলে কূল পায় না। বিধি, তোমার কি মহিমা, তোমার সৃষ্টির পতন কি আশ্চর্য্য! সৃষ্টির পূর্ব্বেই নিরাকার মায়ামোহ ক্রোধ ইত্যাদি জীবের অন্তরে ঢালিয়া দিয়াছ! জীবকুল কালগতিতে সেই সকল অপ্রত্যক্ষীভূত ও দৃষ্টির অগোচর কল্পনার অতীত রিপু সকলের প্রবল প্রভাবে এই ভবে কুদিকে সুদিকে চালিত হয়। জীবনে নানারূপ ব্যাধি শোক তাপ ইত্যাদির প্রবল জ্বালা জীবের কাতর প্রাণে বিষাদের বীচিলহর তুলিয়া দেয়। ক্রমে পাখীর প্রাণে কাতরতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পাখীর মানস-সৈকতে ভবনদীর ভীষণ হিল্লোল আসিয়া পড়িতে লাগিল। পাখী নিরুপায় হইয়া

ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। রুচি-বিরুদ্ধ ও বিস্বাদ ফল জলে দুঃখের দিন কাটাইতে লাগিল। কখন কখন বা অনশনে বৃক্ষডালে বসিয়া নির্জ্জনে আপন মনে কু-ভবের সন্তাপভরা কল্লোলধ্বনি শুনিতে লাগিল।

চতুর্থ প্রবাহ।

সাঁজ সকালে দুই বেলা শৈল লহরে হৈমজলদঘটা কি মনোরম চিত্র—নিদাঘের দিবাশেষে নদীতীরের সুস্নিগ্ধ পবন কি মধুর! শরৎকালে সুনীল আকাশে চাঁদের হাসি কি রমণীয়! আবার নীচে সরোবরজলে কমল-লীলা কি মনোমুগ্ধকর! শীতকালের মৃদু রবিকর কিরূপ স্পৃহনীয় আবার নব বসন্তের কুসুম-সৌরভ ও মলয় পবন কি সুখপ্রদ, আবার বর্ষিায় কালোমেঘ, নিদাঘের প্রখরতাপ ও শীতকালের প্রবল হিম কিরূপ কষ্টদায়ক। প্রত্যেক ঋতুতেই সুখ দুঃখ সমভাবে চলিতেছে—কখন দুঃখ কখন সুখ, কখন শান্তি কখন অশান্তি, সকল ঋতুতেই পর্য্যায় ক্রমে ঘটিতেছে। এই সংসারে যদি একা দুঃখের অধিকার হইত, যদি সুখের প্রবাহ না বহিত, তা হলে এ সংসার চলিত না, সুখের আশাই জীবনে কষ্ট দেয়। জীবকুল সুখ আশা করিয়াই এ জগতে বিচরণ করে, সকলেই সুখ চায়, দুঃখে সকলেরই বিরাগ।

নববর্ষ আসিল, সঙ্গে সঙ্গে পাখীর প্রাণেও নব আশা জাগিল, একবার পাখী সংসারের জ্বালা ভুলিবে—পাখীর প্রাণে সুখোদয় হইবে। পাখী ভব-ধাম স্বর্গধাম মনে করিবে। একটি ডালে দুইটী পাখী, চোকে চোকে প্রাণের মিলন জানাইতেছে—নীরব ভাষায় একে অন্যের প্রাণের কথা বুঝাইতেছে, আজ উভয়ের হৃদয়ে অপার আনন্দ-স্রোত বহিতেছে। না জানি কি অলৌকিক শক্তি দুই প্রাণের স্রোত এক সঙ্গেই মিশাইয়াছে। একের ক্ষুধায় অন্যের ক্ষুধা, একের পিপাসায় অন্যের পিপাসা, একের আহারে অন্যের সুখ, একের দুঃখে অন্যের দুঃখ, পাখীযুগল পায়তো খায়, আর না পায়তো অনশনে বৃক্ষডালে বসিয়া থাকে, কেবল চোকে চোকে চাওয়া চায়িতেই ক্ষুৎপিপাসার প্রবল জ্বালা ভোলে, ভবের বিষমাখা যাতনা আর মনে পড়ে না—এক প্রাণে আর এক প্রাণের মিলন কি মধুর! ইহ সংসারের দুর্নিবার জ্বালাময় ঘটনা-বলী যুগলহৃদয়ে আর জ্বালা দেয় না। ভীষণ ভবহাটের দুরন্ত আগুন আর

মনপ্রাণ পোড়ায় না। পাখীর প্রাণে বিশ্বসংসারের সকল আনন্দ, পাখীর কি আহার জুটিয়াছে? পাখীর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, শোক তাপ ইত্যাদি ভবব্যাধি সকলি ভুলিয়া গিয়াছে। পাখীর আদরের অভাব নাই। প্রকৃতিও পাখীকে এত আদর করে নাই, মায়া মোহ স্নেহ ইত্যাদি রিপুকুল যো পাইয়াছে। সকলে পাখীর পবিত্র হৃদয়ে আশ্রয় লইয়াছে। পাখীর আর এ বাসা ছাড়িতে সাধ নাই। পাখী বৃক্ষডালে জীবন মরণ সার করিয়াছে। পাখী বুঝিয়াছে যন্ত্রণার ভিতর কখন কখন সুখ বটে, সে সুখ পূর্ব্বজ্বালা হরণ করে। পাখীর এখন বৃহস্পতিদশা চলিতেছে, তাই শুভযোগ দেখা দিয়াছে। না জানি আবার কখন কাল শনির পালা আসিবে, শ্রীবৎস চিন্তার দশা ঘটিবে, দারুণ বিচ্ছেদ-তরঙ্গাঘাতে পাখীকে সুদুর তীরে ফেলিবে। পাখী আর চাওয়া চায়ির সুখ বুঝিবে না। না জানি আবার সেই ভব কল্লোলের ভীষণ নিনাদ, কখন পাখীর প্রাণে গরল ঢালিবে, পাখী আত্মহারা প্রাণে মরা হইয়া ভবব্যাধির বিষম বোঝা বহিবে। তুমি সুখসাগরে অবগাহন করিতেছ, তোমার কি দুঃখ নাই, তোমার কপালে আবার দুঃখ আছে? ভবব্যাধির খণ্ডন নাই, তোমার বহিতে হইবে। ভবজ্বালার নির্ব্বাণ নাই, তোমার সহিতেই হইবে। উচ্চ তরুশিরে, গিরিশৃঙ্গে, কন্দরে অথবা অতল জলধিগর্ভে যথায় যাইবে এ যাতনার পার পাইবে না। বিষাদভরা ভবকল্লোলের কঠোর তাপ তোমার মরম ভেদিবে—এই ব্যাধিশূল তোমার কোমল হৃদয় ক্ষত করিবে—হৃদয়ে শোণিতধারা বহিবে।

পঞ্চম প্রবাহ।

জীবগণ সুখের দাস—অসুখের দূরবন্ধু। উষার ভয়ে যেমন নিশাচর পলায়, অসুখের ভয়েও তেমন জীবগণ দূরে সরিয়া থাকিতে চাহে। কুলুকুলু বাহিনী তরঙ্গিণীর তীরে বসিয়া সুবাতাসে ক্ষুদ্র বীচির মৃদুমন্দ আন্দোলন সকলেরই দেখিতে সাধ, কিন্তু ভীম তুফানের জলোচ্ছ্বাস ও গর্জ্জন সকলেরই অপ্রীতিকর; এইতো জীবের স্বার্থ। প্রকৃতির কোমলতায় আমার আহ্লাদ, কঠিনতায় প্রমাদ কেন? দিবানিশি কত কুসুমগন্ধ তোমার তরে চুরি করিয়া তোমাকেই বিলাই তাতে তোমার কত আমোদ হয় কিন্তু একদিন তোমার

একগাছা চালের খড় উড়াইলেই কষ্ট হয় কেন? হিমাগমে প্রভাতের যেই তাপ শান্ত শীতল, নিদাঘ মধ্যাহ্নে যেই তাপের কঠোরতায় প্রীতি নাই কেন? সকলেই সুখের গোধুলির নয়নরঞ্জন দৃশ্য দেখিতে চাহে, দুঃখের মধ্যাহ্ন কেউ চায় না। পাখীরও এমন সুখের বসন্ত খেলিতেছে, দুঃখের বরিষা অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে ও দুই নদীর এক স্রোত বহিতেছে। অবিরাম ঢল ঢল কল কল রবে প্রীতির স্রোত চলিয়াছে দারুণ বৈশাখীও নাই, ঝড় বরিষাও নাই, নীরবে হেলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া তরঙ্গ নর্ত্তন দেখাইয়া দুই প্রাণের এক স্রোত ধীর-বেগে চলিয়াছে। স্রোতজলে পঙ্কিলতা নাই, কুটিলতা নাই, হর্ষ নাই, হিংসা নাই, সে আগুনও নাই। যে আগুনে ভবের জীব প্রাণে মারা যায়, যে আগুনে জীবকুল আঁধার নিশায় জলহীন প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, নয়নে চপলা খেলে, যে আগুনে গৃহী বিজনবন খুঁজিয়া লয়—দুই হৃদয়ে একফুল ফুটিয়াছে—ফোটায় প্রেমের ঊর্ণনাভ জালে পড়িয়াছে; প্রীতি ভক্তি দয়া মায়া ও ভালবাসা সেই জালে বাঁধা পড়িয়াছে; সুখ ও সন্তাপের অতীত স্মৃতি পূর্ব্বানুরাগ সকলই বিস্মৃতির অগাধ জলে ডুবিয়াছে, সেই নদীতীর নীরব, বনের ফলভরা তরু, সেই সুরম্য কুসুমাবাস, সেই বনকুসুম পরিমল সুরভি ও নির্ঝর-সলিল একে একে সকলই হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। আছে শুধু সেই প্রাণের সুখ—মনের সুখ, আর চাওয়া-চায়ি—সাঁঝ সকালে উভয়ের প্রেম-কাকলী ও প্রণয়-ভাষা; পাখী, এ জোয়ার আর কত দূর যাইবে,—এ বাতাস আর কতদিন বহিবে, আকাশপটে কালো মেঘের রেখা এখনও দেখিতে পাও নাই, দেখিবে আর দূরে নাই, পাখী তোমার আত্মস্মৃতি প্রেমের ভীষণ ছবি কাড়িয়া নিয়াছে—অলসতা তোমার হৃদয়ে কুঠির বাঁধিয়াছে, মায়াকে সেই কুঠির-বাসিনী দেবতা করিয়াছে, তোমার সেই কৈশোর ছবি স্বর্গীয়-বৃত্তির সিন্দুর-বিন্দু মায়া মুছিয়া ফেলিয়াছে, প্রলোভন লৌহনিগড় গড়িয়াছে, পাখী, তোমার মোহ হইয়াছে—মত্ততা-বাসার তলায় বসিয়া আছে, আর উপায় নাই, এইরূপে পাখীযুগল আমোদে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। উভয়ের আশা আর এই বাসায় থাকিতে পারে না। উভয়ের বনান্তরে গমন বাসনা হইল। একদা প্রত্যূষে উভয়ে বনান্তরে গমন শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তদভিমুখে প্রয়াণ করিল, অনেক খুঁজিয়া অত্যুচ্চ একটি তরুডালে মনোহর নীড় নির্ম্মাণ করিয়া পাখীদম্পতি ভাবী বিপদের ছায়া দেখিয়া নিরাপদে সময়যাপন করিতে লাগিল। একত্রে উভয়ের অশন, পান ও একত্রে প্রভাত-

সন্ধ্যায় বিভুর আরাধনা গান গাইয়া পাখীযুগল আনন্দ-হিল্লোলে ভাসিল। ভবের যাতনা ভুলিয়া গেল, পেচকের চক্ষে যেমন রবিকর সহিতে পারে না, তেমন সংসারে এক আত্মীয়ের ঐশ্বর্য্য অপর আত্মীয়ের চক্ষু সহিতে পারে না। একের উত্থান অপরের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া দেয়; সেই দুঃখে ও ক্ষোভে অপর আত্মীয় দিবানিশি সেই ঐশ্বর্য্য পতন কামনা করিয়া থাকে—ছলে কি কৌশলে সেই কল্পনাকেও কার্য্যে পরিণত করে, তবে পাখীর সুখে প্রকৃতির চক্ষু জ্বলিবে না কেন? এত প্রেম এত আহ্লাদ সময়ের প্রাণে তাহা সহিবে কেন? ধীরে ধীরে সময় পাখীর বসন্তে বরিষা আনিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। সময় সুযোগের উপাসনায় বসিল, পাখী অদূরে তোমার তরে কালঢেউ উঠিয়াছে, তুমি দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছ না। ঐযে সাদা সাদা কপোতের ন্যায় নীলিমাময় গগনবারিধি বক্ষে ভাসিতেছে, সেইগুলি বাস্তবিক কপোত নহে, সেই তোমার ভীষণ বিপদ্-উর্ম্মির শুভ্র কেশরাশি; সেই ফেন-রাশি তোমার তরে যাতনা আনিবে, দিবানিশি সেই যাতনায় ছট্‌ফট্ করিবে, এমন সুখে মাতিয়াছ, তোমার পরিণাম দুঃখের ভাবী কল্পনা তোমার মানস-মন্দির ছাড়িয়া পলাইয়াছে। বর্ত্তমান সুখলহরীতে তোমার মনঃপ্রাণ বিভোর হইয়াছে। পাখী জীবনের ভাষা বুঝিয়া পা বাড়াইও, নইলে আগুনে পুড়িতে হইবে।

শ্রীবসন্তকুমার কানুনগোয়।

মাটির মানুষ।

তুমি মাটির মত খাঁটি হ'য়ে—
স'য়ে থাক সকল দোষ;—
তবু তোমায় ছুতায় নাতায়—
জ্বালিয়ে মারি, করি রোষ।

পাষাণ-গড়া, যখন তখন—
নিঠুর এই যে দেহখান,—
সঙ্গ তোমার লভিলে খানিক—
খোঁজে কোথায় অভিমান,

তখন তোমায়—তখন আমি
ক্ষুদ্র করি হৃদয় মাঝ,—
দগ্ধ হইগো মানের দায়ে—
হয় না বল কোন কাজ।

আকাশ পাতাল দুনিয়া খুঁজে
সারা হোলাম অবিরত
পেলাম না'ক মাটির মানুষ—
তুমি বঁধু, তোমার মত।

লুকিয়ে তোমার, যখন দেখি—
আগুন মাখা আঁখি জল ;
তখন পরাণ আমি, আমার বল—
দগ্ধ হয় এ অন্তঃস্থল।

তবু স্বভাব, আপন দোষের—
উস্‌কে দিয়ে ধর্ম্ম-ধ্বজা,—
জ্বালিয়ে—পুড়িয়ে—কাঁদিয়ে তোমা—
বসে বসে দেখেন মজা।

আমি পাষাণ, গলে যেতাম—
তুমি যদি কঠিন হ'তে,
আঁখির ঠারে ঘুরুতে হোত
সন্ধ্যা-সকাল-আঁধার রেতে।

মাটির মানুষ ওগো আমার
শক্ত হ'ও গো ধরি পায়,
নৈলে আমার স্বভাবটা যে—
জন্মের মত র'য়ে যায়।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

ভুতপূর্ব্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৫)

নির্দ্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে প্রভার সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে আমার একটীও আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন না। বিবাহের পর আমার মন কি জানি এক নবীন ভাবে বিভোর হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে নূতন পথে—নূতন আশা লইয়া চলিতে লাগিল। যেন বহুদিন নিদ্রার পর জাগরিত হইলাম! যেন নিশার পর দিবা, অন্ধকারের পর আলোক দেখিলাম। যেন দুঃখের পর সুখ, নিরাশার পর ভরসা পাইলাম! বহুকাল ধরিয়া মহাতপ্ত মরুভূমির উপর ভ্রমণের পর যেন "ওয়েশিস্"এ উপস্থিত হইলাম! ভ্রান্ত আমি, মায়ামুগ্ধ আমি যেন মোহের ঘোরে এক সুখ-সাগরের সন্ধান পাইয়া বিপুল পুলকে পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

জগতে চিরদিন কাহার সমান যায় না। দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ, ইহা প্রত্যেক জীবের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কাল যাহাকে হাসিতে দেখিয়াছ, আজ তাহাকে কাঁদিতে, কাল যাহাকে রাজা দেখিয়াছ, আজ তাহাকে রাখাল দেখিতে পাইবে; আবার কাল যাহাকে দুঃখী দেখিয়াছ, আজ তাহাকে সুখী দেখিয়া এবং কাল যাহাকে 'মোট' বহিতে দেখিয়াছ, আজ তাহাকে ধনেশ্বর হইয়া পাল্কী চড়িতে দেখিয়া বিস্মিত হইবে। মানুষের অবস্থা চিরকাল একরূপ থাকে না। চক্রের ন্যায় মনুষ্য-ভাগ্যে সুখ-দুঃখ অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

বিবাহের কিছুদিন পরে আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, বিপিনবাবু তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রভাকে স্নেহবশতঃ অত্যধিক আদর দিয়া তাহার হৃদয়ে এক দুর্দ্দমনীয় অহঙ্কারের বীজ বপন করিয়াছেন। দিন দিন তাহার উদ্ধত ও গর্ব্বিত ব্যবহার আমার নিকট বড়ই অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, একি হইল! স্বর্গে কলঙ্ক কেন? মন্দাকিনী-গর্ভে বৈতরণী-প্রবাহ কেন? এমন ভুবনমোহিনী সুন্দরী প্রভার হৃদয়ে নরকের পূতিগন্ধময় দাম্ভিকতা কেন? হিংসা-দ্বেষ-খল-কপটতা কেন? হৃদয়ে সর্ব্বদা অসন্তোষের অনল জ্বলে কেন? কে বলিয়া দিবে—কেন?

যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার প্রতি প্রভার ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব ততই প্রবল হইতে লাগিল। প্রভা আমার সহিত কথায় কথায় ঝগড়া বাধাইয়া নিতান্ত কর্কশকণ্ঠে বলিত,—"আমার বাপের ভাতে বাঁচিয়া আছ তুমি, তোমার এত তেজ কেন? এমন উগ্রভাব কেন? তোমার তো এক কড়া রোজগার করিবার মুরোদ নাই, তুমি আমার কথার উপর কথা কও? তোমার লজ্জা করে না? তোমার দড়ি যোটে না? আমার যাহা খুসি তাহাই করিব, খুব করিব,—তুমি বারণ করিবার কে?"

আমার শ্বশুর বাড়ীর পার্শ্বেই নগেন্দ্রদের বাড়ী, নগেন্দ্র নবীন যুবক, তাহার দেহ পুষ্ট, বর্ণ কাঞ্চনোজ্জ্বল। বাল্যাবধিই নগেন্দ্রের সহিত প্রভার বড় ভাব ছিল। উভয়ে এক সঙ্গে ধূলাখেলা করিয়াছে, এক সঙ্গে স্কুলে গিয়াছে, এক সঙ্গে কুসুম-মালা গাঁথিয়া পরস্পরের গলায় পরাইয়াছে। বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের বাল্যকালের সেই ভালবাসা যে প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হইয়াছিল, সে বিষয় সন্দেহ করিবার কারণ আমার আদৌ ছিল না। প্রভা নগেন্দ্রের সহিত তাস খেলিত, তাহার কাছে আপনার স্বভাবসিদ্ধ বীণা-বিনিন্দিত স্বরে প্রেম-গাথা গাহিত এবং সামান্য কারণেই হাস্যবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার সম্মুখে দেহলতা ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত করিত। ক্রমে ব্যাপার এইরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে, দৈবাৎ যদি আমি তাহাদের সেই নির্জ্জন ক্রীড়াগৃহে কোন কার্য্যবশতঃ উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে তাহারা উভয়েই বড় বিরক্ত হইত। নগেন্দ্র মুখে কিছু না বলিলেও প্রভা যমের কোন বিশেষ দুয়ারে উপস্থিত হইবার জন্য আমাকে বার বার অনুরোধ করিতে ছাড়িত না, এবং অঞ্চলাগ্র মুখে দিয়া নগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কুন্দদন্ত টিপিয়া মৃদুহাস্য করিতে বিরত হইত না। স্বেচ্ছাচারী প্রভার কথা ও কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা আমার কিছুই ছিল না। কিন্তু নগেন্দ্রের সহিত তাহার এতটা মেলামেশাও আমার অসহ্য হইয়াছিল। শুদ্ধ এই কারণেই তাহার সহিত আমার বনিত না—দিবারাত্র কলহ হইত।

অনেক সময় আমার মনের মধ্যে বড় গ্লানি, বড় ঘৃণা ও অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হইত। বিবাহের পূর্ব্বে যে সুখ ও শান্তি উপভোগ করিতাম এবং ছাত্রদিগকে সাহিত্য পড়াইতে পড়াইতে ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া যে আনন্দ লাভ করিতাম, আবার ছুটীর পূর্ব্বে ছেলেরা যখন উর্দ্ধনেত্রে হাতযোড় করিয়া ভক্তি-গদ্গদ-কণ্ঠে গাহিত,—

ঐ যে আমার জননী রে।
শ্বেত-পদ্ম'পরে চরণ রাখি
মরাল-বাহনে ফেরে॥
অরবিন্দ ভ্রমে অলিকুল ভ্রমে
চরণের চারি ধারে॥
নয়ন বিভায় তপন নিভায়
মুখে পূর্ণশশী হারে॥
ও লাবণ্য-বিভাবিন্দু, লভি রবি-প্রভাসিন্ধু,
লজ্জায় মলিন কুমুদবন্ধু, নেহারি
মায়ের ঐ চরণ রে॥
তপন-তনয়-ভয়-নাশে যদি ইচ্ছা হয়,
নরেন্দ্র আর কভু কোর না 'পঙ্কক' ব্যয়,
রাখ মাকে (সদা) নয়নে রে॥
বিধি হরি হর যাঁহার পায় না অন্ত,—
"বীণাপাণি" মা তোর সেই স্বয়ং অনন্ত
সিদ্ধি ভোগ-মোক্ষ দাত্রী রে॥

তখন যেরূপ স্ফূর্ত্তির ফোয়ারায় স্নান করিতাম, যেরূপ ভক্তিসুধা-পূর্ণ আনন্দের হ্রদে অনেকক্ষণ ধরিয়া ডুবিয়া থাকিতাম, তাহার মধুর স্মৃতিটুকু আসিয়া আমার নির্ব্বুদ্ধিতার ও অপরিণামদর্শিতার পরিণামকে কেবল উপহাস করিত। সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিয়া যাইত। তখন আমি দিব্য চক্ষে দেখিতাম, বিবাহ নামক জিনিষটা একটা মাখাল ফল এবং সংসার একটা দিল্লীর লাড্ডু। ভাবিতাম, এখনও সংসারে আমি একটী মাত্র মায়া-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছি। যদি একবার কোনরূপে এই শৃঙ্খল কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িতে পারি, তাহা হইলে আমার পারলৌকিক উন্নতির পথে আর কেহই অন্তরায় হইতে পারিবে না। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট যে, তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে রূপের একটা মোহ আসিয়া বড় বিভোর করিয়া ফেলিত।

অদৃষ্ট যাহাকে যে দিকে যেরূপভাবে ফিরাইবে, কলের পুতুলের মত তাহাকে সেইদিকে সেইরূপভাবে ফিরিতে হইবে। "নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে"—এই ঋষিবাক্য জীবের নিকট জীবন্ত সত্য। তুমি বর্ত্তমান বিশ্-

বিদ্যালয়ের উপাধিধারী, বি, এ, পাশ করিয়া 'কপাল-টপাল' কিছু মানিতে চাও না—অসভ্য মানবের কু-সংস্কার বলিয়া মনে কর। কিন্তু মহাজ্ঞানী মহর্ষিগণকেও নিয়তির ফেরে পড়িয়া অনেক সময় দিশাহারা হইতে হইয়াছে, —জ্ঞান-গরিমায় জলাঞ্জলি দিয়া পশুত্বে পরিণত হইতে হইয়াছে।

(৬)

সে দিন সকাল হইতেই প্রবল বেগে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। সারাদিনের মধ্যে সে বৃষ্টির কিছুমাত্র বিরাম ছিল না। সন্ধ্যার পর বৃষ্টি-বেগ দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল। আকাশে আরও ঘন মেঘের স্তর স্তূপাকারে জমিতে লাগিল। বৃষ্টিকণাবাহী শীতল পূবে বাতাস অবিরাম গতিতে প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। চারিদিকে ঘোর অন্ধকারের ভিতর নব-বর্ষা-বিধৌত বৃক্ষপল্লবের শন্ শন্ শব্দ, ভেকের কোলাহল ও বৃষ্টির অবিশ্রাম ঝম্ ঝম্ শব্দ কৃষ্ণ-প্রতিপদের রাত্রিটাকে অতি ভীষণ করিয়া তুলিয়াছিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ-বিকাশে ও গভীর মেঘগর্জ্জনে জীবের হৃদয়ে আতঙ্কের তরঙ্গ উঠিতে ছিল।

সেই ঘোর দুর্য্যোগে মুখরা প্রভা অতি তুচ্ছ কারণে আমার সহিত কলহ বাধাইয়া দিল। আমাকে যাহা না বলিবার তাহা বলিয়া অত্যন্ত ভৎর্সনা করিতে করিতে হস্তস্থিত একখানি বাঁধান প্রকাণ্ড পুস্তক আমার মাথার উপর ছুড়িয়া মারিল। তাহার হাবভাবে ও প্রতিবাক্যে, চোখের চাহনিতে এবং কণ্ঠস্বরে দাম্ভিকতার পূর্ণবিকাশ প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্ত্রীর দ্বারা এইরূপ ঘৃণিতভাবে অপমানিত হইয়া আমার বুক ফাটিয়া রক্ত বাহির হইবার উপক্রম করিল। রোষে—ক্ষোভে—ঘৃণায় মুহূর্ত্তের জন্য আমি 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' হইয়া পড়িলাম। তারপর? তারপর ঘরজামাইয়ের অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়া তাহাদের পাপের তুলনা করিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সেই সূচীভেদ্য ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ রজনীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিপিনবাবুর সমস্ত বিষয় ভোগের বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

৭

অনেক দিন পরে আবার সেই স্কুলে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম, আমার স্থানে অপর একটী লোক নিযুক্ত হইয়াছেন। হতাশ হইয়া প্রাণের আবেগে যে নির্জ্জন বাসা-বাড়ীতে আমি বাস করিতাম, যে বাসা-বাড়ী এক সময়ে আমার নিকট অতি রমণীয় ও শান্তিময় বলিয়া বোধ হইত, যে বাসাবাড়ীর সহিত আমার গতজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেই বাসা-

বাড়ীটি দেখিতে গেলাম। যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যে ভদ্রলোকটী আমার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সপরিবারে সেই বাসায় বাস করিতেছেন। আবার ফিরিয়া স্কুলের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন বেলা প্রায় বারটা। স্কুল বসিয়াছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম কিন্তু কেহই আমার সহিত কোন কথা কহিল না; একবার ফিরিয়া চাহিলও না। আমার সমব্যবসায়িগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে আমি মধ্যে মধ্যে বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতাম ও নানা প্রকারে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্রটী করিতাম না, তাঁহারা আমার সহিত কোন সম্ভাষণ করা দূরে থাকুক, বরং আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অনেক নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। আর যে ছাত্রগণের সুখস্বচ্ছন্দতার ও উন্নতির জন্য আমি আমার জীবনের উন্নতির চেষ্টা ভুলিয়া গিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতাম এবং তাহাদের মধ্যে আনন্দ ও পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে স্বোপার্জ্জিত কপর্দ্দক পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া ফেলিতাম, সেই ছাত্রবৃন্দ আজ আর আমার কাছে আসিল না। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে প্রথমে যেমন অনেকেই সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, তাহারাও আমার সহিত কথা কহিতে সেইরূপ সঙ্কুচিত হইতে লাগিল বলিয়া আমার বোধ হইল। কেহ কেহ যেন আবার দূর হইতে আমাকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া পরস্পর ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি বলাবলি করিতে লাগিল ও মন্দ মন্দ হাসিতে লাগিল। তখন আমার প্রাণের ভিতর যে কষ্ট ও অনুতাপ উপস্থিত হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। সেই সময় কে যেন আমার কাণে কাণে কহিল,— তুমি যে এখন "ভূতপূর্ব্ব"! সংসারের আর এক প্রান্ত হইতে আর একটী অভিনয় দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া চোখের জল রুদ্ধ করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইলাম।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রাক্তন।

মাঘ মাসের প্রাতঃকাল। বেলা প্রায় আট ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তথাপি সূর্য্যোদয় হয় নাই; কারণ ভোর রাত্রি হইতেই দিঙ্‌মণ্ডল কুহেলিকা-চ্ছন্ন হইয়াছিল। তখনও সেই কুয়াশা ছাড়ে নাই।

আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি জীর্ণ টুলের উপর বসিলাম। সামনের বাগানে গাঁদাফুল গাছ-গুলাতে প্রচুর ফুল ফুটিয়া কুয়াশায় একরূপ ঢাকিয়াই ছিল। শীতের "কন্‌-কনে" বাতাসও ধীরে ধীরে বহিতেছিল। বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া লোক খুবই কম চলিতেছিল। কেবল খেজুররস ওয়ালারা তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ সুমিষ্ট গলায় "চাই খেজুর রস" বলিয়া হাঁকিয়া যাইতেছিল। তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রস-লুব্ধ দুই চারিটী শান্ত-শিষ্ট বালকও চলিতেছিল।

আমি নীরবে বসিয়া বসিয়া প্রকৃতির সেই কুয়াশাচ্ছন্ন অভিনব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিলাম। নিদ্রা-জনিত আলস্য তখনও সম্পূর্ণরূপে আমায় পরিত্যাগ করে নাই। সহসা বাগানের সম্মুখের দরজার দিকে আমার দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিলাম একটি সাত আট বৎসরের ছোট বালিকা সাজি হস্তে ধীরে ধীরে আমার বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। কুয়াশার জন্য ভালরূপে চিনিতে পারিলাম না বালিকা কে। সে ধীরে ধীরে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি একটি করিয়া সেই সদ্যঃপ্রস্ফুটিত ফুলগুলি তুলিয়া সাজিতে রাখিতে লাগিল। ফুলে ফুলে সাজি যখন প্রায় পূর্ণ হইয়াছে, তখন বালিকা আস্তে আস্তে প্রস্থানোন্মুখ হইল। আমি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে-ছিলাম, বালিকাটি কে এবং কোথা হইতে আমার বাগানে ফুল তুলিতে আসিল? সে নিত্যই কি আসে ইত্যাদি; এবং মনে একটু কৌতুহলও হইতেছিল। এখন তাহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া আর কৌতুহল দমন করিতে পারিলাম না। ধীর-পাদবিক্ষেপে তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম, বালিকা আমাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া কেমন যেন একটু ভীতা হইয়া আমার পানে চাহিল। তাহার সেই ভয়-চকিত ভাব আমার তখন বড় ভাল লাগিল। আমি স্নেহে তাহাকে বলিলাম, "কেমা তুমি এই দারুণ শীতে আমার বাগানে ফুল তুল্‌তে এসেছ? তোমার কি শীত কর্‌ছে না?"

বালিকা ধীরে—অতি ধীরে যেন বীণানিন্দিত স্বরে বলিল, "আমার মা "বত্তো" করেন, তাই ফুল তুল্‌তে এসেছি।

আমি বলিলাম, "কই মা. আমি তো আর কোন দিন তোমায় ফুল নিতে আস্‌তে দেখিনি ?"

তেমনই মধুর, তেমনই কোমল তেমনই সন্ত্রস্তভাবে বালিকা বলিল, "হ্যাঁ. আমিতো এখানে রোজ ফুল তুল্‌তে আসি !"

আমি। কই, আমিতো আর কোন দিন দেখিনি ! আচ্ছা, কি নাম তোমার মা ? কার মেয়ে তুমি মা ?

বালিকা। আমার নাম অমলা ; আমি কেশব বাড়ুয্যের মেয়ে। এই কথা বলিয়াই বালিকা প্রস্থান করিতে উদ্যতা হইল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আর একটু দাঁড়াও মা, আর দুটো কথা আছে।"

একটু ক্ষীণ হাসি তাহার সেই সুন্দর মুখে খেলিয়া গেল। অতি ধীরে —অতি কোমল স্বরে সে বলিল, "আচ্ছা একটু শীগ্‌গির বলুন, বেলা হল, মার "বত্তোর" দেরী হ'য়ে যাবে।"

আমি। তোমাদের বাড়ীতো মা সেই ঐপাড়ায়,—সে যে অনেক দূর ! তুমি এতদূরে ফুল নিতে আস কেন মা ? অন্য যায়গায় যাও না কেন ?

বালিকা। অন্য যায়গায় যেতাম; কিন্তু সব দুষ্ট ছেলেরা আমায় সেখানে মার্ত্তো গালাগালি দিত। তাই বাবা আপনার বাড়ী চিনিয়ে দিয়ে এখান থেকে ফুল নিয়ে যেতে বলেছেন। এখানে কেউ কিছু বলে না, আপনিও না। তাই এখানেই আসি।

আমি। আচ্ছা মা, তাহ'লে যত দিন তোমার যত ফুলের দরকার, আমার এখান থেকেই নিয়ে যেও,—কেমন ? যাও এখন, আর কোন দরকার নেই ;—কি তোমার নাম বল্লে ? অমলা না ?

"হ্যাঁ" বলিয়া বালিকা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

আহা কেমন সুন্দরী বালিকাটি ! কেমন মিষ্টি উহার কথা ! তাহার "ঢল ঢলে" মুখ আর ভাসা ভাসা চোখ দুটি বড়ই সুন্দর। কিন্তু পদ্মকোরকে কীটের ন্যায় তাহার সেই সরলতা মাখান সুন্দর মুখে কি যেন একটা বিষণ্ণ ভাব প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার সেই স্নেহ-কোমল, কুসুম-পেলব, সরল সুন্দর মুখখানি দেখিলে মনে যেমন একটা শান্তি আসে, তেমনই আবার তাহার সেই প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণভাব দেখিলে একটু ক্লেশও হয়।

বিধাতা যাহাকে এত সুন্দরী করিয়াছেন, তাহাকে আবার ঐ অল্প বয়সেই অমন বিষাদময়ী প্রতিমার ন্যায় করিয়াছেন কেন? হায়! একথার উত্তর কে দিবে?

কেশব বাড়ুয্যে আমার পরিচিত। তাঁহার বাড়ী আমার বাড়ী হইতে অল্প দূরেই অবস্থিত। লোকটি বড়ই ধার্ম্মিক এবং নিষ্ঠাবান্। গ্রামে সকলের সহিত তাঁহার সদ্ভাব, সকলেরই সহিত প্রীতি সূত্রে আবদ্ধ। সকলেই তাঁহাকে ভক্তি এবং মান্য করিয়া থাকে। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দুইটি বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছেন। কেশবের পুত্রসন্তান হয় নাই এবং তিনি আজীবন দারিদ্র্য-প্রপীড়িত। পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে যজমানগণের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার কোন প্রকারে চলিয়া যায়। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু অমলাই যে তাঁহার কন্যা উহা আমার জানা ছিল না। কারণ পূর্ব্বে আমি অমলাকে দেখি নাই বা যদিও দেখিয়া থাকি তো পরিচয় জিজ্ঞাসা করি নাই। কেশবের গৃহিণী, যত প্রকার ব্রত হিন্দু-রমণীগণ করিয়া থাকেন তাহার একটিও ছাড়িতেন না। তিনি যে কখনও গ্রামের কাহারও সহিত কোন্দল করিয়াছেন, একথা কেহই বলিতে পারে না।

আমাদের গ্রামখানি মাঝারি ধরণের এবং বেশ সমৃদ্ধ। ধনী নির্ধন, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল শ্রেণী ও সকল জাতি লোকেরই বাস। দোল, দুর্গোৎসব, পূজা পার্ব্বণ ইত্যাদিও কয়েকজনের বাড়ীতে হইয়া থাকে। গ্রামে রায়রাই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। লোকে তাঁহাদেরই গ্রামের জমীদার বলিয়া থাকে। রায়রা বাস্তবিকই খুব ভদ্র এবং পরোপকারী। তাঁহারা কখনও দরিদ্র প্রজাকে উৎপীড়ন করেন নাই বরং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে সাহায্যই করিয়া থাকেন। এক কথায় কুলুকুলুনাদিনী নদী, পাখীর গান, রাত্রে চাঁদের জ্যোৎস্না, দিন দ্বিপ্রহরে গাছের ছায়া, পানীয় ভরা পুষ্করিণী, কাদায় এবং ধূলায় ভরা মেটে পথ প্রভৃতি যাহা যাহা লইয়া বঙ্গ-পল্লীর সৌন্দর্য্য সে সমস্তই আমাদের গ্রামে আছে। রাত্রে যে চন্দ্রকিরণে পাপিয়ার সংগীত শ্রবণ করিয়াছে, বারুণীর তীরে (আমাদের গ্রামের নদীর ঐ নাম) দাঁড়াইয়া যে তাহার অব্যক্তমধুর ধ্বনি শুনিয়াছে, নিদাঘ-আতপ-দগ্ধ হইয়া যে বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় শ্রান্তি দূর করিয়াছে,—সে নিশ্চয়ই বলিবে বঙ্গ-পল্লী শান্তিনিকেতন। কিন্তু হায়! এই সোণার পল্লী সহসা

আজ কাল ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর প্রভাবে একেবারে শ্মশানে পরিণত হইতেছে। উহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় কি নাই ?

আমাদের গ্রামখানি অত শোভার আধার হইলেও আমার নিকট ধূ ধূ শ্মশানের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। হায়! কেন এমন হইত ? একথার উত্তর অনেক। অনেক কষ্টে সে সব এ দগ্ধ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম,—অনেক কষ্টে সে সব একরূপ বিস্মৃতই হইয়াছিলাম। কিন্তু অমলাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত,—তাহার সেই সরলতা মাখান স্বর্গীয় ভাব নিরীক্ষণ করিয়া পর্য্যন্ত, তাহার সেই সুন্দর মুখও সুকোমল স্বর শুনিয়া পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ে সেই সুদূর অতীত জীবনের পুরাতন কাহিনী জাগিয়া উঠিয়াছে। হায়! আমারও অমনই সুন্দরী একটি কন্যা ছিল,—বোধ হয় সে উহা অপেক্ষাও সুন্দরী ? আরও একটি স্নেহের দুলাল পুত্রও ছিল। আমার ক্ষুদ্র গৃহখানি সর্ব্বদাই তাহাদের কলহাস্যে আনন্দিত থাকিত। অমনি করিয়া ফুল তুলিয়া উহারাও মালা গাঁথিত, কিন্তু হায়! সে সব অনেক দিন গিয়াছে। জানিনা কোন্ মহাপাতকের ফলে বিধাতা আমার এ দশা করিয়াছেন! তারপর একে একে ঐ দুইটী দেব-শিশুই আমাদিগকে এই নশ্বর সংসারে পরিত্যাগ করিয়া দেব লোকে প্রস্থান করিয়াছে। বহু কষ্টে তাহাদের শোক ভুলিয়া আমরা দুটি প্রাণী—আমি ও আমার গৃহিণী—হৃদয় শ্মশান করিয়া এখানে পড়িয়া আছি। ইহার মধ্যে কতদিন কাশীবাসী হইতে ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু গৃহিণীর মায়ায় বদ্ধ হইয়া সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। তাঁহার ইচ্ছা তিনি এখানেই, এই "স্বর্গাদপিগরীয়সী" জন্মভূমির এক কোণে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। সুতরাং তাঁহারই অনুরোধে, এই বৃদ্ধ বয়সেও সংসারের মমতা ছিন্ন করিতে পারি নাই।

তাই আজ অমলাকে দেখিয়া আমার সেই পুরাতন স্মৃতি মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু হায়! এ কঠোর হৃদয়ে অধিকক্ষণ তাহার স্থান হইল না। যাহা, অনেক কষ্টে সুকোমল হৃদয়কে বজ্র-কঠোর করিয়া বিস্মৃত হইয়াছি, কেমন করিয়া আর তাহাকে এ হৃদয়ে স্থান দান করি ? যাহা ভুলিয়াছি আর কেন তাহা জাগাইয়া বৃথা কষ্ট পাই ?

(২)

সেই দিন হইতেই অমলা নিত্যই আমাদের বাড়ী ফুল লইতে আসিত। এখন তাহার সহিত আমাদের ভালরূপেই আলাপ হইয়াছে। সে আসিয়াই

প্রথমে আমার সহিত এবং পরে গৃহিণীর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা কহিত; তারপর ফুল লইয়া বাড়ী চলিয়া যাইত।

এক দিন তাহার চলিয়া যাওয়ার পর গৃহিণী আমায় বলিলেন, "আহা বেশ মেয়েটী! কেমন মিষ্টি কথা! শুন্‌লে কাণ জুড়িয়ে যায়! রোজ এসে ও কত কথা বলে, মায়ের কথা বাপের কথা,—আরও কত কথা। সব কথাই বেশ গুছিয়ে বলে। সে দিন কার পুতুলের ছেলের সঙ্গে তার পুতুলের মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছিল, তাও বল্‌লে। সকালে উঠে ওর কথাগুলি শুন্‌তে আমার বড়ই ভাল লাগে।

আমি বলিলাম, "সত্যই তাই। আমিও ওর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়ে বেশ আমোদ পাই। কিন্তু ও পরের মেয়ে আর দুদিন পরে বিয়ে হয়ে গেলেই আর আমাদের কাছে আস্‌বে না; আর অমন করে কথা কবে না। আহা! আমাদেরও অমনই একটি মেয়ে ছিল। হায়! সে যদি এখন থাক্‌তো, তাহলে দুজনে সই পাতিয়ে কত আমোদ আহ্লাদ কর্ত্তো, তাতে আমরা আরও কত সুখী হতাম!"

আমার কথা শুনিয়াই গৃহিণী করুণ স্বরে বলিলেন, "ওগো আর বলো না, ও কথা আর বলো না! ও কথা শুন্‌লে আমার প্রাণ আজ পর্য্যন্ত কেঁদে উঠে।" বলিয়া মর্ম্মস্থল আলোড়িত করিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার হৃদয় আর বাধা মানিল না,—দরদর ধারে চক্ষু দিয়াঅশ্রু বহিল।

আমি মনে মনে বলিলাম, 'ও কথা বলিয়া আমি ভারি অন্যায় করিয়াছি। কত কষ্টে ভোলা কথা কেন আমি আবার জাগাইয়া তুলিলাম?

পর দিন আমি তেমনই জীর্ণ টুলের উপর আসিয়া বসিলাম। সেদিন একটুও কুয়াশা ছিল না। বেশ পরিষ্কার নীল আকাশ; পূর্ব্বদিক লোহিত-রাগ-রঞ্জিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব উদিত হইতেছিলেন। আমি উৎসুক নয়নে ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতেছিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যেই অমলা সাজি হস্তে প্রবেশ করিল। বরাবর আমার নিকট আসিয়া সস্মিতাননে বলিল, "বাবা আজ আমায় শিখিয়ে দিয়েছেন, আপনাকে "হীরু জ্যেঠা" বলে ডাক্‌তে। আমি আপনাকে ঐ বলেই ডাক্‌ব,—কেমন?

আমার প্রাণটা আনন্দে নাচিতে লাগিল। সংক্ষেপে তাহাকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আহা! কত স্নেহ, কত করুণা এই বালিকা হৃদয়ে? তাই যদি নাই হইবে, তাহা হইলে কি সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী

বালিকা, যৌবনাবস্থায় সন্তানবতী হইয়া স্নেহময়ী জননীর আদর্শরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে? না রমণী হৃদয় অত সন্তান-বাৎসল্যে পরিপূর্ণ হয়। কালে যে বালিকা করুণাময়ী জনয়িত্রী হইয়া অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করিবে, এখন হইতেই বুঝি তাহার সূচনা? যাহাদিগকে ভক্তিময়ী, স্নেহময়ী এবং বাৎসল্যময়ী হইয়া আজীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, তাহারা বাল্যকাল হইতেই ঐ সকল গুণের আভাস প্রদান না করিবে কেন? এইরূপে কতক্ষণ চিন্তা করিয়াছি জানি না। যখন চিন্তা শেষ হইল, তখন চাহিয়া দেখিলাম, অমলা পুষ্প চয়নে নিরতা। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার পুষ্পচয়ন-কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে আমার নিকট আসিয়া বলিল, "হীরু জ্যেঠা! আমি কাল মামার বাড়ী যাবো; মামার ভারি অসুখ, তাই মা তাঁকে দেখ্‌তে যাবেন, আমিও তাঁর সঙ্গে যাব। আবার খুব শীগ্‌গিরই ফিরে আস্‌ব। এ ক'দিন তোমার ভারি কষ্ট হ'বে না হীরু জ্যেঠা?" বলিয়া আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল। আমার মনটা কেমন যেন "ছ্যাঁৎ" করিয়া উঠিল। ভাবিলাম, অমলার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া একটু আমোদ উপভোগ করিতেছিলাম, বিধাতা বুঝি তাহা হইতেও আমায় বঞ্চিত করেন! আবার মনে করিলাম,—না, তাহা হইতে বঞ্চিত হইব কেন? অমলা তো আর চিরদিনের জন্যই মামার বাড়ী যাচ্ছে না। শীঘ্রই তো আবার ফিরে আসবে! পরক্ষণেই মনে পড়িল,—অমলা বলিয়া গেল, "তোমার ভারি কষ্ট হবে না?" তবে কি এই কয়দিনের মধ্যে অমলাও সত্য সত্যই আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে সত্য সত্যই কি আমাদের প্রতি তাহার একটা প্রাণের টান জন্মিয়াছে? তা' হইতেও পারে! বালিকা হৃদয় স্বভাবতঃই কোমল; যেখানে একটু স্নেহাদর পায়, যেখানে একটু সমবেদনা পায়, যেখানে একটু সহানুভূতি পায়, সেখানেই তাহা আকৃষ্ট হয়। তবে আমাদের প্রতি অমলা আকৃষ্টা হইবে না কেন? আমরা তো তাহাকে খুব আদর যত্ন করি—আপনার কন্যার ন্যায়ই তাহাকে স্নেহ করি! হাঁ! নিশ্চয়ই সে আমাদের ভালবাসে;—ভালবাসার প্রতিদান ভালবাসা!

আমার মনে হইল, সে যখন ঐ কথা কয়টী উচ্চারণ করিল, তখন তার গলার স্বর যেন ভারি ভারি হইয়াছিল। যেন ঐ কথা কয়টী বলিবার সময় তাহার সেই ইন্দীবর তুল্য নয়নদ্বয় সজল হইয়াছিল। যদিও আমি তাহা দেখি নাই, তথাপি আমার মনে হইতেছে তাহার ঐরূপ ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়া-

ছিল। পাছে আমি দেখিয়া ফেলিলে তাহার প্রাণের ভাব ধরা পড়ে, এই ভয়ে একটুও অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া প্রস্থান করিল।

আর কষ্ট? কষ্ট কি হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে। এক দিন যাহার আসিতে বিলম্ব হইলে উৎসুক নয়নে আগমন পথ পানে চাহিয়া থাকি,—ক্ষণে ক্ষণে মনের মধ্যে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হয়; ক্রমান্বয়ে তাহাকে কয়েক দিন না দেখিলে কি কষ্ট হইবে না? একথা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? হায়, অবোধ বালিকা! কষ্ট হইবে কি না যদি তুই জান্‌তিস্, তাহা হইলে কি ঐ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তিস্? তোকে এই কয় দিন না দেখিয়া আমি যে কেমন করিয়া দিন কাটাইব, তাহা তোকে কি জানাইব?

হায় রে দুর্ব্বল হৃদয়! পরের জন্য এত কেন? আর দুই দিন পরে যাহার সহিত চক্ষের দেখা পর্য্যন্ত হইয়া উঠিবে না, তাহার জন্য এত বিচলিত হও কেন? নিজের রত্ন হারাইয়া যখন সহ্য করিতে পারিয়াছিস্, তখন আর ইহা সহিতে পারিবি না? অমলা কে? পর বইত আর কিছুই নহে। কয়দিন আগে উহার সহিত তো কোনই সম্বন্ধ ছিল না; আজ না হয় দুই দিন উহার সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাহার জন্য এত অস্থিরতা কেন?

যে হৃদয়কে বজ্র অপেক্ষাও কঠিন করিয়া গঠিত করিয়াছিলাম, আজ সহসা তাহার এইরূপ পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহাকে পূর্ব্বের মত কঠোর করিয়া লইলাম।

চাহিয়া দেখিলাম, বেলা প্রায় অষ্ট ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কি "মাথামুণ্ড" ভাবনায় এতক্ষণ অতিবাহিত হইল, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ীর ভিতর গেলাম। সে দিন সমস্ত দিনটাই মনটা কেমন খারাপ ভাবে কাটিয়াছিল। কিছুতেই তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে সমর্থ হই নাই।

তারপর এক এক করিয়া আরও কয় দিন কাটিয়া গিয়াছে। অমলা ছয় দিন পরে মামার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তারপর হইতে নিত্যই আমাদের বাড়ী প্রয়োজনে কিংবা বিনা প্রয়োজনে একবার করিয়া আসিত। আমার সহিত এবং গৃহিণীর সহিত নানা কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যাইত। তাহার মাতুল সম্পূর্ণ-রূপে আরোগ্য-লাভ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ প্রামাণিক।

আঁধারে আলোক।

কোমল জনম, বিফল স্বপন,
ধূলায় লুটিবে (এ) নরদেহ,
সাজান সংসার অসার মায়ার
রহিবে পড়িয়া (দূরে) রম্য গেহ।
আঁধার গগনে, এসেছি বিপিনে
পাব বলে রাতুল চরণ,—
রহিলাম বসি' জাগি' সারা নিশি—
না মিলিল সে শ্যামবরণ
পাখী উড়ে যায় ডেকে বিভু পায়
নিরজনে (এবে) পাব মোর পতি,
আশা পথ চেয়ে দিন যায় বয়ে
(এ) জনমে মোর হ'লনা গতি।
চাঁদ ফুটে ওঠে আলো ভাসে মাঠে
আসিলাম (আমি) মণিকর্ণিকায়;
তিমির নামিল চন্দ্রমা ডুবিল,
চলিয়াছি (এবে) ভস্ম মাখি গায়।
দিন রাত গেল ছয় ঋতু এল
হিম বরিষা পড়িল মাথে,
জ্ঞান নাহি মোর দিন রাত্তি ভোর,
ও রাঙ্গা চরণ রেখেছি সাথে।
আঁখি মেলি দেখি ফুল-ভরা শাখী
বিল্বপত্র করে ত্রিনয়না সতী,
শিরে গঙ্গা ফণী, হর-শূলপানি,
দাঁড়ায়ে দুয়ারে ত্রিজগত-পতি॥

শ্রীফণিভূষণ মুখুর্য্যে, বি, এ।

প্রতিদান।

(১)

"সুবর্ণপুর" একটী ক্ষুদ্র "পল্লীগ্রাম"। এই সুবর্ণপুরেই আমার জন্মস্থান। গ্রামের দক্ষিণদিকে খরস্রোতা "ইচ্ছামতী" নদী প্রবাহিতা। নদী হইতে আমাদের বাড়ী বেশী দূরে নয়। আমাদের সংসারে আমার পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বৌদিদি, তাহা ছাড়া দূর সম্পর্কীয় এক পিসিমাতা আছেন। আমিই এখন পিতামাতার কনিষ্ঠ পুত্র। আমার কনিষ্ঠ আর কেহ বর্ত্তমান নাই। আমার একটী ভগ্নী ছিল, কিন্তু কালের কুটীল দুর্দ্দৈব বশতঃ ইচ্ছামতী তাকে গ্রাস ক'রেছে। রামনগর মাতুলালয় হইতে ফিরিবার সময় কাল বৈশাখের প্রবল ঝড়ে নদী-বক্ষে যখন আমাদের ক্ষুদ্র তরণী নিমজ্জিত হয়, সেই সময় আমার বোন—স্নেহের সুষমা—খরস্রোতা ইচ্ছামতীর অতল সলিলে চিরদিনের জন্য লুপ্তা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হতভাগ্য আমি, আমার ত মৃত্যু হইল না! হায়! সংসারে সে যে আমার প্রিয় হইতেও প্রিয় ছিল। যদি কোন অপরাধে পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া অনুতপ্ত হইতাম, তখন সুষমা আসিয়া দাদা-দাদা বলিয়া তাহার কোমল কর দুখানি দিয়া যখন আমার কণ্ঠবেষ্টন করিত, তখন আমার দুঃখ কষ্ট, শোক তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা, এক মুহূর্ত্তের জন্য কোন দূর দুরান্তরে ভাসিয়া যাইত। কিন্তু হায়! আজি আর আমায় সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই। আজি যে আমার হৃদয় মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে, আজি ত কেহ সান্ত্বনা দিতে আসে না। হায়! আজি যদি আমার স্নেহের বোন সুষমা থাকিত, তাহা হইলে আমার এই হৃদয় মরু-ভূমি শান্তি-নিকেতন হইত। আয়, বোন একবার আয়! আমার এই অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ে শান্তি দিতে একবার আয়! দেখিয়া যা এ হৃদয় শ্মশান হইতেও ভয়ঙ্কর হইয়াছে, মরুভূমির ন্যায় ধু ধু করিতেছে, প্রস্তর সম কঠিন হইয়াছে। এ হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্যও শান্তি নাই, সুখ নাই, স্নেহ নাই ভাল-বাসা নাই। আছে শুধু লেলিহান্ দাবানল, ভীষণ চিতাগ্নি, আর সর্ব্ব শরীরে প্রখর জ্বালা।

(২)

হায়! আজি আবার সেই দিন। ইচ্ছামতী আজি আবার, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আর আমি তীরে বসিয়া,

তার এই প্রতিহিংসার চূড়ান্ত ভাব দেখিয়া, পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া দুই এক ফোঁটা অশ্রুজলে তাহার জল বৃদ্ধি করিতেছি। এমন সময়ে একটা প্রবল ঝড়ে নদীবক্ষ আন্দোলিত করিয়া দিল। এবার সে রাক্ষসের মত সংহার বেশ ধারণ করিয়া, ভীমবেগে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। চারিদিক্ অন্ধকার, তাহাতে আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি নিশ্চল নির্ব্বাকভাবে, তাহার এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে বসিয়া রহিলাম। ক্রমেই ঝড়ের গতি বৃদ্ধি হইল। আরও দ্বিগুণভাবে নদী গর্জ্জন করিয়া উঠিল। আমার মনে হইল, এই সেই কাল বৈশাখের প্রবল ঝড়। একদিন এই সময়ে, আমার স্নেহের ভগ্নী আমাদের স্নেহে বঞ্চিত হইয়া চিরতরে ইহার অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। আজি আবার ঠিক সেই দিন! অকস্মাৎ এক ভীষণ চীৎকারে আমার সকল ভাবনারাশি দূরে চলিয়া গেল। সে চীৎকারে আমার হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল। কি সে চীৎকার! কি ভীষণ মর্ম্ম-বিদারক কাতরধ্বনী! ঘোর অন্ধকার, প্রবল ঝড়, আমি উঠিলাম। প্রবল বায়ু আমার প্রায় উন্মাদের মত অবস্থায় পরিণত করিয়াছে। গায়ে একটা চাদর ছিল, বাতাসে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে কিছু ঠিক্ করিতে পারিলাম না। এমন সময় আবার সেই ভীষণ মরণ-চীৎকার। এ চীৎকারে বোধ হয় পাষাণও দ্রবীভূত হয়। "রক্ষা কর কে কোথায় আছ প্রাণ গেল বাঁচাও।" আমি উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া উঠিলাম, ভয় নাই ভয় নাই। আমার সে স্বর তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল কি না জানি না। কিন্তু আর কোন চীৎকার আমি শুনিতে পাইলাম না। আমি উন্মাদের মত তীরে ছুটাছুটী করিতে লাগিলাম। কিন্তু ঘোর অন্ধকার কিছুই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। সহসা বাতাস কমিয়া গিয়া নদী শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। সেই ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইলাম প্রায় পঞ্চাশ হস্ত দূরে মানুষের মত কি একটা ভাসিয়া যাইতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি, আমার মনের অবস্থা কল্পনা করিয়া নদী বক্ষে ঝাঁপ দিলাম। অতি কষ্টে ঢেউগুলির সহিত সংগ্রাম করিয়া সেই মূর্ত্তিখানিকে দুই হস্তে বুকের উপর তুলিয়া সাঁতার দিয়া তীরে আসিলাম। যখন মূর্ত্তিখানিকে তীরে তুলিলাম, তখন আমি স্তম্ভিত! হরি! হরি! একি! এ যে প্রায় দ্বাদশ-বর্ষীয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী এক দেবী প্রতিমা! একি রূপ! একি সৌন্দর্য্য! দেখিলাম যে বালিকার দেহে তখনও প্রাণ আছে। চেষ্টা করিলে

বাঁচিতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নদী হইতে আমাদের বাড়ী বেশী দূরে নয়। আমি বালিকাকে কাঁধে তুলিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিতে লাগিলাম। বাড়ীতে আসিয়া প্রথমেই বালিকার সুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলাম। সকলেই আমার সাহসে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। বিশেষতঃ "বৃদ্ধা পিসিমাতা আমায় যতটা ধন্যবাদ দিলেন এতটা আর কেহ দেয় নাই।" সকলেই বালিকার সুশ্রূষায় নিযুক্ত। ক্রমে, ক্রমে, বালিকার জ্ঞান হইল! ক্ষীণস্বরে বলিল আমি কোথায়? আমি বলিলাম, ভয় নাই সুস্থ হও পরে জানিবে। এইরূপ সুশ্রূষার পরে বালিকা সুস্থ হইল, তখন তাহার পরিচয় পাইলাম। সে সংগ্রাম পুরের হারাধন রায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। রায় মহাশয় কোন বিবাহ উপলক্ষে মাণিকগঞ্জে গিয়াছিলেন, সেখান হইতে সপরিবারে বাড়ী যাত্রা করিবার পথে এই বিপদ! বালিকার নাম নির্ম্মলা। নির্ম্মলা পিতা মাতার জন্য বড়ই অস্থির, অতি কষ্টে সকলে তাহাকে ভুলাইয়া রাখে। হারাধন বাবুর অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাঁহার বা তাঁহার স্ত্রীর কোন সংবাদই পাইলাম না। বুঝিলাম যে সর্ব্বসংহারিণী ইচ্ছামতীই তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। তাঁহারা সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ইচ্ছামতীর অতল গর্ভে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। হায়! নির্ম্মল সলিলে ইচ্ছা-মতি! তুমি এমন মায়া মমতা হীনা পাষাণীর মত হইলে কেন? আজিও বুঝি পাষাণ্ পিতাকে ভুলিতে পার নাই?

বাড়ীর সকলেই নির্ম্মলাকে ভালবাসেন। কিন্তু আমি? আমি যে তাহার জন্য আমার জীবনের সব সুখ সব শান্তি বিসর্জ্জন দিয়াছি। এখন যে আমার ধ্যান, জ্ঞান, নির্ম্মলা! আমার সুখ দুঃখ নির্ম্মলা! শুধু সুখ দুঃখ কেন, যদি আমার জীবনের কিছু থাকতে হয়, যদি আমার জীবনের জীবন থাকে তাহা হইলেও সে একমাত্র নির্ম্মলা। সেই নির্ম্মলা কি আমায় ভাল বাসে না? সেই নির্ম্মলার হৃদয় কি এতই কঠিন হইবে? তবে আমি কেন তাহার জন্য এত লালায়িত? তবে কেন তাহার সেই সুন্দর মূর্ত্তিখানিকে আমি হৃদয়ের সহস্রদল-পদ্ম-মধ্যে বসাইয়া, প্রত্যহ, প্রত্যহ কেন প্রতি মুহূর্ত্তেই ইষ্টদেবতার ন্যায় পূজা করি! তবে কেন তাহার নাম প্রতিক্ষণেই অতি গোপনে হৃদয়তন্ত্রীতে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় জপ করি? তবে কেন তাহার সেই মধুর নাম প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইয়া, আমার হৃদয়কে অনুক্ষণের জন্য কল্পনারাজ্যে বিচরণ করায়? সে কি আমায় ভাল

বাসে না? তবে কেন তাহার জন্য আমি আমার জীবনকে অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছি! অশান্তিময়! তাহাই বা বলি কি করিয়া, সেই অশান্তির মধ্যে কি যেন একটু শান্তির ছায়া আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে। সেই অশান্তি আঁধারের মধ্যে নির্ম্মলার আলোকময় মুখখানি যেন মাঝে মাঝে আমার হৃদয়কে প্রদীপ্ত করিয়া তুলে। তাই বলিতেছি অশান্তিই বা বলি কি করিয়া! সে চিন্তা যে শান্তিময়ী তার ভাবনা যে স্বর্গীয়া, তার ধ্যান যে পরম ধন। তবে বল নির্ম্মলা তুমি আমাকে ভালবাস। নির্ম্মলা! নির্ম্মলা! একবার বল্ তুই আমায় ভালবাসিস্। আমি আর কিছুই চাই না, তোর মুখের একটি মাত্র কথা শুনিয়া, আমি আমার সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করি। নির্ম্মলার অপরূপ সৌন্দর্য্য আমার হৃদয়ে এমন ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, যে কিছুতেই তার স্মৃতি আমার হৃদয় থেকে দূর করিতে পারিলাম না। শুধু তাহারই চিন্তায় আমার সমস্ত দিনটা অতিবাহিত করিতে হয়। চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করে।

একদিন চিন্তা করিতেছি! নির্ম্মলার অপরূপ সৌন্দর্য্যের মধুময় মূর্ত্তিখানি আমার মানসচক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া আমাকে আরও চিন্তিত করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময়ে সকল চিন্তায় সুধাবর্ষণ করিয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গিতলহরী আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে সঙ্গীত কি মধুর! কি মর্ম্মস্পর্শী! আমার সকল সুখ দুঃখ সেই গানের সুরে কোন দূর দুরান্তরে ভাসিয়া গেল। আমি উঠিলাম। আমাদের পুকুরধার দিয়া যেন সুর আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল। আমি সেই দিকেই অগ্রসর হইলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া কি দেখিলাম! দেখিলাম পুকুরের সানের উপর আলুলায়িত কেশা, সুমোহনবেশা আমার মানসপ্রতিমা নির্ম্মলা।—নির্ম্মলা আবার গাহিল—

> শুনেছি তোমার নাম অনাথ আতুর জন,
> এসেছি তোমার দ্বারে শূন্যে ফিরি না যেন॥

কবির কি মধুর সৃষ্টি! আমি মুগ্ধ! গান শেষ হইলে, আমি বলিয়া উঠিলাম, নির্ম্মলা! কি সুন্দর কণ্ঠস্বর তোমার! নির্ম্মলা বলিল,—একি! আপনি এখানে কখন আসিলেন? আমি বলিলাম,—তোমার গানের সুরে আমি মুগ্ধ হইয়া, নিজের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমি এখানে প্রায়

দশ মিনিট দাঁড়াইয়া আছি। নির্ম্মলা! আর একটি গান গাও! তোমার সুর বড় মধুর বড় সুন্দর! নির্ম্মলা লজ্জা না করিয়া আবার গাহিল—

এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার।
আজি এ মধুর নিশি দশদিশি হাসি
এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার॥

আমি আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, নির্ম্মলা! এত সুন্দর গান তুমি জান? আগেত' আমায় বল নাই! এত দিন আমি নির্ম্মলার নিকট আমার মনের ভাব প্রকাশ করি নাই, কিন্তু আজ আমি উন্মত্ত! সত্যই আমি আজ উন্মত্ত। আমি সহসা নির্ম্মলাকে বলিয়া ফেলিলাম, নির্ম্মলা! তুমি কি আমায় ভালবাস? নির্ম্মলা বলিল,—যিনি আমার জীবন-দাতা তাঁহাকে ভালবাসিব না—তবে কাহাকে ভালবাসিব? আমি বলিলাম,—তাহা নয়। আমি তোমাকে যেরূপ ভালবাসি তুমি কি সেইরূপ ভালবাস? নির্ম্মলা বলিল,—সে কেমন? আমি বলিলাম, সে ভালবাসা স্বর্গীয়! সে বড় মধুর বড় সুখের। সে ভালবাসা বিষের চেয়েও তীব্র, সর্প অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। সে ভালবাসা পবিত্র উপাদানে গঠিত। নির্ম্মলা! নির্ম্মলা! আমি তোমাকে সেইভাবে ভালবাসিয়াছি। তোমার রূপের প্রভায় আমি উন্মাদ হইয়াছি। প্রিয়তমে! একবার বল তুমি আমায় ভালবাস! আমি তোমার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছি বলিয়া তোমার নিকট এ কথা বলিতে সাহস হইয়াছে। বল বল আমায় ভালবাস? নইলে আমি দেশত্যাগী হইব, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবনের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিব। বল বল নির্ম্মলা তুমি আমায় ভালবাস, নির্ম্মলা বলিল,—বাসি। আমার জীবনে যত সুখ শান্তি আছে সব আমি তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি। তুমিই আমার দেবতা—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। আমি আনন্দে বলিলাম নির্ম্মলা! যে দিন নদী-বক্ষ হইতে তোমার ওই অপরূপ মূর্ত্তিখানি তীরে তুলিলাম, ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোক তোমার অচৈতন্য দেহের উপর আসিয়া তোমাকে কত সুন্দর করিয়াছিল! নির্ম্মলা! নির্ম্মলা! সেই দিন হইতে আমার হৃদয়পটে তোমার নির্ম্মল মূর্ত্তিখানি চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে! সেই দিন হইতে আমার হৃদয়ের সকল সুখ শান্তি চলিয়া গিয়াছে, আমার হৃদয়মাঝে কি এক প্রলয়ের আঁধার জমাট বাঁধিয়াছে! প্রিয়তমে,

আজ কিন্তু তোমার ওই একটি মাত্র কথায় আমার এই মরু হৃদয়ের মাঝে কে যেন শান্তিবারি সেচন করিয়াছে! আমার অশান্তিময় প্রাণে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। এই চির অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের মাঝে আবার আলোকের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার কথা শেষ হইলে নির্ম্মলা আবার বলিল, তুমি আমায় রক্ষা করিয়াছ, আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে তাহার 'প্রতিদান' দিবার কিছুই নাই! আমি আনন্দে নির্ম্মলার মধুমাখা মুখে একটি চুম্বন করিয়া বলিলাম, নির্ম্মলা, প্রিয়তমে! এ বড় মধুর 'প্রতিদান'।

(৪)

একদিন প্রভাতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বাহির হইলে পর, শুনিলাম আমার বিবাহ। কিন্তু কাহার সঙ্গে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অথচ বিবাহ। আমি আবার চিন্তা মগ্ন হইলাম। আমার বিবাহ? কিন্তু কার সঙ্গে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বৌদিদি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, কি ঠাকুর পো! বিয়ে ক'রে, শেষে যেন নির্ম্মলার চাঁদমুখ দেখিয়া আমাদের ভুলিয়া যাইও না। আমি নির্ব্বাক, আমি যেন বধির! আমি বিস্মিত—আমি স্তম্ভিত! কথা কি সত্য?

সত্য সত্যই তাহাই! মাতার একান্ত ইচ্ছা, আমার সঙ্গে নির্ম্মলার বিবাহ দিয়া, নির্ম্মলাকে কন্যার মত চিরদিন বাড়ীতে রাখিয়া দেন। মায়ের কথায় কাহারও আপত্তি হইল নাই। শুভ দিনে আমাদের গাত্রহরিদ্রা ও শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। আমিও নির্ম্মলাকে পাইয়া বড় খুসী হইলাম। সেও বোধ হয় হইল। বাসরে নির্ম্মলাকে বলিলাম, নির্ম্মলা! তুমি কি সুখী হইয়াছ? নির্ম্মলা বলিল,—আমাদের মত সুখী কে? তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, এ প্রাণ চিরদিনই তোমার। তুমিই আমার প্রভু হৃদয়-দেবতা। আমি বলিলাম,—নির্ম্মলা! বড় মধুর ভালবাসা তোমার। বড় সুন্দর তুমি। আমি নির্ম্মলাকে বুকে টানিয়া তাহার কমল-বিনিন্দিত সুকোমল গণ্ডে ও তাহার সুধা মাখা মুখে শত চুম্বনে তাহার ভালবাসার 'প্রতিদান' দিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু।

ছিন্নলিপি।

যে যাবে সে গেছে চ'লে রেখে গেছে লেখা তার,
মরমের ভাষা হেন কে কোথা পাইবে আর!
মরতে যে এনেছিল স্বরগের রসোচ্ছ্বাস,
তার বীণে উঠিত কি এতই মধুর ভাষ?
এনহে কবির ভাষ', এনহে ঝঙ্কার তার
এযে ঘোর পদ্মময়, এ ছায়া সরলতার!
এতে নাই হা হুতাশ, এতে নাই আয়োজন,
এতে নাই বাক্যছটা, বৃথা আত্ম-বিসর্জ্জন!
—ঘুরে ফিরে এক'ই কথা, "তোমা ছাড়া জানি না
তোমার বিরহে তাই অভাগিনী মলিনা"!
"জীবন-সর্ব্বস্ব," "নাথ," "প্রিয়তম," "প্রাণেশ্বর",
ইহাতে পাবে না কভু সম্বোধন-আড়ম্বর!
ইহাতে পাবে না কোথা বিরহের তপ্তগান,
ইহাতে না আছে ওগো হাসি কান্না অভিমান!
কত দিন ব'য়ে গেল লিপিখানা লিখে গেছে
কত কথা ছিঁড়ে গেছে, আধা আধা প'ড়ে আছে।
তবু ও লিপিকাখানি এতই কবিত্বমাখা
প্রতি বাক্যে আছে এত অস্ফুট উপমা আঁকা।
কালিদাস পারে নাই শকুন্তলা হাতে আঁকি,
রঘুবংশ কোথা লাগে, মেঘদূত শুধু ফাঁকি,—
প্রতি পংক্তি ধরে হেথা এতই গভীর ভাব
মাঘ কোথা লাগে বল, শ্রীকণ্ঠে বা কিবা লাভ!
এমন ললিত পদ কোথায় পাইবে হর্ষ?
কোথাও পাইনি হেন ব্যাপিয়া জীবনবর্ষ!
প্রতিবর্ণে উঠে এর কত অতীতের কথা,
কত অতীতের হর্ষ, কত বর্ত্তমান ব্যথা,
অক্ষরে অক্ষরে এর কত মিলনের আশা
প্রতিপদ উচ্চারণে কত না নীরব ভাষা!
তোমরা বলিবে হায়, ইহাতে কিছুই নাই,
কেন যে এমন লাগে আমিও বুঝিনা তাই!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কার্পাস বীজের তৈল।

পৃথিবীতে কোনও সামগ্রীর অপব্যয় অর্থনীতিশাস্ত্রের যুক্তি-বিরুদ্ধ। একালে জল-প্রপাত হইতে বিদ্যুৎ সঞ্চিত করিয়া তাহা কার্য্যে বিনিয়োগ করা হইতেছে, সূর্য্যকিরণকে আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা রন্ধনাদি কার্য্যনির্ব্বাহের চেষ্টা হইতেছে, এমন কি টেলিগ্রাফে সংবাদ আদান প্রদান কার্য্যে তাহার প্রধান অবলম্বন তারটীকে বাদ দিয়া কেবল পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়াই অভীষ্ট সাধন সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অপরদিকে মনুষ্য পশু প্রভৃতির পুরিষ পর্য্যন্ত কাজে লাগিয়া যাইতেছে, সুতরাং আমরা বস্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য কার্পাসের আবাদ করায় তুলায় যে রাশি রাশি বীজ পাই, তাহা কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা নির্ণয়ের জন্য এদেশের কৃষিবিৎ পণ্ডিত ও অর্থনীতিবিৎ ব্যবসায়ীগণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক একত্র আলোড়িত হইতেছে।

কিন্তু ইউরোপে ও আমেরিকায় এই বিষয়ের আলোচনা অনেক পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। ইউরোপের অনেক দেশে কার্পাসের বীজ খুব কাজে লাগিয়া গিয়াছে। কার্পাসের বীজে যে বেশ তৈল হয় তাহা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ফ্রান্সের আর্শেলিস নগর তৈলের কারবারের জন্য বিখ্যাত, সেখানে ১৯০৭ অব্দে ১৪৪৮৬ টন কার্পাস বীজের তৈল আমদানী হইয়াছিল। মার্কিন দেশ তুলার আবাদের জন্য বিখ্যাত, এই তৈল সেখান হইতেই ফরাসী দেশে আমদানী হইয়াছিল। নানা জাতীয় খৈল ও ১৭৯৭০০ টন আমদানী হইয়াছিল; এই খৈল ফ্রান্সদেশের অনেক কৃষিক্ষেত্রে সাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ভারতের কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের দৃষ্টিও কার্পাসবীজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কার্পাসবীজ কিছুদিন হইতে প্রচুর পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানী হইতেছে এবং প্রতি বৎসরই রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয় বলিয়াই সে দেশে ইহার এত আদর হইয়াছে। ১৮৯৯—১৯০০ অব্দে ভারত হইতে ৪৩,৪৮৫ হনড্রেডওয়েটের (প্রতি হনড্রেডওয়েটের পরিমাণ প্রায় পৌণে দুই মণ) বীজ ইউরোপে রপ্তানী হয়, কিন্তু ১৯০২—১৯০৩ অব্দে ৩৯,৭৪,০০০ হনড্রেডওয়েট বীজ রপ্তানী হইয়াছিল। দুই বৎসরের মধ্যে রপ্তানীর পরিমাণ কত বৃদ্ধি হইয়াছিল ভাবিলে

বিস্মিত হইতে হয়। কার্পাসবীজের মূল্য অধিক নহে মশিনা, মাষকড়াই প্রভৃতির মূল্য তুলনায় কার্পাসবীজের মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প; এক মন কার্পাস বীজের মূল্য দেড় টাকার অধিক নহে। অন্ততঃ বোম্বাই সহরে ইহার এই দর। ভারত হইতে কাঁচা জিনিস ইউরোপে রপ্তানি করা ভারতের পক্ষে বিশেষ লাভজনক নহে; কারণ সেই জিনিস হইতে কোনও পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতের পারিশ্রমিকে দেশের লোক বঞ্চিত থাকে। আমরা অপরিষ্কৃত চামড়া পাঠাইব, জুতার ট্যান করা চামড়া লইব, তুলা দিয়া সুতা লইব—চিরদিন এ নিয়মে কার্য্য চলিলে আমাদের শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের অবস্থা কখনই উন্নত হইবে না। যদি আমরা এত অল্প দামে বিদেশে কার্পাসবীজ না পাঠাইয়া এদেশেই তাহা হইতে তৈল উৎপাদনের চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের শ্রম কখনই অপুরস্কৃত থাকিবে না। কার্পাসবীজের সুপরিষ্কৃত তৈল আমাদের এই বিষম তৈলসমস্যার দিনে অনায়াসেই খাদ্য সামগ্রী পাকে ও অন্যান্য গৃহকর্ম্মে ব্যবহৃত হইতে পারে, বিশেষজ্ঞগণ তাহার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহার খৈল কেবল সারের কার্য্যে নহে, গবাদি পশুর খাদ্যরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইউরোপের কৃষিজীবীরা কার্পাসের খৈলে জমীর উৎপাদিকা শক্তিবর্দ্ধনে এতই কৃতকার্য্য হইয়াছে যে, ইহা তাহাদের ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধিপক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, বিলাতের হল নগরে যে কার্পাসের খৈল বিক্রয় হইতেছে—বোম্বাই সহরে কার্পাস বীজের মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং আমাদের দেশের কৃষকদের যদি স্বদেশহিতৈষী মহাশয়েরা বুঝাইয়া দেন যে, কার্পাসবীজের খৈল তাহারা অনায়াসে গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে পারে—তাহা হইলে তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, এবং পরীক্ষার ফল এত সন্তোষজনক হইবে যে, এই খৈলের জন্য সকলেরই আগ্রহ জন্মিবে; তখন কার্পাস বীজের তৈল উৎপাদনের জন্য অনায়াসেই বহুসংখ্যক কল প্রতিষ্ঠিত হইবে। সর্ষপাদির তৈল যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং কার্পাস বীজের তৈলের যেরূপ সুনাম শুনিতেছি, তাহাতে ঘানিতে বীজ মাড়িয়া এই তৈল আহার্য্য দ্রব্যের সহিত সর্ষপ তৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায় কি না, তাহার পরীক্ষা হওয়া উচিত। সর্ষপ তৈলের নাম করিয়া আজ কাল যে সকল পদার্থ আমাদের পাকযন্ত্রের সচলতা রক্ষা করিতেছে, তাহাদের তুলনায় কার্পাসবীজের তৈল অনেক পরিমাণে নিরাপদ বলিয়াই মনে হয়।

আমেরিকায় এই তৈলের ব্যবহার কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। পঞ্চাশ গ্যালন তৈল ধরিতে পারে, এরূপ ত্রিশ লক্ষ পিপা তৈল এক মার্কিন যুক্তরাজ্যে প্রতিবৎসর উৎপন্ন হইতেছে।

কার্পাস বীজের তৈল প্রথমে অপরিচ্ছন্ন ও অব্যবহার্য্য থাকে, ইহাকে কষ্টিক সোডা দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। অবশ্য কিরূপে প্রচুর পরিমাণ তৈল অল্প সময়ের মধ্যে শোধিত করিতে হইবে, তাহা রাসায়নিক পণ্ডিতগণের দ্বারা নির্দ্ধারিত করিতে হইবেই; তবে জানা গিয়াছে, ৫০ হইতে ৩০০ পিপা পর্য্যন্ত তৈল একবারে বিশোধিত হইতে পারে। পরিষ্কৃত হইলে তৈলের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ হয়। দেখিলে মনে হয় যেন জলপাইয়ের তৈল। তখন ইহা খাদ্যদ্রব্যে মাখিয়া খাইলে ইহার আস্বাদন কটু বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না; বরং খাদ্যদ্রব্য বেশ সুস্বাদ হয়। পরিষ্কৃত তৈলকে বিশোধিত করিতে প্রতি মণে চারিসের কমিয়া যায়, অর্থাৎ ঐ পরিমাণ রেতি বা ময়লা পড়ে। কিন্তু এই 'রেতির' মূল্য আছে; ইহা হইতে সাবান হইতে পারে। অবশ্য ইহা স্বতন্ত্রভাবে সাবান নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয় না—সাবানের ইহা একটি প্রধান উপাদান হইতে পারে। এমন কি, সাবান প্রস্তুতের জন্য আজ কাল বাজারে যে সকল উপাদান কিনিতে হয়, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

আজ কাল সাবানের ব্যবসায়ে দারুণ প্রতিযোগিতা উপস্থিত! বিলাতী সাবান ভারতের বাজার হইতে প্রায় নির্ব্বাসিত, ভারতের অনেক প্রধান সহরে সাবানের কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নূতন নূতন লোক সাবানের কারবার স্থাপনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন। যিনি জিনিস সস্তা দিতে পারিবেন, তাঁহারই কারবার প্রতিষ্ঠাপন্ন ও লাভজনক হইবে। সুতরাং সাবান ব্যবসায়ীরা কার্পাসবীজের তৈলের 'রেতি' দ্বারা কিরূপে সাবান নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করুন। নানা বিষয় আবিষ্কারের সময় আসিয়াছে, এখন আর পুরাতনের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না।

এখন এই লাভের ব্যবসাটা যাহাতে ইউরোপীয়েরা একচেটিয়া করিয়া রাখিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। আমরা আমাদের দেশের ধনকুবেরদিগকে এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপণের জন্য অনুরোধ করি। বিশেষজ্ঞ রাসায়নিকগণের সহায়তা গ্রহণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগকে

ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। স্বদেশীর স্রোত এক ধারায় বহিলে তাহাতে দেশের সর্ব্ব সাধারণের সকল বিষয়ে সুবিধা হইবে এ আশা নাই;—স্বদেশী ভাগীরথীকে শতধারায় শতদিকে প্রবাহিত করিতে হইবে; তাহাতে আমাদেরই মঙ্গল, তাহাতেই আমাদের গৌরব, উন্নতি ও মুক্তি। আর এই জন্যই আমরা এই সকল বিষয়ের আলোচনা একান্ত আবশ্যক মনে করি।

শ্রীঃ —

আবাহন।

এস নবীন রাগ মাখি,
চাহ মেলিয়ে শোভন আঁখি,
জাগ ত্রস্ত বিষাদ চিত্তে মম,
পরাণ ভরিয়ে দেখি।
গাই এমনি মধুর গান,
যাহে পুলকে মাতিবে প্রাণ,
ধীরে উঠিবে মধুর ললিত কণ্ঠে,
বিশ্ব মোহন তান।
এস হৃদয়-আবাসে মম,
তব শ্বেত কান্তি-কম,
হেরি পূরিবে চিত্ত মধুর হাস্তে,
ফুল্ল নলিনী সম।
এস নবীন রাগ মাখি,
চাহ মেলিয়ে শোভন আঁখি,
দেহ জ্ঞান-আলোক মলিন চিত্তে,
রাঙ্গা চরণে রাখি।

শ্রীদুর্গাদাস দত্ত।

শিক্ষার দোষ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় মিত্রবাড়ী হইতে তাহার বাড়ী আসিয়া বহির্ব্বাটীর চালা-ঘরে বসিলেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও আদর-অভ্যর্থনা করিয়া নিজে যে আস্তৃত মাদুরে উপবেশন করিলেন, তাহাতেই বসাইলেন। তারপরে—"পেঁচো, পেঁচো" বলিয়া ভৃত্যকে ডাক দিলেন।

অনেক ডাকাডাকির পরে পেঁচো ওরফে পাঁচু, তস্য ওরফে পঞ্চানন দালাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

পাঁচুর বয়স ত্রিশ বৎসর হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, পঞ্চাশ বৎসর বয়স সে অনেক দিন উত্তীর্ণ করিয়া বসিয়াছে। মুখের চুয়া'ল দুটা সম্পূর্ণভাবে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে,—চক্ষু নিম্নদিকে নামিয়া গিয়াছে। নাসিকা শুষ্কভাবাপন্ন। দেহ কঠোর - বিশুষ্ক। পৃষ্ঠদেশ কিঞ্চিৎ উঁচু এবং সম্মুখভাব ঈষৎ নীচু। পরিধেয় বস্ত্র মলিন,—মুখে শ্মশ্রু-গুম্ফ নাই। সে একটু তোৎলা। আর বুদ্ধি সবিশেষ সূক্ষ্ম—এত সূক্ষ্ম যে, অনেক সময় অনেকে নাই বলিয়াই বিবেচনা করিয়া থাকে।

পাঁচু স্ব-শরীরে হাজির হইলে, স্মৃতিরত্ন বলিলেন,- "একটা আলো দে। আর বাড়ুয্যেদাকে এক-সিলিম তামাক সেজে এনে খাওয়া।"

কপালের শিরা কুঞ্চিত করিয়া, পাঁচু বলিল,—"সন্ধ্যার স—স—সময়ই ল্যা—ল্যা—ম্প জেলে দিয়ে গিইছি:"

স্ম। তার আলো ত এখন নাই। এ যা' আছে, চন্দ্রকিরণ এসে পড়েছে, তুই বোধ হয় তা' বুঝিতে প্পারিতেছিস্?

পাঁ। হেঁ—তা তা আর বু—বু—বুঝতে পারিনে? আমি কি বো—বো—বোকা?

স্ম। তবে আলো আন্।

পাঁ। লে—লে—লে—লে—লেম্পটা দাও।

স্ম। কোথায় রাখিয়া গিয়াছিলি, দেখিয়া নে।

পাঁ। তো—তো—তোমরা তবে বারেণ্ডায় উঠে এ—এ—এ—এস।

স্ম। কেন রে?

পাঁ। লে—লে—লে—লে—লেম্প খুঁ—খুঁ—খুঁজে নেব ত।

স্ম। এতটি ভদ্রলোক উঠে যাবেন, তবে তুই ল্যাম্প খুঁজে নিবি?

পাঁ। কি—কি—কি ক'রবো?

স্ম। না হয় বাড়ীর মধ্য হইতে আর একটা জ্বেলে আন্।

পাঁ। আ—আ—আর কোথায় পাব। দয়ালমিত্তির যে ঘটী বাটী থা—থা—থালার সঙ্গে লে—লে—লেম্প গুলাও নিয়ে গিয়েছে।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন,—"দয়াল মিত্র লোকটা কি ভয়ঙ্কর। নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণের নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া ঘরের জিনিষগুলো টানিয়া লইয়া গেল!"

স্মৃতিরত্ন সে কথার কোন উত্তর করিলেন না। পার্শ্বস্থ মধুরায় বলিলেন,—"অমন যদি না কত্তেন, তা'হলে কি আর স্মৃতিরত্নদা ওর মায়ের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্ত্তেন না।"

স্মৃতিরত্ন জ্যোৎস্নালোকে বিস্ময়-চকিত উদার দৃষ্টিতে মধুরায়ের মুখের দিকে চাহিয়া, বলিলেন,—"সে কি ভায়া? আমি ব্রাহ্মণ;—কে আমার অনিষ্ট বা ইষ্ট করিল, তাহাই চিন্তা করিয়া আমি কাজ করিব? কাজ উপস্থিত হইলে, যাহা কর্ত্তব্য—তাহাই করিব। ব্যক্তিগত—আত্মগত উপকার অনুপকার—ইষ্ট-অনিষ্ট—হিত-অহিত বুঝিয়া কাজ কি ব্রাহ্মণের করিতে আছে ভাই? ব্রাহ্মণ ও অপর জাতিতে এইটুকু প্রভেদ। দয়াল মিত্র যদি আমার কোন অপকার না করিতেন, অনেক টাকা বা ভালবাসা দিতেন,—তথাপিও তাঁহার বাড়ী গিয়া যাহা করিতে নাই, তাহা করিতাম না।"

এই সময় বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন,—"কৈ রে পেঁচো, তামাক কৈ?"

পাঁচু তখনও সেই স্থানে সেইরূপভাবেই দণ্ডায়মান। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের কথার প্রত্যুত্তর দেওয়ার কোন্ হেতুবাদ আছে বলিয়া বোধ হয় সে বিবেচনা করিল না, সুতরাং কোন কথা কহিল না।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় তাহাতে বিরক্ত হইলেন। তিনি অহিফেনসেবী,—তখন অহিফেনের অনায়িত নেশা—অহিফেন-বান্ধব তাম্রকূটের ঘন মিলন একান্ত আবশ্যক, সুতরাং তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত—কিঞ্চিৎ উত্তেজিত—কিঞ্চিৎ উদ্ধত হইয়া বিদ্রূপের ভাষায় বলিলেন,—"স্মৃতিরত্নের চাকরটি যা হয়েছে!

পয়সা দিয়া রাখলে আর এমন রত্ন কেহ রাখে না। যজমান বাড়ীর আলো চাউলের বিনিময়ের বাঁদর আর কত হবে। ছ-দণ্ডের মধ্যে এক ছিলিম তামাক আন্‌লে না গা!"

মধুরায় সে কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"তামাক আনবে কি গা;—ওবে সেই এসে দাঁড়িয়েছে,—আর এক পা বুঝি নড়েছে।"

যদু মুখুয্যে বলিলেন,—"একটা আলো, তা'ই আন্‌লে না।"

পাঁচু তথাপি কোন উত্তর করিল না। উত্তর না করিবার বোধ হয় তাহার আরও কারণ এই যে—একটী কথা বলিতে গেলে, অনেক সময় নষ্ট হয়; পরন্তু ব্রাহ্মণের বাড়ী থাকিয়া—ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিয়া সহন-শক্তি তাহার এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, গালাগালি দাও, ঝগড়া কর,—অথবা দুই একটা কিল-চাপড়ই দাও, সে যাহা করিবে,—সে যেমন ভাবে চলিবে, তাহা হইতে কখনই বিচ্যুত হইবে না।

পাঁচু কথা কহিল না, নড়িল না, তামাক সাজিয়া আনিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না, দেখিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয় তখন পাঁচুর মনিবের শরণাপন্ন হইলেন। বলিলেন,—"স্মৃতিরত্ন; তোমার পাঁচুকে তামাক আন্‌তে বল্লে, তার কি হ'ল?"

স্মৃতিরত্ন ধমক দিয়া বলিলেন,—"কৈ রে পেঁচো তামাক?"

পেঁচো তখন গলা ঝাড়িয়া, কপালের শিরা টানিয়া, চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া, জিহ্বা দ্বারা দন্তমূলে আঘাত দিয়া বলিল,—"হুঁকো—হুঁ—হুঁ হুঁকো কোথায় রে—রে—রেখেছো?"

বিরক্তি সহকারে স্মৃতিরত্ন বলিলেন,—"তামাক খেয়ে তখন বোধ হয় বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিলাম।"

পাঁ। কো—কো—কোথায়?

স্মৃ। দক্ষিণের দাবায়।

পাঁ। কো—কো—লকে?

স্মৃ। আছে;—যেখানে হুঁকা, সেইখানেই কোল্‌কে আছে।

পাঁ। তামা—মা—ক?

যদু মুখুয্যে বিরক্তিভাবে বলিলেন,—"যা বাপু; তোকে আর তামাক সাজ্‌তে হবে না। ব্রাহ্মণকে আর জ্বালাতন করিস্ না। এমন পাপও মানুষে রাখে।"

স্মৃতিরত্ন ধমক দিয়া বলিলেন,—"মর নির্ব্বংশের বেটা—আমি কি মর হাতে করিয়া বসিয়া আছি। আগে তামাক শীঘ্র আনবি ত' আন্, নইলে তোর মুণ্ডপাত করিয়া ছাড়িব।"

"মু—মু—মু—মুণ্ড তো অনেকে—ছেঁ—ছেঁ—ছেঁ—ছেঁড়ে, কিন্তু—জি—জি—নিষ গুছিয়ে—দ্যা—দ্যা—দ্যায় কোন্ ব্যা—ব্যা—টা।"—এই কথা বলিতে বলিতে পাঁচু ধীর-মন্থর গমনে চলিয়া গেল।

বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের নিরাশ হৃদয়ে তামাকু আগমনের একটু আশার সঞ্চার হইল।

রাখাল বাঁড়ুয্যে প্রবীণ। তিনি বলিলেন,—"থাক্, রাত হ'য়ে গেল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাড়ী যাই। ভাল, কায়স্থগণের সহিত আমাদের কি প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য—তার একটা পরামর্শ কর।"

স্মৃ। জানেন কি দাদামহাশয়, কায়স্থজাতি—বাঙলার মধ্যে বড় জাতি। ধনে মানে বিদ্যাশিক্ষায় উঁহারাই শ্রেষ্ঠ। বাঙলার সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন থাকিলে, বাঙলায় জাতিভেদ রক্ষা করিতে হইলে, বাঙলায় সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বজায় রাখিতে হইলে, কায়স্থকেই অগ্রণী হইতে হইবে। কায়স্থই ক্ষত্রিয়—কায়স্থ যদি ব্রাহ্মণ লইয়া—ক্ষত্রিয়োচিত ব্রাহ্মণের আদর ও সম্মান করিয়া, নিজের বৃত্তি অবলম্বন করেন,—সমগ্র হিন্দুসমাজের হিতকামী হইয়া ক্ষত্রিয়ের মত কাজ করেন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় হউন—

মনু। তাহা হইলে দ্বাদশদিনে অশৌচান্ত হইবে?

স্মৃ। কেন হইবে না? চণ্ডাল যদি ব্রহ্মজ্ঞ হয়, তাহার যে অশৌচজনিত অশুচিত্ব হয়ই না। তিনি তখন নিত্যমুক্ত।

ম। তুমি যেরূপ কায়স্থের কথা বলিলে, তেমন কি কেহ নাই?

স্মৃ। অনেক।

ম। তাঁহাদের দ্বাদশ দিনে অশৌচ যায়?

স্মৃ। নিশ্চয়। কিন্তু একটা দিন দেখিয়া একটু আগুণ জালিয়া গলায় একটা পৈতা লইলে মাত্র ঐ হিংসাদ্বেষ-পরায়ণ মিথ্যাবাদী শূদ্রাধম দয়াল মিত্রের ক্ষত্রিয়োচিত অশৌচ পালনে অধিকার হইবে না।

ম। যদি উহারা বলে, অমন ব্রাহ্মণ অনেক আছে—তাহাদের অশৌচ যায় কেন?

স্মৃ। যে সব ব্রাহ্মণ নিত্য পতিত;—ব্রাহ্মণ হইয়া যাহারা ব্রাহ্মণের

কাজ না করে, তাহারা পতিত—কাজেই শূদ্রবৎ। তবে যেমন করিয়া আসিতেছে, তেমনই করিয়া যাইতেছে—সমাজে লোক নাই, কথা কহিবার কেহ নাই—যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিয়া যাইতেছে। দণ্ড ও পুরস্কার থাকিলে, সমাজ আবার গঠিত হইতে পারে।

এই সময় চাঁদের হাটের কৃষকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঁড়ুয্যে মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরা কারা?"

স্থ। চাঁদের হাটের কতকগুলি লোক—আমার কাছে আসিয়াছে।

পাঁচু তখনও ফিরিল না। সে দিনকার মত ব্রাহ্মণেরা বিদায় হইলেন।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

নিবেদন।

প্রভু, তব সনে মোর অনন্ত প্রভেদ,
আমি, বুঝিনি তোমার মহিমা।
তুমি, সাধু মহাজন চিত্ত-বিনোদন,
আমি, শুধু পাপময় গরিমা॥
তুমি, করুণায়-সিক্ত প্রভাত-শিশির,
আমি, কঠিন নিদাঘ রক্তিমা।
তুমি, সরল নিষ্কাম দেবতা সমান,
আমি, স্বার্থ-পরা পিশাচী সমা॥
তুমি, পবিত্র ত্রিদিবে সদানন্দময়,
আমি, ধরাতে বিষাদ-প্রতিমা।
হায়; তব সনে মোর অনন্ত প্রভেদ,
আমি, কি দিব তোমার উপমা?
এবে, করি নিবেদন এ ক্ষুদ্র জীবন,
যবে, ছাড়াইবে অন্তিম সীমা।
তুমি, পবিত্র চরণে পরশি তখন,
মোর, মুছে দিও পাপ-কালিমা॥

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মজুমদার।

প্রতাপাদিত্য।

প্রতাপাদিত্য একজন বাঙ্গালী বীর,—বঙ্গের একজন সুপ্রসিদ্ধ স্বাধীন রাজা, বঙ্গের বারভূঁইয়ার একজন প্রধান ভূঁইয়া, জাতিতে বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। প্রতাপের পিতা বাঙ্গলার সুলতান, সুলেমান ও দায়ুদের শাসনকালে একজন প্রসিদ্ধ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। রাজকার্য্যে নিরন্তরই তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠতা, পরিণামদর্শিতা, সাবধানতা, মহানুভাবকতা, সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফুর্ত্ত কূটকটাক্ষী প্রতিভারও লীলাখেলা চলিত; তাই তিনি রাজকার্য্য করিয়া স্বল্পদিন মধ্যেই প্রভূত ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করেন,—বিপুল ধনসম্পদ্-সম্পন্ন হইয়া উঠেন।

বঙ্গের শাসনকর্ত্তা দায়ুদের পতন হইলে তিনি পূর্ব্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া ধনসম্পদ সহ সাগরতীরবর্ত্তী কোন এক অভিনব স্থানে একটী সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করেন এবং উত্তরোত্তর ভূসম্পত্তি বাড়াইয়া এক বৃহৎ রাজ্যের পত্তন করিয়া তাহাতে রাজার ন্যায় অক্ষুণ্ণ প্রভাব-পরাক্রমে প্রতাপ প্রতিপত্তিতে বিরাজ করিতে থাকেন; ক্রমে নবাব-সরকার হইতে রাজচিহ্ন—রাজশ্রী "রায়" "রাজা" উপাধিসহ "ডঙ্কা নিশান" প্রাপ্ত হন।

প্রতাপের পিতা একান্ত স্বধর্ম্মভক্ত, স্বদেশভক্ত, স্বজাতিভক্ত ও সর্ব্বোপরি রাজভক্ত ছিলেন। যাহাতে সাম্রাজ্যের শান্তিস্থিতির মূল সম্রাজনশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে,—রাজ্যেশ্বর সম্রাটের সর্ব্বোপরিতন প্রভুশক্তি অক্ষুণ্ণ রহে,—শাসন-ক্ষমতা অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্বোপরি পরিচালিত হয়;—সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন,—কৃষি বাণিজ্য শিল্পকলার নব নব উন্নতির পরিপূর্ণ সম্পদ সমৃদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে,—বাঙ্গালী নব নব কৃষিকার্য্যে অনুরাগী এবং সুদক্ষ, নব নব বাণিজ্যে অনুরাগী এবং নিপুণ, নব নব শিল্পকলার উদ্ভাবনে অনুরাগী এবং সমর্থ হইয়া উঠে; অনন্তর বঙ্গকে—জননী জন্মভূমিকে ধনধান্যে পরিপূর্ণ, স্বজাতিকে স্বধর্ম্মে স্বকর্ম্মে শক্তিমান কর্ম্মবীর করিতে—স্বজাতি সর্ব্বত্রই একপ্রাণতা লাভ করে, তিনি নিরন্তর এই পুণ্যময় স্বদেশব্রত সাধনেই ব্রতী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর ভারতেশ্বর মোগল-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার,—মোগল-সরকারে নিয়মিত রাজকর প্রদান করিয়া করদ-রাজার ন্যায় [illegible] সুপ্রতাপে প্রজারঞ্জন,—রাজ্যবাসী স্বজাতি বিজাতি, ধনী নির্দ্ধন,

সম্রান্ত ইতর নির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধ বনিতার শান্তিসুখ সাধন করিতেন; তাই তাঁহার মোগল-সরকারে,—সম্রাট দরবারে যেমন বিলক্ষণ প্রভাব প্রতিপত্তি, সম্মান-প্রতিষ্ঠা, আদর-আপ্যায়নও ছিল, তেমন তিনি স্বদেশে স্বজাতি মধ্যেও কর্ম্মবৈভবে, পুণ্যপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে আবালবৃদ্ধ বনিতার আদরণীয়, আপ্যায়নময় পূজনীয়ও ছিলেন। বস্তুতঃ তখন তিনি সম্রাট-দরবারে এবং রাজ্য ভরিয়া একজন শ্রেষ্ঠ গুণবৃদ্ধ সামন্তরূপেই গণ্যমান্য হইতেন,—বিপুল সম্মানও পাইতেন।

পুত্র প্রতাপাদিত্য পিতার এই প্রতিষ্ঠায় সামন্ত-সম্পদসৌভাগ্য-সম্ভোগে সন্তুষ্ট ছিলেন না; তিনি পিতাকে নিরন্তর রাজকর বন্ধ করিতে—মোগল-সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করিতে, আপনাকে বঙ্গে একজন "স্বাধীন রাজা" বলিয়া ঘোষণা করিতে উত্তেজিত করিতেন; কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ রাজনীতিজ্ঞ দূরদর্শী কাল দেশ-পাত্র-নির্ব্বাচন-সমর্থ রাজভক্ত, বিচক্ষণ বৃদ্ধ পিতা উত্তেজিত হইতেন না,—শান্ত শীতল-চিত্তে সরল-প্রশান্তভাবে, স্নিগ্ধমধুর বাক্যে পুত্রকে মোগল-সম্রাটের অপ্রতিহত সর্ব্বোপরিতন প্রভুশক্তির অনিবার্য্য অদম্য প্রতাপ-পরাক্রমের এবং অফুরন্ত ধনবল জনবল তাহাতে দুর্দ্দম বাহুবল-কাহিনী কহিয়া নানারূপে প্রবোধিত করিতেন; পুত্রকে শিষ্টশান্ত-সন্তুষ্ট রহিতে, রাজভক্ত হইতে পরামর্শ দিতেন। প্রজা রাজদত্ত যেটুকু মুক্ত অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই তাহার সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। প্রজা কখনই দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়া, প্রাপ্ত প্রজাধিকারের গণ্ডী পার হইতে উদ্যম করিবে না, রাজশক্তির বিরুদ্ধাচারী অবমাননাকারী হইবে না এবং রাজশক্তির ক্ষমতা-প্রভাবহারী কোন কথাও বলিবে না। প্রজা নিরন্তর সন্তুষ্টচিত্তে আত্মোপরি রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত রাখিবে, এবং সরল হৃদয়ে শক্তির প্রতি হৃদয়গত ভক্তি রাখিয়া রাজ-সান্নিধ্যে অভাব আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিবে। বৎস! ইহাই প্রজাধর্ম্ম। আমি আশা করি, তুমি এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে,—এই ধর্ম্মপথে গতিমান হইবে, এবং আজীবন নিত্য মঙ্গলেও প্রতিষ্ঠিত রহিবে। মনে রাখিও রাজার উদারচিত্তসম্ভূত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুগ্রহ দান, মুক্তপ্রজাধিকারই প্রজার চির মঙ্গলকর। সামন্ত ও সম্রাটের প্রজা, সাম্রাজ্যের সামন্তগণও সম্রাটের প্রদত্ত রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত প্রজাধিকার রক্ষা, প্রজাধর্ম্ম পালন করিবে, এবং বংশ-ক্রমাগত পরম মঙ্গলেও রহিবে। পুত্রের প্রতি পিতার এই হিতকারী শিক্ষা-দণ্ডিকা ফল প্রসব করে নাই; কাল-দেশ-পাত্র বোধহীন যৌবন-মদ-মত্ত

মত্ততার আত্মবোধ-শূন্য পুত্র প্রতাপাদিত্য প্রবোধও মানিলেন না, শিষ্ট শান্ত রাজভক্ত—স্বধর্ম্ম-পালনরত হইবারও পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না, মঙ্গলেও রহিলেন না। যৌবন-সহচরী দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে কল্পিত ভুবনদুলাল ভুবনাকাঙ্ক্ষিত মোহন কল্পবৃক্ষ দেখাইয়া মোহিত করিয়া ফেলিল।

কিছুদিন পরে বৃদ্ধ পিতা যুবাপুত্রকে মোগল সম্রাটের অপরিভব প্রভাব-পরাক্রম অফুরন্ত সম্পদ-বৈভব ধনবল জনবল বাহুবল অজেয়শক্তিত্ব প্রভুত্ব, নিত্যোজ্জ্বল প্রতাপ সাক্ষাৎ দর্শন করাইবার জন্য মোগল-রাজপাট মোগল-প্রভুত্বের ইন্দ্রালয়, মোগল-সম্পদের বৈকুণ্ঠপুরী, মোগলবৈভবের কুবেরধাম, মোগলশাসনের শমন-ভবন, মোগলপ্রতাপের সূর্য্য-মণ্ডল, দিল্লী ও আগ্রা মহানগরীতে প্রেরণ করিলেন। পিতার আশা ছিল, পুত্র প্রতাপ মোগল-রাজতার এই সকল ভারতত্রাস ভুবনবিস্মিত সর্ব্বরাজ-মোহন বিভূষণ-ঘটা দর্শন করিয়া শিষ্টশান্ত রাজভক্ত হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দুরাকাঙ্ক্ষাও পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু বৃদ্ধের আশালতা সুফলবতী হইল না, কুফলই প্রসব করিল।

প্রতাপাদিত্য দিল্লী ও আগ্রা নগরীতে উপস্থিত হইয়া ছদ্মবেশে ক্রমে নগরীদ্বয়ের নানা স্থানে ভ্রমণ রাজতার নানা অঙ্গ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং মোগল-রাজতার অঙ্গ-হীনতা, রাজার ব্যবস্থা বিচার-বিভ্রাট, তাহাতে রাজবংশীয় রাজজাতির প্রতি পক্ষপাতিতা, তাহাতে শাসক-বর্গের স্বেচ্ছাচারিতা, সেনাপতি-সমূহের বিলাস-ব্যসন-মত্ততা, সঙ্গে সঙ্গে সেনা-মণ্ডলীর ভোগসর্ব্বস্বতা, তাহাতে সহনশক্তির হীনতা, কর্ত্তব্যসাধনে অলসতা, অস্ত্র-শস্ত্রের অল্পতা, যাহা আছে তাহাও সুতীক্ষ্ণ তেজঃশূন্য, ক্ষণিক ব্যবহারেই অকর্ম্মণ্য এবং প্রধান মন্ত্রী হইতে সামান্য প্রহরীর উৎকোচগ্রাহিতা, তাহাতে দু'য়েরই কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিমুখতা, দীর্ঘসূত্রতা, যাহার যেটুকু ত্রুটী অভাব—সকলই দেখিলেন, জানিলেন, বুঝিলেন; সুতরাং দ্বিগুণ আকাঙ্ক্ষায় প্রফুল্ল;—তাহাতে চতুর্গুণ সাহসী হইয়াই রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং অতি সাবধান হইয়া সুদক্ষ সুকর্ম্মী সেনাদল সংগঠনে—সুতীক্ষ্ণ বহুকাল-কর্ম্মক্ষম সুকর্ম্মণ্য অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে বৃদ্ধপিতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পুত্র প্রতাপ পরলোক-গামী পিতৃদেবের পুণ্যময়ী পরমক্রিয়া একাদশা এবং দেবলোক স্বর্গে চিরবাস জন্য তোরণাদিকর বৃষোৎসর্গ, শালগ্রাম নারায়ণচক্র দান,

ভূমি-দান, জল-দান, হস্তী গো উষ্ট্র দান, নৌকা পাল্কী দান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে স্বর্ণ-অলঙ্কার, রজতপাত্র, সুবর্ণ-মুদ্রা, কৌষেয় বসনদান এবং সাধারণ্যে অন্ন-বস্ত্র রৌপ্যমুদ্রা দান, পূর্ণাঙ্গ দানসাগর, অন্নমেরু প্রতিষ্ঠা, ভূরিভোজন, ভিক্ষুক বিদায় অঙ্গময় পিতৃশ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মহাসমারোহে নব মহাসমারোহ মিলাইয়া ঘোর মহাসমারোহ করিয়া আপনাকে "স্বাধীন রাজা" বলিয়াও ঘোষণা করিয়া দিলেন! দুর্গশিরে "স্বাধীন রাজ-পতাকা" উড্ডীয়মান হইল! দুর্গমধ্যে "স্বাধীন রাজডঙ্কা" বাজিতে লাগিল! মুক্ত বায়ুতে পতাকা উড়িল, মুক্ততালে ডঙ্কা বাজিল!

প্রতাপাদিত্য দুরাকাঙ্ক্ষার উগ্র মদিরা পান করিয়া এমনই বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, আত্মক্ষমতা প্রভাবের ক্রিয়া-শালিত্বের পরিমাণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন! মোগল-সরকারে রাজ্যভোগের বাৎসরিক খাজনা বন্ধ করিলেন; ক্রমে প্রতাপাদিত্য বঙ্গে অতি প্রবল পরাক্রান্ত "স্বাধীনরাজা" প্রতাপান্বিত "ভূঁইয়া" হইলেন; তাই বঙ্গ-কবিকেশরী ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর গাহিয়াছিলেন,—

"যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ;
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আটে তাঁয়,
ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ।"

উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা এবং দুরাকাঙ্ক্ষা,—এক নহে,—মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে;—এক সুরনন্দিনী, অন্য অসুরবালা। যে আশা প্রাপ্ত-প্রতিভা-বিদ্যা-জ্ঞান-ক্ষমতা প্রভাবশক্তি সাধ্যের পরিমাণ জানিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতিলাভ-মঞ্চে, সেই পরিমাণ পর্য্যন্ত উঠিতে চায়,—নিম্নে পড়িয়া রহিতে চায় না,—হীনভাবে পূর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট রহে না,—নবীন সৌন্দর্য্য প্রভাব লাভ করিতে, অভিনব সুন্দর হইতেই ছুটিয়া চলে,—উচ্চদিকেই—উচ্চ কর্ম্মেই গতি মতি হয়; সেই আশাই উচ্চ আশা ও সুরনন্দিনী। সুরনন্দিনী নিরন্তরই সরলা,—তাহাতে প্রকাশমানা,—ব্যক্ত সুব্যক্ত রহিয়াই লীলাখেলা করেন। বস্তুতঃ উচ্চ-আশা সুরনন্দিনী, কেবল কল্পিত, চিন্তার বিনোদক্ষেত্রে বিহার করেন না,—পুরুষার্থকে সঙ্গী লইয়া সত্যের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রেই ধাবমানা হন; তাই প্রায় দিব্য কর্ম্মফলও লাভ করিয়া থাকেন। দুরাকাঙ্ক্ষা,—দুরাশা,—অসুরবালা;—মনে রাখিও, অসুরবালা নিরন্তরই কুটিলা,—তাহাতে আত্মগুপ্তি

প্রফুল্লা,—অব্যক্ত রহিয়াই লীলাখেলা করেন,—কূর্ম্মধর্ম্মিণী, কূর্ম্মকর্ম্মিণী! দুরাশা প্রাপ্ত-প্রতিভা-বিদ্যা-জ্ঞান-ক্ষমতা-প্রভাব-শক্তি-সাধ্যের অসীম পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া অসীমেই প্রধাবিত হয়; কিন্তু সঙ্গী পুরুষার্থ, ঐ সকলের পরিমাণ সীমা পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াই শ্রান্ত হইয়া পড়ে; তখন আশা, এই শ্রান্ত পুরুষার্থকে সঙ্গী করিয়া অসীমে পড়িয়া বিড়ম্বনা লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে থাকে,—একেবারে নিম্নেও পড়িয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল;—প্রতাপাদিত্যের দুরাশা,—প্রতাপ সহ পড়িয়া গেল,—বঙ্গের প্রতাপাদিত্য, মধ্যাহ্নেই অস্তগমন করিলেন।

ক্রমে প্রতাপের নব অভ্যুত্থান-সংবাদ, ভারতেশ্বরের কর্ণগোচর হইল;—অক্ষুন্ন প্রতাপ প্রফুল্ল, সূর্য্যজয়ী প্রতাপান্বিত ভারতসম্রাট,—হিন্দুস্থানের সর্ব্বময়কর্ত্তা, সর্ব্বোপরিতন প্রভু, একচ্ছত্রী একদণ্ডী,—"দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর" আকবর, প্রতাপের এই নব সমারোহ বার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু কোনরূপ বিস্ময়, উদ্বেগ, আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন না।

সেই সময়ের করদরাজগণ কি বড় বড় ভৌমিকমণ্ডলী, এইরূপ প্রায়ই স্বাধীন হইতে,—স্বাধীন রহিতে চেষ্টা করিতেন,—কেহ কেহ স্বাধীনতাও লাভ করিতেন,—স্বাধীন রহিতেন; ইহাতে বিস্ময় উদ্বেগ-আশঙ্কার বিষয় কিছুই ছিল না; সুতরাং সম্রাটও কিছু প্রকাশ করিলেন না।—"অতি সামান্য ধনজন-বলসম্পন্ন, ক্ষুদ্রপ্রাণ, একজন করদরাজা, সংখ্যাতীত, রণদুর্ম্মদ, মোগল-বাহিনী সহ দুর্দ্ধর্ষ মোগল সেনাপতিকে দর্শনমাত্র বশীভূত হইবে, এবং রাজকর দান করিবে,—নয় বন্দী হইবে, প্রাণ হারাইবে"—সুতরাং সম্রাট কিছুই প্রকাশ করিলেন না। একপক্ষে, সম্রাটের এই প্রকাশ না করা স্বাভাবিক,—অতি বড়ত্বেরই লক্ষণ,—সম্রাটের মহত্ত্ব মহাপ্রাণতার,—অতি উচ্চতম মনস্বিতার অন্তর বলের সহ চিরবিজয়ী বাহুবলের অদম্যপরাক্রমের প্রতি, অটল বিশ্বাসেরও পরিচয় বটে; অন্য পক্ষে সম্রাটের সাধারণ রাজ্য-রক্ষণনীতির সুষ্ঠু বিচক্ষণতায় ত্রুটী এবং দণ্ডদাননীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ ক্রিয়ারও ভ্রান্তি বটে। যাহা হউক, অবিলম্বে প্রতাপের প্রতাপহরণ করিতে,—নব উদীয়মানা, তেজস্বিতার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে এবং কল্পিত ঐশ্বর্য্য মদমত্ততার ভ্রান্তি দূরীভূত করিতে বঙ্গসুবার সুবাদার প্রতি আদেশ প্রচারিত হইল।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দুর বিবাহ।

যাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্রাদি জানেন না এবং মানেন না, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের বিবাদ নাই। যাঁহারা হিন্দুর সংসারের মধ্যে বাস করে, হিন্দু সমাজের ব্যষ্টি ওসমষ্টি, হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন, হিন্দুর শাস্ত্রের মান মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সতত তৎপর, হিন্দু-শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধ পালন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের কথাই আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচনা করিব। মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম বৌদ্ধ, অথবা হিন্দু সমাজত্যাগী বা ধর্ম্ম-দ্রোহীর সহিত আমরা বিচার তর্কে প্রবৃত্ত হইতেছি না।

হিন্দুর বিবাহ অতীব পবিত্র সংস্কার। অন্ত ধর্ম্মে বিবাহের অর্থ যাহা, হিন্দুর পরিণয় তাহা নহে। হিন্দুর উদ্বাহ গভীর ভাবাত্মক, অচ্ছেদ্য, ইহকাল-পরকাল-বদ্ধ-মূলক। হিন্দুর দম্পতির মধ্যে ডাইভোর্স (Divorce) নাই, "তালক" নাই, আইন অনুসারে স্বতন্ত্র বাসবিধি বা স্বাতন্ত্র্য (Jndicial seueratiou) নাই। হিন্দুনারী একবার পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলে, সে সম্বন্ধ আর বিচ্ছিন্ন হয় না।

দুঃখের বিষয়, অধুনা অনেকে ইহা জানেন না বা বুঝেন না। হিন্দুশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা, দেবভাষায় অজ্ঞতা ইহার মুখ্য কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। বিবাহের সময় অনেকে যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাহার ভাবার্থ পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহার নিমিত্তই এত গণ্ডগোল হইয়াছে ও হইতেছে। নতুবা ইচ্ছা করিয়া কে কোথায় তাঁমা, তুলসী, শালগ্রাম-শিলা, হোমাগ্নি, গুরু-জন, সভাস্থ সুধীজন প্রভৃতির সম্মুখে শপথ করিয়া আবার প্রত্যাহার করিয়া থাকে? কার্য্যের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, সমাজে এরূপ দুর্নীতি প্রবেশ করিতে পারিত না।

যাঁহারা হিন্দুনারীর পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাঁহারা গণ্য-মান্য বরেণ্য হইলেও মিথ্যার প্রশ্রয়কারী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন; কেন, তাহা বলিতেছি।

১। হিন্দুর বিবাহ-ব্যাপারে সম্প্রদানকারী যখন পাত্রীকে বরকে দান করেন, তখন বলেন,—

সালঙ্কারাং কন্যাং প্রজাপতিদেবতাকাং * * "অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বরায় ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

অর্থাৎ সালঙ্কার কন্যাকে বরের গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া বরকে দান করা হইল।

সম্প্রদানকারী দান ত করিলেন, এখন বর তাহা গ্রহণ না করিলে দান অসিদ্ধ হয়। কাজেই বরও "স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করেন।

দান প্রতিগ্রহণ করা মহাপাপ। সকল ধর্ম্মে, সকল শাস্ত্রে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চলিত কথায় বলে, "দিয়ে নিলে কুকুর হয়।" যাহা দান করা যায়, তাহার উপর আর স্বত্ব থাকে না। যাহা নিঃস্বত্ব হইয়া দান করা হইল, আবার কন্যার সেই পিতৃপক্ষ কিরূপে পুনরায় অধিকারীস্বরূপ অন্যকে বিবাহিতা সম্প্রদান করিতে পারেন? কন্যাকে বরের হস্তে দান করা হয়, বরকে কন্যার হস্তে সমর্পণ করা হয় না, তাই বরের পুনরায় দারপরিগ্রহে শাস্ত্রানুসারে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা ঘটে না। যাঁহারা বলেন, পুরুষের যদি দুইটা বিবাহ হইতে পারে, বালবিধবার পত্যন্তর গ্রহণ কেন হইবে না, তাঁহারা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারেন, দেবতাকে সাক্ষ্য করিয়া যে সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, তাহাই প্রধান অন্তরায় হইয়া থাকে।

এই ত গেল সম্প্রদানের কথা। তাহার পর বধূর কথা। উত্তর বিবাহ সম্পন্ন কালে বধূ বলেন,—

"ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্ ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ,—ধ্রুবনক্ষত্র যেরূপ আকাশে স্থিরভাবে বিদ্যমান, আমিও পতিকুলে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় স্থির থাকিব, এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি, এই শপথ ও স্বীকার যিনি ভঙ্গ করিতে বলেন বা ইহাতে সাহায্য করেন, তিনি কি প্রত্যবায়ভাগী হন না? হিন্দুর শাস্ত্রে হিন্দুর শিক্ষা দীক্ষায় সত্যপালন মহৎধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। সত্যপালনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায়। সেই সত্যভঙ্গ করিতে যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নীতিজ্ঞানহীন নহেন কি? যাঁহারা দেশের লোকের শিক্ষকস্থানীয় বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না,—দেশের আশা-ভরসাস্থল যুবকবৃন্দকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারা যদি কার্য্যতঃ নীতিহীনতার পরিচয় দেন, তাহা হইলে তাহা কি দুঃখের বিষয় হয় না?

যাঁহারা সমাজসংস্কারকের বেশে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে চাহেন, তাঁহারা যদি হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ চালাইতে প্রকৃত প্রয়াসী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে হিন্দুর শাস্ত্রানুমোদিত বিবাহ-সংস্কারের

পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এরূপ মন্ত্রোচ্চারণ ক্রিয়াকলাপ, বিবাহ-ব্যাপারে প্রবেশ করাইতে হইবে, যাহাতে হিন্দু-দম্পতির সম্বন্ধে অটুট না হয়, ইচ্ছা করিলেই ডাইভোর্স বা তালাক চলিতে পারে, পতিবিয়োগে বিধবা পুরুষান্তর গ্রহণ করিতে পারে, অথচ সত্য-লঙ্ঘন না হয়। ইহা করিতে হিন্দু-সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোন হিন্দু কি প্রস্তুত? দেবগৃহ কুকুরের আবাসস্থলে পরিণত করিতে কেহ অভিলাষী কি? হিন্দুর যে বিবাহসংস্কার জগতে আদর্শ ব্যাপার বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহার অপলাপ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। হিন্দুর বিবাহ চুক্তি নহে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

মাসিক সংবাদ।

পঞ্চনদে সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতি অত্যন্ত আশা-জনক। তবে কবিতা-গ্রন্থের কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। এক বৎসরে ৬২৪ খানি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে। কাব্য যে সাহিত্যের অঙ্গহানি করে, তা' বলিতেছি না—তবে 'বাবু-কবিতা'য় দেশ না ছাইয়া ফেলে!

বাণীর বরপুত্র মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি নদিয়া-জেলার ফুলিয়া গ্রামে। গত ২৭এ চৈত্র সেখানে কবির স্মরণোৎসব মেলা হইয়া গিয়াছে।

(Registered No C 344.)
বৈশাখ,
অবসর
মাসিক পত্র
ঘোষ এটর্ণি য়্যাট্-ল-সম্পাদিত।
কলিকাতা, ৩৪নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে
শ্রীহরিপদ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ সিকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵১০ আনা।

সূচী।

অবসন্ন—

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন।

অবসর

১২শ ভাগ । } বৈশাখ । { ১ম সাংখ্যা ।

নূতন বর্ষ ।

(১)

ফাগ মেখেছে গাবের গাছ,
        লেবুর ফুল ঝরে গেছে ফুটে ;
ফল নিয়েছে আমের মুকুল—
        মধু ভ্রমর অন্ধ হ'য়ে ছুটে ।
কিসের লাগি পবন পাগল,—
        উধাও দিবস-যামিনী,
শ্বেত গুচ্ছে—মিষ্ট গন্ধে—
        ফুল্ল কুসুম কামিনী ।
বেলা নয় গো, বেলের ফুল—
        সেও যে গন্ধে ভাসায় দিক্,
আসছ বলে—নূতন বর্ষ—
        এ সব তোমার মাঙ্গলিক ?

(২)

আ মরি কি কচি পাতায়—
        বাঁধলো অশথ মাঠের পর ;—
তিখীণ রোদে রাখাল বালক—
        রবে যে তার বুকের পর ।

দগ্ধ—তপ্ত—তবু দূর্ব্বা

ধর্‌লো দেখ শ্যামল দেহ ;

সিঁ[illegible]র মেখে সবুজ ঝোপে—

সা[illegible] অশোক সোণার গেহ ;

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নূতন বরষ, ধরার পরে।

(৩)

খালি ডালে, আসবে বলে—

ফুট্‌লো চাঁপা থাকে থাকে,

কোকিল বধূ সারাটী রাত—

স্বপ্নে বুঝি তোমায় ডাকে !

আর এক জনের চক্ষু যে যায়—

কেঁদে কেঁদে তোমায় ভেবে !

এস দেবতা—এস বর্ষ—

স্বর্গ-হ'তে শীষ নেবে।

তোমার শুভ আশীষ পেলে

ঘুচ্‌বে ধরার আকাল টুক,

লগ্ন বেঁধে বসেগো তাই—

দেখ্‌তে তোমার মধুর মুখ।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

প্রেম ও ভালবাসা।

একদিন কথাচ্ছলে জনৈক বন্ধুর সহিত তর্ক হইল,—"প্রেম ও ভালবাসা" দুইটীতে কোন পার্থক্য আছে কি না? বন্ধুবরের অভিমত 'ভালবাসা' 'প্রেমেরই' অপভ্রংশ; সুতরাং একার্থজ্ঞাপক প্রভেদ কিছুই নাই। আমি কিন্তু তাঁহার বাক্যের সমর্থন করিতে পারিলাম না এবং বাক্য দুইটীর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে অনুভব করিলাম। আমার মনে যাহা উদয় হইয়াছিল তাহাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করিলাম। সামান্য বিদ্যা আমার, বর্ণনাচ্ছলে যদি ভ্রমে পতিত হই (যেহেতু কঠিন বিষয়ের সমস্যায় সেইরূপ হওয়াই সম্ভব) পণ্ডিতমণ্ডলী এবং আমার প্রিয় পাঠকবর্গ কৃপা-পরবশ হইয়া তাহা সংশোধন করিয়া দিলে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইব। আর এক কথা, আমার মনে হয়ত একটা ভ্রম ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে, সাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ না করিলে সংশোধন হইবে কিরূপে? সেই আশায় প্রলুব্ধ হইয়াই আজ সাধারণের নিকট স্বল্প-বিদ্যার অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া এই কঠিন বিষয়ের সমস্যায় প্রবৃত্ত হইলাম। সুধীগণের নিকট আমার এ দোষ মার্জ্জনীয় নহে কি?

কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমেই তাহার অর্থ ও উৎপত্তি-স্থান নির্ণয় করা আবশ্যক। সাধারণ ভাবে আমরা প্রেম ও ভালবাসা একার্থবাচক বা চলিত কথায় এক জিনিষ বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু মূল ধরিয়া অনুসন্ধান করিলে আমরা এই দুইটীর মধ্যে কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ অনুভব করিতে পারি। প্রেম বলিলে আমরা সাধারণতঃ উহা স্বর্গীয় বলিয়াই জানি। অধুনাতন কতকগুলি অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত কুসংস্কারাপন্ন বর্ব্বরের হাতে পড়িয়া প্রেমের বিকৃত অবস্থা ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত কি তাহাই? সত্যই কি প্রেম কু-অর্থ ব্যঞ্জক? প্রেম বা প্রণয় বলিলে সত্যই কি আমরা স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ প্রণয় বিবেচনা করিব? না তাহা স্বর্গীয়-ভাবে পূর্ণ পবিত্র ভগবৎ-প্রেম বলিয়া গ্রহণ করিব। ধরিতে গেলে প্রেমের উৎপত্তি মনে, মন আত্মার রূপান্তর মাত্র এবং আত্মাই ভগবান বা ভগবানের অংশ-বিশেষ; সুতরাং যে বস্তুর উৎপত্তি ভগবানের সহিত জড়িত তাহা কখন কোনরূপে কলুষিত বা দোষাবহ হইতে পারে না। প্রেম কাহাকে বলে? দুইটী আত্মার বা মনের পবিত্র সংমিশ্রণই প্রেম বা প্রণয় নয় কি?

প্রথমে উচ্চতর স্তর হইতেই আলোচনা করা যাউক। ধরুন, ভগবৎ প্রেম লাভ করিতে হইলে কিরূপ হওয়া আবশ্যক? স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় এবং মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, সম্পূর্ণ তন্ময়তা না জন্মিলে ভগবৎ-প্রেম লাভ ঘটে না। এইরূপভাবে যে প্রেমের অধিকারী হওয়া যায় তাহা চিরস্থায়ী ও পবিত্র। এই তন্ময়তা লাভ করিতে হইলে মনের যাবতীয় ময়লা ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে, কারণ মনে যে কোনরূপ চিন্তা আসিবে তাহাতেই ভগবচ্চিন্তার ব্যাঘাত ঘটিবে। অতএব এক ভগবচ্চিন্তা ব্যতিরেকে অন্য যে কোন চিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধভাবে অবস্থান করিতে পারিলে তবে তন্ময়তা আসিবে আপাততঃ আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি; সুতরাং ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রেম পবিত্র এবং স্বর্গীয়; দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যেমনই বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হউক না কেন উহা বাস্তবিক কুরুচি বা কু-অর্থ ব্যঞ্জক নহে।

এইবার পার্থিব বৈধ প্রেমের অবতারণা করা যাউক। বৈধ প্রেম বলিতে আমরা সাধারণতঃ স্বামী ও স্ত্রীর পবিত্র প্রণয় বিবেচনা করিয়া থাকি। তা বলিয়া পুত্রের প্রতি পিতা-মাতার, ভ্রাতা ভগ্নীর, হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের প্রেম যাহার আদান-প্রদান লোক-চক্ষুর বহির্ভূত নহে তাহাও বৈধ প্রেম। লোক-চক্ষুর অন্তরালে গোপনে যে প্রেম সাধিত হয় তাহাই ঘৃণিত অবৈধ প্রেম। কিন্তু এ উভয়বিধ প্রেমেরই স্থায়িত্ব বড় অল্প। বৈধ প্রেম যদিও কিছুদিন স্থায়ী হয়, অবৈধ প্রেম ক্ষণ ভঙ্গুর। বৈধ প্রেমের স্থিতিকাল খুব বেশী জীবনকাল পর্য্যন্ত; আবার পাত্র-বিশেষে তাহাও নহে। বলিয়াছি আত্মার সহিত আত্মার সংমিশ্রণই প্রকৃত প্রেম। সুতরাং পার্থিব জীবনে উভয়ে উভয়কে যতকাল প্রণয়ের চক্ষে দেখিতে পারিল ততদিন প্রেম স্থায়ী হইল, সামান্য মাত্র মনের বিভিন্নতা জন্মিলে প্রণয় নষ্ট হইয়া গেল। অবশ্য পিতামাতার সন্তানের প্রতি সেরূপ হয় না বটে, কিন্তু তাহারও স্থিতি তাঁহাদের জীবনকাল পর্য্যন্ত। আবার এমন অনেক অকৃতজ্ঞ সন্তান আছে যাহারা জনক-জননীর অকৃত্রিম স্নেহ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভ্রাতায় ভগ্নীতেও ঠিক তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যাহাদের সহিত রক্তের সম্বন্ধ তাহাদের মধ্যেই যখন এইরূপ ঘটনা—প্রাণে প্রাণে মিলন হয় না, তখন বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যে প্রণয়ের অপলাপ ঘটিবে ইহা বলাই বাহুল্যমাত্র। এই যে ক্ষণস্থায়ী

প্রণয় ইহা প্রেম পদবাচ্য নহে; আমরা ইহাকে পার্থিব ভালবাসা নামে আখ্যাত করিতে পারি। শেষ স্বামী স্ত্রীর প্রেম, তাহাও অনেক স্থলে চ'খের নেশার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন কালের কথা বলিতেছি না, আধুনিক সভ্যজগতে কয়টী স্বামী-স্ত্রীতে এক প্রাণ—এক জীব হইয়া ঘর-সংসার করিতেছেন? যে কোন ঘটনা লইয়া, অনেক সময় অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়াও মতদ্বৈধ ঘটিয়া থাকে; এবং যেরূপ প্রণয় থাকিলে প্রেম পদবাচ্য হয় তাহার অপলাপ ঘটিয়া থাকে। আমার পাঠকগণের মধ্যে খুব অল্প লোকই বোধ হয় অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারিবেন যে, তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে একপ্রাণ— একজীব হইয়া পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম উপভোগ করিতেছেন। হইতে পারে স্ত্রী স্বামীর পায়ে প্রেমের পশরা ঢালিয়া দিতেছেন কিন্তু প্রতিদানে তাহা প্রাপ্ত হইতেছেন না। কেন নয়, তাহার কারণ নির্ণয় করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবে সেরূপ যদি কেহ থাকেন তিনি আপনার প্রাণে অনুভব করিয়া লইবেন। বৈধ প্রেমের যখন এই অবস্থা তখন অবৈধ প্রেম লইয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই।

চুরি করিয়া যে বস্তু ভোগ করিতে হইবে তাহাতে বিড়ম্বনা অনেক। প্রেমের বিকাশ কখন গোপন থাকে না, কোন না কোন দিন প্রকাশ হইয়া পড়িবেই; সুতরাং প্রাণের ভিতর সর্ব্বদা আতঙ্ক লইয়া স্বর্গীয় সম্পদ উপভোগ করা চলে কি? আর যদি স্বর্গীয় বস্তুই উপভোগ করিলাম তবে ভয় কেন? অতএব ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে অবৈধ প্রেম প্রেমই নয়; নির্ম্মল ভালবাসাও বলিতে পারি না, উহা কেবল চ'খের ধাঁধা মাত্র। যেমন কোন সুন্দর বস্তু দেখিলে অতি সহজে আমাদের মন আকর্ষিত হয় ইহাও সেইরূপ সৌন্দর্য্যের দাসত্বমাত্র। সুতরাং প্রেম যে স্বর্গীয় তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল; এইবার আমরা ভালবাসার অবতারণা করিয়া দেখি, এই দুইটীর মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না?

আমি বলিতে চাই ভালবাসা পার্থিব, মনের সহিত জড়িত থাকিলেও ইহার উৎপত্তি চক্ষে এবং ইহা সৌন্দর্য্যের নিত্য সহচর। কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষে মন আকৃষ্ট না হইলে ভালবাসা জন্মে না এবং এই আকৃষ্ট করিবার প্রথম ও প্রধান অস্ত্র চক্ষু। অন্ধেরা কি এত শীঘ্র ভালবাসিয়া ফেলে? অন্ধকে কখন ভালবাসার দায়ে পাগল হইতে দেখিয়াছেন কি? কিন্তু প্রেমে পাগল হইতে অনেক অন্ধকে দেখা গিয়াছে। কাণা ফুলওয়ালীর কথা

ছাড়িয়া দিউন, সেত কবির কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে; তবুও সে শচীন্দ্রনাথের গুণ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রণয়পাশে আবদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। কল্পনাতেও কবি প্রেমেরই জয় গান গাহিয়াছেন। বাস্তবজগৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন এ দৃষ্টান্ত বোধ হয় নয়নগোচর হইবে না। তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন অন্ধেরা কি ভালবাসে না? বাসে, কিন্তু লোকের মুখে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তাহাদের চক্ষু না থাকিলেও কর্ণ চক্ষুর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। বলিতে পারেন, ঈশ্বরকেও ত লোকে ভালবাসে। স্বীকার করি; (নতুবা নাস্তিক বলিয়া গণ্য হইব) কিন্তু বলুন দেখি, একটি রূপসী যুবতীর প্রতি লোকে যত বেশী আকৃষ্ট হয়, ঈশ্বরের প্রতি তত হয় কি? তাহা না হইবার কারণ সহজেই অনুমেয় যে, যাহাকে চক্ষের উপর দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রতি লোকে যত শীঘ্র আকৃষ্ট হয়, চক্ষের অন্তরালে অবস্থিত বস্তুর প্রতি সেরূপ হয় না। ঈশ্বরকে যদি দেখিতে পাইতাম, তাঁহার অনন্ত ও অতুলনীয় সৌন্দর্য্য যদি আমাদের চক্ষের উপর বিভাবিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা তাঁহাকে ঐরূপ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতাম না। তবুও আমরা তাঁহার আংশিক বিকাশস্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিকে ভালবাসি। কারণ প্রকৃতি যখন তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উন্মোচন করিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন আমরা তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি এবং ভালবাসিয়া ফেলি। ইহাতেই বুঝা যায় যে ভালবাসা চোখের নেশা, চক্ষুর অন্তরালে উহার স্থায়িত্ব বড়ই অল্প এবং নেশা কাটিয়া গেলে আর কিছুই থাকে না। আরও দুই একটি সরল দৃষ্টান্ত দিতেছি যদ্দ্বারা আমার এ উক্তি সমর্থিত হইবে।

প্রথমে মনুষ্য ব্যতিরেকে অন্য একটি ইতর প্রাণীকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করুন। ধরুন, আপনার একটি প্রভুভক্ত বিশ্বাসী কুকুর আছে, আপনি হাত তুলিয়া না দিলে সে খায় না, একদণ্ড আপনাকে না দেখিলে তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকে; এবং বোধ হয় আবশ্যক হইলে আপনার জন্য সে নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে। তাহার কারণ আপনি তাহাকে ভালবাসেন এবং স্নেহ করেন। কিন্তু তা বলিয়া আপনি কি তাহার সহিত প্রেম করিতে পারেন? প্রেমের কথা কেহ উল্লেখ করিলে আপনি স্বতঃই উত্তর প্রদান করিবেন "কুকুরের সহিত প্রেম কি? ইতর জন্তু প্রেমের ধার

কি ধারে? হয় ত বা আপনি প্রশ্নকারীর উপর বিরক্ত বা রাগান্বিত হইয়া উঠিবেন। সেইরূপ অন্য একজন হয়ত একটি সুন্দর পক্ষী পুষিয়াছেন। পাখীটাকে তিনি যথেষ্ট ভালবাসেন; না হইলে পুষিবেন কেন? কিন্তু ভালবাসেন বলিয়া ত তাহার সহিত প্রেম করিতে পারেন না; ভালবাসিয়াই সুখী হইতেছেন।

সজীব বস্তু পরিত্যাগ করতঃ জড় জগতে পদার্পণ করুন, দেখিবেন তাহাতেও আমার উক্তি সমর্থিত হইবে। একজন ভোজনশীল ব্যক্তি মিষ্টান্নে অত্যন্ত রত এবং তাহার মধ্যে বোধ হয় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মিষ্টান্ন অধিক ভালবাসে। ইহার সহিত প্রেমের কোন সম্বন্ধ আছে কি? কেহ বলিতে চাহেন কি যখন সে ব্যক্তি সেই নির্দ্দিষ্ট মিষ্টান্নগুলি উদরস্থ করিল তখন সেগুলির সহিত কি তাহার প্রেম করা হইল? সেইরূপ কোন ব্যক্তি হয়ত সুদৃশ্য মূল্যবান্ পোষাকে বরবপু সজ্জিত করিতে ভালবাসে, এবং বহু অর্থব্যয়ে সঙ্কল্প সাধনে রত হয়। এই ভালবাসার মধ্যে প্রণয়ের কোন অস্তিত্ব আছে কি? এ অন্ধ ভালবাসা অণু পরমাণুরূপে আঁখিপুটে ভাসিতে থাকে এবং অবসর মত বিস্তৃতি লাভ করে, তারপর সম্যক পরিতৃপ্ত হইলেই ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যায়। কিন্তু প্রেমের ধ্বংস নাই। এক জন্ম হইতে জন্মান্তর পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি আছে; সমতুল্য বা শ্রেষ্ঠ ব্যতিরেকে প্রেম হয় না এবং জড়ের সহিত প্রেম সম্ভবপর নহে। প্রেম অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু ভালবাসার বিচ্ছেদ আছে। প্রেম উর্দ্ধগামী, ভালবাসা অধোগামী; প্রেমের বিকাশ মনে ভালবাসার বিকাশ চক্ষে; ভালবাসা অন্ধকার প্রেম অন্ধকার বিনাশক; ভালবাসা মনুষ্যকে হিতাহিত জ্ঞান বিবর্জ্জিত করিয়া সময়ে মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত করে, আর প্রেম পশু-প্রকৃতি লোককেও দেবত্ব প্রদান করিয়া সমাজে আদর্শনীয় করে।

এই সমস্ত বিষয় সম্যক পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে আমার অনুমান মিথ্যা নহে। প্রেম বাস্তবিকই স্বর্গীয় ও কুরুচি বিবর্জ্জিত; কেবলমাত্র কতকগুলি কুরুচি-সম্পন্ন লোকের হস্তে পড়িয়াই কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু যে বস্তু স্বভাবতঃ উজ্জ্বল কোন কারণে বহির্দ্দেশ মলিন হইলেও অন্তর্দ্দেশ মলিনত্ব প্রাপ্ত হয় না। হীরক মৃত্তিকা-লিপ্ত হইলে নিষ্প্রভ হয় বটে, কিন্তু ধৌত করিলেই তাহার স্বভাব-সুলভ উজ্জ্বলতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। এ অস্থায়ী মলিনত্বে গুণের কিছুই তারতম্য হয় না বরং সমাদর

বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অন্যদিকে ভালবাসা যে পার্থিব তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সুতরাং এতদুভয় সম্বন্ধে আর অধিক অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। তবে সূচনাতেই বলিয়াছি যে, বর্ণনাচ্ছলে অস্মদীয় প্রবন্ধে যদি কোনরূপ ভ্রম পরি[illegible] সুধীগণ ও আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকাবর্গ তাহা সংশোধন করিয়া দিলে চির কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইব।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন।

সুবর্ণ ও সিন্দূর।

সুবর্ণ ডাকিয়া কহে সিন্দূর সকাশে,
"আমার গহনা নারী বড় ভালবাসে।
ললাটে তোমার স্থান বিন্দুর আকারে,
আমি থাকি রমণীর সর্ব্ব অঙ্গভরে।
সামান্য কৌটার মাঝে থাক তুমি ঢাকা,
লোহার সিন্দুকে মোরে দায় হয় রাখা।
তোমার অভাবে নারী ভাবে নাকো ক্ষতি,
আমি না থাকিলে কিন্তু বিবাহে দুর্গতি।"
এতেক শুনিয়া কহে সিন্দূর হাসিয়া,
"বৃথা দোষে দোষী মোরে করিছ রোষিয়া।
হউক সুন্দর নারী তোমায় পাইয়া,
থাকে নাকো সে সৌন্দর্য্য মোরে হারাইয়া।
যতদিন আমি থাকি রমণী-সিঁথিতে,
ততদিন সধবা সে কথিত জগতে।
যেই দিন আমি তা'র ছাড়িব সীমন্ত,
সেই দিন হ'তে তার সুখ হ'বে অন্ত।"

শ্রীবেণীমাধব দত্ত।

প্রাক্তন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৩)

কালচক্রের আবর্ত্তন প্রতিহত করিতে পারে এমন ক্ষমতা এ সংসারে কাহারও নাই। সে আপনার অভ্রান্ত গতিতে অপ্রতিহতভাবে ঠিক চলিতেছে। তাই দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এইরূপে আরও তিনটী বৎসর কোথা দিয়া কেমন করিয়া চলিয়া গেল, তাহা ঠিক জানিতে পারিলাম না।

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই মাঘ মাস আসিল। এই তিনটী বৎসরের মধ্যে অমলা প্রত্যহই আমাদের বাড়ী আসিয়াছে। তবে যে যে দিন খুব জল ঝড়ে পথে চলা দুষ্কর হইয়াছিল, সেই সেই দিন আসিতে পারে নাই।

আজ আর কয়েক দিন হইতে অমলা আসিতেছে না। আমরা তাহার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। মনে নানা ভাবের উদয় হইতেছে, কখনও ভাবিতেছি তাহার পীড়া হইয়াছে, কখনও ভাবিতেছি, বোধ হয় সে আবার মামার বাড়ী গিয়াছে, তাই আসিতে পারিতেছে না। কিন্তু ওভাবকে চাপা দিবার জন্য অমনি অন্য ভাবের উদয় হইতেছে। মনে করিতেছি সে মামার বাড়ী যায় নাই, তাহা হোলে আমাকে খবর দিয়া যাইত। আবার কখনও ভাবিতেছি, অমলা বড় হইয়াছে, সেইজন্য তাহার পিতা-মাতা একা পথে বাহির হইতে তাহাকে নিষেধ করিয়াছেন। পরক্ষণেই মনে হইতেছে, না তাহা হইতে পারে না, কারণ "পাড়াগায়ে" ওরূপ কোন বাধা-বিঘ্ন নাই। এখানে সকলেই একটা প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ, সুতরাং সকল নারীই কাহারও নিকট হইতে মাতৃ-জ্ঞানে পূজা পাইয়া থাকেন এবং কাহারও নিকট হইতে ভগ্নী-জ্ঞানে স্নেহ পাইয়া থাকেন। অতএব এখানে ওরূপ কোন বাধা থাকিতে পারে না। ইত্যাকার বহু-বিধ চিন্তা মনে উদয় হইতে লাগিল, এবং বিলীন হইতে লাগিল, কিন্তু যথার্থ কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হইলাম না।

এইরূপে আরও দুই দিন কাটিয়া গেল, তথাপি অমলা আসিল না, কাজেই তাহার সংবাদ লওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া চিন্তাকুল মনে তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কেশব বাড়ুয্যের গৃহাভিমুখে চলিলাম। কেশবের

বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কেশব বাহিরের ঘরে বসিয়া ধূম-পান করিতেছেন। আমাকে আসিতে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন,— "এস, হীরুদা যে! কি মনে করে? সংবাদ ভাল তো?"

আমি সংক্ষেপে আমাদের কুশল-বার্ত্তা জানাইয়া অন্য কোন কথা না পাড়িয়া প্রথমেই অমলার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কারণ ভূমিকা করিয়া কথা পাড়ি, এরূপ অবস্থা তখন আমার মনের ছিল না।

আমি বলিলাম,—"আজ ক'দিন থেকে অমলা আমাদের বাড়ী যাচ্ছে না কেন, জান্‌তে না পেরে তোমার কাছে এলাম। সে ভাল আছে তো?"

কেশব। হাঁ, সে বেশ ভালই আছে।

আমি। তবে আমাদের বাড়ী আর যায় না কেন?

কেশব। তার বিয়ের ঠিক হচ্ছে বলে সে আর পথে বেরোয় না।

আমি। সে কি! বিবাহ! কবে? কার সঙ্গে? এ কথা তো আমাকে এত দিন বলনি?

কেশব। এখনও কোন ঠিক হয়নি বলে কারও কাছে প্রকাশ করিনি। তুমি এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে তোমায় বল্লাম।

আমি। কোথায় কথা-বার্ত্তা হচ্ছে? কিরূপ পাত্র?

কেশব। কয়েক জায়গায় তো কথা হচ্ছে, কিন্তু তাদের সন্তুষ্ট করতে আমি পার্‌বো কেন? আমার মত গরীবলোক তাদের দু'হাজার পাঁচ হাজার দেবে কোথা থেকে? কাজেই সে সব জায়গার মধ্যে কোথাও হবার কোনই আশা নেই। তবে এক জায়গায় একটু সুবিধা বলে বোধ হচ্ছে, কিন্তু পাত্রটী তেমন সুবিধে হয়!

আমি। কিরূপ পাত্র?

কেশব। এমন কিছু নয়, পাত্রটী কুলে-শীলে আমাদেরই সমান। তবে শুন্‌ছি নাকি তাঁর বয়স হ'য়েছে, এবার নাকি তাঁর তৃতীয় পক্ষ!

আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম,—"অ্যাঁ! সেকি! তৃতীয় পক্ষ? তাহলে বল অশীতিপর বৃদ্ধ! নানা, তুমি অমন কাজ কখনও করো না। অমন সোণার প্রতিমাকে মহাপথের পথিকের হাতে তুলে দিও না।

কেশব। তাইতো ভাবছি কি করি! আমার তেমন সঙ্গতি নাই যে অমলাকে দেখে শুনে একটি ভাল ঘরে দেই। তাদের যে "খাঁই", সে "খাঁই" আমি পূরণ কর্‌বো কেমন করে?

আমি বলিলাম,—"তাই বলে আশী বৎসরের বুড়োর সঙ্গে অমন কচি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে নাকি? আমাদের টাকা নেই বলে কি আমরা মানুষ নই? তুমি দেখে শুনে উপার্জ্জনক্ষম অথচ দরিদ্রবংশে উদ্ভূত এবং কৌলিন্যে তোমাদের সমান, এরূপ একটী পাত্রের সহিত অমলার বিয়ে দাও।

কেশব একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন,—"তাই বা পাচ্ছি কই? ওরূপ পাত্রের যে দর আজ কাল আরও বেশী। তাদের পিতামাতা মনে করেন তাঁদের জীবনটা তো একরূপ কষ্টেই কেটে গেছে, এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় ছেলেটী "মানুষ" হয়েছে, তার বিয়ে উপলক্ষে কিছু উপার্জ্জন করেনি। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তাঁরা অসম্ভব চাহিয়া বসেন; সুতরাং বুঝিতেই পাচ্ছ, এরূপ অবস্থায় নির্ধন ব্যক্তির কন্যাদায় কিরূপ ভয়ানক। আমাদের বঙ্গীয় সমাজ সে দিকে চেয়ে দেখেন না। তাঁদের এখন চাই খালি টাকা! টাকা যোগাও তুমি সমাজের নেতা হ'তে পারবে, আর টাকা না দিতে পার, তুমি যদি আহারাভাবে শুকিয়ে মর, তাহলেও সমাজ ফিরেও চাইবে না। এই তো আমাদের সমাজ! যে সমাজে সমবেদনা নাই—সহানুভূতি নাই, যে সমাজের দ্বারা একটুও উপকার পাবার যো নাই, সে আবার সমাজ? এই বিবাহ-পণের দায়ে পড়ে কত কন্যাকর্ত্তা সর্ব্বস্বান্ত হলো, কত কন্যার পিতা কন্যার বিবাহে নিজের বাস্তু-ভিটাখানি পর্য্যন্ত অর্থ-লোলুপ পিশাচ বৈবাহিকের হাতে তুলে দিয়ে, ক্ষণকালের জন্য কন্যাদায় হ'তে নিষ্কৃতি পেয়ে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ব্যোম-আচ্ছাদিত বৃক্ষতলে দাঁড়ালেন! তবু আজ পর্য্যন্ত কি সমাজপতিগণ ঐ প্রথা উঠাতে পারলেন? না উঠাবার একটু চেষ্টাও করেছেন? ভবিষ্যতে যে উঠবে এমন কিছু আভাষ পাচ্ছ? অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের মত লোকের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

এ কথার আমি কি উত্তর দেব খুঁজিয়া পাইলাম না। তথাপি যথাসাধ্য কেশবকে বুঝাইয়া বলিলাম, তিনি যেন ঐ পাত্রের সহিত অমলার বিবাহ না দেন। কিন্তু কেশব তাহা ততটা গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন,—পাত্রের বয়স হইয়াছে বটে, কিন্তু তত বেশী নহে। আর অবস্থাও বেশ ভাল, অমলার "খাওয়া-পড়ার" কোন কষ্টই হইবে না। অধিকন্তু টাকা-কড়িও কিছু লাগিবে না; সুতরাং এতটা সুবিধা তাঁহার মত লোকের পক্ষে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। তিনি টাকা-কড়ি কোথায় পাইবেন যে অমলাকে ভাল

ঘরে দিবেন ? কাহারও নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে বা সাহায্য লইতে তিনি একেবারেই ইচ্ছুক নহেন। অতএব ঐ পাত্রই তাঁহার পক্ষে সুবিধা-জনক ইত্যাদি ইত্যাদি।

তথাপি আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলাম, কিন্তু কোন ফললাভের আশা করিতে পারিলাম না। কথার ভাবে বুঝিলাম কেশব ঐ পাত্রের সহিত অমলার বিবাহ দিতে একরূপ কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন,—"অদৃষ্টে থাকে অমলা ইহাতেই সুখী হইবে।"

সুতরাং আমি নিরাশহৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

* * * *

তারপর আর একমাস কাটিয়া গিয়াছে। এটা ফাল্গুন মাস। আজ অমলার বিবাহ। সংবাদ পাইবামাত্রই ছুটিয়া কেশবের বাড়ী গেলাম। তখন সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়, দিনমণি অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছেন। বিহঙ্গমগণ সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া কলরব করিতে করিতে নিজ নিজ কুলায় অভিমুখে ফিরিতেছিল। কৃষক-কুল শ্রান্ত বলদগুলিকে সঙ্গে লইয়া আনন্দচিত্তে ফিরিতে-ছিল। বসন্ত-পবন বিকসিত কুসুম-সৌরভ দিকে দিকে বিকীরণ করিয়া মৃদু-মন্দ গতিতে বহিতেছিল। দুই একটা কোকিল তখনও থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল।

আমি দ্রুতপদে কেশবের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গোধূলি-লগ্নেই বিবাহ। সুতরাং বিবাহের যথাসাধ্য আয়োজন চলিতেছিল। আমি অন্য কিছুই না করিয়া, আগেই কেশবের সহিত দেখা করিয়া পাত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি বলিলেন,—"যাহার কথা বলিয়াছিলাম, তাহার সহিতই অমলার বিবাহ দিব।"

শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মুখদিয়া কোন কথাই সরিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া বলিলাম,—"কেশব, ভাল করিলে না। অমন সোণার প্রতিমাকে বাস্তবিকই তুমি এক মুমূর্ষু-বৃদ্ধের হাতে তুলিয়া দিলে! চিরদিনের জন্য অমলাকে দুঃখের অকূল-পাথারে ভাসাইয়া দিলে ? হায়! অভাগিনী অমলা শুধু দুঃখ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আর কিছুই বলিতে পারিলাম না, বুকের ভিতর যে কেমন করিতে লাগিল, তাহা বুঝাইব কেমন করিয়া ? সেরূপ ভাষা যে আমার নাই!

কেশবও কিছুই বলিলেন না, শুধু বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বাদ্যোদ্যম সহকারে "বর" আসিয়া কেশবের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। আমি "বরের" আকৃতি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য পাল্‌কীর নিকটবর্ত্তী হইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে শিহরিয়া উঠিলাম; দেখিলাম, দন্ত-বিহীন, পলিত-কেশ, লোল-চর্ম্ম অথচ স্থূলকায় এক বৃদ্ধ বিবাহবেশে সজ্জিত হইয়া পাল্‌কীর ভিতর বসিয়া রহিয়াছে। কিছুদিন পরে মহাপ্রস্থানের জন্য যাহাকে আয়োজন করিতে হইবে, সে কি না আজ "বর" সাজিয়া, নূতন করিয়া সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে! আজ বাদে কাল মনুষ্যের অন্তিমস্থান মহাশ্মশানে যাহার অস্তিত্বের লোপ হইবে, আজ কি না তাহার বিবাহ-বাসর! হায় রে অদৃষ্ট! জন্ম-দুঃখিনী, অভাগিনী অমলাকে আজ চির-জীবনের মত অকূল-দুঃখ পারাবারে ঝাঁপ দিতে হইল! হায়! বিধি-লিপি কে খণ্ডাইতে পারে?

আর সেস্থানে একটুও অপেক্ষা করিতে পারিলাম না; তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম।

বাড়ী ফিরিয়া সমস্ত কথা গৃহিণীকে বলিলাম। তিনিও শুনিয়া ক্ষণেকের জন্য শিহরিয়া উঠিলেন। দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার চক্ষু পরিত্যাগ করিয়া নীরবে ধরাতল সিক্ত করিল।

(৪)

আরও পাঁচ বৎসর কোথাদিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই। এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে অমলার আর কোনই সংবাদ জানিতে পারি নাই। জানিবার কোন উপায়ও ছিল না; কারণ তাহার বিবাহের ছয়মাস পরেই তাহার মাতা স্বর্গারোহণ করেন। তাহার কিছুদিন পরেই তাহার পিতাও সহধর্ম্মিণীর প্রদর্শিত পথের পথিক হন; সুতরাং অমলা একেবারে আত্মীয়শূন্যা হয়। তাহার আপন বলিতে কেবলমাত্র শ্বশুরালয়ে বৃদ্ধ স্বামী ও সম্ভবতঃ আরও কেহ ছিল। কাজেই আমি আর তাহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। অমলার শ্বশুরালয় কোথায়, তাহাও আমি জানিতাম না।

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমার দেহের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মাথার চুল আর একগাছিও কৃষ্ণবর্ণ নাই; সবই ধবধবে সাদা। গাত্রচর্ম্ম শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। এক

কথায় আমার দেহের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বে আমায় দেখিয়াছে, এখন আর সে আমায় দেখিলে সহসা চিনিতেই পারিবে না। এমনই কালের মহিমা!

শুধু দেহের নহে,—সাংসারিক পরিবর্ত্তনও অনেক হইয়াছে। আজ দুই বৎসর হইল গৃহিণীর গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে; সুতরাং আজ আমি সংসারে একা, সম্পূর্ণ একা! আপনার বলিবার আর কেহই নাই। যাহার মায়ায় বদ্ধ হইয়া এতদিন এই সংসার-কারায় অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতেছিলাম, আজ সেও আমার মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া কোন্ অজানা রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। সুখে-দুঃখে যে জন আমার একমাত্র সহায় ছিল, আজ সেও আমায় পরিত্যাগ করিয়াছে। যাইবার সময় মুখের একটা সামান্য কথাও বলিয়া যায় নাই। হায়! তবে কেন মানব এই স্বার্থে ভরা সংসারে এই মায়ানিকেতনে মিথ্যা মায়ায় আবদ্ধ হইয়া থাকে? এই অনিত্য সংসারে, যেখানে কিছুই নিজের নহে, সেখানে কেন ভ্রমান্ধমানব বৃথা "আমার আমার" করিয়া একটা নশ্বর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহার জীবন অতিবাহিত করে?

আমার এখন সংসারের যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। তবে আর কাহার জন্য এ সংসারে পড়িয়া থাকি? বহুদিন পরে আবার ৺কাশীবাসী হইবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। এতদিন কোন্ কালে আমি এ বাসনা চরিতার্থ করিতাম; কেবলমাত্র গৃহিণীর জন্য তাহা পারি নাই। এখন আর গৃহিণী নাই, সুতরাং তাহা পূর্ণ করিতে আর কোনও প্রতিবন্ধক নাই। এখন শুধু জন্মভূমির মায়াটা কাটাইতে পারিলেই হয়।

আর এ বন্ধু-বান্ধবশূন্য, সহায়-সম্বল-বিহীন, আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শূন্যসংসারে বাস করিতে কিছুতেই ইচ্ছা হইল না। কাজেই তৈজসপত্র যাহা কিছু ছিল সমস্তই, এমন কি বাস্তভিটাখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটী দ্রব্য লইয়া ৺কাশীবাসী হইতে চলিলাম।

যাইবার পূর্ব্বে মাতৃসমা জন্মভূমির নিকট একবারমাত্র রুদ্ধকণ্ঠে সজল-নেত্রে বিদায় গ্রহণ করিয়া, এ জীবনের মত তাহা পরিত্যাগ করিলাম। বিদায় লইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলাম। সেই শিশুকাল হইতে এই বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত যাঁহার অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়াছি, যাঁহার প্রত্যেক

দ্রব্য এমন কি এক কণা ধূলি পর্য্যন্ত হৃদয়ের পরতে পরতে কি এক বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছে, এ হেন জন্মভূমিকে কি সহজে পরিত্যাগ করা যায়? যায় না বলিয়া কি করিব? আমার ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তিকে বাধ্য হইয়াই তাহা করিতে হইল। "যে দেশেতে জন্ম আমার সেই দেশেতে মরণ", বিধাতা আমার ভাগ্যে লিখেন নাই। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জন্মের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলাম। হায় অদৃষ্ট!

কাশীতে আসিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে বাঙ্গালীটোলায় একটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পরিবারে আশ্রয় পাইতে সমর্থ হইলাম। ঐ পরিবারে মাত্র সাতজন লোক ও একটি দাসী, সাতজনের মধ্যে তিনজন পুরুষ ও চারিজন স্ত্রী। কথাবার্ত্তায় অনুমান করিয়া লইলাম পুরুষ তিনটি পরস্পর পরস্পরের সহোদর ভ্রাতা এবং চারিজন স্ত্রীলোকের মধ্যে তিনজন ভ্রাতৃত্রয়ের সহধর্ম্মিণী এবং একজন তাঁহাদের অল্পবয়স্কা বিধবা বিমাতা বা "সৎ শাশুড়ী।"

আমার এ অনুমান ঠিক হইয়াছিল। দাসীটী ঠিকে কাজ করিয়া থাকে। প্রাভাতিক কাজ-কর্ম্ম সারা হইয়া গেলে সে আপন গৃহে চলিয়া যায়। আবার বৈকালে আসিয়া কাজ-কর্ম্ম সারিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করে।

ভ্রাতা এবং বধূগণের মধ্যে বেশ প্রীতি আছে। তাঁহারা তাঁহাদের ঐ অল্পবয়স্কা বিধবা পোষ্যাটিকে একটুও স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারেন না। তাঁহাদের ধারণা, কর্ত্তার মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কোথা হইতে অনর্থক একটা পোষ্যা জুটাইয়া সংসার হইতে হিসাব-নিকাশ শেষ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা ঐ হতভাগিনীর ভরণ-পোষণ করিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু বিদায় করিয়া দিবার বা মারিয়া ফেলিবার উপায় নাই, তাই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উহার ভরণ পোষণ করিতে হইতেছে।

এদিকে শ্বশ্রূঠাকুরাণী দিবারাত্রি অক্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও ইহাদের মন যোগাইতে পারেন না। গৃহের প্রায় সমস্ত কার্য্যই ইহাকে করিতে হয়। বধূত্রয়ের মধ্যে কেহই কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। কেনই বা করিবেন? তাঁহারা তো আর বসিয়া খান না; দিবা রাত্রি বেশ বিন্যাস, আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি করিতেই সময় পান না, তা সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিবেন কোথা হইতে? শাশুড়ীমাগী শুধু বসিয়া খায়, সেই সমস্ত কাজ করিবে। প্রকৃতপক্ষে হইতেছেও তাহাই।

এই পরিবারে আমি কোন্ সৌভাগ্যের বলে আশ্রয় পাইতে সমর্থ হইয়া

ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ আমাকে বৃদ্ধ দেখিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, আমাকে তাহারা আপন গৃহে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু আহারাদির খরচটা আমাকেই দিতে হইত; সুতরাং ইহাতে যে তাহাদের স্বার্থ একেবারেই ছিল না, এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। সে যাহা হউক, আমি ঐস্থানেই আস্তানা পাতিয়াছিলাম।

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে আহারাদি শেষ করিয়া, আপনার ক্ষুদ্র ঘরখানিতে বসিয়া বসিয়া 'তাম্রকূট ধূম পান করিতেছি; এমন সময় অন্দর মহলে যেন একটা কিসের কলহের সাড়া পাইলাম।

একজন বলিল, "আমিতো মা, তোমাকে স্নান করে এসেই ও কথা জানিয়ে ছিলাম। আমার বড় ছেলেকে ও কথা বল্‌তে লজ্জা করে, তাই তোমাদের কাছে বলি। তুমি তখন বল্লে আনিয়ে দেব; আর এখন বল্‌ছ "আমি জানিনে!

দ্বিতীয়জন ঝঙ্কার দিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "মিথ্যে কথা বল কেন? কখন আমায় ওকথা বলেছিলে? আমি তো আর "সর্ব্বজ্ঞ" নই যে তোমার পেটের কথা জান্‌তে পার্‌বো!"

প্রথম। কি বল্লে মা? আমি মিথ্যে কথা বলছি? তুমি মনে করে দেখ দেখি, আমি তোমাকে প্রাতঃকালেই ও কথা বলেছি কি না? তুমি ঝীকে বাজার কর্‌তে পয়সা দিচ্চ, তখনই আমি তোমাকে বল্‌লাম, "আমার আতপ চাল নেই মা, আনিয়ে দিতে হবে। তা তুমি তখন "আচ্ছা" বলে চলে গেলে, আর কিছুই বল্লে না। আমি মনে কর্‌লাম ঝি চাল এনে আমার হাঁড়ীতে রেখে গেছে। তাই আমি তোমাদের রান্না-বাড়ি ক'রে তোমাদের খাইয়ে-ধুইয়ে নিয়ে, নিজের পোড়া পেটের চেষ্টায় এলাম। উনুনে জল চড়িয়ে, হাঁড়ি থেকে চাল নিতে গিয়ে দেখ্‌লুম, একটি ক্ষুদ ও নাই।

এমন সময় তৃতীয় একজন কোথা হইতে আসিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তোমার জন্যে বাছা দুপুরবেলা খাটা-খোটার পর যে কেউ একটু শোবে, তার যো নেই! যেমন শুয়েছি, অমনই এসে চাল নেই বলে কিচি-কিচি লাগিয়ে দিয়েছ। জিনিষ-পত্র ফুরিয়ে গেলে আনিয়ে দিবার জন্যে বল্‌তে হয়। অত লজ্জা কর্‌তে গেলে চলে না। পেট যখন ভরাতে হয়, তখন কথা কইতেও হয়। কেওতো আর কারুর পেটের কথা জানিতে পারে না।"

তারপর আর কোন কথা শুনিতে পাইলাম না। একটু পরেই জ্বলন্ত উনানে জল ঢালিয়া দেওয়ার শব্দ পাইলাম, আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। এক অনাথা বিধবাকে অনাহারে রাখিবার জন্যই ঐরূপ বাক্য-বাণ নিক্ষিপ্ত হইল। অভাগিনী মনের দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে উনুন নিভা-ইয়া সেদিন অনাহারে থাকিতেই কৃত-সঙ্কল্প হইল।

আমার মনে ইহাতে বড় কষ্ট হইল। ভাবিলাম, গৃহে একজন বিধবা ব্রাহ্মণী অভুক্ত অবস্থায় থাকিবেন, আর আমি আহার করিয়া দিব্য আরাম উপভোগ করিব, ইহাতে আমার পাপ হইবে। তাহা হইতে দিব না, আমার তো অন্দরে প্রবেশ নিষেধ নাই ; সুতরাং গিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া আহার করিতে বলি, কিন্তু তাহা আর করিতে হইল না। আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় আমার ঘরে এক অনশন-ক্লিষ্টা, স্তিমিত-যৌবনা বিগত-শ্রী বিধবা প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহার দিকে চাহিলাম, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি আর তত প্রখর ছিল না বলিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। অধিকন্তু তিনি আবার তখন রোদন করিতেছিলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া চকিতে আমার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"হীরু-জ্যেঠা! আমায় চিন্‌তে পার্‌ছনা? আমি কেশব বাঁড়ুয্যের মেয়ে অমলা!

কথা কয়েকটী শুনিয়া ইচ্ছা করিল খানিকটা কাঁদি, কিন্তু শুষ্ক নীরস, কঠোর এ হৃদয়, এক বিন্দু জলও চোখ দিয়া বাহির হইল না!

ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলাম,—"অমলা! তোমার এই দশা হয়েছে! হা ভগবন্! আমাকে ইহা দেখাইবার জন্যই বুঝি এখানে আনিয়া ছিলে?"

অমলা অস্বাভাবিক-স্বরে বলিল,—"আজ এ দশা হয়নি হীরুজ্যেঠা! পাঁচ বছর থেকে আমি এ যাতনা ভোগ কর্‌ছি। এতদিন প্রকাশ কর্‌বার একটা লোকও পাইনি, আজ তোমাকে তার কিছু বলতে এসেছি। এ যাত-নার কিছুও প্রকাশ কর্‌তে পারলে আমি অনেকটা শান্তি পাই, আমার দুঃখের কথা শুন্‌বে কি হীরুজ্যেঠা?"

আমি কোনই উত্তর করিতে পারিলাম না, মৌনাবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিলাম। অমলা বলিতে আরম্ভ করিল।

(৫)

"হীরুজ্যেঠা! আমি জন্মদুঃখিনী, দুঃখ সহ্যের সাথী হয়েই আমি জন্ম-

গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু পাঁচ বৎসর আগেও তা' জানতে পারিনি। যে-দিন সেই অশীতিপর বুড়ার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ল, সেই দিনই বুঝলাম আমার কপাল পুড়েছে, আমি দুঃখের অকূল সাগরে ডুব্‌লাম। একবার মনে হ'য়ে ছিল, যদি আমার মরণ হ'তো, তা'হলে আমি সুখী হ'তাম, আমাকে আর এই দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ কর্‌তে হ'তো না। কিন্তু আমার অদৃষ্ট-লিপি অন্যরূপ। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ফলিল। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘর কর্‌তে এই যাতনা সহ্য কর্‌তে এলাম। ছয় মাস কাটিতে না কাটিতেই বিধবা হলাম। তারপর থেকেই এই দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য কর্‌বার জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। আমার কপাল পুড়ল দেখে, মা বাবা হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পেলেন। কিন্তু সে ব্যথা আর তাঁদের বেশীদিন সহিতে হ'ল না। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তাঁরাও এ সংসার থেকে চির-বিদায় নিলেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অমলা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। আমি যে শুধু চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিলাম, তাহা নহে। আমার প্রাণের মধ্যে যে তখন কিরূপ করিতেছিল তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব?

অল্পক্ষণের মধ্যেই হৃদয় দৃঢ় করিয়া অমলা আবার বলিতে লাগিল, "তারপর কি হ'লো শুন্‌বে হীরুজ্যেঠা? তারপর সকলের সঙ্গে এই কাশী-ধামে চলিয়া আসিলাম। এখানে এসে কিছুদিন বেশ সুখে ছিলাম, কিন্তু তা বেশীদিন স্থায়ী হইল না। তারপর থেকেই যে কি যাতনা সচ্ছি, তা কি করে তোমায় বুঝাব? হায়! বিধবা হ'লে যে এত যাতনা সহ্য কর্‌তে হয় তা আমি আগে জান্‌তাম না। অনেকদিন আত্মহত্যা করে এ যাতনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার ইচ্ছে হয়েছিল; কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ জেনে তা থেকে বিরত হয়েছি। কিন্তু হীরুজ্যেঠা! আর তো আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি নে! বলে দিতে পার, কোন্ উপায়ে এই নরকযন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি পাব?"

এ কথার উত্তর কি দিব, ঠিক করিতে পারিলাম না। নীরবে বসিয়া বসিয়া পূর্ব্বের সেই স্মৃতি ভাবিতে লাগিলাম। মনে পড়িল, অমলার সহিত আমার সেই প্রথম সাক্ষাৎ;—মনে পড়িল, তাহার সেই বাল্যের সুন্দর মুখখানি;—মনে পড়িল, তাহার সেই বীণা-নিন্দিত স্বরে কথা আর মনে পড়িল, তাহার স্বামীর সেই আকৃতি এবং বিবাহের দিন কেশব বাড়ুয্যের সহিত

সাক্ষাৎ কালীন তাহার সেই সজল চক্ষু ও শুষ্ক আনন। একবার শিহরিয়া উঠিলাম। এবার দুই ফোঁটা জল ধীরে ধীরে আমার সেই ক্ষীণ-দৃষ্টি চক্ষু হইতে ঘরের মেঝেয় পড়িল।

অমলা আবার কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু ঘরের দ্বারের পার্শ্বেই কাহার যেন পদশব্দ শুনিয়া একবারে চমকিত হইয়া ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গাস্নান সারিয়া ও বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া আসিয়া, আমার ঘরখানিতে বসিয়া আছি, এমন সময় ঝি আসিয়া আমায় বলিয়া গেল যে এ বাড়ীতে আর আমার স্থান হইবে না; আমি যেন অদ্যই বাড়ী পরিত্যাগ করি।

পলকের মধ্যেই সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলাম। আমি অমলার পরিচিত এবং সে তাহার দুঃখের কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়াই গৃহকর্ত্তা বা কর্ত্রী আমাকে সে বাড়ী হইতে দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে আপনার "আস্তানা" তুলিয়া স্থানান্তরে যাইবার চেষ্টায় বাহির হইলাম। হায় অমলা! কে না বলিবে ইহা "প্রাক্তন"—কে না বলিবে ইহা অদৃষ্ট;—কে না বলিবে ইহা বিধি-লিপি!

শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ প্রামাণিক।

স্থান দেমা তোর চরণে।

মাগো এ ভব সংসারে ভাবি সুখাগার
ভুলিয়া মোহের ছলনে।
শত অতৃপ্ত আশায় হইয়া বিভোর
রয়েছি অনিত্য স্বপনে॥
আমি দু'দিনের তরে এসেছি হেথায়
যেতে হবে পুনঃ ফিরিয়া।
হায়! নিমিষের তরে ভাবি না জননী
জন্ম যাবে শুধু কাঁদিয়া॥

আমি ভুলে আছি মাগো! জনমে জনমে
পেতে হবে হেন বেদনা।
আমি ভুলে আছি হায়! অন্তিমের ঘোর
অসীম নরক-যাতনা॥
আর সব চেয়ে আমি ভুলেছি তারিণী
পথের সম্বল করিতে।
তারা দুর্গতি-হারিণী নামটী তোমার
হৃদয়ের মাঝে জপিতে॥
তাই প্রতিফল তার সারাটী জীবন
প্রতি পদে পদে পেয়েছি।
আমি বিবেকবিহীন মূঢ়মতি বলে
অনেক যাতনা সয়েছি॥
আজ কি জানি কি পুণ্যে সহসা জননী!
নিশীথে মধুর স্বপনে।
যেন মোহিনী-মূরতি হেরিয়া তোমার
তন্দ্রা-বিজড়িত নয়নে॥
ওমা ছিঁড়ে গেছে মোর মোহের বাঁধন
আশার কুহক ত্যজেছি।
আজ মরুভূমি সম হৃদয় লইয়া
শরণ তোমার লয়েছি॥
মোর তপ্ত অশ্রুজল দাওমা মুছায়ে
কৃপা-বারি ঢাল পরাণে।
আমি বড় যাতনায় এসেছি জননী!
স্থান দেমা তোর চরণে॥

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মজুমদার।

সারনাথে ঘণ্টা কয়েক।

সূর্য্যদেব পশ্চিম অচলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। দশাশ্বমেধ ঘাটের প্রস্তর-রাজি অনেক পরিমাণে শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছে. বিচিত্রবেশধারী বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানাজাতীয় লোকে ঘাট ভরিয়া গিয়াছে, চারিদিকে বিচিত্র দৃশ্য। কেহ বা প্রস্তরাসনে বসিয়া ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে কথকের মুখনিঃসৃত তুলসীদাসের অমৃতোপম সুমধুর রামায়ণ শুনিতেছেন— আবার কেহ বা 'পাণ্ডা' বা 'ঘাটালদিগের' পরিত্যক্ত চৌকী দখল করিয়া অন্যের নিকট স্বমুখে সালঙ্কারে আপন পাণ্ডিত্য ও বীরত্বের পরিচয় দিতেছেন; —কেহ বা সঙ্গী সমভিব্যাহারে পাদচারণা করিতে করিতে নানা গল্প করিতেছেন; —আবার কেহ বা মুগ্ধনয়নে পুণ্যতোয়া জহ্নু-নন্দিনীর সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন। এ হেন সময়ে আমরা কয়েকজন একটি প্রস্তরস্তম্ভের উপর বসিয়া গল্পের বন্যার মুখ খুলিয়া দিয়া মহানন্দে তাহা উপভোগ করিতেছিলাম এবং মাঝে মাঝে প্রকৃতির নিথর নীরব সান্ধ্যছবি দেখিয়া পুলকে পূর্ণিততনু হইতেছিলাম। হঠাৎ বন্ধুবর -প্রস্তাব করিলেন, "কাল পরশু দুদিন ছুটি আছে; চল একবার সারনাথ ঘুরে আসা যাক্!"

নূতনত্বহীন সহুরে জীবন দিনে দিনে কেমন এক ঘেয়ে হইয়া উঠিতেছিল। "নূতন "নূতন" করিয়া সকলেরই মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল; সুতরাং বন্ধুবরের প্রস্তাব সমর্থিত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। তৎপরদিনই যাইবার দিন স্থির হইল। 'আমরা বেলা ৮টার মধ্যেই কাশী পরিত্যাগ করিব' ঠিক হইল।

* * * *

"দুলকি গমনে, ঝন্ ঝনে ঝনে, করতাল ঘুঙুর টেকা বাজাইয়া" কাণ ঝালাপালা করিতে করিতে একা ছুটিয়াছে। দুইধারে পেয়ারার ও কুলের বাগান! মাঝে মাঝে মাঠ। প্রাকৃতিক শোভা উচ্চাঙ্গের না হইলেও একেবারে দীন নয়! যতই সারনাথের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই ধামেক স্তূপের অগ্রভাগ সুস্পষ্টরূপে আমাদের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন মুণ্ডিতমস্তক একটি বিশাল জীব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কঙ্কর-বিনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর আমরা

"চৌখণ্ডী স্তূপের" পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। একটি অতি জীর্ণ ভগ্ন স্তূপের উপরে অষ্টকোণাকৃতি একটি গৃহ অবস্থিত। ইহাই "চৌখণ্ডী"। ইহার উচ্চতা প্রায় একটি চারি পাঁচতলা বাড়ীর সমকক্ষ হইবে। ইহার পৃষ্ঠদেশে একটি দ্বারের উপরে পারস্য ভাষায় লিখিত আছে "বিখ্যাত পাৎশাহ হুমায়ুন এই স্তূপে আরোহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মিত হইল।" সুতরাং বোঝা যাইতেছে, তৎপুত্র আকবর ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যদি চ ইহা (স্মৃতিগৃহটি) অষ্টকোণাকৃতি তথাপি সাধারণে ইহার নাম দিয়াছে "চৌখণ্ডী" বা চতুষ্কোণ!

পুনরায় এক্কা চলিল—চলিল কেন ছুটিল। গভর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত মিউজিয়ম ঘরের নিকট আসিয়া আমরা এক্কা হইতে অবতরণ করিলাম। ঘরের ভিতর ঢুকিতেই দ্বারপ্রান্তে রক্ষিত একটি চতুর্ম্মুখ সিংহ দেখিলাম। খননকালে লোকে ইহার দুইটি মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে; এখনও সেই ভগ্নমূর্ত্তির সুচারু-শিল্পকণা অধুনাতন পাশ্চাত্য শিল্পকে অবহেলে পরাজয় করিতে পারে, এমনি তাহার চাতুর্য্য! মসৃণ, পাঁশুটে রঙ্গে ভূষিত সিংহটীকে আমরা মুগ্ধনেত্রে দেখিলাম। জানি না কবে কোন সুলগ্নে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বর্ণ-বিকৃতি ঘটে নাই। নিকটেই একটি বৃহদায়তন ছত্র ও তন্নিম্নে একটি নিমীলিত নয়ন ধ্যানোপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্ত্তি! ছত্রটি প্রস্তর-নির্ম্মিত। তার-পরে যে কত বিচিত্র কারুকার্য্য সমন্বিত ভগ্নমূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, সকলের নাম করিয়া পরিচয় দিতে গেলে 'অবসর' কেন একখানা সুবৃহৎ মহাভারতেও স্থান সঙ্কুলান হয় না। হঠাৎ বন্ধুবর—চীৎকার করিয়া উঠিলেন "দেখেছ হে, আধুনিক শিক্ষিত লোকগুলো কি মিথ্যেবাদী! বলে কি না তামাক ভারতে ছিল না। ইহা খাঁটি আমেরিকার জিনিস! তবে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানে হুঁকা, কলিকা কোথা থেকে আসিল?" বলা বাহুল্য তিনি একজন তামাকু-ভক্ত!

বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাচীন শিল্প-কলার সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিয়া আমরা ধামেক স্তূপের নিকট পৌঁছিলাম। ইহার উচ্চতা প্রায় ১১০ ফুট, ব্যাস প্রায় ৯২ ফুট এবং নিম্নতলের পরিধি প্রায় ২৯৪ ফুট। ৪৩ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত চুণার প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। ভূমি হইতে ৮।১০ হাত উচ্চে ৮।১০টী কারুকার্য্য-ময় ফলক বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রত্যেক ফলকের নিম্নদেশে এক একটী কুলুঙ্গী রহিয়াছে। কোন কোন জায়গা গভর্ণমেণ্ট মেরামত করাইয়া দিয়াছেন।

ধামেক শব্দটী বোধ হয় ধর্ম্মোপদেশকের অপভ্রংশ। সুপ্রসিদ্ধ কানিংহাম সাহেবও এইরূপ লিখিয়াছেন। 'ধামেক' হইতে সার্দ্ধ ত্রিশত হস্ত পশ্চিমে আর একটি স্তূপ আছে। এই স্তূপে অশোক বুদ্ধদেবের 'নখ' সমাহিত করেন।

ইহার কিয়দ্দূরে ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি মসৃণ পাংশুটে রঙের স্তম্ভ প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ এইটি দেখিয়া না আসিলে সারনাথ দর্শন অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ইহার নাম "অশোক-স্তম্ভ"। কালের কঠোর স্পর্শে কত শিল্পকলা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই মসৃণ স্তম্ভটির কিছু-মাত্র বর্ণ-বৈলক্ষণ্য হয় নাই। যেন ইহা এই মাত্র প্রস্তুত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় স্তম্ভটি খননকালে কয়েক খণ্ডে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভের শিরোদেশে যে সিংহটি অধিষ্ঠিত ছিল, সেটির কথা পাঠকদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই স্তম্ভটির গাত্রে যে ঘোষণাটি পালি-ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে, ভাষান্তরিত করিলে তাহা এইরূপ হয়;—"যদি কোন শ্রমণ বা ভিক্ষু ধর্ম্ম-সংঘের মধ্যে বিবাদ বা কলহ বাধায় তবে তাহাকে আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিবে। রাজার এই আদেশ। রাজ্যস্থ সকলে ইহা পালন করিতে যত্নবান হউন!"

ইহার নিকটেই একটি বৌদ্ধবিহারের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এখনও খননকার্য্য সমাপ্ত হয় নাই। প্রতি বৎসরই নূতন নূতন নয়ন-মনোহর দ্রব্যাদি বাহির হইতেছে। এখানে একটি ক্ষুদ্র পালী বিদ্যালয় আছে। এক জন সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধ ইহার গুরু। তিনিই এই সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ পরিদর্শন করেন।

ইহার কিঞ্চিৎ দূরে একটি জৈন মন্দির। ভিতরে পরেশনাথ বিরাজিত।

জৈন মন্দিরের নিকটে একটি ধর্ম্মশালা অবস্থিত। অনেক লোকজনের বসিবার স্থান আছে।

এই ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণে সারনাথ মহাদেবের মন্দির। তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম সারনাথ। গ্রামটি বেশ বৃহৎ কিন্তু অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আর অধিক লিখিয়া পাঠকদিগকে বিরক্ত করিতে চাহি না। অতএব এখান হইতেই বিদায় লই।

শ্রীভূপতিতোষ রায়।

প্রতাপাদিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সম্রাট প্রবল-প্রতাপ আকবর, প্রতাপাদিত্যের প্রতাপকে যেরূপ সামান্য জ্ঞান করিয়াছিলেন, প্রতাপ প্রতাপে সেরূপ সামান্য ছিলেন না; তাই তাঁহার বিপক্ষে যে বঙ্গসুবাদারের অল্পসংখ্যক সেনাসহ অভিযান, ইহাই মোগলপক্ষে আশঙ্কার বিষয় হইয়া পড়িল;—সুবেদার মোগল সেনাসহ, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও দূরীভূত হইলেন। বস্তুতঃ সংখ্যায়, অস্ত্রশস্ত্রের উৎকর্ষতায়, রণনৈপুণ্যে, সাহসিকতায়, সহিষ্ণুতায়, কর্ত্তব্যসাধনায় বীরত্বের লীলাখেলায় প্রতাপসেনা মোগলসেনাকে একেবারে পরাভূত করিল! কিন্তু তখনও যদি প্রতাপ রাজস্ব দান করিতেন, রাজভক্ত হইতেন,—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চাহিতেন;—ক্ষমা ত পাইতেনই,—বোধ হয় বীরত্বের পুরস্কারও লাভ করিতেন।

যুদ্ধে বিজয় লাভ করায়, প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ যেন মধ্যাহ্ন আদিত্য-প্রতাপ সম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সাধারণ্যে প্রতাপ বীরপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা-প্রভাতে যেন বঙ্গের মোগল-প্রতিষ্ঠা-চন্দ্রমা, পূর্ণিমা-প্রফুল্লা হইলেও পরিম্লান হইয়া পড়িল।—"প্রতাপ বাহুবল-প্রভাবে বঙ্গের মোগল যশঃ-প্রভা হরণ করিয়াছেন,—বিপুল যশস্বী অতুল প্রভান্বিত হইয়াছেন!"—এই নিমিত্ত, বঙ্গসুবা ভরিয়াও তাঁহার রাজধানীর "যশোহর"—"যশোহর" হইল।

বৈশাখের পূর্ণিমা নিশা; প্রফুল্ল জ্যোৎস্নায় দিগন্ত প্রফুল্ল;—আজ ভুবন ভরিয়া চন্দ্রদেবের অক্ষুণ্ণ রাজত্ব,—দিগন্তোজ্জ্বলা প্রভার দিব্য প্রভাব,—মধুময়তায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে;—বঙ্গ সংসার এক অপূর্ব্ব মধুর ভাবোচ্ছ্বাসে মধুময় হইয়াছে। এখন যদি প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ বিধানে,—অদৃষ্ট কারণে, একখানি মেঘ উঠিয়া চন্দ্রদেবকে,—মধুরোজ্জ্বল, জ্যোৎস্নার বিধাতৃ-পুরুষকে আচ্ছাদিত করে, তবে অবশ্য সংসার অন্ধকারময় হইবে,—ভুবনে আর মধুর ফুল্লতা, মধুরস্ফূর্ত্তি,—মধুময়তা রহিবে না। তখন সেই অন্ধকারে, জ্যোতিরিঙ্গণেরই,—যেটুকু মধুর জ্যোতি,—নিভুপ্রভা দান করে;—তাহাতে সেই তখন জ্যোৎস্নার বিধাতৃপুরুষ হইয়া উঠে; তখন সাধারণেও

তাহার জয়গান করে,—সে-ই পথপ্রদর্শক হয় ;—কিন্তু ইহাও সেই প্রকৃতির বিধান, ইহার কারণও অদৃষ্ট। তবে এইরূপ অধিকক্ষণ,—অবশ্য আবার সেই প্রকৃতিরই বিধানে,—অদৃষ্ট কারণেও বটে, টিকিতে পারে না ; —বৃষ্টি হয়, অথবা বাতাস বহিয়া মেঘ সরাইয়া দেয়, আকাশ নির্ম্মল হয় ; আবার চারিদিকে দেবপ্রভা বিধাতার দিব্য প্রসন্নতা,- চন্দ্র-প্রতিভা জ্যোৎস্না প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে ; তাহাতে আবার জগৎও প্রফুল্ল, স্ফূর্ত্তিমান মধুময় হয়, সুতরাং তখন জোনাকীও ঝোপের অন্তরাল আশ্রয় ক'রে,—লুকাইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়া পড়িল।

উত্তিষ্ঠমান, নবপ্রতাপ-প্রফুল্ল প্রতাপাদিত্য মোগলযুদ্ধে বিজয়ী হইয়া পূর্ণস্বাধীনতা লাভ করিয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেই নবস্বাধীনতা নবপ্রজারঞ্জন নবরাজ্য-সম্ভোগ সম্ভূত দিব্য মুক্ত সুখশান্তি অধিক দিন ভোগ করিতে সমর্থ হইলেন না ; প্রতাপের বিরুদ্ধে, রাজধানী হইতে মোগলবাহিনী প্রেরিত হইল,—বাহিনী যেমন সংখ্যায় প্রচুর তেমন রণদুর্ম্মদ,—বাহিনীপতি—রণদক্ষ দুর্জ্জয় নিত্যবিজয়ী অরিন্দম মানসিংহ ! প্রতাপের রাজ্য টলমল করিতে লাগিল !

শীতবিমুক্ত নির্ম্মোকত্যাগী মুক্ত বসন্তস্ফূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তিমান,—তাহাতে নবশক্তি নবতেজ নব উত্তেজনাসমন্বিত,—তাহাতে নব আশা-উৎসাহ-পরিপূর্ণ নব নীরুজ শ্রীমান্ কালসর্প যেমন কালদণ্ডধারী যমোপম কিরাতের প্রতি দর্শনমাত্র প্রধাবিত হয়,—কালদণ্ডধারী দূরে সরিয়া পড়ে,—মুক্তত্বের নব প্রতাপ-প্রফুল্ল প্রতাপাদিত্যও বিপুল যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত, অদম্য রণশক্তিতে সমন্বিত—অজেয় হইয়া মোগলবাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল—প্রতাপাদিত্য জয়লাভ করিলেন,—মোগলসেনা পলায়মান হইল। বিজয়ী প্রতাপের রাজ্য ভরিয়া বিজয়োৎসব,—নগরে নগরে বিজয়বাদ্য—বিজয়সঙ্গীত,—গ্রামে গ্রামে বিজয় ঘোষণা,—গৃহে গৃহে বিজয়লক্ষ্মীর পূজা হইতে লাগিল।

কালধ্বনি,—ব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তননাদ,—প্রকৃতির অন্তস্তল হইতে নিরন্তরই উঠিতেছে ; যাহার দিব্য কর্ণ আছে, সে শুনে,—সাবধানও হয়, রক্ষাও পায় ; যাহার নাই, সে শুনেও না,—সাবধানও হয় না, রক্ষাও পায় না। "হে বৃক্ষ ! সাবধান, সুতীক্ষ্ণ ভীষণ শস্ত্ররূপী লৌহখণ্ডের কুঠারের পশ্চাতে তোমার স্বজাতি বৃক্ষখণ্ড সংযুক্ত,—খণ্ড কাঠুরিয়ার মুষ্টি বদ্ধও হইল ; সাবধান

সাবধান! কিন্তু প্রতাপ সাবধান-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন না, সাবধানও হইলেন না,—রক্ষাও পাইলেন না।

ঐশ্বর্য্য-মদমত্তা, সম্পদোন্মাদ, সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কার, অভিমান, আত্মম্ভরিতা, ভ্রান্তি, মূঢ়তা প্রতাপকে উন্মাদ, আত্মবিস্মৃত, বিবেকশূন্য, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন, তাহাতে সেই ধ্বনি-শ্রবণকারিণী দিব্য শ্রুতিশক্তি রহিত করিয়া ফেলিল; প্রতাপ কালধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্তরায় একান্নবর্ত্তী। হিন্দুশাস্ত্রের সনাতন বিধান,—ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা—রাজসিংহাসনোপবিষ্ট,—পিতৃব্য তাঁহার কিছু না হইলেও দেবকল্প গুরুজন, পরমপূজনীয়, সর্ব্বদোষক্ষমার্হ বটে; কিন্তু পিতৃব্য বসন্তরায়, কোন একটী কর্ম্মে অপরাধী হওয়ায়, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপ তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

এই সর্ব্বসংহারক, মহাগুরুজন-বধ-জনিত পাপ প্রতাপকে স্বর্গ হইতে নরকে পাতিত করিল! প্রতাপের রাজশ্রীপ্রফুল্ল শিরোমণ্ডলে, আকাশমণ্ডল যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায় পলায়ন করিয়া, মোগলরাজ আকবরের শরণাপন্ন হইলেন; সুতরাং তাঁহার মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত—ভূপতিত হইল না; তিনি পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। এই হইতে প্রতাপের প্রতি রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারও সেই অটল ভক্তি শ্রদ্ধা টলিয়া পড়িল। প্রতাপকে নৃশংস রাক্ষসই জ্ঞান করিতে লাগিল।

শুভাদৃষ্ট দেবপুরুষ আকবর, কচুরায়ের নিকটে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের গৃহছিদ্র,—মহা মহা অভাবাদি অবগত হইলেন; এবং তদনুসারে এইবার যুদ্ধের আয়োজনও করিলেন। "চিরদিন কখনও সমান না যায়" প্রতাপাদিত্যের "জীবন-প্রাহ্নেই" "অপরাহ্ন" সমাগত হইল! আদিত্যদেব, পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেন, ক্রমশঃ নিম্নে নামিতে লাগিলেন;—দেবতায়, সন্ধ্যার ছায়াও পড়িতে লাগিল! তাঁহার পরম বান্ধব,—"ঘরের ঢেঁকি" জলে পড়িয়া মহামারাত্মক, মহাশক্র "কুমীর" হইল।

"দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর" দৈবকল্প, মহানুভব আকবর স্বর্গবাসী হইয়াছেন। রাজকুমার সেলিম, জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন,—ভারতের সর্ব্বময় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়াছেন; এই সময়ে আবার প্রতাপের বিরুদ্ধে মোগল সেনার অভিযান চলিল। এই অভিযানই শেষ অভিযান। এবারও মানসিংহ সেনাপতি হইলেন। অসংখ্য মোগলবাহিনী,—মেদিনী কম্পিত, দিগন্ত শঙ্কিত, জনপদ ত্রাসিত—যশোহর

রাজ্যকে আতঙ্কিত করিয়া, "প্রতাপগড়ের" সিংহদ্বারে আসিয়া ঘোর সিংহনাদ ছাড়িল। এই অভিযান সঙ্গে, প্রতাপের গৃহশত্রু কচুরায়ও উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ভাষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল; গৃহশত্রু কচুরায়ের মন্ত্রণায়, প্রতাপাদিত্য সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন! কালদণ্ড সর্পশিরে পতিত হইল; মানসিংহ জয়লাভ করিলেন।

প্রতাপাদিত্য, পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কোন এক দুর্গমস্থানে সুরক্ষিত দুর্জ্জয় দুর্গে উপস্থিত হইলেন এবং নিরাপদে অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু এই নিরাপদের শীতলকুঞ্জেও আপদের প্রলয়বহ্নির অগ্নিমূর্ত্তি দর্শন দিল; গৃহসন্ধানী কচুরায়ের সন্ধানে অচিরেই প্রতাপ মোগলসেনার হস্তে ধরা পড়িলেন এবং লৌহপিঞ্জরে সংরুদ্ধও হইলেন।

প্রতাপ সংরুদ্ধ অবস্থাতেই দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। বীরচূড়ামণি মোগল-সেনাপতি মানসিংহের ইচ্ছা ছিল,—হিন্দু-বাঙ্গালী-বীরর্ষভ প্রতাপকে জীবিতাবস্থায় ভারত-সম্রাটকে দেখাইবেন, এবং তাঁহার অনিন্দ্য বীরত্ব-কাহিনী,—শুভ-অদৃষ্ট শুভ-পুরুষকার-মিলনসম্ভূত জীবনলীলার কথা-বার্ত্তা শ্রবণ করাইবেন;—বীর, বীরের সম্মান রক্ষা করিবেন; কিন্তু প্রতাপ পথি মধ্যেই পুণ্যধাম পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জীবনলীলার অবসান করিলেন; বঙ্গের পুণ্যশ্লোক পুরুষ পুণ্যলোকে গমন করিলেন।

প্রতাপের প্রথম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাপ, পিতৃবাক্য লঙ্ঘন;—"জীবিতে বাক্য পালনং"—পিতৃ ভক্তির প্রথম সূত্রে—শুভ বাক্যে অবহেলা;—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥" হিন্দুর পরম ধর্ম্মসূত্রও বিস্মৃত হওয়া; দ্বিতীয় রাজদ্রোহিতাচরণ,—ঐহিক পারত্রিক ধর্ম্ম সাধনের,—জীবন্মুক্তি লাভের, শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠবল ও সাধন মুক্তির—জীবনোন্নতির পথপ্রদর্শক, মনুষ্যের সর্ব্বাবস্থায়ই জাতিচ্যুত, সমাজতাড়িত, পিতৃ-মাতৃত্যাগী জনেরও রক্ষাকর্ত্তা, পোষণকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ; তৃতীয়, স্বর্গ হইতেও উচ্চ, বিধাতৃকল্প, পিতৃদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পরমগুরু, পরম বান্ধব, পরম পূজনীয় পিতৃব্যের শিরশ্ছেদন, মনুষ্যত্বের অপঘাত,—আত্মপাত,—নরক-দূতের আমন্ত্রণ,—সাক্ষাৎ—আলিঙ্গন! এই ত্রিদোষাশ্রিত,—স্বেচ্ছাচারী, পরিমুক্ত, ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম-সাধন জনিত, ভবরোগের প্রলয়ঙ্করী আধির,—উপসর্গ,—সান্নিপাতিক-জ্বরপিপাসা নিরন্তরই অকাল মৃত্যুকে আহ্বান করে। এ ক্ষেত্রেও তাহা করিল।

ইন্দ্রিয়ধর্ম্মই পরধর্ম্ম; পরধর্ম্ম নিরন্তরই ভয়াবহ! সুতরাং ত্রিদোষাপন্ন সান্নিপাতিক রোগী ভবরোগের বিকারগ্রস্ত, আর কতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে? অচিরেই লয়কে আশ্রয় করে; বঙ্গের স্বাধীন রাজা প্রতাপাদিত্যও সেই লয়কে আশ্রয় করিলেন। বঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজার রাজত্ব ফুরাইয়া গেল।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্"। কর্ম্মী মাত্রকেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে; যিনি শুভকর্ম্মী তিনি শুভফল,--আত্মোন্নতি,—আরোগ্য, সন্তোষ, শান্তি, এবং অশুভকর্ম্মী—অশুভ, আত্মাবনতি, রোগ, বিক্ষোভ, উদ্বেগ, মর্ম্মদাহ লাভ করিবেন।

প্রবাদ,—মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্য এবং রাজধানীর দূর-সুদূর স্থান একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে। মোগলসেনার ভীষণ অত্যাচার, তদুপরি প্রলয়ঙ্করী মহামারীতে অনেক গৃহস্থ অযুতে অযুতে সর্ব্বস্বশূন্য হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে; তাই অনেক গৃহস্থও লক্ষে লক্ষে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়া যায়; রাজ্যের অনেক অংশ একেবারে জনহীন হইয়া পড়ে। এবং ক্রমে ক্রমে ভীষণ জঙ্গলে,--মহাবনরাজ্যে, --"সুন্দর বনে" পরিণত হয়; হিংস্রজন্তু-কুলেরও আবাসভূমি—একছত্রী সাম্রাজ্য হইয়া উঠে।

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা?
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং,
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত ভুবনমোহিনী মথুরা নগরী এবং রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত জগদ্বন্দিনী কোশল-নগরী আজ কোথায়? হে মোহাচ্ছন্ন মানব! এইটী চিন্তা করিয়া মনকে স্থির কর, এই জগৎ নশ্বর অনিত্য ইহাই অবধারণ কর। মহামায়ার লীলা বিকার মোহ-জনিত—এই ভব-রোগের বিকার—দুরাকাঙ্ক্ষা অন্যায় প্রলোভন ত্যাগী হও, ন্যায়ানুগত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সন্তোষ আশ্রয় কর। অনন্তর সন্তুষ্টচিত্তে ন্যায়বান্ সত্যময় রহিয়া আত্মজ্ঞান সাধনার মহাক্ষেত্রে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মনুষ্যত্বের—গণদেব মূর্ত্তির সাধনায় সিদ্ধ হও; অভেদ জ্ঞানসহ পরার্থ আত্ম-সর্জ্জন বল লাভ কর, এবং কর্ম্মক্ষেত্রের বিশ্বকর্ম্মা, গণনায়কপদে প্রতিষ্ঠিত হও; তোমার মানবজন্ম সফল হউক।

শ্রীজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

"সন্ধ্যা"।

বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল—
রবি ব'স্‌লো পাটে।
রক্ত-রাগে আকাশ ছাওয়া—
দেখ্‌লে আশা টুটে॥
বধূরা সব কলসী কক্ষে
যাচ্ছে গৃহপানে।
'হুয়া হুয়া' রবে শিবা
ডাক্‌ছে গহন বনে॥
'হাম্বারবে' গাভীগণ
ছুট্‌ছে বাড়ীর দিকে।
রাখালেরা গাচ্ছে গান
আপন মনের সুখে॥
'কিচ্‌মিচিয়ে' পাখীরা সব
যাচ্ছে দ্রুত নীড়ে।
'প্রদীপ' হাতে কুলবধূ
ফির্‌ছে ঘরে ঘরে॥
মৃদু-হাস্যে চন্দ্রদেব
উঠ্‌লো নীলাকাশে।
সঙ্গে সঙ্গে শত শত
তারা উঠ্‌লো ভেসে॥
কুমুদিনী ফুল্ল মনে
মিশ্‌লো পতি সনে।
কমলিনী মুদে আঁখি
চাচ্ছে ধরা-পানে॥
আমি শুধু শূন্য মনে
চেয়ে আকাশ পানে!
সংসারের লীলা খেলা
ভাব্‌ছি আপন মনে॥
সন্ধ্যা হ'ল, ছুটে সবাই—
বাড়ীর দিকে গেল।
দেখে শুনে, ক্ষুণ্ণ মনে
বাড়ী যেতে হ'ল॥

শ্রীবিজয়গোপাল বক্সী।

ঠাকুর সদানন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিশীথে-বিল্বমূলে।

"তুই ত ভারি দুষ্ট ছেলে!"

"কেন, আপনার আমি কি করেছি?"

"যে পাতাটায় হাত দিতে যাচ্চি, সেইটাই যে তুই ভেঙ্গে নিচ্চিস্।"

"বাঃ! আপনার যে ঠিক উল্ট কথা দেখ্‌চি, আমিই ত যেটায় হাত দিচ্চি, আপনি সেইটা ভেঙ্গে নিচ্চেন্।"

"আচ্ছা, তুই এ বেলপাতা নিয়ে কি করবি বল্ দেখি?" একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জনৈক ব্রাহ্মণবালককে উক্তরূপ তিরস্কারের পর এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন জ্যোৎস্না ফিন্ ফিন্ করিতেছে; চারিদিক নিস্তব্ধ, জনমানবের একটু-মাত্রও সাড়াশব্দ কোথাও নাই, কেবল কোন কোন বৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক একটা পাখী মাঝে মাঝে ডাকিয়া সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। পথের ধারে বাগানের গাছের পুঞ্জীকৃত ছায়ার মাঝে বোধ হয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বালকের কথোপকথন শব্দ শুনিয়াই কোথাও বা শৃগালাদি সরিয়া যাইতেছে, শুষ্ক পত্রের সড়্ সড়্-শব্দে তাহা বেশ জানা যাইতেছে। কোথাও বা বায়ু-বেগে গাছের পাতা নড়িতেছে, তাহার ছায়া ভূমিতলে পতিত হইয়া যেন কত ভীতিপ্রদ কল্পিত জীবের নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে; নিশাচর পক্ষীরা নিঃশব্দে বৃক্ষে বৃক্ষে উড়িয়া তাহাদের আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু বালকের কোনও দিকেই দৃক্‌পাত নাই, সে নিত্য ভোরে উঠিয়া পূজার জন্য যেমন ফুল বিল্বপত্র তুলিতে যায়, আজও সেইরূপ বাহির হইয়াছে। সে এখনও বুঝিতে পারে নাই যে, অনেক রাত্রি থাকিতেই আজ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পথে কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া একবার মনে মনে ভাবিয়াছিল—বোধহয় ভোর হইতে এখনও বিলম্ব আছে, কিন্তু তাহার পরই বিল্বমূলে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বিল্বপত্র চয়ন করিতে দেখিয়া নিশ্চিন্তমনে সেও বেলপাতা সংগ্রহ করিতে লাগিল। যদিও বৃদ্ধকে দেখিয়া বালক তখন মনে করিয়াছিল

যে, রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, পরন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন তৃতীয়প্রহরও অতীত হয় নাই। জ্যোৎস্না-রাত্রিতে এমন ভ্রম কখন কখন অনেকেরই হয়।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিতে যেমন রূপবান্, তেমনি দিব্যকান্তিবিশিষ্ট। তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রু ও উন্মুক্ত কেশরাশি, তাঁহার কাষায় বস্ত্র, স্কন্ধবিলম্বিত উত্তরীয় তাঁহার সেই দিব্য জ্যোতিঃপুঞ্জকে আরও যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে; তাঁহাকে দেখিলে সহসা ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বাস্তবিক এমন তেজঃপূর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। বালকটী নিতান্তই বালক; সবেমাত্র দ্বাদশবৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, হাতে ফুলের সাজি, গলায় পৈতার গোছা, পরিধানে একখানি লাল চেলি, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ দুইটী সোণার মাকড়ি কাণে দুল্‌দুল্ করিতেছে, মাথার কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ-গুচ্ছ হাওয়ায় ফুর্‌ফুর্ করিয়া উড়িতেছে, ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট দেহকান্তি যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বালকটীর যেমন নাক তেমনি চোক্, মুখ দেখিলে বেশ সাহসী ও বুদ্ধিমান্ বলিয়াও বোধ হয়। দেবাদির পূজা অর্চ্চ-নায় তাহার যে প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহা এই রাত্রে ফুল বিল্বপত্র তুলিবার অনুষ্ঠানেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। যখন সেই ব্রাহ্মণ তাহাকে নমস্কারের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই এই বেলপাতা লইয়া কি কর্‌বি বল্ দেখি?" তখন সে বেশ সাহসের সহিতই বলিল, "কেন, পূজা করিব।" ব্রাহ্মণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কি পূজা করিতে জানিস্?" এইবার সে যেন কি চিন্তা করিয়া বলিল—"না, আমি পূজা করিতে জানি না, তবে আমি গায়ত্রী জানি, আমার দাদারা পূজা করেন।" বোধ হয় বালকটী ভাবিয়াছিল যে, যদি ইনি পূজার মন্ত্র জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে ত বলিতে পারিব না; অথবা এরূপভাবে মিথ্যা কথা বলা বালকের নিশ্চয়ই অভ্যাস ছিল না। ব্রাহ্মণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, গায়ত্রী কি জানিস্ বল্ দেখি?" বালক বোধহয় যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই হইল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন গায়ত্রী মন্ত্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন যেমন তাহার জানা ছিল তেমনি আবৃত্তি করিল; সে বুদ্ধিমান্ ও বিলক্ষণ সাহসী হইলেও এমন পরীক্ষা-বিভ্রাটে কোনও দিনই পতিত হয় নাই, সে কারণ তাহার একটু লজ্জাও হইল। বৃদ্ধ বলিলেন—"গায়ত্রীর উচ্চারণ ত তোর ভাল নয়, তা তুই মন্ত্র-তন্ত্র শিখিস্ না কেন?" বালক যেন লজ্জায় অবনতমস্তক হইয়া বলিল—"এইবার শিখিব।"

বৃদ্ধ তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"তবে এক কায কর্, রোজ এমনি সময়ে একটু রাত্রি থাকিতে এইখানে আসিস্, আমি তোরে সব শিখিয়ে দেব, কিন্তু আমার কথা কারেও বলিস্ নি।" বালক তাহার কথায় স্বীকৃত হইয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার কাণে কাণে আরও কি বলিয়া দিলেন। বিল্বতল নিস্তব্ধ হইল। বালক ইহার পূর্ব্বে সেই ব্রাহ্মণকে আর কোথাও দেখিয়াছিল কি না, যদিও সে তাহা সম্পূর্ণ স্মরণ করিতে পারিল না, তিনি নিতান্ত অপরিচিত হইলেও বিনা বিতর্কে তাঁহাকে আজ হইতেই সে আপনার গুরু, শিক্ষাদাতা বলিয়া স্থির করিয়া লইল ও অতি শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার সকল আদেশ পালন করিতে লাগিল। বালক সে রাত্রি আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে নিজ বাড়ীর দিকে চলিল, বৃদ্ধও ভিন্নপথে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহা এখন হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখন ইংরাজের এত বড় সাধের কলিকাতা-সহর এমন মোহন-শ্রী ধারণ করে নাই। তখন অতিদূর পল্লীগ্রামের অপেক্ষাও কলিকাতার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। কলের জল, গ্যাসের আলো বা ড্রেণ তখন কিছুই ছিল না, বড় বড় নর্দ্দামা পাঁকে ভরা, এঁদো পুকুর, অনেক জায়গায় হোগলা-বনও ছিল ; যেমন মশা তেমনি মাছি, গোলপাতার ও খোলার ঘরই অধিক, পাকা বাড়ী তখন খুব কম ছিল। ট্রাম ত দূরের কথা, তখন এ দেশে রেল গাড়ীরও পত্তন হয় নাই। লোকে হাঁটা পথে, নৌকাযোগে বা গো-শকটে দেশদেশান্তরে গমনাগমন করিত। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে "ছ্যাকড়াগাড়ী" নামে এক বিচিত্র যানের অস্তিত্ব ছিল, এখনও অশীতিপর-বৃদ্ধা পিতামহীর মুখে তাহার বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, সেই সময় কলিকাতার উত্তর প্রান্তে গঙ্গার ধারে "বরাহনগর" একটী অতি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম, তথায় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভদ্র গৃহস্থ ও ধনাঢ্য লোকের বসবাস ছিল।

নবদ্বীপাদির তুল্য না হইলেও বিদ্যালোচনায় বরাহনগর নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিল না। অধ্যাপক রামপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার এবং তৎপুত্র প্রেমচাঁদ বেদান্তবাগীশের চতুষ্পাঠী তখন দেশপ্রসিদ্ধ ছিল। বহুদেশ হইতে অসংখ্য ব্রাহ্মণ-কুমার তাঁহাদের চতুষ্পাঠীতে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আগমন করিত। বরাহনগরের চতুষ্পাঠী বলিলে, প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চতুষ্পাঠী বুঝাইত। এতদ্ব্যতীত তাঁতিপাড়ার "বুড়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠীরও" বেশ নাম ছিল। তবে পূর্ব্বোক্ত চতুষ্পাঠীর অধিক প্রসিদ্ধির কারণ—তাহার অধ্যাপক মহাশয় বংশপরম্পরায় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার নানা শাস্ত্রে যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি একজন উচ্চ-শ্রেণীর কথক বলিয়াও তাঁহার সম্মান ছিল। তাঁহার পিতা গৌরীপ্রসাদ তর্কালঙ্কার, তিনিও কথকতা করিতেন; রামপ্রসাদ তাঁহার পিতার নিকট হইতেই কথকতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। গৌরীপ্রসাদের পিতা রামমাণিক্য বিদ্যাসাগর যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি উচ্চ অঙ্গের সিদ্ধ-সাধক বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁতিপাড়ার যে বুড়াভট্টাচার্য্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই শতাধিক-বর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইঁহারই মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। পুঁটিয়ার মহারাজ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সন্মান করিতেন ও বৃত্তি প্রদান করিতেন। ইংরাজী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন। এই পণ্ডিত এবং সিদ্ধ-সাধকের বংশের চতুষ্পাঠী যে চির প্রসিদ্ধ থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রেমচাঁদ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মধ্যম সহোদরও সুপণ্ডিত ছিলেন, তবে তিনি অধ্যাপনাদি কোন কার্য্য করিতেন না, অথবা কোনও সাংসারিক কার্য্যেও তিনি মনোযোগ প্রদান করিতেন না, সর্ব্বদা প্রতিবাসী ধনাঢ্য বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আমোদ-প্রমোদে দিন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীগণ কেহই অধিক দিন জীবন ধারণ করেন নাই, সেই কারণ তাঁহাদের পিতামহী এক সময় তারকেশ্বরে যাইয়া বাবার নিকট মানসিক করেন যে, "আমার রামপ্রসাদের এবার যে পুত্র সন্তান হইবে, তাহাকে তোমার "সন্ন্যাস" করিয়া দিব। ঠাকুর, সে যেন চিরজীবী হয়!" বৃদ্ধা কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করিয়া ঠাকুরের চরণামৃত অতি ভক্তিসহকারে পুত্রবধূকে পান করাইয়া দিলেন। যথাসময়ে পুত্রবধূ একটী অতি সুন্দর নবকুমার প্রসব করিলে, বৃদ্ধা তাহার নাম রাখিলেন "ঠাকুর-

দাস"। শিশু ক্রমে অতি যত্নে ও আদরে লালিত-পালিত হইতে লাগিল, ক্রমে মুখে কথা ফুটিল, কিন্তু সে এক অস্বাভাবিক শব্দ! সকলেই প্রথমে "মা মা" অথবা "বা বা" বলে, কিন্তু এ শিশুর মুখে প্রথমেই বাহির হইল "বম্ বম্"। আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসী শিশুর মুখে এই "বম্ বম্" শব্দ শুনিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল; সেই বুড়াভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ক্রমে এই কথা শুনিলেন ও শিশুকে দেখিতে আসিলেন। শিশুর মুখে সেই বিচিত্র শব্দ শুনিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইলেন ও "দীর্ঘজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই ভাবে আদরে আদরে শিশু ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, বিদ্যারম্ভের কাল উপস্থিত হইলে, যথাসময়ে তাহার বিদ্যারম্ভ করান হইল, বালক নিকটস্থ এক পাঠশালায় বর্ণমালা লিখিতে আরম্ভ করিল। এই সময়েই তাহার পিতার লোকান্তর ঘটে, তাহার সাধ্বী মাতাও অচিরকালমধ্যে সেই পথাবলম্বিনী হন। অধ্যাপক বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও তাঁহার মধ্যম সহোদরেরই পিতৃ মাতৃ বিয়োগ ঘটিল, বালক ঠাকুরদাস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের স্নেহে ও পিতামহীর ঐকান্তিক আদর যত্নে তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। বৃদ্ধা এই বয়সে একমাত্র পুত্র ও একমাত্র সুশীলা পুত্রবধূর বিয়োগজনিত ভীষণ শোকাবেগ কেবল মাত্র এই বালক পৌত্রটীর মুখের দিকেই চাহিয়া ভুলিতে লাগিলেন। বালক ক্রমে অষ্টম বর্ষে উপনীত হইল, জ্যেষ্ঠ বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাহার যথারীতি উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করিলেন, সন্ধ্যা গায়ত্রী প্রভৃতি নিত্য-কর্ম্ম করাইতে লাগিলেন, কিন্তু লেখা পড়ায় তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। পিতামহীর অনুরোধে তাহাকে শাসন করা দূরে থাকুক, কেহ একটী কথাও কোন দিন বলিতে পারিত না; সুতরাং খেলা-ধূলাতেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদিগের সহিত মিলিয়া এ পাড়া ও পাড়া ক্রমে এ গ্রাম সে গ্রাম করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রথম প্রথম এক বেলা হয় ত বাড়ীতেই আসিল না। "কোথায় গেল, কোথায় গেল" বলিয়া চতুষ্পাঠীর ছাত্রবর্গ চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল; পিতামহী নিজেই কাতর ভাবে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন; তাহার পর যখন তাহাকে বাড়ীতে আনা হইল, বেদান্তবাগীশ মহাশয় শাসন করিতে যাইলেন, পিতামহী তাহাতে বাধা দিলেন। তাহার পরিবর্ত্তে কত আদর যত্ন করিয়া তাহাকে স্নান ও আহারাদি করাইয়া দিলেন। সেই কারণ বেদান্তবাগীশ মহাশয় একদিন বলিলেন "ঠাকুর মা, তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে

দেশোর মাথাটা খেলে।" ঠাকুর দাসকে ছেলেবেলার সকলে দাসু বা দেশো বলিয়া ডাকিতেন। বৃদ্ধা বলিলেন "দেখ্ প্রেমচাঁদ, কেবল এর মুখ চেয়েই আমি উন্মাদ হইনি, নতুবা আমার রামপ্রসাদ যে দিন থেকে আমায় ছেড়ে গেছে, আমার ঘরের লক্ষ্মী বৌমা যেদিন চলে গেছে, সেই দিন থেকেই আমাতে আমি নেই, কেবল তাদের এই গুঁড়োটার মুখ দেখে সে সব ভুলে আছি; কি করবি বল্—তোদের একটী মাত্র ছোট ভাই, ও মা বাপের যত্ন কি তা জান্‌লে না; যদি লেখা পড়া এখন নাই শেখে, এখন একটু খেলিয়ে ধুলিয়ে বেড়ায় বেড়াক্। বড় হলে যখন বুঝ্‌তে পার্‌বে, তখন কি আর অমনি থাকবে? ও আমার ঠাকুরের দাস, ওর বুদ্ধি শুদ্ধি ভালই হবে, তখন দেখিস্। এই বলিয়া বৃদ্ধা তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়ন বস্ত্রাঞ্চলে মুছিলেন। পণ্ডিত প্রেমচাঁদ পিতামহীর কথা শুনিয়া আর কোনও কথা বলিলেন না। সেই অবধি ঠাকুরদাস জ্যেষ্ঠের শাসন হইতে একেবারে অব্যাহতি পাইল। বালক লেখা পড়া না শিখিলেও, সৌভাগ্যক্রমে কোন দুষ্ট প্রবৃত্তি তাহাকে আশ্রয় করে নাই। উপনয়নের পর হইতেই সে নিয়মিত স্নান সন্ধ্যাদি যথারীতি পালন করিত, ঠাকুরপূজার জন্য নিত্য পুষ্পাদি সংগ্রহ করিত, দেবতা ব্রাহ্মণে তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, তবে চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্রদিগের অধ্যাপনাকালে সে কখনই উপস্থিত হইত না, সে পথে সে কোনদিনই পাদ-চারণা করিত না, সে সময় গ্রাম গ্রামান্তরে সে ঠাকুরদেবতা দেখিয়া বেড়াইত; গঙ্গার ঘাটে পঞ্চবটীমূলে "সিদ্ধবাবার" নিকট বসিয়া থাকিত, কখনও বা "ভৈরবীমার" নিকট বসিয়া তাঁহার জীবন-কাহিনী শুনিত, আবার কখন কখন তাহার সেই দশ বার বৎসর বয়সেই পাড়ার সঙ্গী বালকদিগের সহিত মিলিয়া কালীঘাট, খড়দহ ও অন্যান্য দেবতার মন্দির ও তীর্থাদি দর্শন করিতে চলিয়া যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন কলিকাতা ও তৎসমীপবর্ত্তী গ্রামের পথ ঘাট তেমন ভাল ছিল না, রেলগাড়ীও তখন হয় নাই, মোট কথা যাতা-য়াতের তেমন সুবিধা ছিল না—বালক সে বিষয়ে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া পদব্রজেই সকল স্থানে যাতায়াত করিত, কাহারও বাধা আপত্তি সে গ্রাহ্য করিত না। পিতামহী কত বুঝাইতেন, কত প্রলোভন দেখাইতেন, কোন কথাই তাহার মনে লাগিত না। তবে কোনও স্থানে দুই একদিন অধিক বিলম্ব হইবে, ইহা পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারিলে ঠাকুরমাকে সে কথা বলিয়া যাইত ও তাঁহার নিকট হইতে কিছু কিছু খরচপত্রও চাহিয়া

লইত। কখনও বা বৃদ্ধা স্নেহবশতঃ তাহার সঙ্গেই সে সকল স্থানে গমন করিতেন।

ঠাকুরদাস এখন সবেমাত্র দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, এই সময়েই পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত বিল্বমূলস্থিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত তাহার পরিচয় হয়। সে নিত্য পিতামহীর নিকটেই শয়ন করিত, প্রত্যহ গভীর নিশায় সে যখন ফুলের সাজি লইয়া বাহির হইত, তখন সকলেই প্রায় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকিত। কেহই জানিতে পারিত না, বালক কোথায় যায় বা কি করে। যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত, তখন কেহ কেহ সবেমাত্র উঠিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের ক্রিয়া আরম্ভ করিতেন। শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা বা বসন্ত নাই, তাহার নিত্যই সমভাব। এখন হইতে তাহার এইমাত্র পরিবর্ত্তন হইল যে, সে আর দুই এক দিনের জন্য কোথাও অতিবাহিত করে না। যেখানেই যাক্ বা সমস্ত দিন কেহ তাহাকে দেখিতে না পাইলেও সন্ধ্যার পর সে ঠাকুরমার নিকট উপস্থিত হইবেই। বেদান্তবাগীশ মহাশয় বা তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা 'শিরোমণি মহাশয়' তাহাকে অল্পই দেখিতে পাইতেন, তবে পিতামহীর নিকটেই প্রত্যহ তাহার সংবাদ লইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন। ভ্রাতৃ-জায়ারা পিতৃ-মাতৃহীন কনিষ্ঠ দেবরকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, তাঁহাদের দুইজনের কেহ কোনও দিন তাহাকে আহার করাইয়া না দিলে সেদিন তাহার আদৌ তৃপ্তি হইত না। এ অভ্যাস তাহার বহু দিন ছিল, বিশেষ বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি তাহাকে এতদূর যত্ন করিতেন যে, মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত বালক কোনদিন মাতার অভাব অনুভব করিতে পারে নাই। সুতরাং তাহার বাল্য-জীবন মনের আনন্দেই কাটিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হর্ষ ও বিষাদ।

দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর দিন, সে দিনও আবার চলিয়া যায়, তাহাতেই মাস, ক্রমে বৎসররূপে অতিবাহিত হইয়া যায়; কালের এই চিরন্তন রীতি সমভাবেই প্রচলিত,—আজ যে শিশু, দু'দিন পরে সে বালক বা

কিশোর, আবার কাল-প্রবাহে তাহাকে যৌবনের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া দিবে, সময়ে তাহারও পরিবর্ত্তন হইবে, সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। চির-পুরাতন অতি বৃদ্ধকাল নিত্য নবীন বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে, কেহ তাহা চিন্তার মধ্যে ক্ষণমাত্রও স্থায়ী রাখিতে পারে না। সেই গভীর নিশীথে বিল্বমূলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত প্রথম পরিচয় ও কথোপকথনের পর সুদীর্ঘ তিনটী বৎসর বা সহস্রাধিক দিবস কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ততগুলি গভীর নিশাও অতীতের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে— বালক ঠাকুরদাসও সেই অতীত দিবস ও রজনীগুলির সহযাত্রী হইয়া আজ তাহার জীবনের ষোড়শ-বর্ষে উপনীত হইয়াছে। নীতিশাস্ত্রে জীবন-কালের এই সন্ধি-ক্ষণ যৌবনের পূর্ব্বাভাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সময় হইতে পুত্র পিতার নিকটেও মিত্রবৎ আচরণ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য বলিয়া নীতিজ্ঞ-দিগের স্থির অভিমত শুনিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক, বালক ঠাকুরদাসের জীবন-নাটকে এই তিনটী বৎসরের মধ্যে একটী অঙ্ক ও কয়েকটী গর্ভাঙ্কের নিয়মিত অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষে সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্ম এস্থলে সংক্ষেপে তাহার দুই-একটীর উল্লেখ করিতেছি।

পুরাতন চিরদিনই নূতন আনিবার পক্ষপাতী, তাহা হইলেই তাহার যেন কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়; নূতনের হস্তে তাহার কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সে অবসর লইতে পারে, এই চিরাচরিত প্রথা পরিবর্ত্তন করে কাহার সাধ্য? বৃদ্ধ পিতামহী জ্যেষ্ঠ পৌত্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন,—"প্রেম-চাঁদ! আমি কবে আছি কবে নাই, আমার ঠাকুরদাসের বৌএর মুখ দেখিয়া যাইতে বড় সাধ, সে সাধ তুই মিটাইয়া দে।" প্রথমে বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাহাতে অনেক আপত্তি তুলিয়াছিলেন, পরে পূজনীয়া পিতামহীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি অনন্যোপায় হইয়া ভ্রাতার বিবাহ দিলেন; নূতন বধূ গৃহে আসিল, তাঁহার স্ত্রী বরণ করিয়া কনিষ্ঠা দেবর-জায়াকে ক্রোড়ে লইলেন। বৃদ্ধা আজ আনন্দে বিভোর, কিন্তু সে প্রগাঢ় আনন্দের মধ্যেও অলক্ষ্যে তাঁহার চক্ষুপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল, একবার চীৎকার করিয়া বলিয়াও ফেলিলেন—"ওরে রামপ্রসাদ আজ যে তোর বড় আদরের ঠাকুরদাসের বৌ এসেছে, বাপ্ রে তুই আজ কোথায় রে, তোর বিহনে আর যে আমি"— "বড়বৌ তাড়াতাড়ি কনেবৌকে দিদিশাশুড়ীর ক্রোড়ে দিয়া বক্ষাঞ্চলে তাঁহার

নয়ন মুখ মুছাইয়া দিলেন। বৃদ্ধা সজল নয়নে কনেবৌয়ের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন; ইতিমধ্যে মেজবৌ (শিরোমণি মহাশয়ের গৃহিণী) কনিষ্ঠ দেবরকে ধরিয়া আনিয়া বৃদ্ধার ক্রোড়ে বসাইয়া দিলেন, বৃদ্ধা উভয়কে ক্রোড়ে লইয়া বস্তুতঃই তখন আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

কালস্রোতে বিবাহ-উৎসবের সে আনন্দ-কোলাহল ক্রমে মন্দীভূত হইয়া গেল, আবার সংসারের একটানা প্রবাহে দিনরাত কাটিতে লাগিল। বৃদ্ধার সকল সাধ এখন মিটিয়াছে; এ বৃদ্ধ বয়সে যে জন্য তাঁহার জীবন ধারণ, তাহা ত পূর্ণ হইয়াছে,—তাঁহার ঠাকুরদাসের নূতন সংসারের পত্তন হইয়াছে, আর তাঁহার সংসার-মায়ার প্রয়োজন কি? তিনি যেন ভগবানের নিকট এখন যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

পৌষমাস গিয়া সবেমাত্র মাঘমাস পড়িয়াছে, এ সময় বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই একটু সুখের সময়, সকল ঘরেই ধান চাল গোলাজাৎ হইয়াছে, বিশেষ কয়েক বৎসর অজন্মার পর এবার ফসল আঠার আনা জন্মিয়াছে—সকলেরই আনন্দ, সকলেরই এবার সচ্ছল অবস্থা। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পিতৃশিষ্য বেহালা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ হালদার মহাশয়ের নূতন জমীদারী হইতে যথেষ্ট মুনফা হইয়াছে, সেই কারণ তাঁহার তীর্থদর্শন করিবার প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় গুরুপুত্র বেদান্তবাগীশের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আজ তিনি গুরুপাটে আসিয়াছেন। প্রবীণ হরগোবিন্দ প্রথমে গুরুমাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গুরুপুত্রকে যথোচিত অভিবাদন করিলেন ও তাঁহার মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা হালদারমহাশয়ের এই সদিচ্ছার অনুমোদন করিলেন ও বৃদ্ধা তাঁহার সহিত যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ভক্ত হরগোবিন্দ তাহা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইয়া তখনই যাইবার দিন স্থির করিতে বলিলেন। আগামী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা হইবে স্থির হইয়া গেল। যথাসময়ে বরাহনগরের ঘাট হইতে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া সকলে নৌকা-যোগে তীর্থ-যাত্রায় বাহির হইলেন। বৃদ্ধা পিতামহীর সঙ্গে শিরোমণি মহাশয়ও চলিলেন। তাঁহারা নানাস্থানে তীর্থ করিয়া ফিরিবার পথে পুনরায় কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেরই ইচ্ছা, এখানে কিছুদিন তাঁহারা বাস করিবেন। নিত্য গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, বিশালাক্ষী ও কালভৈরব প্রভৃতি দর্শনে তাঁহারা আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ কাশীর সে সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত, বর্ত্তমান সময়ের মত কাশী তখন জনাকীর্ণ

সহরে পরিণত হয় নাই, প্রকৃতই তপোবন-সদৃশ সিদ্ধ সাধকগণ-সেবিত পুণ্য-তীর্থ কাশীধাম মর্ত্ত্যে কৈলাসপুরীই বলিতে হইবে। পুণ্যবতী বৃদ্ধা পিতামহী এমন স্থানে আসিয়া জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, নিত্য বিশ্বনাথের চরণে কায়মনোবাক্যে তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এক দিবস কি জানি তাঁহার কি মনে হইল, তিনি ভাবিলেন আর কেন? সময় ত সন্নিকট হইয়াছে! মধ্যম পৌত্র শিরোমণি মহাশয় সঙ্গেই ছিলেন, তাঁহাকে তখনই ডাকিয়া বলিলেন—"ঈশেন, আজ আমার শেষ দিন, সকলকে সত্বর আহারাদি সারিয়া লইতে বল্—আর তুই আমার সঙ্গে চল্, একবার বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া আসি। আর কালবিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধা পদব্রজে বহির্গত হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে শিরোমণি মহাশয় ও হরগোবিন্দ বাবু যাইলেন। প্রথমে গঙ্গাস্নান করিয়া লইলেন, তাহার পর বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাদি সমস্ত দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া চিরপবিত্র মণিকর্ণিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেই বৃদ্ধাকে যেন সহসা ভিন্নরূপা বলিয়া বোধ হইল, সে শিথিল দেহ গোলমাংস যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া কেমন এক যৌবন প্রভায় তাঁহার শরীর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, দেহ হইতে তখন এক প্রকার দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। তিনি আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন। অন্যূন এক ঘণ্টা-কাল এই ভাবে অতীত হইলে, তিনি শিরোমণি মহাশয়ের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, এই স্থানেই আর দুই খানা কুশাসন পাতিয়া দাও, আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, আমি একটু শয়ন করিব। তাঁহার ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া স্নানার্থী দুই একজন ক্রমে তথায় দাঁড়াইয়া গেল, কেহ কেহ পুষ্পচন্দনাদি সহযোগে তাঁহার চরণ পূজা করিতে লাগিল। ক্রমে সূর্য্যদেব গগনের মধ্যদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে, কোথা হইতে এক সংকীর্ত্তনের দল আসিয়া খোল করতাল সহযোগে উচ্চরোলে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। হরগোবিন্দ বাবু ও শিরোমণি মহাশয় তখন সেই পূজ্যপাদ দেবীর চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া কেবল অশ্রুধারা দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। সময় পূর্ণ হইল—দেবী সকলের অলক্ষ্যে কোথায় অন্তর্হিতা হইলেন তাঁহার শূন্য দেহ-মন্দিরটী মাত্র পবিত্র মণিকর্ণিকাতটে শেষ কার্য্যের জন্য পড়িয়া রহিল।

যথাসময়ে তাঁহার সংস্কার করিয়া সকলে বাসায় ফিরিলেন। অনন্তর কাশীধামেই তাঁহার আদ্যকৃত্য সমাপন করিয়া যখন তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত

হইলেন, তখন সকলেই তাঁহার অসাধারণ শেষ-লীলার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও সমস্ত পরিবার সাময়িক শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন; কিন্তু ঠাকুরদাসের কাতরতা আর বলিবার নহে। সে ইতি-পূর্ব্বে কখন কল্পনাও করে নাই যে, তাহার ঠাকুরমাতা তাহাকে এমন ভাবে ছাড়িয়া যাইবেন। পিতামাতার শোক তাহাকে অনুভব করিতে হয় নাই, আজ পিতামহী তাহাকে যে ভাবে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন, তাহার বিন্দু-বিসর্গও যদি সে পূর্ব্বে জানিতে পারিত, তাহা হইলে সে কখনই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিত না—পিতামহীর সঙ্গে সেও তীর্থদর্শনে বহির্গত হইত। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া তাহাকে বিশেষ যত্ন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, তাহাকে স্নান আহার করাইলেন, কিন্তু সে কি বুঝে, সে থাকিয়া থাকিয়া কাতর হইয়া উঠে।

পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুরদাস কোনদিন লেখাপড়া করিত না, জ্যেষ্ঠ কোন-দিন তাহাকে আপনার সম্মুখে আসিতে দেখে নাই, পিতামহীর অনুরোধে সে কোনদিন তিরস্কৃতও হয় নাই, কিন্তু আজ তাহার এই ভাব দেখিয়া জ্যেষ্ঠের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল, তিনি স্বয়ং ঠাকুরদাসকে কত বুঝাইলেন, কত যত্ন করিলেন। ঠাকুরদাস ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াদিগের ঐকান্তিক যত্নে পিতামহীর সে ভীষণ শোক যেন ক্রমে ভুলিতে লাগিল, আবার পূর্ব্বের ন্যায় নানা স্থানে ঠাকুর দেবতা সাধুসজ্জন দর্শন করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা।

যশোহর সাহিত্য সম্মিলন।

গত ৭ই ও ৮ই এপ্রিল—শুক্রবার ও শনিবার মধুসূদন ও দীনবন্ধুর জন্ম-ভূমি, সীতারামের কীর্ত্তিস্থল যশোহরে নবম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। হিন্দুপত্রিকা সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত বাচস্পতি বাহাদুর এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ পি এইচ্ ডি মহাশয় সাধারণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরাবর যেমন সম্মিলনকে চারিভাগে বিভক্ত করা হয়, এবারও তাহা করা হইয়াছিল। ফলে সাহিত্য-শাখায় সতীশচন্দ্র, বিজ্ঞান-শাখায় প্রমথনাথ, দর্শন-শাখায় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ ও ইতিহাস-শাখায় প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নাটোরের মহারাজ, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, কাশিম বাজারের মহা-রাজ প্রভৃতি সভায় যোগদান করিবেন বলিয়া সংবাদ-পত্রে ঘোষণা করা হইয়াছিল, কিন্তু সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, রাজা-রাজড়ার নাম-গন্ধও নাই।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসুমতী সম্পা-দক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ইঁহারা দুই জন পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু পরে আবার ইঁহাদের নিমন্ত্রণ পত্র প্রত্যাহার করা হইয়াছিল।

আমরা যশোহরে গিয়াছিলাম, নিমন্ত্রণ পত্রও পাইয়াছিলাম। রায় যদুনাথ আমাদের যত্নের কোন ত্রুটী করেন নাই, তবে গত বৎসর বর্দ্ধমানাধিপ যেমন প্রত্যেক প্রতিনিধির নিকট যাইয়া তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধার বিষয় অন্বেষণ করিয়াছিলেন, রায় বাহাদুর তেমন করেন নাই।

সুকবি শ্রীমতী মানকুমারী বসু যশোহরে গিয়াছিলেন, তাঁহার একটী কবিতাও সভায় পঠিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি স্বয়ং সভায় উপস্থিত হন নাই। বোধ হয় নায়ক ও বসুমতীর লেখার ফলে!

অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এক পক্ষে ধরিতে গেলে কর্ত্তৃত্ব করিয়া-ছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থায় অনেক প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই এবং অনেক বিদেশী সাহিত্যিক মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়াও আসিয়াছিলেন।

প্রথম দিন সভার অধিবেশনে স্থানীয় সেসন্ জজ্ সভাপতি নির্ব্বাচন করিলে রায় যদুনাথ ও ডাঃ সতীশচন্দ্রের বক্তৃতাতেই সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। কারণ, বেলা ১২টা স্থলে ৩ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। বাঙ্গালী সময়ের মূল্য বুঝে কি না ?

দ্বিতীয় দিন বিচারপতি সারদাচরণ ও ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ সভাস্থল আলোকিত করিয়াছিলেন। তবে সাহিত্য-সভায় ব্যোমকেশের ইংরেজী পোষাকের পরিবর্ত্তে ধুতি চাদর পরিধানে দেখিলে সুখী হইতাম।

যেমন চলন সই প্রস্তাব, উপপ্রস্তাবাদি গৃহীত, অনুমোদিত ও সমর্থিত হয়, যশোহরে তদপেক্ষা নূতন কিছুই হয় নাই।

এই অবসরে রায় যদুনাথ, বিদ্যাভূষণ রাজেন্দ্রনাথ, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি বেশ একটু চাল চালিয়া লইয়াছেন।

সভাপতির অভিভাষণে নূতন কাযের কথা কিছুই নাই। স্থানে স্থানে অপরিমার্জ্জনীয় ভ্রমপ্রমাদ যথেষ্টই আছে। সহযোগী বসুমতী সেগুলি বেশ খুঁটি নাটি করিয়া দেখাইয়াছেন। তাই আমরা তাহাতে বিরত রহিলাম।

এবার যশোহরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও সভাপতি চতুষ্টয় ভিন্ন অন্য কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক গমন করেন নাই। যশোহর-বাসীর দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে।

আগামী বর্ষে বাঁকীপুরে দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হইয়াছে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বাঁকীপুরে অনুষ্ঠিত হইলে কেমন শোভনীয় হইবে, তাহা সুধীবৃন্দের বিচার্য্য।

মোটের উপর যশোহর সাহিত্য-সম্মিলন "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"তে পরিণত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তবে রায় যদুনাথের ক্লেশ ও ধৈর্য্য প্রশংসনীয়। তিনি নানা বিপত্তির সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া নিদ্রিত যশোহরকে আবার জাগ্রত করায় যশোহর বাসীর ধন্যবাদার্হ।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ঋণ-শোধ।

সেদিন প্রভাতে ছোট চালাটীতে বসিয়া রহমত আলী তামাক টানিতে টানিতে গো-সেবারত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হাঁরে করিম! আমাদের পশ্চিমজোতের খড়গুল কেটে আন্‌লে হয় না? করিম জাবনা মাখিতে মাখিতে বলিল, সে আর কেটে এনে কি হবে, গরু ছেড়ে খাইয়ে দিলেই হবে। রহমত কিছু ভগ্ন স্বরে বলিল, "তাইতো রে তাতে কি হবে। করিম বলিল, একমুটোও না বাবাজী! রহমত আপন মনে তামাক টানিতে লাগিল। করিম বলদ দুইটি ও গাভীটীকে যথাস্থানে বাঁধিয়া বৎসটিকে একপাশে বাঁধিল; তারপর পিতার পাশে একটা খড়ের বিড়া টানিয়া নিয়া বসিল এবং রহমতের হাত হইতে হুকাটা লইয়া তাহাতে একটা টান দিয়া বলিল, বাবাজি, বছর কাটবে কিসে, কুড়ি বিঘে জমীর ধান একমুটোও ঘরে ঢুকিল না, খাবো কি? রহমত একটা মোটা রকমের নিশ্বাস টানিয়া বলিল, খোদা জীব দিয়েছে আহার দিবে, তার জন্য ভাবি না, তবে জমীদার বাড়ী হইতে দুইদিন পেয়াদা আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

করিম হুকাটা পিতাকে দিয়া বলিল, তাইতো, কি হবে! রহমত বলিল, হবে আর কি, খোদা যা করে! সহসা পিতাপুত্রের কথায় বাধা পড়িল, দুইজন পাইক মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা চৌদ্দপোয়া মাপের লাঠি ঘাড়ে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং একজন রহমতকে সম্বোধন করিয়া কহিল "সেখের পো, নায়েব মহাশয় ডাকছে! রহমত ভীতভাবে বলিল "মামু, কাল সকালে যা পারি, নিয়ে তেঁনার সাথে দেখা কর্ব্বো বলো।

পাইক বলিল, তা আমি জানি না তোমাদের বাপবেটাকে নিয়ে যাবার কথা। রহমত হতাশ ভাবে পুত্রের দিকে চাহিল। করিম বলিল, তা চল না বাবাজি, নায়েব মহাশয়কে বুঝিয়ে বলে দুদিনের সময় নেব। রহমত নায়েব মহাশয়কে বেশ চিনিত, তথাপি ভয়ে ভয়ে কাছারীর দিকে চলিল। গোপীনাথপুর নামক গ্রামখানি কপোতাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত, সেই গ্রামের ঠিক নদীর তীরে রহমত আলীর বাস, বাসগৃহ খানি ক্ষুদ্র সাদা সিধা রকমের। দুইখানি খড়ের ঘর, একখানি রাঁধিবার ক্ষুদ্র চালা, একপাশে একটি গোশালা, উঠানে একটা বৃহৎ তেঁতুল গাছ, পরিজনের মধ্যে তাহার স্ত্রী ও ষোড়শবর্ষীয় পুত্র

করিম। গৃহস্থালটী লইয়া রহমত বেশ আনন্দের সহিত কাল কাটাইত, কিন্তু গত বৎসর হইতে তাহার সময় মন্দ পড়িয়াছে, বিগত ভাদ্রে কপোতাক্ষীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহার সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে,রহমতের বুক দমিয়া গেল, বুঝিল এবার আর রক্ষা নাই এ খোদার মার! বাস্তবিকই বুঝি রহমত এবার খোদার অভিশাপে পড়িল।

রহমতের বাড়ীর অনতিদূরেই কাছারী বাড়ী। রহমত যখন কাছারীতে উপস্থিত হইল, তখন নায়েব মহাশয় একখানি জলচৌকিতে বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন। নায়েব মহাশয়ের দেহটী বেশ স্থূল,উদরের পরিমাণটা দেহের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরু, বর্ণ ঈষৎ শ্যাম, কণ্ঠদেশে তুলসীর মালা, নাম শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র ঘোষ, জাতিতে সদ্‌গোপ। ঘোষ মহাশয়ের বিদ্যা শিক্ষা কোথায় কতদূর হইয়াছিল, সে সন্ধান কেহ রাখে না; তবে তিনি যে খাজনা আদায় ও প্রজা-শাসন করিতে সিদ্ধহস্ত, এ কথা সকলেই স্বীকার করিত।

তাঁহার প্রবল প্রতাপ, সকলে বলিত যে তাঁহার প্রতাপে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়! রহমত কাঁপিতে কাঁপিতে এহেন প্রবলপ্রতাপান্বিত নায়েব মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং ভূমিস্পর্শ করিয়া এক সুদীর্ঘ সেলাম করিল। নায়েব মহাশয় তাহার দিকে একবার বক্রদৃষ্টি করিলেন মাত্র, রহমত পুত্রের সহিত উঠানের একপার্শ্বে বসিল। মুখ প্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ হইলে ভৃত্য তামাক দিয়া গেল, নায়েব মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন,রহমত ব্যাপারখানা কি, খাজনা এনেছিস্! রহমত দুই একবার ঢোক গিলিয়া বলিল, হুজুর! আপনি গরীবের মা বাপ, যদি মেহেরবাণী করে এ কিস্তিটা রেহাই দেন, তবে আসছে কিস্তিতে—বাধা দিয়া নায়েব মহাশয় বলিলেন—আমার তো বাবার ধন নয় যে রেহাই দিব, ও সব কথা থাক্, আজই খাজনা চাই! ওরে নবা, আজ খাজনা আদায় করে বাপ বেটাকে ছেড়ে দিস্! রহমত কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—হুজুর আপনি মা বাপ, আপনি এরূপ জুলুম করলে—তবে রে বেটা নেড়ে জুলুম,বলিয়া নায়েব মহাশয় সশব্দে চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন—জুলুম কি রে, তোকে খুন করবো, ওরে, এদের বাপ বেটাকে ৫০।৫০ জুতা লাগাও!

এদিকে নায়েব মহাশয় যখন পিতাপুত্রকে শিক্ষা দিতেছিলেন, তখন গ্রামবাসীরা সভয়ে দেখিল, রহমতের গৃহ হইতে অগ্নির করাল জিহ্বা উঠিয়া

মধ্যাহ্ন গগন আচ্ছন্ন করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক সেখানে সমবেত হইল, কিন্তু কি জানি কাহার ইঙ্গিতে সে অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা হইল না, রহমতের স্ত্রী গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারে নাই, সে জীয়ন্তে দগ্ধ হইল, দেখিতে দেখিতে অগ্নিরও তেজ কমিয়া আসিল, গৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। অপরাহ্নে রহমত যখন পুত্রকে লইয়া গৃহে ফিরিল, তখন করিম অচৈতন্য, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত! রহমত পুত্রের অচেতন দেহ বক্ষে লইয়া ভস্মস্তূপের নিকট দাঁড়াইল এবং চতুর্দ্দিকে একবার দেখিল, বড় দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সে কাঁদিল না, সে তখন পুত্রকে মাটিতে রাখিয়া ডাক্তার আনিতে চলিল।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার আসিলেন—করিমের অবস্থা দেখিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। তাহার পর রহমতের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া পুলিশে সংবাদ দিতে বলিলেন। রহমত জানিত—তাহার এ কার্য্যে পুলিশে সংবাদ দেওয়া বৃথা, পুলিশ যে নায়েবের দক্ষিণ হস্ত, তাই সে ডাক্তারের কথায় একবার ঊর্দ্ধে চাহিল, বুঝি পৃথিবীর উপর যে আদালত,—যেখানে রাজা প্রজায় ভেদ নাই, নায়েব রহমত উভয়েই সমান, সেই আদালতে প্রাণের অব্যক্ত কাতরতা জানাইয়া সে বিচারপ্রার্থী হইল। কিন্তু সে উচ্চ আদালতে দরিদ্রের এ অভিযোগ পৌঁছিবে কি? যথারীতি চিকিৎসা চলিল,—করিমের আর চেতনা হইল না, ডাক্তার আশা ত্যাগ করিলেন। তৎপরদিবস রাত্রে করিমের একটু জ্ঞান হইল, একবার অতি কষ্টে সে বলিল, বাবাজি চড় মেরেছে এর শোধ চাই; ইহার পর তাহার বাক্‌শক্তি চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইল, তবুও রহমত কাঁদিল না, তাহার কর্ণে তখন পুত্রের সেই শেষ উক্তি বাজিতেছিল—এর শোধ চাই, রহমতও মৃত পুত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—এর শোধ চাই। তাহার বিকৃত কণ্ঠধ্বনি ভিত্তিগাত্রে প্রহত হইয়া প্রতিধ্বনি দিল—চাই। রহমত এখন—এখন সংসার পথে একা পড়িল, তাহার সুখের গৃহ শ্মশান হইল। সে এখন আর কাহারও সহিত কথা কহে না, নীরব ভস্ম স্তূপের উপর বসিয়া কেবল ভাবে। নীরব মধ্যাহ্নে স্তব্ধ সন্ধ্যায় সে নদীতীরে একা বসিয়া থাকিত, বসিয়া বসিয়া দেখিত জল ত যেমন চলিত, তেমনই চলিয়া যাইতেছে। কপোতাক্ষী তেমনই হেলিয়া দুলিয়া কল কল রবে ছুটিতেছে, তেমনই তাহার তরঙ্গায়িত বক্ষ ভেদ করিয়া নৌকাসকল নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছে। সম্মুখের তেঁতুল গাছের উঁচু ডালে বসিয়া পাখীগুলি তেমনই ডাকিতেছে। দিনের

পর সন্ধ্যা—সন্ধ্যার পর রাত্রি সেই মত আসিতেছে, আবার যাইতেছে। নায়েব মহাশয় তেমনই ছড়ি ঘুরাইয়া নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছেন, সংসারে সবই সমান চলিতেছে; কেবল তাহার দিনগুলা উল্টাইয়া গিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার বুকের শিরাগুলা টন্ টন্ করিয়া উঠিত। তাহার উদাস হৃদয়-খানা কপোতাক্ষীর শীতল জলতলে শয়ন করিয়া জুড়াইবার নিমিত্ত অস্থির হইয়া উঠিত, কিন্তু অমনি কোথা হইতে একটা সকরুণ স্বর তাহার কাণে বাজিত,—এর শোধ চাই—এর শোধ চাই! সহসা তাহার সম্মুখে অতীতের স্মৃতির একখানা চিত্র ফুটিয়া উঠিত,সে দেখিত—তাহার করিম মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া বলিতেছে—এর শোধ চাই! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে উন্মাদের ন্যায় শূন্য গৃহপানে ছুটিত, মুক্ত বায়ু তাহার পশ্চাতে হো হো শব্দে উপহাসের অট্টহাস্যে হাসিয়া উঠিত।

বর্ষাকাল। গত রাত্রিতে নদীতে বাণ পড়িয়াছে, কপোতাক্ষী কূলে কূলে পুরিয়া উঠিয়াছে, প্রবল তরঙ্গ আসিয়া তীরে আঘাত করিতেছে। মাঝিরা মোটা মোটা কাছিতে বটগাছে নৌকা বাঁধিয়া বসিয়া আছে। রহমত প্রাতঃকাল হইতে নদীতীরে বসিয়া কপোতাক্ষীর এই উন্মাদ-দৃশ্য দেখিতেছিল। সে যেখানে বসিয়াছিল, তাহার অনতিদূরেই খেয়াঘাট, নায়েব মহাশয় পুত্রের সহিত সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কারণ, নায়েব মহাশয়ের শিশু পুত্রটীর পীড়ার সংবাদ লইয়া তাহার মধ্যমপুত্র তাঁহাকে লইতে আসিয়াছে, এই জন্যই অদ্য তিনি বাড়ী গমন করিতেছেন। নদীতে বাণ আসিয়াছে, ইহা তিনি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এই সামান্য কারণে পুত্রের পীড়া উপেক্ষা করা ভাল নয় বলিয়া তাঁহাকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। দিনু মাঝি শক্ত কাছিতে নৌকাটীকে বাঁধিয়া মদনের দোকানে বসিয়া আরামে তামাক টানিতেছিল, আর গত বৎসর সে এইরূপ বাণের মুখে কিরূপ সাহসের সহিত তাহার নৌকা রক্ষা করিয়াছিল, তাহাই বলিতেছিল। এক্ষণে নায়েব মহাশয়কে দেখিয়া হুকা ফেলিয়া প্রণাম করিল। নায়েব মহাশয় তাহাকে শীঘ্র পার করিতে আজ্ঞা করিলেন। সে তাহার জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু সে সকলকে একেবারে পার করিতে সম্মত হইল না। অগত্যা নায়েব মহাশয়ের পুত্র ও একজন পাইক নৌকায় উঠিল। দিনু ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। রহমত কঠোর দৃষ্টিতে নৌকার দিকে চাহিয়া রহিল। স্রোতের বেগে হেলিয়া দুলিয়া নৌকা চলিল, সম্মুখেই একটা ঘূর্ণাবর্ত্ত, দিনু অনেক চেষ্টা করিয়াও

নৌকা রাখিতে পারিল না, নৌকা বেগে গিয়া আবর্ত্তে পড়িল; তীর হইতে সামাল সামাল শব্দ উঠিল। দিনু সবলে হাল চাপিয়া ধরিল আর অমনি কট্ কট্ শব্দে হালের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল, নৌকাও একপাক ঘুরিয়া জলমগ্ন হইল। নায়েব মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। নায়েব মহাশয় মাটিতে আছড়াইয়া পড়িলেন। সেখানে রহমত বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখেই নৌকা-খানা ডুবিল। রহমতও অমনি হা আল্লা বলিয়া জলে পড়িল, কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

কিছুক্ষণ পরে ঘাট হইতে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, যেখানে নৌকা ডুবিয়াছিল, তাহার কিছু দুরে দুইটী মাথা ভাসিয়া উঠিয়াছে, দেখিতে দেখিতে মাথা দুইটী তীরে লাগিল। নায়েব মহাশয় ছুটিয়া নিকটে গেলেন, নিকটে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন পুত্রের উদ্ধারকর্ত্তা রহমত! তিনি বসিয়া পড়িলেন, এমন সময় রহমত তাঁহার পুত্রকে সেখানে আনিয়া তাঁহার পদতলে দিল, আর উচ্চকণ্ঠে বলিল,—আজ আমার করিমের ঋণ শোধ! সে উত্তর নায়েবের হৃদয়ে এককালে সাত বজ্রের আঘাত করিল।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

চাট্‌নী।

গয়ারাম। আচ্ছা হারাধন ৫০ বছর পূর্ব্বে যে সকল শিশু জন্মেছে, তাদের চেয়ে আজ কালকার ছেলেদের জীবনাশা বেশী নয় কি?

হারাধন। তা ত হবেই, তাদের যে ৫০ বছর বয়স হ'য়ে গেছে!

রাম। দেখ শ্যাম, আমার ঠাকুরদাদা জীবিতাবস্থায় খুব নাম জাহির করিয়াছিলেন। আমি তাঁর উপযুক্ত পৌত্র!

শ্যাম। তাতে কি আর ভুল আছে? সে সময়ে এদেশে তোমার ঠাকুরদাদাই যে একমাত্র মূর্খ ছিলেন।

মাসিক সংবাদ।

কবিবর স্যার রবীন্দ্রনাথ জাপানে গমন করিতেছেন। জনরব, তথা হইতে আমেরিকায় গমন করিবেন। ভরসা করি, বিদেশী সম্মান আমদানী করিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে বাধিত করিবেন।

গত ৩০এ বৈশাখ শনিবার অপরাহ্ন সাড়ে চারি ঘটিকার সময় সাহিত্য সম্মিলনের বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হাওড়া ডিউক পাবলিক লাইব্রেরীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "ব্যাপ্তি-পঞ্চক" নামক নব্য ন্যায়ের গ্রন্থ সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ৫৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম্, এ প্রণীত "সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব" বাহির হইয়াছে। মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীমৎ স্বামী উত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি কর্ত্তৃক সম্পাদিত "শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা" বাহির হইয়াছে। মূল্য ১৷৽ সিকা।

সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী প্রণীত "পঞ্চবটী" প্রকাশিত হইয়াছে। সরলা, ক্ষমা, দত্তমহাশয়, শিবপূজা ও পুনর্ম্মিলন এই পাঁচটী সামাজিক গল্প নিয়াই পঞ্চবটীর সৃষ্টি। গল্পগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক। প্রিয়জনকে উপহার দিবার যোগ্য। মূল্য ।৽ চারি আনা মাত্র। প্রাপ্তি-স্থান অবসর কার্য্যালয়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত "সাধক সহচর" প্রকাশিত হইয়াছে। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অনেকগুলি উপদেশ ও বিবিধ নূতন আখ্যায়িকাদি দ্বারা গ্রন্থকার সাধারণের চিত্তাকর্ষণে যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা পাঠক-পাঠিকার অন্তঃকরণে কথঞ্চিৎ ধর্ম্মভাব জাগরিত হইলেই আমরা সুখী হইব।

দার্শনিক পণ্ডিত শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

অভিনব জ্ঞান-বিজ্ঞানময় অনন্ততত্ত্বে পরিপূর্ণ।

নূতন সংস্করণে অভিনব আকারে সংশোধিত হইয়া প্রকাশ হইল। কিন্তু সাধারণের অনুরোধ ক্রমে এ সংস্করণে মূল্য কমান হইল।

আর্য্য ঋষিগণ যে সাধনায় যোগশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আজকাল শুপ্ত ইয়োরোপবাসী সেই সকল কাণ্ডে জগতে হুলস্থূল বাধাইয়াছেন। কিন্তু সুপ্ত বাঙ্গালী এতদিন সে কথা লয়েন নাই—সিদ্ধির কথা বলিয়া যোগ-যোগাদি প্রতিষ্ঠা লইয়া থিয়োসফিষ্ট সম্প্রদায়, স্পিরিচুয়ালিজম্ সম্প্রদায় হইয়াছে।

তাই আজি সাধনায় সাধনার স্বর্গদ্বার চির-উন্মুক্ত হইল।

সাধনায় সাধনারই কথা আছে। কিসের সাধনা, সে কথা বিজ্ঞাপনে কুলায় না। রূপের সাধনা, কামের সাধনা, প্রেমের সাধনা, ধনের সাধনা, দীর্ঘজীবনের সাধনা, শক্তির সাধনা, যাহা ইচ্ছা করিবার সাধনা, বশীকরণের সাধনা, মোকদ্দমার জয়-পরাজয়ের সাধনা, সর্ব্ব প্রকার যোগের-সাধনা, মাধুর্য্য রসের সাধনা, দেবদেবীর সাধনা—ফল কথা, জগতে যত কিছু কার্য্যের মানবীর প্রয়োজন তৎসমস্ত বিষয়ের সাধনা এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য হিন্দুদর্শন ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া যিনি যে বিষয়ে ইচ্ছা, সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। লেখার কৌশলে, ভাবের সরলতায় সকলেই বুঝিতে ও কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য বিলাতিবৎ বাঁধাই ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল ৵০ তিন আনা।

অবসর পুস্তকালয়।

৩৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাসিক পত্র
শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এটর্ণি য়্যাট্-ল-সম্পাদিত।
কলিকাতা, ৩৪নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে
শ্রীহরিপদ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৹ সিকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵১৹ আনা।

সূচী।

সীতার গোদাবরী স্নান।

অবসর।

১২শ ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ। { ১০ম সংখ্যা।

সংসারে অশান্তি হয় কেন?

প্রথম খণ্ড।

(চরিত্র-সমালোচনা)

স্ত্রী-শিক্ষা।

ক্ষুদ্র প্রবন্ধচ্ছলে আজ একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের অবতারণা করিতেছি; ইহাদ্বারা অনেকের অপ্রিয়ভাজন হইতে হইবে জানিয়াও সমাজের মঙ্গল কামনায় এবং নারীজাতির চরিত্রগত দোষের অপনোদনেচ্ছায় এ কার্য্যে ব্রতী হইলাম। যদি ইহাদ্বারা সমাজের কথঞ্চিৎ উপকারও সাধিত হয়,—সংসারে শান্তি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে আমাকে বিশেষ সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিব, আর যদি কেবল অভিসম্পাতের ভাগী হই, তাহা হইলে আমার দুরদৃষ্টই বলিতে হইবে।

"অবসর পত্রে" ইতিপূর্ব্বে "স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালী" শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্গ-রমণী-কুলের কতকগুলি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম। তবে সে প্রবন্ধে আধুনিক রমণীকুলের চরিত্রগত দোষগুলি সম্যক্ প্রদর্শিত হয় নাই; অথচ আশার নিবৃত্তি না হইলে প্রাণে একটা আকাঙ্ক্ষা রহিয়া যায় বলিয়াই অপ্রিয় হইলেও অদ্য এ প্রবন্ধের অবতারণা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি। বিশেষতঃ আমি জীবনে স্ত্রীচরিত্রে যে দোষগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রবন্ধরূপে প্রকাশিত করিতেছি।

আজ পনর বৎসর হইল আমি সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছি; তা বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে ইতিপূর্ব্বে আমি উদাসীন ছিলাম। সংসারী বলিলে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি অর্থাৎ মুষল স্কন্ধে করিয়া তাহার ভারে অবসন্ন হইয়া—'সর্পে ছুছুন্দর ধরার ন্যায় গিলিবারও উপায় নাই, ফেলিবারও ইচ্ছা নাই ভাবে' পুরুষের যে দশা ঘটিলে আমরা প্রকৃত সংসারী আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি, সেইরূপ সংসারপথ আজ পনর বৎসর হইল অবলম্বন করিয়াছি। আমার বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ৩১ বৎসর। জ্ঞানলাভ হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমি অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণও অত্যধিক পরিমাণে স্বাধীনতায় সমুৎসুক হইয়া সংসারের পথে—সন্তান সন্ততিগণের উন্নতির পথে এবং স্বামীর শান্তির পথে কণ্টকারোপণ করিতেছেন।—সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, অলীক্ষরা প্রভৃতি স্বামিভক্তিপরায়ণা, ধর্ম্মশীলা, শান্তিরূপা রমণীগণের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে ইঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্মে অধুনা এত উন্মনা হইবেন কেন? শান্তির আধারভূতা হইয়া সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করিবেন কেন এবং কেনই বা পার্থিব সৌভাগ্যে সৌভাগ্যান্বিতা হইয়া মনঃকষ্টে দিন যাপন করিবেন? ইঁহারা কিরূপভাবে এই সমস্ত ঘটাইতেছেন, তাহা একে একে বুঝাইয়া দিতেছি।

প্রথমতঃ আমি দেখাইতে চাই যে, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন বা করিবার চেষ্টা করিতেছেন কি না? স্ত্রীজাতি যে চারিটী অবস্থাতেই পুরুষের অধীন, তাহা আমি স্ত্রী-শিক্ষাপ্রণালীতে দেখাইয়াছি। বিবাহের পর তাঁহারা স্বামীর অধীন, ইহাই সামাজিক নিয়ম ও হিন্দুশাস্ত্রের বিধি। পূর্ব্বে ছিলও তাহাই, নারীগণ যতই বুদ্ধিমতী বা বিদুষী হউন না কেন, কেহই সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া সমাজ বা শাস্ত্রের অবমাননা করেন নাই; সর্ব্বতোভাবে তাঁহারা স্বামীর অজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়াই পরম সুখ-শান্তিতে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখনকার স্ত্রী-লোকদিগকে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে দেখা যায়। পুরুষগণ সকলেই আপনাপন তুলনায় বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণ তাঁহাদের উপর কত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন, এবং নারীগণও অনুভব করিতে পারিবেন যে, তাঁহারা কত স্বাধীন-ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের দাস সবাই, তবে পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহারা সহজেই সুন্দরী সহধর্ম্মিণীর

কুহকে পড়িয়া আত্মবিস্মৃত হন, কর্ত্তব্য পথ হইতে চ্যুত হইয়া স্ত্রীর মন যোগাইবার জন্য কত ব্যস্ত হইয়া পড়েন, এরূপ ঘটনা এখন গৃহে গৃহে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে। যে নারীগণ স্বামীর পায়ে আত্ম সমর্পণ করিবে, স্বামীর ইঙ্গিতে ফিরিবে, আজ কি না স্বামীকে তাহাদেরই মন যোগাইতে হয়, ইহা কি কম আক্ষেপের কথা! ইহা কি স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা নহে? বলিতে পারেন,-- রমণীগণ অপেক্ষা পুরুষগণ ইহার জন্য দায়ী,কেন না পুরুষগণ এইরূপ করিতেছেন বলিয়াই ইহা ঘটিতেছে। কিন্তু আমি বলি তাহা নহে, কারণ গৃহীতা আমি, তুমি দাতা; আমি যদি দান গ্রহণ না করি, তুমি আমায় দিতে পার কি? স্ত্রীলোকদিগের আন্তরিক ইচ্ছা পুরুষগণ তাহাদিগকে তোষামোদ করুক; না করিলে যে কোন তুচ্ছ ঘটনা লইয়া সংসারে অশান্তির তীব্র হলাহল বিস্তার করিবে। বেচারী পুরুষ সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর একটু শান্তিলাভের পরিবর্ত্তে সেই অশান্তি-বিষ-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া মরিবার ভয়ে বাধ্য হইয়া রমণীকে তোষামোদ ও মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিবেন। প্রমাণ প্রয়োগ আমাকে প্রদর্শন করিতে হইবে না; অধিকাংশ বঙ্গ-সংসারই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাঙ্গালীর কয়টী সংসার আর পূর্ব্বের ন্যায় একান্নবর্ত্তী থাকিয়া সুখে দিন যাপন করিতেছে? কিন্তু এই সংসার বিচ্ছিন্ন হইবার কারণ কি? ইহার মূলে স্ত্রীলোক নয় কি? কে না স্বীকার করিবেন যে স্ত্রীলোক হইতেই সংসারটা ছারখার হইয়া গেল? রমণী এক দিকে যেমন মমতাময়ী—শান্তির আধার স্বরূপিণী, অন্যদিকে আবার তেমনই কঠোর-হৃদয়া—অশান্তির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। এক তুলনায় রমণী যেমন দেবী-রূপিণী, অন্য তুলনায় তেমনই দানবীগুণবিশিষ্টা পিশাচিনী। স্বার্থ-সাধনেচ্ছায় স্ত্রীলোক করিতে পারে না এমন কাযই নাই; তাহাদের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, অতি সহজে লোকের মন হরণ পূর্ব্বক স্বার্থ-সাধন করিবেই করিবে। বলে না পারে, ছলনায় পুরুষকে হস্তগত করতঃ কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইবে। উহাদের এক চক্ষে গরল ও অপর চক্ষে অমৃত; এক ওষ্ঠে হাসি এবং অন্য ওষ্ঠে অভিমানের ক্রন্দন ঠিক একই সময়ে প্রতিফলিত হয়। পুরুষকে স্ব বশে রাখিবার অভিপ্রায়ে রোষকষায়িত লোচনে তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে যখনই বুঝিল যে, পুরুষ তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখনই অমনি সে ভাব গোপন পূর্ব্বক সেই গরলপূর্ণ চক্ষুটী মুদ্রিত করতঃ অমৃতময়

চক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে শীতল করিয়া দিবে ;—ক্ষণিকের জন্য কপট হাসি হাসিয়া সুযোগ মত অভিমানের প্রবল উৎস ছুটাইতে আরম্ভ করিবে। অবোধ পুরুষ তখন সেই মায়া-কান্নায় মুগ্ধ হইয়া অভিমান অপনোদনের জন্য তাহার মনোরঞ্জনার্থ নানারূপ মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তোষামোদে প্রবৃত্ত হইবেন। না হইলেও উপায় নাই ; কেন না, অভিমান-বারি যতই বর্ষিত হইতে থাকিবে, ততই অশান্তির বৃদ্ধি হইবে। অহোরাত্র অশান্তির আগুণে বাস করা অপেক্ষা সামান্য তোষামোদে যদি তাহা নির্ব্বাপিত হয়, পুরুষ তাহাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। কিন্তু যেমন রাই কুড়াইয়া বেল হয়, এক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রথমে অল্প হইতে তোষামোদের মাত্রা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং নারীর স্বভাব এরূপ হইয়া পড়ে যে, তখন প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও মন না যোগাইলে তাহারা শান্ত হয় না। পাঠক পাঠিকাগণ একবার নিরপেক্ষ ভাবে বলুন দেখি, ঘটনা ঠিক এইরূপ দাঁড়াইয়াছে কি না ? বলুন দেখি, রমণীগণ এরূপ আচরণে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করেন কি না ? তাহা যিনি না করেন, আমি তাঁহাকে দেবীরূপে পূজা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই অশান্তি সৃষ্ট হইবার কারণ জানেন কি ? যদি না জানেন, আমি বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ করুন।

আমি যতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা এই যে, প্রবল স্বার্থ-পরতাই এই সমস্ত অনিষ্টের মূলীভূত কারণ। স্বার্থচিন্তা আধুনিক অন্তশ্চক্ষু অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, রমণীকুলের বহিশ্চক্ষুর সাহায্যে তাহার মোহিনী-মূর্ত্তি দেখিয়া লোকেরা এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে, পরের জন্য এতটুকু চিন্তা করিবারও অবসর প্রাপ্ত হয় না। একবারও ভাবেন না যে সাধু মহাপুরুষগণ, গরীয়সী প্রাচীন মহিলাগণ, মধ্যযুগের রাজপুত-রমণীগণ এবং আধুনিক স্বাধীনা পাশ্চাত্য মহিলাগণ পর্য্যন্ত পরোপকারকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞানে তাহা সাধনের জন্য স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আধুনিক বঙ্গ-রমণীকুলের মধ্যে অধিকাংশের হইয়াছে কি "আমি সুখে থাকি, আমার স্বামী পুত্র সুখ ভোগ করুক, আমার সঞ্চয় হউক বা অস্মৎ-সম্বন্ধীয় যাহা কিছু সব ভাল হউক, অন্যের সহিত আমার সংশ্রব কি,—অন্যের চলে না চলে তাহাতে আমার মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি ?" এ ত গেল পরের কথা, এইবার আপনার জন, খুব অন্তরঙ্গ আত্মীয়, ধরুন স্বামীর সহিত তাঁহারা কিরূপ আচরণ করেন, তাহা বলিতেছি।

আমাদের (বাঙ্গালীর) স্ত্রীলোকেরা চাহেন স্বামী সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের বশে থাকুন; তাঁহারা যে ন্যায়তঃ স্বামীর অধীন এ কথা মনে করিতে তাঁহাদের ঘৃণা বোধ হয়। ইহা তাঁহাদের স্বামীর সহিত আচরণে প্রমাণীকৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা না করিয়া আমি মোটামুটি বলিয়া যাই যে, আমাদের স্ত্রীলোকেরা কি সাংসারিক ব্যাপারে, কি পুত্র কন্যাগণের লালন পালনে, এমন কি তাঁহাদের নিজেদের প্রতিও তাঁহারা এত অধিক স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন যে, তাহার ফল অতি দুঃসহ হইয়া উঠে। স্বামী বেচারীকে সেই অশান্তি নিবারণ করিবার জন্য,—সেই উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি যাহাতে না দেখিতে হয় তাহার প্রতিকার কামনায় স্ত্রীর নিকট সর্ব্বদা চোরের ন্যায় অবস্থান করিতে হয়; যেন কত গুরুতর অপরাধে অপরাধী! স্ত্রীও তখন যতদূর সাধ্য তাঁহার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া লয়। আবার যে রমণীর স্বামী সংসারে অন্যান্য ব্যক্তিগণের অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করেন বা যাহার স্বামীর উপায়েই সংসারটী প্রতিপালিত হয়, সে রমণীর মেজাজ যে কত অধিক উগ্র—কতই অশান্তি উদ্দীপক, তাহা ভুক্তভোগিগণ অনুভব করিয়া লইবেন। আপনাকে সমধিক বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মঠ প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে স্বামীকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করা ত বর্ত্তমান বঙ্গ-রমণী-কুলের একটা ভীষণ ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকন্তু অধিক উপার্জ্জনকারীর বা সংসার প্রতিপালকের স্ত্রীগণ তমোগুণের বশবর্ত্তিনী হইয়া লঘুগুরু বিচার-বিরহিত হন এবং তীব্রবাক্য-বাণে পোষ্যদিগের মনে অযথা কষ্ট দিতে কুণ্ঠিতা হন না! এমন কি কেহ কেহ সময়ে কটূক্তি করিতেও বিরত হন না। তাঁহারা চাহেন—শ্বশ্রূ প্রভৃতি মাননীয় গুরুজন কর্ত্রী থাকিলেও তাঁহারাই সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে বিচরণ করেন এবং আপন স্বেচ্ছামত যাহাকে যেরূপ বণ্টন করিয়া দিয়া অবশিষ্টাংশ আত্মসাৎ করেন, অথচ কেহ তাহাতে কোনরূপ আপত্তি বা অভি-যোগ উত্থাপিত করিবে না। কোন একটি একান্নবর্ত্তী পরিবারে উপার্জ্জনক্ষম জ্যেষ্ঠের স্ত্রীকে কনিষ্ঠের স্ত্রীর প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছি যে "যাহার স্বামী অধিক উপার্জ্জন করিবে, তাহার পুত্রকন্যাগণ ভাল খাইবে বা অধিক অংশ পাইবে।" এ কথা লইয়া সেই দুইটী রমণীর মধ্যে বিবাদ হইতেও দেখিয়াছি, তবে কর্ত্তব্য-জ্ঞানসম্পন্ন কনিষ্ঠ কিন্তু এ তুচ্ছ কথায় কর্ণপাতও করেন নাই, এবং তাঁহারই যত্নে সংসারটী না

ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া আজও অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। এরূপ স্ত্রীলোক জগতে বিরল নহে; তাহার প্রমাণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আজ কাল বাঙ্গালীর কয়টী সংসার একান্নবর্ত্তী আছে! কিন্তু এরূপ ঘটনাচক্রে সংসার পৃথক হইলেও আমি পুরুষকে (ঐরূপ স্ত্রীর স্বামীকে) দোষী করিতে পারি না। যেহেতু তিনি স্বার্থপরায়ণা পত্নীর মনোরঞ্জনার্থ ভ্রাতার সহিত পৃথক হইতে ইচ্ছা না থাকিলেও উগ্রচণ্ডা-রূপিণী স্ত্রীর অত্যাচার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য পৃথক হইতে বা সহোদরের উপর অত্যাচার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক অশান্তি ভোগ করিতে হয় ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। তাহা হইলে বলুন দেখি, স্ত্রী-চরিত্র কি ভীষণ? নিজের অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না, মুখে যাহা বলিতেছে কার্য্যতঃ তাহা উপযুক্ত কি না তাহা দেখিবে না এবং পরিণাম চিন্তা না করিয়াই হাম বড় জ্ঞানে অন্যের মনে অযথা ক্লেশ উৎপাদন করিবে,—শান্তির সংসারে অশান্তির বিষ ঢালিয়া নিজের, স্বামীর ও পরিজনবর্গের কষ্টের কারণ হইবে।

এই হাম বড় হইতে আমার দ্বিতীয় উত্তরটী সরল হইতেছে। আমি এইবার দেখাইব—বঙ্গনারীগণ হাম বড় হইয়া নিজেদেরও তৎসহ সন্তান সন্ততিগণের কত অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। কথাতেই আছে, বড় হবি ত ছোট হ। অর্থাৎ সংসারে যদি খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে বিনয়ী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই বিনয় কথাটা আজকাল বঙ্গনারীগণের অভিধান হইতে উঠিয়া গিয়াছে ও উগ্রতা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। লজ্জাই যাঁহাদের ভূষণ ছিল, এখন তাঁহারা সেই লজ্জাকে অঞ্চলাবৃত রাখিয়া প্রকাশ্যরূপে গলাবাজী করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন না। পুত্র কন্যাগণকে মিষ্ট বচনে সৎশিক্ষা দেওয়া দূরে থাক, তাহাদের সহিত এরূপ আচরণ করিবে যে, অনুকরণ-প্রিয় বালকবালিকাগণও তাহা শিক্ষা করিয়া প্রতিপক্ষে সেইরূপ ব্যবহার করিবে। তাহাদের সেরূপ ব্যবহারে আবার সেই জননীই সময়ে সময়ে অধৈর্য্য হইয়া তাহাদের উপর অমানুষিক শাসনজাল বিস্তার করিবেন; অথচ বুঝিবেন না যে, সে সমস্ত স্বকৃত কুকর্ম্মের বিষময় ফল। কেহ বুঝাইয়া দিলেও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন না, কেন না তাহা হইলে তাঁহাকে ছোট হইতে হইবে, অধিকন্তু উপদেশদাতাকেও কতকগুলি অযাচিত প্রত্যুপদেশ দানে আপ্যায়িত করিবেন। দুঃখের বিষয়, রমণীগণ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করেন না এবং ইহাও বুঝেন না যে, পুরুষের

একটা কটাক্ষপাতে যে কার্য্য সহজে সমাধান হইবে, স্ত্রীলোকের শত তাড়নায়ও তাহা হইবে না। জননীর কোল সন্তানের সান্ত্বনার স্থান। জনক কর্ত্তৃক অনুশাসিত হইলে বালক মাতৃকোলেই আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে, পূর্ব্বাপর এইরূপই হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এখন ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্তান জননীর নিকট সান্ত্বনা পাইবার পরিবর্ত্তে তাড়-নাই লাভ করিয়া থাকে এবং সান্ত্বনা দিবার জন্য পিতা তাহাকে বক্ষে ধারণ করেন। ফলে এই হয় যে, বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশু জননীর উপর শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে এবং অন্যান্য দোষ আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে। উহাতে সন্তানের যতদূর অনিষ্ট হইবার তাহা ত হইলই, অধিকন্তু মাতাও অবাধ্য সন্তান লইয়া সুখী হইতে পারিলেন না। বলুন দেখি, আজ কাল অবস্থা ঠিক এইরূপ দাঁড়াইয়াছে কি না? হইতে পারে আপনার সন্তান সুবোধ এবং আপনার যথেষ্ট অনুগত, কিন্তু সর্ব্বত্র কি এইরূপ? অনেক জননীকে কি প্রায়ই বলিতে শুনা যায় না যে "অবাধ্য সন্তান লইয়া পুড়িয়া মলেম?" কিন্তু এমনটী হয় কেন তাঁহারা কখনও চিন্তা করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন আমি বলিয়া দিতেছি, ইহা তাঁহাদের "হামবড়" হইবার বিষময় ফল। তাঁহারা যদি আপনাপন কর্ত্তব্য পালন করেন, তাহা হইলে এরূপটী ঘটে না এবং তাঁহাদিগকেও পরে অনুতাপ ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু হায়! ইদানীং তাঁহারা কর্ত্তব্য পথ হইতে এতই বিচ্যুত হইতেছেন যে, জানিয়া শুনিয়াও এই সকল সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি, যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে মৎ-বর্ণিত একাদশ বর্ষের "অবসর পত্রে" প্রকাশিত স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন, সকল তথ্য অবগত হইবেন।

এইবার তাঁহাদের নিজেদের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। ইহাও আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ নিজেদের প্রতি বিশেষ যত্ন লন না এবং কেহ লইতে বলিলেও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। এই ঔদাসীন্যের জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে হয় এবং পরিজনদিগকেও বিপন্ন করিয়া থাকেন; তবু যে কি রীতি ইহাতেও তাঁহাদের চৈতন্য উৎপাদন হয় না। আবার, কোনরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে যদি শুশ্রূষার এতটুকু ক্রটী হয়, তাহা হইলেও বিপদ; নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়াচ্ছলে পরিজনবর্গকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতেও কুণ্ঠিতা হন না; অথচ ভাবেন

না যে উহা স্বকৃত অবহেলার ফল। কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার যে কিরূপ বিরক্তিকর, তাহা ভুক্তভোগীই বলিতে পারেন। সাধারণতঃ স্বামী বেচারাকেই এই অযাচিত তাড়না অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে হয়। কোন কথা বলিতে যাইলেও বিপদ; কথায় কথায়, রাগ অভিমান যেন কুরুক্ষেত্রের পুনরভিনয়! রমণীগণ মনে মনে বুঝিয়া দেখুন একথা সত্য কি না? হইতে পারে সকলেই এরূপ স্বভাবযুক্ত নহেন, কিন্তু অধিকাংশ বঙ্গরমণীই আজ কাল এইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তাহাতেই রমণী-কুলের উপর দোষারোপ হয়। ইহার প্রতীকার তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই করিতে পারেন। তাঁহারা যদি নৈতিক পথ অনুসরণ করতঃ নিজেদের কর্ত্তব্য মানিয়া চলেন, প্রবীণাগণ যদি পাশ্চাত্য মতে আপনাপন পুত্রকন্যাগণকে সৎশিক্ষা প্রদান করেন,—তাড়নার সহিত যদি মমতার রজ্জুও বিস্তার করেন,—স্বার্থকে যথাসাধ্য বলিদান দিয়া, অবকাশমত পরের দিকে একটু চাহিয়া দেখেন এবং প্রবাদ বাক্যটী সত্যে পরিণত করিবার জন্য যদি তাঁহারা শান্ত মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন, তাহা হইলে আর ওরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। লোকে তাহা হইলে সংসারে থাকিয়া সত্যই স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতে পারেন। যাহা এতাবৎ চলিয়া আসিতেছিল, সেরূপ করা তাঁহাদের উচিত নহে কি? তাঁহাদের কি ভাবিয়া দেখা উচিত নহে যে, সংসারে তাঁহারাই মূর্ত্তিমতী শান্তিদায়িনী—শ্রমক্লিষ্ট পুরুষের একমাত্র জুড়াইবার স্থল? তাঁহারাই যদি কঠোরতা অবলম্বন করেন, তবে নিরীহ পুরুষ যায় কোথায়? তাঁহাদের উচিত নহে কি, অধুনাতন অযুক্তিপূর্ণ অসার নাটক নভেল মুখস্থ না করিয়া গরীয়সী প্রাচীন রমণীগণের জীবন-চরিত আলোচনা করিয়া দেখা যে তাঁহারা কি কি গুণে গরীয়সী হইয়াছিলেন,—কি কি গুণে তাঁহারা সংসারে সমাজে পূজনীয়া এবং সুদূর ভবিষ্যতেও প্রাতঃস্মরণীয়া ও আদর্শস্থানীয়া হইয়াছেন? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক যে, যদি সেই রমণীগণ আদর্শ-স্থানীয়া হইতে পারিয়া থাকেন, তবে বর্ত্তমান রমণীগণই বা কেন সেইরূপ হইতে পারিবেন না? কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। নশ্বর জগতে কিছুই থাকে না, কেবল যশই রহিয়া যায়। কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়া গিয়াছে, প্রাচ্যরমণীগণ কালের অনন্ত শান্তিময় ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন চিহ্নই জগতে বিদ্যমান নাই, কিন্তু তাঁহাদের নাম অমর হইয়া রহিয়াছে, এবং যতদিন আকাশে চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান

থাকিবে. হিন্দু নাম যতদিন ধরা হইতে লোপ না পাইবে, ততদিন তাঁহাদের নাম ও অন্তর্দ্ধান হইবে না। এরূপ সৌভাগ্য লাভ করা কি গৌরবের বিষয় নহে? স্পষ্ট কথা লিপিবদ্ধ করিলাম বলিয়া আমার উপর দোষারোপ না করিয়া একবার মন স্থির করতঃ বুঝিয়া দেখিবেন, আমি যাহা বলিলাম তাহা রঞ্জিত কি প্রকৃত? সত্যই কি রমণীগণ সকল সুখের অধিকারিণী হইয়াও নিজেদের সামান্য একটু ভ্রমে আজীবন মনঃকষ্টে দিনযাপন করেন না?—সদা প্রফুল্লময়ী না হইয়া অপ্রসন্নতার আবরণে মুখমণ্ডল আবৃত করতঃ স্বামীর ও তৎসংশ্লিষ্ট পরিজন বর্গের ক্লেশ উৎপাদন করেন না? সমস্ত সুখ-শান্তির সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়াও স্ত্রীজাতি স্বার্থপরতারূপ ভ্রম-জালে পতিত হইয়া সংসারে অশান্তি উৎপাদন করিতেছেন। এই ভ্রমাপনোদন করিয়া সংসারকে সুখ-শান্তির আকর করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য নয় কি?

(ক্রমশঃ।)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন।

তুমি ও আমি।

তুমি! নিরাশা-সাগরে আশার তরণী,
আঁধারে আলোক ভাতি।
আমি! জীবনে মরণে, জনমে জনমে
রহিব তোমার সাথী।
তুমি! সুন্দর চির ভুবনে অতুল
নাহিকো তোমার শেষ।
আমি! মুগ্ধ হয়েছি হেরি নিশিদিন,
ও চারু মোহন বেশ।
তুমি! অমল ধবল চির নিরমল,
সরস নলিনী-প্রায়।

আমি ! প্রেমানত এই হৃদয় লইয়া,
লুটেছি তোমার পায়।
তুমি ! শারদ নিশীথে জ্যোছনা মাখান,
শোভন কুসুম-রাশি।
আমি ! সুবাসের মত প্রতিদলে তব,
রয়েছি কেমন মিশি।
তুমি ! যমুনা-পুলিনে, বিজনে, বিপিনে,
মোহন বাঁশরীতান।
মম ! হৃদয় বীণায় ধ্বনিতেছে শুধু,
তোমারি প্রেমের গান।
তুমি ! দূর নীলাকাশে তারকার মত,
ধীরে ফুটে আছ চেয়ে।
আমি ! জীবনের যত বেদনা সন্তাপ,
ভুলেছি তোমারে পেয়ে।
তুমি ! নীরদ-মাঝারে দামিনীর মত,
চমকে দিয়েছ দেখা।
তবু চেয়ে দেখ প্রভু হৃদিপটে মম,
তোমারি মুরতি আঁকা।
তুমি ! যত দূরে রবে নিকট হইতে,
মায়া-যবনিকা টানি।
আমি ! প্রেম-পূজা বলে তোমারি চরণে,
মিলাব হৃদয় আনি।

শ্রীমতী লাবণ্যময়ী দেবী।

কমলা।

আমি আমার স্বামীর সহিত প্রায়ই পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতাম। দুই তিন বৎসর পর দেশে আসিয়া পনেরো কুড়ি দিন থাকিতাম মাত্র, তাহাও বড় ঘটিয়া উঠিত না।

সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা। স্বামী ছয় মাসের ছুটি লইয়া দেশে আসিলে আমি একবার পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করাতে, জানি না কেন স্বামী তাহাতে সম্মত হইলেন এবং নিজেই আমাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

এবার বাপের বাড়ী আসিয়াই শুনিলাম, আমার মাতুল-কন্যা কমলার বিবাহ উপলক্ষে মাতাঠাকুরাণী তাঁহার ভ্রাতৃ গৃহে যাইতেছেন। অনেক দিন পরে আমারও মাতুলালয়ে যাইবার জন্য বড় ইচ্ছা হইতেছিল, স্বামীর মত জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোনও আপত্তি করিলেন না, মাতা তো আমি যাইব শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতাই হইলেন।

আমার মামার বাড়ী ফরিদপুর জেলায় কোনও পল্লীগ্রামে। রাত্রি ১০টার সময় শিয়ালদহ হইতে যে গাড়ী গোয়ালন্দ অভিমুখে যায়, আমরা সেই গাড়ীতে আরোহণ করিলাম, এবং সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া সকাল সাতটার সময় একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশনে অশ্ব-শকট বা গো-শকট কিছুই পাওয়া যায় না, আমাদের যাইবার জন্য দুইখানা 'ডুলি' উপস্থিত ছিল, (ডুলির পরিচয় এস্থলে দেওয়া অনাবশ্যক, কারণ যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে কখনও গিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন ডুলি কি আশ্চর্য্য যান) তাহাতেই কোনও রূপে আরোহণ করিয়া মাতুল-গৃহে উপস্থিত হইলাম। মামা মামী ও ভাই ভগ্নীরা আমাকে খুব আদর অভ্যর্থনার সহিত গ্রহণ করিলেন। আমিও অনেক দিন পরে তাঁহাদের স্নেহ-পূর্ণ ব্যবহারে বেশ তৃপ্তি লাভ করিলাম। বাড়ীতে চারিদিকেই সকলে বিবাহের কায-কর্ম্ম – বিবাহের আমোদ উৎসবের কথা লইয়া ব্যাপৃত! এমন কি, বাসর ঘরে বরের সঙ্গে কে কি ঠাট্টা করিবে, সে সকল পরামর্শও আমার কর্ণে দুই একবার পৌঁছিতে লাগিল। কিন্তু এ আমোদ উৎসবের ভিতরে কমলাকে দেখিতে পাইলাম না। কমলাকে আমি বাল্যাবধি বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতাম, সেও আমাকে জ্যেষ্ঠা সহোদরার

ন্যায় ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। কমলার অনুপস্থিতিতে আমি মনে করিলাম, সে বুঝি বিবাহ হইবে বলিয়া কোথায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া আছে।

এদিকে সকলেই স্নানাহারের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, সুতরাং কমলার সহিত দেখা না করিয়াই স্নানাহার করিতে হইল। সমস্ত রাত্রি প্রায় অনিদ্রায় কাটাইয়াছি, আহারাদির পর যেমনই আলস্যভরে শয্যার আশ্রয় লইয়াছি, অমান কোথা হইতে নিদ্রা আসিয়া অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করিয়া নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া লইল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, উঠিয়া মনে বড় দুঃখ হইল, ভাবিলাম "আমি কি? এতদিন পরে এলাম, কমলার সঙ্গে দেখা না করেই ঘুমিয়ে প'ড়েছি।" নিজের উপরেই বড় রাগ হইতেছিল, এমন সময় দেখি মামার ছোট ছেলেটি সেই স্থান দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইতেছে। তাহাকে ডাকিয়া কমলার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "ছোড়্দি আজ ৪।৫ দিন হ'ল ঘর থেকে বেরোয় না, রাত দিন শুয়ে থাকে।" বালকের কথা শুনিয়া আমার প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল, বলিলাম,—"চল্ তো দেখি তোর ছোড়্দি কোথায়?" "এস।"—বলিয়া বালক যাইতে লাগিল, আমিও তাহার পশ্চাদ্গামিনী হইলাম। তিন চারিটী ঘর পার হইয়া বালক একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া বলিল,—"ওই ঘরে ছোড়্দি!" আমি ত্বরিতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম; যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার অশ্রু সম্বরণ করা অসাধ্য হইল। কমলা ঘরের এক কোণে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছে, মাঝে মাঝে যেন ছিন্নকণ্ঠ কপোতের ন্যায় দারুণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে! আমার আগমনের বিষয় সে না জানিতেই আমি তাহার নিকটে বসিয়া পড়িলাম, এবং আবেগভরে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম,—"একি কমল? তোর বিয়ে—আমরা সব আমোদ কর্ত্তে এলাম, তুই এমন করে পড়ে কাঁদ্‌ছিস্?"

কমলা তাহার সেই জল-ভরা বড় বড় চক্ষু দুইটি আমার নেত্রোপরি স্থাপিত করিয়া কি যেন ভাবিল, কি যেন প্রাণের অসহ্য বেদনা আমাকে জানাইতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু প্রবল বেগে অশ্রুধারা বহিয়া তাহার সে ইচ্ছা ভাসাইয়া লইয়া গেল। আমি অঞ্চল দ্বারা তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলাম,—"ছিঃ কমল! আর কাঁদিস্‌নে বোন্, আমি তোর সেই প্রভা দিদি,—

আমাকে চিনিস্ নাই ?" কমলা মস্তক আন্দোলিত করিয়া জানাইল,— আমাকে চিনিয়াছে। কমলার কান্না দেখিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল, অথচ তাহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। একবার মনে করিলাম "কমলা কি কাহাকেও ভাল বাসিয়াছে,—তাহার সহিত বিবাহ হইল না বলিয়াই এ মর্ম্মভেদী ক্রন্দন! যদিও প্রণয়ের দুর্দ্দমনীয় গতিরোধ করা মানবশক্তির অসাধ্য,—তথাপি কমলা হিন্দুকন্যা হইয়া এ দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিল কেন? ভাবিয়া বড় দুঃখ হইল। প্রকাশ্যে বলিলাম "তুই কথা বল্‌বিনে, আমি কি ক'রে বুঝ্‌বো ?"

এবার সে অতি কষ্টে অতি চেষ্টাতে অস্ফুট স্বরে বলিল "দিদি—"

"কি বল্‌বি ? বল্ না" বলিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম, সে আমার বুকের ভিতরে মাথাটি রাখিয়া যেন কিছু শান্তি লাভ করিল; যেমন মাতৃহারা শিশু অপর আত্মীয় কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া দীর্ঘকালের পর জননীর স্নেহময় বক্ষে মস্তক রাখিতে পাইলে বিমল আনন্দে তাহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে; তখন সে জননীর অঙ্ক ব্যতীত আর স্বর্গ সুখেরও প্রয়াসী থাকে না; কমলারও বুঝি আমাকে পাইয়া তাহাই হইল। আমিও তাহাকে বক্ষে লইয়া বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছি। কিছুক্ষণ পরে আমার মাতুলানী সেই গৃহে আগমন করিলেন, এবং আমার ক্রোড়ে কন্যাকে দেখিয়া যেন কিছু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, পরে বলিলেন, "এখনকার মেয়েদের রীতি প্রকৃতিই যেন কি রকম? মরণ আর কি? বিয়ে হবে—কত সুখে থাক্‌বেন, তা না কেঁদে কেঁদে মরছেন, যেন পুত্তুর শোক পড়েছে।" মামীর কন্যার প্রতি এমন স্নেহসম্ভাষণে আমার ভয়ানক বিরক্তি বোধ হইল, তথাপি তাঁহার উপর আমার কিছু বলা উচিত নহে—বিবেচনায় অতি কষ্টে চুপ করিয়া গেলাম। বেশ ভদ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ মামী মা! কমলের বিয়ে হবে কার সঙ্গে ?"

মাতুলানী যাইতেছিলেন, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তা শোন নি? রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক্ হ'য়েছে—তার অবস্থা বেশ ভাল,—অনেক গহনা গড়িয়েছে—"রত্নেশ্বর" শুনিয়াই আমার প্রাণটা যেন শিহরিয়া উঠিল, তাঁহার আর কোনও কথা শুনিবার ইচ্ছাও রহিল না। বলিলাম, "কোন রত্নেশ্বর? যাঁহার দেশে ভয়ানক দুর্নাম হওয়াতে কিছুদিন দেশত্যাগী হইয়া লুকাইয়া ছিলেন, তিনি নয়তো? আর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে কমলের বিয়ে

কি ক'রে হবে ? তিনি শ্রোত্রিয় না ? তাঁর সঙ্গে কি কুলীনের মেয়ের বিয়ে হয় ?"

মামীমা আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া, তাঁহার অসমাপ্ত গহনার গর্ব্বটুকু হৃদয়ে গোপন করিয়া আমার প্রতি বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। আমি কমলার সেই ক্ষীণ দেহখানি বক্ষে লইয়া অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

(২)

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার বক্ষে মস্তকটী রাখিয়া কমলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক প্রবোধ বাক্যের পর সে যখন উঠিয়া বসিল— তাহার সুনীল চক্ষু দুইটি যেন রক্তোৎপলের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। উন্মাদিনীর ন্যায় দীপ্ত চক্ষে সে আমার দিকে চাহিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইল, তাহার সে দৃষ্টিতে আমি শিহরিয়া উঠিলাম, বুঝিলাম প্রাণের অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে না পারিয়া কমলা এ ভীষণাকৃতি ধারণ করিয়াছে। তখন আবার তাঁহার মাথাটি বুকে টানিয়া লইলাম, এবং সস্নেহে তাহার আলুলায়িত কেশরাশি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম "কমল। তোর কি হয়েছেরে ? কেন এত কাঁদছিস্! বল্‌বিনে ?"

কমলা তেমনই মাথা না তুলিয়াই অস্ফুটস্বরে বলিল,—"দিদি! আগে যদি আস্‌তে!"

আমি। আগে এলে কি হ'ত বোন্? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, এ বিয়েতে কি তোমার মত নাই ?

কমলা। মত কি দিদি ? তুমি কি জান না ?

আমি। কি জান্‌ব কমলা ? মামী-মার মুখে তো শুন্‌লাম—রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বিয়ে হবে, তিনি তো মামার চেয়েও বয়সে বড়, কেন এ বিয়ে হ'চ্ছে—তা তো বুঝি না।

"শুধু কি বয়সে বড় দিদি ? তুমি জান না"—বলিয়া কমলা আবার কাঁদিয়া ফেলিল, আর কিছু বলিতে পারিল না।

আমি জানিতাম, সেই রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তী যৌবনকালে নানাপ্রকার কুক্রিয়াসক্ত ছিলেন, বোধ হয় তজ্জন্য এতদিন বিবাহও হয় নাই, হঠাৎ এ পরপারের যাত্রী হইয়া তাঁহার বিবাহে প্রবৃত্তি জন্মিল কেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "তুমি যদি অত

কেঁদেই অস্থির হও, তবে আর আমার কিছু শোনা হয় না, কোনও উপায় ও চেষ্টা করা হয় না, সব আমাকে বল দেখি যদি কিছু পারি।"

আমার কথা শুনিয়া কমলা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল, তাহার প্রাণে বুঝি একটু আশারও সঞ্চার হইল, নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের ন্যায় সে যেন আমাকেই একমাত্র অবলম্বন মনে করিয়া নতমুখে বলিল,—"দিদি! বাবা আমাকে অনেক টাকার লোভে বিক্রী কচ্ছেন।"

"সে কি? তা কি হয়? আমি বাল্যাবধি প্রায়ই বিদেশে বিদেশে থাকি, সমাজের কোনও নিয়ম বিশেষ জানি না। আমার পিতা একজন বড় কুলীন, আমাকেও বহু অর্থ ব্যয়ে কুলীনের ঘরে বিবাহ দিয়াছেন। কন্যার বিবাহে টাকা দিতে হয় তাহাই জানিতাম, জামাতার নিকট হইতে কন্যার পিতা যে অর্থ লইতে পারেন, তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।" কমলা বলিল "হয় কি না জানিনে, কিন্তু এখানে তাই হচ্ছে।"

আমি। আচ্ছা মামাই যেন টাকার লোভে এ বিয়ে দিচ্ছেন, মামী কোন প্রাণে তোমাকে ঐ পাত্রে বিয়ে দিতে সম্মত হ'লেন?

"কি জানি দিদি, আমি বুঝি তাঁদের গলগ্রহ হ'য়েছি"—কমলার চক্ষু আবার জলে ভরিয়া গেল। আমি বলিলাম "আমিতো কিছুই বুঝ্লাম না, মার কাছে শুনে আমি তারপর দেখি কিছু পারি কি না।" আমার যে এ সম্বন্ধে কতদূর ক্ষমতা তাহা বোধ হয় সে সময় আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম না, তাই বার বার তাহাকে বৃথা আশায় আশ্বস্ত করিতেছিলাম। আমার একমাত্র ভরসা স্বামী ও পিতা, তাঁহারা উভয়েই অনুপস্থিত, আর তাঁহারা উপস্থিত থাকিলেই বা এমন নিষ্ঠুর পাষাণ পিতামাতার এই পৈশাচিক কার্য্যের কি প্রতিকার করিতে পারিতেন, তাহাও বুঝি তখন বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

আমি মাতার কাছে যাইব ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখি, একজন ভৃত্য একখানা রৌপ্যনির্ম্মিত থালায় কতকগুলি অলঙ্কার ও একখানি উৎকৃষ্ট বেনারসী শাড়ী লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, আর একজন নানাবিধ মিষ্টান্ন-পূর্ণ দুইখানা থালা, তৎপশ্চাতে সহাস্য-বদনে মামীমা ও গম্ভীর বদনে মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাস্থানে থালাগুলি রক্ষিত হইলে মামীমা থালাবাহকদের বক্‌শিশ্ দিয়া বিদায় করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌ছিস্ প্রভা! গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসেছে, আমাদের ফরিদপুর জেলায় কক্‌খনো এ নিয়ম

নেই, জামাই কিনা অনেকদিন কল্‌কাতায় ছিলেন, তাই সব শিখে এসেছেন।"

তাঁহার মুখে যেন হর্ষ উছলিয়া উঠিতেছে, কমলা তাহা দেখিয়া দ্বিগুণ বেগে কাঁদিয়া উঠিল। আমারও ঐ সকল দ্রব্যাদি দেখিয়া অতিশয় বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল, মামীমাকে কিছু না বলিয়া মাকে বলিলাম "মা! এ সব কি? কমলা কেঁদে কেটে অস্থির হচ্ছে, তবুও এই ছাই ভস্মের লোভে তাকে এই স্থানেই বিয়ে দিতে হবে?"

ক্রোধে মামীমার চক্ষু লাল হইয়া উঠিল, বলিলেন,—"কি সব অশুভক্ষুণে কথা? ঠাকুরঝী, তোমার মেয়ের কি এসব রীতি ভাল?"

আমার প্রতি মামীমার বিরক্তিতে মাতাও যেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন, আমাকে বলিলেন—"প্রভা! ও কথা বল্‌তে নাই—এসব শুভকায, আর ও কাঁদেই বা কেন?"

মার এ সরলতা আমার আদৌ ভাল লাগিল না। আমি জানিতাম—মা আমার উন্নতহৃদয়া, কিন্তু কাহারো কোনও প্রকার গোলমালে থাকিতে ভাল বাসিতেন না। আমি মায়ের কথার আর কি উত্তর দিব, আমার স্নেহময়ী মা কি এখনো বুঝিতে পারেন নাই, কমলা কাঁদে কেন?

মা আবার বলিলেন "নে এখন ওকে কাপড় চোপড় পরিয়ে দে, বাপ্‌ মাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে কষ্ট হচ্ছে, তা তো সকলেই যেয়ে থাকে, তোরতো এ খুব কাছেই হ'ল, ছিঃ মা, কাঁদ্‌তে নাই।" মাতা নিজেই কমলাকে উঠাইতে গেলেন। আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম,—"মা, তোমারো কি বুদ্ধি সুদ্ধি সব গেল? তুমিও কি গহনা কাপড় দেখে ভুলে গেলে?"

"কেন? কেন? কি হয়েছে?" বলিয়া মা প্রসারিত হস্ত সরাইয়া লইলেন। আমি বলিলাম, "তুমি শোন নাই কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে? এ বিয়েতে ওর ইচ্ছে নাই, তাই ও কাঁদ্‌ছে।"

মা একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "বিয়েতে আর বাঙ্গালী মেয়ের ইচ্ছা অনিচ্ছা কি মা? তবে ছেলেটির বয়স একটু বেশী, তা আর কি হবে? উপায় তো নাই, খাওয়া পরার কোনও কষ্ট হবে না।"

আমি বিস্মিত হইয়া জননীর দিকে চাহিলাম, তখন আমার হেম বাবুর উন্মাদিনীর কথা মনে পড়িল—

"বিবাহিতা নারী সখের খেলনা,
খায় দায় পরে নাহিক ভাবনা।
জানে না ভাবে না প্রণয় কেমন,
প্রাণের বল্লভ পতি কিবা ধন!"

একটু নীরবে থাকিয়া প্রাণকে একটু সংযত করিয়া শেষ উপায়ের উদ্দেশ্যে বলিলাম—"মা! তোমারো কি এখানে এসে জ্ঞান বুদ্ধি সব গেছে? তুমি মামাকে বল না, এ সব জিনিষ ফিরিয়ে দাও না, দেশে যদি ভাল ছেলে না পাওয়া যায়, আমরা ওকে নিয়ে যাই, এক রকম করে ওকে সুপাত্রে বিয়ে দেবই দেব।"

আমার কথায় মার মন যেন কেমন হইয়া গেল, তিনি আমাদের কাছে বসিয়া পড়িলেন এবং ধীরে ধীরে কমলার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মামীমা এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন, আমার শেষ কথা তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইল, ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "আহা! কি আমার আত্মীয়-সকল এসেছেন রে! যেমন কর্ত্তার বুদ্ধি! এই সব নিয়ে এসে মেয়েটাকে শুদ্ধ নষ্ট কচ্ছে।" মামীমা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। মা আস্তে আস্তে বলিলেন "কি করবো বাছা? আমি আজ সবে এ'লাম, বিয়ের সমস্ত প্রস্তুত, এখন কোনও বাধা দিতে চেষ্টা কর্লে তিনি তো আমার কথা রাখ্‌বেন না, বেশীর ভাগ আমার উপর বিরক্ত হবেন, আর তাঁর মুখও তত ভাল নয়, তার পর বউ গিয়ে এতক্ষণ কত লাগাচ্ছে।"

সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, তনয়ার অশ্রুজলে দৃক্‌পাত না করিয়া আমার মাতুলমহাশয় সেই পরলোকযাত্রী রত্নেশ্বরের হস্তে স্নেহময়ী কন্যাকে চিরদিনের জন্য সমর্পণ করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, কমলার ও তৎসঙ্গে আমারও একমাত্র অশ্রুজল ব্যতীত আর অবলম্বন রহিল না।

বঙ্গদেশের প্রথানুসারে বাসি বিবাহের দিন—অর্থাৎ বিবাহের পর দিন বর-কন্যা স্বতন্ত্র বাস করিয়া থাকে, এ বাড়ীতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। আমি সন্ধ্যার পরে মাতার সহিত একটি ঘরে শয়ন করিলাম। জানি না, কি ভাবিয়া কমলাও আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আমার নিকটে শুইতে চাহিল। উঃ! তাহার সেই যাতনাপূর্ণ বদনমণ্ডল, সেই মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস আমি এখনো ভুলিতে পারি নাই। মাতা শয়ন করিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম "মা! আর এখানে থাক্‌বো না, চল না আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমরা যাই।"

মা বলিলেন, "আজ আর না, কাল্‌কেই যাব, ভেবেছিলাম মাসখানেক দাদার কাছে থাক্‌বো, তা আর ইচ্ছে নাই।"

কমলা বলিল, "দিদি! আর তো দেখা হবে না থাক না দুদিন্, তবু তোমার কাছে থাকৃতে পাব।"

আমি তাহার সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "তুমিতো বোন্ কাল্‌কেই স্বামীর বাড়ী যাবে, আমি এখানে কেন থাক্‌বো?" কমলা আবার উচ্ছ্বসিত বেগে কাঁদিয়া উঠিল। তখন মা বলিলেন "ছি মা, কাঁদ্‌তে নাই, যা হ'য়েছে সেই ভাল।" কিন্তু কমলাকে স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বুঝি মাতারও সামর্থ্য ছিল না। আমি কমলাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য মাতাকে প্রসঙ্গান্তরে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিলাম, "আচ্ছা মা! তোমরা তো বল কুলীনের মেয়ে ছুরিত্তিরে বিয়ে হ'লে কুলীনের জাত্ যায়, তবে মামার জাত্ গেল না কেন?"

আমার কথায় মা একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"সে অনেক কথা বাছা! তোমার মামার যে কেন এমন দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল তা তো বুঝি না,আমার বাবার নাম উনি একেবারে ডোবালেন্।"

আমি আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন মা, এতে কি খুব দোষ হ'য়েছে?"

মা। দোষ কি? মহাদোষ! যারা এমন বিয়ে দেয়, বাবার মুখে শুনেছি তারা চিরদিন অনন্ত নরক ভোগ করে।

আমি। সে তো পরের কথা, শাস্ত্রে ইহার কি ব্যবস্থা আছে, তা কি তুমি জান?

মা। শাস্ত্রে এর আর কোনও ব্যবস্থা নাই, এটা মানুষের ইচ্ছাকৃত,—যারা মেয়ে বিক্রী করে অথচ নিজে সমাজে কুলীন বলিয়া পরিচিত হ'তে চায়, এটা তাদেরি রচিত ব্যবস্থা। প্রথমে কুশ দিয়ে একটা মানুষের মূর্ত্তি গড়ানো হয়, তার একটা কাল্পনিক নাম-করণ করে, সেই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক বিয়ের মন্ত্র পড়াইয়া মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়, পরে সেই মূর্ত্তি জলে ডুবিয়ে দিয়ে, অর্থাৎ মেয়েকে বিধবা করে পুনরায় বিয়ে দেওয়া হয়, কোন হীনবংশের লোক মূল্যদ্বারা সেই পত্নী ক্রয় করে, শাস্ত্রানুসারে সে স্ত্রী অসিদ্ধ, তার হাতের জল পর্য্যন্ত অশুদ্ধ।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া কমলা যেন কি একপ্রকার অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া

আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমিও সে সময় অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মাতা কিছু অপ্রতিভ হইয়া নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

পরদিন যথাসময়ে 'বরক'নে' বিদায় হইল। কমলার সে সময়ের অবস্থা যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা জীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না। আমি তখন কেবলই ভাবিতে লাগিলাম, "একি কঠোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত! বাঙ্গালীর ঘরে নারীজন্ম গ্রহণ ঈশ্বরের কি ভয়ানক অভিসম্পাত! কতদিনে বাঙ্গালী এ বালিকাবধের পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে? অথবা বঙ্গবালা নিজের সুখদুঃখ সমুদায় বিধাতার চরণে সমর্পণ করিয়া ভাবিতে শিখিবে—

"পাবি অনায়াসে পতি কোন জন,
পাবি অনায়াসে অন্ন আচ্ছাদন,
তবে কেন এত মিছে বিবাদ"

ইহার পরে কিছুদিন আর তাহার কোনও সংবাদ লইতে পারি নাই। প্রায় ছয় সাত মাস পরে মাতার এক পত্রে জানিতে পারিলাম, কমলার স্বামী সেই বৃদ্ধ পরলোক গমন করিয়াছেন, এবং আমার মাতুল কন্যার অর্থাদি সহ কন্যাকে স্বীয় আবাসে লইয়া আসিয়াছেন। আরও শুনিলাম,--কমলা বিধবা, অলঙ্কার পড়িবার তাহার প্রয়োজন নাই বোধে, মাতুলপত্নী সেগুলি নিজের ও বধূদের ভিতরে ভাগ করিয়াছেন এবং নিজে তাহা পরিধান করিয়া নিজেকে সৌভাগ্যশালিনীও মনে করিয়া থাকেন। তারপর আর কিছু দিন পরে শুনিলাম, মাতুলানী স্বর্গগতা, তাঁহার পুত্রবধূ, পুত্র ও মাতুল মহাশয়ের অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় কমলা উদ্বন্ধনে সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করিয়াছে।

শ্রীকুমুদেন্দু দেবী।

কিছু নাহি চাই।

থাকে উচ্চে সুনীল গগন,
নিম্নে থাকে শুধু নীল জল,
চাঁদের আলোক পড়ে গায়,
শব্দ-হীন জল কোলাহল।
এই বাড়ী—এই ঘর, দ্বার—
হ'য়ে যায় কোন জল যান!
ভেসে চলি—তুমি আর আমি,—
তবে বুঝি শান্ত হয় প্রাণ।
অই যে ডাকিছে গাছে পাখী—
বউ কথা কও শুধু আজ।
এইরূপ ডাকে যেন সেই—
স্থির ধীর সাগরের মাঝ!
দে দোল দে দোল, দোল দোল
হাওয়া আসি তরণী দুলায়,
তব অঙ্কে শুধু শুয়ে আমি,—
আঁখি তব নয়ন ভুলায়।
আকাশ, সাগর হেসে হেসে,
লয়ে যদি ফিরে দেশে দেশে।
হিংসা দ্বেষ না পায় সন্ধান,
চেয়ে চেয়ে থাকে ব্যবধান।
পড়ে দাঁড় ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ ঝুপ্‌,
চেয়ে দেখি শুধু তব রূপ।
দুজনায় এই যোগ যদি—
তিলেকের তরে কভু পাই,
জীবনের সব সাধ মিটে;—
ফিরে আর কিছু নাহি চাই।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

ভালবাসা ও প্রেম।

(আমার অভিমত।)

বৈশাখমাসের 'অবসরে' শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার চিত্তোৎকর্ষ-সাধক প্রবন্ধ—"প্রেম ও ভালবাসা" সম্বন্ধে যে সুযুক্তি ও সুরুচিপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমাদের সাহিত্যে এরূপ প্রবন্ধের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে; কেননা, কুরুচিপূর্ণ নাটক নভেলের সমালোচনায় সময় নষ্ট করা অপেক্ষা কোন সারগর্ভ সদ্‌বিষয়ের আলোচনায় সময় যাপন করা সহস্র গুণে ভাল। যাহাতে নৈতিক উন্নতি হয়, যাহাতে আত্মার উর্দ্ধগতি হয়, যাহাতে জ্ঞানের অপকর্ষ না হইয়া বরং উৎকর্ষ সাধিত হয়, সেরূপ বিষয় আলোচনা করা ভাল নহে কি? যাহাতে হৃদয়ের তমোভাব বিদূরিত করিয়া সত্ত্ব-গুণের আধিক্য ঘটায়, সেরূপ বিষয়ের আলোচনা ভাল নহে কি? (এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সকলের রুচি একরূপ নহে বা সকলে একরূপ বিষয়ের আলোচনায় আনন্দোপভোগ করিতে পারেন না)। তবে মোটা-মুটি যতদুর বুঝি, তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে—জগতের অধিকাংশ সুধীবৃন্দের এই মত। কারণ যাহা ভাল—যাহা খাঁটি সত্য, সেই দিকেই লোকের মন অধিক আকৃষ্ট হয়। তাই বলিতেছি, আমাদের সাহিত্যে এরূপ প্রবন্ধের আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

নরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটা যে সুখপাঠ্য,—সুযুক্তি ও সুরুচিপূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রবন্ধটি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি, কিন্তু দুই একটি স্থলে নরেন্দ্রবাবুর সহিত ঠিক একমত হইতে পারি নাই; সেটা আমার অজ্ঞতার বা জ্ঞান-হীনতার পরিচায়ক কি না, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই; তাই সুধীবর্গের সমক্ষে প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।- অবশ্য আমি নরেন্দ্রবাবুর সহিত প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হই নাই, (সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখা ভাল) কারণ আমার ন্যায় সাহিত্য-বিদ্বেষী জ্ঞানহীন মূর্খের সেরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করাও বাতুলতার পরিচায়ক। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নরেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত স্থলে স্থলে আমার

মত-ভেদ ঘটিয়াছে। সে বিষয়ে যথাসাধ্য কিছু বলিয়া আমি 'প্রেম ও ভালবাসা' সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। নানারূপ কূটতর্ক বা যুক্তি দ্বারা নিজ মত স্থাপন করিয়া বাহাদুরী লওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে ভালবাসা ও প্রেম সম্বন্ধে আমার মনে যে ভাব উঠিয়াছে, কোনরূপ তর্ক বা যুক্তি দ্বারা তাহার মীমাংসা না করিয়া তাহাই সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমার এ দুঃসাহসিকতায় যে ভ্রম বা প্রমাদ দৃষ্ট হইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে আমার ভ্রম বা প্রমাদের জন্য আমি সুধীগণের নিকট ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারি। কারণ, সুধীশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র বাবু যখন অশেষ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াও আপনার কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া, পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রত্যাশা করিয়াছেন, তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি—কাণ্ড-জ্ঞান বিবর্জ্জিত জ্ঞানহীন মূর্খ আমি—আমি যে সুধীবৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

নরেন্দ্রবাবু প্রবন্ধের প্রথমেই 'প্রেম ও ভালবাসা'কে দুইটী স্বতন্ত্র জিনিষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু প্রেম ও ভালবাসা পৃথক্ হইলেও আমার মতে এতদুভয়ের পার্থক্য বড় বেশী নহে। জল ও বরফে যেরূপ পার্থক্য, ভালবাসা ও প্রেমেও ঠিক সেইরূপ পার্থক্য। যেমন জল রূপান্তরিত হইয়া বরফে পরিণত হয়, অর্থাৎ যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, সেইরূপ ভালবাসা রূপান্তরিত হইয়া অর্থাৎ গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। দুয়ে'রই উৎপত্তি স্থল মন। সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া তন্ময় হইতে পারিলে তবে প্রেম লাভ ঘটে ; আর ভালবাসার লক্ষ্যবস্তুতে আপনার ভালবাসা কেন্দ্রীভূত করিতে পারিলে তবে ভালবাসা পাওয়া যায়। ভালবাসা আয়াসলভ্য না হইলেও প্রেম যে-আয়াস-লভ্য, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভালবাসার উৎপত্তি স্থল যে চক্ষু এ কথা ঠিক যুক্তি সঙ্গত নয়। তাহা হইলে অন্ধ ব্যক্তি কখনও ভালবাসিতে পারিত না বা অপরের ভালবাসা লাভ করিতে পারিত না। ভালবাসায় যে চিরবঞ্চিত, প্রেমলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিতে পারে না। যে ভালবাসিতে জানে না, সে প্রেমে মাতোয়ারা হইবে কি রূপে ? বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যেরূপ এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করে, সেইরূপ প্রেমার্জ্জন করিতে হইলে প্রথমে পার্থিব ভালবাসা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অপার্থিব অর্থাৎ

স্বর্গীয় ভালবাসায় উপনীত হইতে হয় ; তৎপরে ঐ অপার্থিব ভালবাসা হইতে ক্রমে ক্রমে প্রেম লাভ ঘটিয়া থাকে। যেমন সোপানারোহণ করিতে হইলে একটার পর একটা ধাপে পা দিয়া ক্রমশঃ উঠিতে হয়, সেইরূপ প্রেমরাজ্যে উপনীত হইতে হইলে একটীর পর একটী স্তর অতিক্রম করিয়া চলিতে হয়। এক লম্ফেই গাছের আগায় চড়া যায় না ; চড়িতে হইলে আস্তে আস্তে—ধীর-মন্থর গমনে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে উঠিতে হয়। অন্ধ ব্যক্তি যে ভালবাসিতে জানে,—কবিবর মিল্টনের জীবনে তাহার প্রমাণ দেখুন। কবিবর ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে দৃষ্টিশক্তি-হীন হইয়া পড়েন। অন্ধ হইবার চারি বৎসর পরে কবিবর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে তিনি কখনও চক্ষে দেখেন নাই,কিন্তু তাহার সৌজন্যতায় ও গুণে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন নাই। (বলা বাহুল্য, অন্ধ কবির ভালবাসা স্বার্থ-শূন্য ও পবিত্র) তিনি স্ত্রীকে চক্ষে দেখিতে না পাইলেও প্রেমের চক্ষে তাহাকে নিয়ত দেখিতে পাইতেন ; সেই জন্য স্ত্রীর অদর্শন-জনিত খেদ কখনও করিতেন না। তিনি বলিতেন,—"মানস-চক্ষে আমি আমার স্ত্রীকে সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাইতেছি।" বিবাহের দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহার স্ত্রী প্রসব-বেদনায় কাতর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কবিবর স্ত্রীর মৃত্যুতে দুঃখিত না হইয়া বলেন,—"আমাদের পার্থিব সম্বন্ধ ফুরাইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সহিত যে প্রেমের বন্ধন ঘটিয়াছে, তাহা অবিচ্ছেদ্য। স্বর্গে আমাদের অবিচ্ছেদ্য মিলন অবশ্যম্ভাবী।"

And such as yet once more I trust to have
Full sight of her in Heaven without kestraint

"Milton"

এখন বলুন দেখি, অন্ধ মিল্টন কি ভালবাসিতে জানিতেন না ?—না তিনি প্রেমের আস্বাদন পান নাই ? অবশ্যই তিনি ভালবাসা জানিতেন। দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে যে ভালবাসিতে পারা যায় না, এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রম। ভালবাসার নিকট রূপ, যৌবন, সৌন্দর্য্য অতি তুচ্ছ,—অতি তুচ্ছ। তবে পার্থিব ভালবাসার নিকট সে গুলি আদরণীয় হইতে পারে।

ভালবাসা দ্বিবিধ—পার্থিব ও অপার্থিব অর্থাৎ স্বর্গীয়। পার্থিব ভালবাসা (যাহা আমরা সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাই) প্রধানতঃ রূপ, লোভ, মোহ (মায়া) ও আসক্তি এই কয়টি রিপু হইতে উৎপন্ন হয়। নরেন্দ্র বাবু যে

ভালবাসার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই শ্রেণীর। আর নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় ভালবাসাই রূপান্তরিত হইয়া প্রেমে পরিণত হয়।

প্রেম বলিলে আমরা প্রকৃতই কোন স্বর্গীয় বস্তু বলিয়া বুঝি। আর ভালবাসা বলিলে এখনকার পার্থিব ভালবাসার ছায়া আসিয়া পড়ে—তাই ভালবাসা কলঙ্কিত। কিন্তু ভালবাসা বলিলেও কোন স্বর্গীয় বস্তুর বিভাস আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা যদি স্বর্গীয় বস্তু না হইবে, তাহা হইলে অল্লাধিক পরিমাণে সকলের হৃদয়ে ইহার পরিস্ফুরণ দেখা যায় কেন ? ভালবাসা স্বর্গীয়,—ঐশ্বরিক—তাহা না হইলে উহার শক্তি কখনও সর্ব্বশরীরে বিরাজমান থাকিত না। ভগবান সর্ব্বময়—তাঁহার শক্তিও সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে, তাই ভালবাসার শক্তিও সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে। কিন্তু আজকাল, এই স্বর্গীয় ভালবাসা কতকগুলি অশিক্ষিত, কুসংস্কারান্ধ লোকের হস্তে পড়িয়া কলঙ্কিত হইতে বসিয়াছে। নরেন্দ্রবাবুও স্বীকার করিয়াছেন যে, "যে বস্তুর উৎপত্তি ভগবানের সহিত জড়িত, তাহা কখনও কোনরূপে কলুষিত বা দোষাবহ হইতে পারে না।" ভালবাসায়ও ভগবানের শক্তি বিজড়িত দেখা যায়, সুতরাং ভালবাসাও কদাপি দোষাবহ বা কলঙ্কিত হইতে পারে না। (ভালবাসা বলিতে আধুনিক পার্থিব ভালবাসা বুঝিবেন না)। দুর্দ্দান্ত কালের প্রচণ্ড গতিতে কলুষিত বা বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা কলঙ্কশূন্য—পবিত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য, প্রেম জন্মে কিরূপে ? প্রথম অবস্থাতেই দুইটী হৃদয়ের মিলন বা সংমিশ্রণ হওয়া একান্ত অসম্ভব। প্রথমতঃ পার্থিব ভালবাসা (রূপ, লোভ, মোহ এবং আসক্তি হইতে যাহা জন্মে) জন্মে। গুণে বা রূপে আকর্ষিত হইয়া একের হৃদয় অন্যের প্রতি আসক্ত হয়, তখন বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়—উহার মূলে স্বার্থ আছে। কিন্তু যখন ঐ আসক্তি স্বার্থশূন্য, কামনাশূন্য ও স্পৃহাশূন্য হয়, তখন উহা ভালবাসায় পরিণত হয়। আবার ঐ ভালবাসা যখন ভগবানে কেন্দ্রীভূত হইয়া গাঢ় হয় ও জগন্ময় পরিব্যাপ্ত হয়—অর্থাৎ সর্ব্বজীবে ভগবানের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, তখন উহা প্রেমে পরিণত হয়। প্রেমের কখনও বিলয় হয় না। প্রেমের প্রভাব জন্ম জন্মান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আসক্তি কিরূপে প্রেমে পরিণত হয়, তাহা চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের আখ্যায়িকায় প্রমাণীকৃত হইতে পারে। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি নাম্নী কোন বেশ্যার রূপ যৌবনে আত্মহারা

হইয়া তাহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন। কয়েক বৎসর পরে ঐ আসক্তিময় প্রণয় ভালবাসায় পরিণত হইল ; আর তাহার রূপ যৌবন উপভোগের বাসনা রহিল না—চিন্তামণির উপর তাহার প্রকৃত ভালবাসা জন্মিল। তারপর একদিন বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির মুখে সুধামাখা হরির নাম শ্রবণ করিয়া হরিতে তন্ময় হইয়া পড়েন। এইরূপে প্রেমবিহ্বল বিল্বমঙ্গল ভগবানের কৃপালাভ করিয়া চরিতার্থ হন। সংসারের আসক্তিময় ভালবাসা এইরূপে আস্তে আস্তে নির্ম্মলতার দিকে অগ্রসর হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। ভগবানের প্রেম-তত্ব বুঝিয়াছেন, এরূপ লোক জগতে কয়জন মিলে ?

বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে, রাধাকৃষ্ণের বা রামসীতার প্রেম—যাহা জগতে আদর্শ-প্রেম বলিয়া কথিত হয়,—ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিলে তাহাতেও মান, অভিমান ও স্বার্থের অস্পষ্ট ছায়া পরিলক্ষিত হয়। শ্রীরাধিকার মান-ভঞ্জন তাহার জলন্ত প্রমাণ। সীতা-চরিত্রেও এরূপ অভিমানের ছায়া কিছু কিছু দেখা যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞকালে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে সর্ব্বজন-সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা আপনার নির্ম্মল চরিত্রের পরিচয় দিতে বলেন। সীতাদেবী পূর্ব্বে একবার কঠোর অগ্নিপরীক্ষা দিয়াছিলেন। পুনরায় অগ্নিপরীক্ষার কথা শুনিয়া মনে করিলেন, সকলেই তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছেন। তিনি পুনরায় অগ্নিপরীক্ষা দিতে অস্বীকৃতা হইয়া অভিমানভরে ধরিত্রীগর্ভে লুক্কায়িত হইলেন। ইহা কি অভিমানের পরিচায়ক নহে ? চৈতন্যদেব বা বিল্বমঙ্গলের প্রেম জগতে আদর্শ বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে। প্রেম আদান-প্রদান, মান-অভিমান, ভয়-ভাবনা, লজ্জা-সরম—এসব কিছু জানে না। প্রেম প্রতিদান কিছুই চায় না ; প্রেম চায়—কেবল আত্মবিসর্জ্জন দিতে। সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দেওয়াই প্রেমের ধর্ম্ম।

আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—নরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "ইতর প্রাণীর সহিত ভালবাসা হওয়া সম্ভব, কিন্তু প্রেম হওয়া সম্ভব নহে। কুকুরকে ভালবাসা যায়, কিন্তু তাই বলিয়া তার সঙ্গে প্রেম করা যায় না"। আমার মত ঠিক তা নয়। আমি বলি, কুকুরকে যদি ভালবাসা যায়, তবে তার সঙ্গে প্রেমও অবশ্য করা যায়। আমার মতে—আপনি কুকুরকে যে ভাবে ভাল বাসেন, সে ভাবে তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায় না ; কেন না, প্রকৃতই যদি আপনি আপনার কুকুরকে ভালবাসিতেন, তাহা হইলে আপনার সাধের

কুকুরের মৃত্যুর পর অন্য একটি কুকুর অন্বেষণ করিতেন না, বা দু'দিন শোক করিয়া তাহাকে ভুলিয়া যাইতেন না। ভালবাসা কখনও দুই দিনে ভুলিয়া যাওয়া যায় না। সুধীবৃন্দ এরূপ ভালবাসাকে মোহ বা মায়া বলিবেন না কি? সেইরূপ আপনার সুন্দর পাখীটীকে আপনি ভালবাসেন—হঠাৎ আপনার পাখীটী মরিয়া গেল; আপনি কিছুক্ষণ শোক করিয়া আর একটী সুন্দর পক্ষী আনিয়া সে স্থানে রাখিলেন, একের অভাব অন্যের দ্বারা পূর্ণ করিলেন। এস্থলেও পূর্ব্ব মত স্বীকার্য্য নহে কি?

কোন ভোজনশীল ব্যক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট মিষ্টান্ন খুব অধিক পরিমাণে আহার করেন। ইহার সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ আছে কি? এরূপ ভালবাসা আসক্তি বা লোভ নহে কি? আর অধিক কিছু বলিতে চাই না, এখন সুধীগণ বা 'অবসরের' প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ বিচার করিয়া দেখুন, আমার মত সমীচীন কি না?

শ্রীবিজয়গোপাল বক্সী।

অপ্রকাশ।

(Modest Merit)

উজ্জ্বল কিরণ-দীপ্ত বহু রত্নরাজি
রয়েছে সাগর-গর্ভে বহুরূপে সাজি,
অদৃষ্টেতে জন্ম লয়ে কত শত ফুল,
সাজাইছে ধূ ধূ মরু প্রকৃতির দুল!
বিতরিছে নিজ-গন্ধ মরু সমীরণে,
সেইরূপ বহু ব্যক্তি আছেন গোপনে!

শ্রীভূপতিতোষ রায়।

সাধনায় সিদ্ধি।

(১)

"মাগো সর্ব্বমঙ্গলা, মনস্কামনা সিদ্ধি কর মা"? এক বৃহৎ অট্টালিকার কোন নিভৃত কক্ষে বসিয়া একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা এইরূপ প্রার্থনা করিতেছিল।

তখনও প্রভাত হয় নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল উষারাণী অনতি-বিলম্বে ধরাবক্ষে পদ-বিক্ষেপ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বিহগকুল অস্ফুট কাকলী ধ্বনিতে নূতন প্রভাতকে আবাহন করিতেছিল, আর প্রভাতী স্নিগ্ধ বায়ু সাধুপ্রকৃতি মানবের ন্যায় সমস্ত হৃদয়খানি কুসুম সৌরভে পূর্ণ করিয়া বুঝি রোগার্ত্তের রোগ-যন্ত্রণার ও শোকার্ত্তের মর্ম্মবেদনার উপশম করিবার জন্য ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল।

বালিকার নাম কমলা। কমলা দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা। খুলনা জেলায় পদ্মপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামে কমলার পিতা শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের বাসস্থান। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা ধনীই হউন, আর নির্ধনই হউন, প্রায় সকলেই নানারূপ বিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহে বসিয়া ভক্তি-সহকারে ভজনা করিতেন। শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে বহুকালের প্রতিষ্ঠিত দেবী আদ্যাশক্তি বিরাজ-মানা। এখনকার ব্রাহ্মণেরা কেহ ইচ্ছা করিয়া গৃহে দেবতার প্রতিষ্ঠা তো করেনই না, তবে যদি বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে নিতান্ত অভি-সম্পাতের ভয়ে হউক, আর চক্ষুলজ্জার খাতিরে হউক, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির মত দুটী তণ্ডুলকণা কোন প্রকারে উৎসর্গ করেন মাত্র, কিন্তু পূজাকালে তাঁহাদের মুখে ভক্তির চিহ্ন দেখা যায় বলিয়া মনে হয় না। শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সামান্য যাজন-ক্রিয়া করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, কোন বস্তুই দেবীকে উৎসর্গ না করিয়া তিনি গ্রহণ করিতেন না এবং দিবসের তিনভাগ সময় তিনি দেবীমন্দিরেই অতিবাহিত করিতেন।

ধরণীবক্ষে তরুণ অরুণালোকের মত কমলার যখন প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছিল, সেই সময়ে কে যেন তাহার সমস্ত হৃদয়খানি জুড়িয়া মায়ের মূর্ত্তি আঁকিয়া দিয়াছিল। তাই পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা পূজার সময় হইলে খেলা ধূলা ফেলিয়া, নীরবে মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া থাকিত এবং পিতার

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক অর্ঘ্যাদি দান দেখিয়া ও সুললিত ছন্দে মাতৃ-বন্দনা শ্রবণ করিয়া প্রাণে কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিত। স্তবাদির ভাবার্থ যদিও সে বুঝিতে পারিত না, তথাপি আবৃত্তি করিতে ক্রটী করিত না। আরতির সময় পিতার হস্তস্থিত ঘণ্টার সহিত তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী যেমন তালে তালে আনন্দে নাচিয়া উঠিত, বোধ হয় শতবর্ষ পূজা করিয়াও কোন সাধকের তেমন আনন্দ—তেমন তৃপ্তি হইত না। কমলার পিতা বালিকা কন্যার এরূপ ভক্তি ও একাগ্রতা দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইতেন।

(২)

দুই বৎসর পূর্ব্বে এক চন্দ্রকরোদ্ভাসিত বাসন্তী রজনীতে সেই গ্রামের জমীদারপুত্র সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কমলার বিবাহ হইয়াছে। তখন সত্যচরণ কলিকাতায় কলেজে এল, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। কমলার পিতা একমাত্র সন্তান স্নেহের পুতলী কমলাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়া বড় সুখী হইয়াছিলেন, কিন্তু কমলা বিবাহের পরে শ্বশুরবাটীতে আসিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে পিতৃগৃহে ফুল তুলিত, চন্দন ঘসিত, পূজার গুছাইত এবং মায়ের ভোগান্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করিত, কিন্তু এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে দেবীমূর্ত্তি নাই—পূজা অর্চ্চনাদি নাই, আছে কেবল কমলা যাহাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, সেই বিলাসিতা।

তাই দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদে আসিয়া, বহুমূল্য বসন ভূষণ, দাস দাসী, পাচকের প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি, নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াও কমলা সুখী হইতে পারিল না। স্বচ্ছ শীতল বারিপূর্ণ স্ফটিকাধারে রক্ষিত মীন যেমন কর্দ্দমাক্ত বারিধিবক্ষে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়; কমলা পিতৃভবনের ক্ষুদ্র কুটীরাভ্যন্তরে দেবীমূর্ত্তির আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য তেমনি লালায়িত হইল, কিন্তু হায়, উপায় নাই—সে যে পরাধীন। কমলা স্বামী-গৃহে আসিবার সময় তাহার মাতা বলিয়া দিয়াছেন "মা! সাবধানে স্বামীর সংসার করিও, হিন্দুনারীর পতিই উপাস্য দেবতা। শৈশবে পিতা মাতা, যৌবনে স্বামী, বার্দ্ধক্যে পুত্র হিন্দুনারীর একমাত্র অবলম্বন, সাবধান মা শাস্ত্রের অমান্য করিও না!" মায়ের এই সারগর্ভ উপদেশ তাহার প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের ফলে কমলা তাহা পালন করিতে পারিল না, কারণ সত্যচরণ ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষপাতী।

পবিত্র হিন্দুকুলশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে কিম্বা দীর্ঘপ্রবাসী বলিয়া সত্যচরণের মনের ধারণা,—হিন্দু ধর্ম্ম—কুসংস্কার! হিন্দুর আচার ব্যবহার, রীতি নীতি সকলই মিথ্যা। দুই এক জন ব্রাহ্ম-বন্ধুর প্ররোচনায়, তাহার এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই সে পিতৃ-পিতামহ-সেবিত পবিত্র হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শব্দের পুনরাবৃত্তি করিল, এবং সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলেও রীতিমত ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিত, ব্রাহ্ম-সঙ্গীত ও উপাসনা শিক্ষা করিতে সে বেশ আনন্দ উপভোগ করিত।

(৩)

সম্মানের সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে সত্যচরণ যখন দেশে ফিরিল, তখন সর্ব্ব প্রথমে কমলার ব্যবহার তাহার নিকট বড়ই অশান্তিকর বলিয়া মনে হইল। কমলা,—যে তাহার অনুর্ব্বর মরুতুল্য হৃদয়ের আনন্দ-নির্ঝরিণী, যাহাকে লইয়া তাহার সংসার, যাহাকে ভালবাসিয়া তাহার আনন্দ, যাহার প্রতি তাহার পিতৃ-মাতৃহীন জীবনের সকল সুখ-দুঃখ ন্যস্ত, সেই কমলা যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুদের অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে যে তাহার আর ক্ষোভের সীমা থাকিবে না।

সত্যচরণ মনে করিয়াছিল,—বাটী আসিয়াই একটী নিভৃত কক্ষ উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবে এবং সকালে সন্ধ্যায় তাহারা দুই জনে পরম পিতা পূর্ণ-ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। প্রভাতের বালারুণ, চঞ্চল শিশুর মত কমলার সর্ব্বাঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইবে, আর সন্ধ্যার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোক কমলার লালিত্য-মাখা বদনমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ করিবে; সে যে কত সুখ-কত আনন্দ, সত্যচরণ সেই নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করিবার জন্য বড় লালায়িত হইয়া উঠিল। তাই একদিন কমলাকে নির্জ্জনে পাইয়া সাগ্রহে বলিল—"দেখ কমল! স্বামী যাহা ভালবাসে না, স্ত্রীর কি তাহা করা উচিত?"

কমলা ম্লান বদনে বলিল "না।"

"তবে আমি যাহা ভালবাসি না, তুমি তাহা কর কেন?"

কমলা কোন উত্তর করিল না বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র প্রাণ যেন বলিতেছিল "এক দিন তুমি ভালবাসবে সেই আশায়।"

মনের কথা অনেক সময় মুখে প্রকাশ হইয়া যায়, তাই কমলার অনিচ্ছা

সত্ত্বেও দৈবক্রমে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল,—"একদিন তুমি ভালবাসবে সেই আশায়।"

উত্তেজিত কণ্ঠে সত্যচরণ বলিল "সে আশা ত্যাগ কর কমলা! তুমি স্বপ্নেও ভেবোনা যে, বালকের মত পুতুল খেলা করে আমি জীবনের অমূল্য সময় গুলো নষ্ট কোরব! যারা মূর্খ—যারা অজ্ঞান, তারাই চিরদিন আঁধারে ডুবিয়া থাকিবে, কিন্তু সে আঁধার সকলের জন্য নয়।"

কমলা তেমনি ম্লান মুখে বলিল "সে কালের মুনি-ঋষিরা কি মূর্খ—

বাধা দিয়া সত্যচরণ বলিল "মূর্খ নয়তো কি? মানুষের স্ব-ইচ্ছায় তৈয়ারি একটা মাটির পুতুল যাহাদের মোক্ষদাতা, আর সেই পুতুল পূজা করিয়া যাহারা ধন্য হয়, তাহারা মূর্খ নয়তো মূর্খ কে? দেখ কমলা! দরিদ্রতায় হীন-বুদ্ধি পিতার আশ্রয়ে থেকে যা করেছ বেশ, কিন্তু এখন সে সঙ্কল্প ত্যাগ কর, তুমি আমার পরিণীতা পত্নী; ভাল হউক আর মন্দই হউক—আমি যে পথে অগ্রসর হইব, বাধ্য হইয়া তোমাকে সেই পথে যেতে হবে, তাই বল্‌ছি—এখনও সাবধান হও, আমার কথা মত চল্‌তে চেষ্টা কর।"

"অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নাই, তোমাকে মিনতি ক'রে বল্‌ছি আর আমায় কিছু বলিও না, আমি মরিতেও প্রস্তুত, তবু অন্য দেবতার আশ্রয় লইতে আমার শক্তি নাই।" কমলার স্বর কোমল অথচ দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক।

"বেশ কথা, আজ হইতে আমারও প্রতিজ্ঞা,—যতদিন তুমি আমার মনের মত না হবে, তত দিন আমি তোমার মুখ দেখবো না।" বিরক্তি স্বরে এই কথা কয়টী বলিয়া সত্যচরণ সেখান হইতে চলিয়া গেল।

(৪)

তখন অপরাহ্ন। সূর্য্যদেব প্রখর কিরণে ধরণীতল উত্তাপিত করিয়া, রণশ্রান্ত বীরপুরুষের মত বিশ্রাম লালসায় পশ্চিম গগনের গোধূলি-শয্যায় আশ্রয় লইতেছিলেন। আর বৈশাখী প্রভঞ্জন, তপন-তাপে শুষ্ক পত্র-পুষ্প-নিচয়কে ও সুপক্ক ফলসমূহকে বৃন্তচ্যুত করিয়া কখন ধীরে ধীরে—কখনও দ্রুতগতিতে বহিয়া যাইতেছিল। অদূরে এক বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া একটী অভুক্ত ভিখারী বালক ধীরে ধীরে করুণ রাগিণীতে গাহিতেছিল—

তারা নামে এত দুঃখ
আগেতো জানিনি হায়;

তা হ'লে কি দিবানিশি
জপিতাম রসনায় ?
সে অভয় পদ-তরী
জীবন-সম্বল করি
(এবে) পাথারে ডুবিয়া মরি
কাঁদে হৃদি নিরাশায়।
লভিবারে পূর্ণ জ্ঞান
সে পদ করেছি ধ্যান,
(ওগো) তাহে যদি কাঁদে প্রাণ
(তবে) সে নামে কি ফলোদয় ?

সত্যচরণ চলিয়া গেলে কমলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় বসিয়া ছিল, সহসা ভিখারী বালকের সকরুণ গীত-ধ্বনি তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিল, সে ভাবিতে লাগিল,—ধন্য ভিখারী বালক, ধন্য উহার সহিষ্ণুতা, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছে "তারা" নামে কোন ফলোদয় নাই বলিতেছে, কিন্তু তবু আবার গাহিতে ছাড়িতেছে না। মা! ধন্য তোমার মহিমা! কমলার দুটী চক্ষু বহিয়া ভক্তির অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

তখন পতনোন্মুখ সূর্য্য-কিরণ নদীর জলে, গৃহ-প্রাচীরে ও বৃক্ষশাখায় উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল। ঊর্দ্ধে নীল অনন্ত আকাশ, কমলা তন্ময়-চিত্তে সেই দিকে চাহিয়া গান শুনিতেছিল। ইত্যবসরে সন্ধ্যার অন্ধকার চারি দিকে ঘনাইয়া আসিল দেখিয়া গায়ক ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেল, এবং সেই করুণ রস-মিশ্রিত সঙ্গীতালাপ ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসিল দেখিয়া কমলার চৈতন্য হইল। তখন সে চক্ষের জল মুছিয়া অসংখ্য তারকা-খচিত নীলাকাশের প্রতি চাহিয়া করযোড়ে বলিল,—"মা দয়াময়ি! পিতার নিকট শুনিয়াছি,—যে তোমাকে দুঃখে পড়িয়া ভক্তির সহিত ডাকে, তুমি তার সে ডাক শুনিতে পাও। কিন্তু মা, আজও তাহার সফলতা লাভ করি নাই, জানি না তোমার সন্তাপহারিণী নামের মাহাত্ম্য কি ?

(৫)

তারপর প্রায় এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘকাল এক বাটীতে অবস্থান করিয়াও সত্যচরণ কমলার সহিত দেখা করে নাই, অবশ্য ইহাতে তাহার বেশ একটু কষ্টও বোধ হইয়াছিল, কিন্তু উপায় নাই; কমলা তাহাকে

একদিনও ত ডাকিয়া পাঠাইল না; তবে কি সে নিজেই উদ্যোগী হইয়া কমলার অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। ক্ষুদ্র বালিকার এত তেজস্বিতা,—এত দৃঢ়তা শোভা পায় না! এই সকল ভাবিয়া সত্যচরণ মন স্থির করিল এবং দ্বিগুণ উৎসাহে উপাসনায় রত হইল।

ভক্তি স্বর্গের জিনিষ, তাহা সকলের হৃদয়ে থাকে না। ভক্তি হইতে বিশ্বাসের উৎপত্তি. সেই জন্য প্রকৃত ভক্তি যাহার অন্তরে বিরাজমান, সে যে দেবতাকেই আশ্রয় করুক না কেন, আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে চিরদিন তাঁহার আরাধনা করিয়া প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করে, আর ভক্তি-হীন মানব দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করা ত দূরের কথা, পরন্তু অনবধানতা নিবন্ধন প্রাণে একদিনের তরেও শান্তি পায় না। তাই বুঝি শাস্ত্রকার বলিয়াছিলেন—"ভক্তিতে মুক্তি, আর অভক্তিতে আসক্তি"।

সত্যচরণ যখন মুদিত-নেত্রে নিবিষ্ট-চিত্তে ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন তাহার শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনের মধ্যে বালিকা কমলার প্রভাত শিশির-সিক্ত সেফালিকার ন্যায় ম্লান মুখখানি উদিত হইয়া, তাহার সকল আয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। তখন বিরক্ত হইয়া সত্যচরণ ভাবিল,—"ভাল আপদ ঘরে আনিয়াছি, আমার সকল আশা পণ্ড করিল!" আর একবার ডাকিয়া দেখিব, এবার যদি না আসে, তাহা হইলে এই শেষ।

হায়, তরলমতি হিন্দু-যুবকগণ! তোমরা এই বলে বলীয়ান্ হইয়া কত অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হও! তোমরা নিজ জননীকে সামান্য মাতৃ-সম্বোধনে সন্তুষ্ট করিতে পার না, আর বঙ্গমাতার শোকাশ্রু মুছাইবার জন্য কত মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতার সৃষ্টি কর! নিজের সামান্য বিষয়টুকু রক্ষা করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই, কিন্তু স্বদেশ রক্ষার জন্য উন্মত্ত হইয়া তোমরা রণ-সজ্জার সজ্জিত হইতে কুণ্ঠিত হও না! কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমরা কখনও জয়লাভ করিতে পার নাই। তাই বলি, তোমাদের শোণিত সঞ্চালনে অসমর্থ দুর্ব্বল ধমনীর যাহা অসাধ্য, সে পথ পরিত্যাগ করিয়া সামর্থ্যানুগত পথে অগ্রসর হওরাই সর্ব্ববাদি-সম্মত।

(৬)

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোক ধীরে ধীরে হাসিতেছিল, আর সেই হাসি অঙ্গে মাখিয়া প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধা যেন কোন অভিনব আনন্দভরে সমীরণ স্পর্শে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল। এই সময়ে

সত্যচরণ সকলের অজ্ঞাতসারে নিঃশব্দে নিজ অন্দর-মহলে প্রবেশ করিল। কারণ, সে ভাবিয়াছিল যে যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে কমলাকে ডাকিবে, নচেৎ কায নাই। গর্ব্বিত সত্যচরণ তখনও প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের ভয়ে লজ্জিত হইতেছিল। সে ধীরে ধীরে কমলার শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া দেখিল—কমলা গৃহে নাই; সত্যচরণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল, ভাবিল—কমলা গেল কোথায়? শুধু কমলাকে আয়ত্তাধীন করিবার জন্যই সে এতদিন ভিতরে আসে নাই, কিন্তু কমলার সকল খবরই রাখিত, আজও একটী নূতন ঝী তাহাকে বলিয়াছে,—"মা-ঠাকরুণ বাক্স থেকে আজ মেলা গহনা বাহির করিয়াছেন, বুঝি আজ বাপের বাড়ী যাবেন।" সে সংবাদে সত্যচরণ হাসিয়াছিল, কারণ সে জানিত কমলার পিতা-মাতা আজ প্রায় দুই মাস হইতে চলিল ৺কাশীধাম গিয়াছেন।

সত্যচরণের এইবার সেই ঝীর কথা মনে পড়িল, ভাবিল—কমলা গহনা বাহির করিতেছিল কেন? সেতো গহনা পরা ভালবাসে না। তবে কি কমলা অবিশ্বাসিনী? সত্যচরণের চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, সে আর ভাবিতে পারিল না; তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। সে অধোবদনে অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া রহিল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়াও কমলাকে ফিরিতে না দেখিয়া, সত্যচরণ নিঃসন্দেহে কমলাকে অবিশ্বাসিনী স্থির করিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তখন জ্যোৎস্না ডুবিয়া গিয়াছে; চারিদিক অন্ধকার। সেই বিশ্বব্যাপী সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকারে মর্ম্মাহত সত্যচরণ ধীরে ধীরে আপন গন্তব্যস্থানে ফিরিয়া যাইতেছিল। সহসা পথিমধ্যে একটী ক্ষুদ্র কক্ষের রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্র-পথে ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখিয়া সত্যচরণ থমকিয়া দাঁড়াইল এবং আশা ও উদ্বেগের প্রবল ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ-চিত্তে স্খলিত-চরণে সেই কুটীরের দ্বারদেশে গিয়া উপনীত হইল ও শুনিতে পাইল—কমলা অনুচ্চস্বরে কাহার সহিত কথা বলিতেছে। সত্যচরণের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল, সেখানে দাঁড়াইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু কৌতুহল তাহাকে বাধা দিল, মানসিক উত্তেজনায় বিহ্বল হইয়া সত্যচরণ অগ্রসর হইয়া দ্বারের ছিদ্রপথে যাহা দেখিল, তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যস্থলে এক চতুষ্কোণ বেদীর উপর এক দেবীমূর্ত্তি, মূর্ত্তি শিল্পি-নির্ম্মিত নির্জ্জীব মূর্ত্তি কি বিধাতা-নির্ম্মিত সজীব মূর্ত্তি, তাহা সত্যচরণ বুঝিতে পারিল না; শুধু

দেখিল, নবনীরদ-নিন্দিত নীলাজের ন্যায় একখানি প্রতিভাময়ী দেবীপ্রতিমা! সম্মুখে একখানি আসনে কমলা উপবিষ্টা! সেই প্রতিমার অঙ্গে স্থানে স্থানে হীরক-খচিত নানাবিধ অলঙ্কার। সত্যচরণ বিস্ময়ের সহিত দেখিল, সেই অলঙ্কার-রাশি তাহার স্বর্গীয়া জননীর। কমলার গায়ে কোন গহনা নাই; পরিধানে শুধু একখানি পট্টবস্ত্র। অযত্নরক্ষিত কেশভার পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিয়া স্তবকে স্তবকে মুখের উপর পড়িয়াছে। প্রদীপের স্তিমিত-আলোকে সত্যচরণ দেখিল, যদিও কমলার মুখখানি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় ম্লান ও গম্ভীর, তথাপি তাহাতে যেন কেমন একটী স্নিগ্ধ পবিত্র জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতেছে। সত্যচরণ কমলাকে কখনও পূজার বেশে দেখে নাই, তাই আজ পট্টবস্ত্র-পরিধানা, আলুলায়িত-কুন্তলা গম্ভীরা কমলাকে দেবী-ভ্রমে সত্যচরণ আত্মহারা হইয়া গেল।

(৭)

ছিদ্রটী খুব ছোট। এক চক্ষু ভিন্ন দেখা যায় না, সেই এক চক্ষুর দৃষ্টিতে সত্যচরণের একবার বেদীস্থিতা মহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি, আর একবার আসনোপ-বিষ্টা সৌন্দর্য্যময়ী কমলা, কাহাকেও দেখিয়া সাধ মিটিল না। নীরব নিস্পন্দভাবে সত্যচরণ অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন কমলার পূজা বুঝি শেষ হইয়াছিল, তাই গললগ্নীকৃতবাসে অনুচ্চস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবীকে প্রণাম করিতেছিল—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥

সত্যচরণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কারণ সে জানিত—কমলা নিরক্ষর, কিন্তু এমন সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক সে কি করিয়া শিখিল? সত্যচরণ আর থাকিতে পারিল না, স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে ডাকিল—কমলা!

কমলা তাহা শুনিতে পাইল না। সে তখন প্রণাম মন্ত্র শেষ করিয়া, চন্দনরক্ষিত পুষ্প ও বিল্বদল মায়ের চরণে অর্পণ করিয়া ধীর অথচ সুললিত স্বরে গাহিতেছিল—

বাগীশ্বরি নমস্তুভ্যং জ্ঞানদে বরদাংবরে।
পরেশে পরমপ্রজ্ঞে শুভবুদ্ধিপ্রদায়িনি।

সুখদা মোক্ষদা প্রাণধনদাত্রী পরাৎপরে।
রাজরাজেশ্বরী ত্বং হি সর্ব্বসন্তাপহারিণি ॥

সত্যচরণ দেখিল—কমলার দুটী চক্ষু জলে পরিপূর্ণ; বুঝিল—সে অশ্রু কিসের! সে আবেগ-জড়িতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিল "কমলা, কমলা! দ্বার খোল; আমি আসিয়াছি।" এইবার কমলার ধ্যান ভাঙ্গিল এবং স্বর অপরিচিত নহে জানিয়াও বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে দ্বার খুলিয়া দেখিল—সম্মুখে তাহার স্বামী!

কমলার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল; কি সর্ব্বনাশ! এখনি যে তাহার বড় সাধের দেবী প্রতিমা পুষ্করিণীর অগাধ জলে ডুবিয়া যাইবে! সে আর ভাবিতে পারিল না, উন্মাদিনীর ন্যায় শূন্য দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সত্যচরণ করুণস্বরে বলিল—"তোমার ভয় নাই কমলা, আমি আর তোমাকে কিছু বলিব না, তুমি এ প্রতিমা কোথায় পাইলে?"

কমলা তেমনি নীরব—তেমনি নিস্পন্দ; বুঝি তখনও তাহার স্বামীকে বিশ্বাস হয় নাই।

সত্যচরণ উদ্বেলিত হৃদয়ে আবার বলিল, "বল কমলা! আমার এত তাড়নায় এত অত্যাচারে থাকিয়াও তুমি এ মনোমুগ্ধকরী দেবীপ্রতিমা কোথায় পাইয়াছ?"

(৮)

কমলা এইবার আশ্বস্ত হইল এবং ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা যখন ৺কাশীধাম যান, সেই সময় বলিয়া পাঠাইলেন,—'মা, আমরা রেলপথে ৺কাশীধাম যাইব, গৃহপ্রতিষ্ঠিত দেবতা বিধর্ম্মীদের স্পর্শ করিতে দেওয়া মহাপাপ; আর আমরাও বৃদ্ধ হইয়াছি, কয়দিনই বা বাঁচিব, অতএব যদি তুমি মাকে সেবা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে লইয়া যাও, মায়ের ইচ্ছায় তোমার অভাব নাই, মাকে সুখী রাখিও। আমি দরিদ্র, মাকে মনের মত সাজাইতে পারি নাই।' বাবার এই কথাগুলি শুনিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমার নিকট তিরস্কৃত হইবার ভয়ে গুপ্তভাবে দেবীকে গৃহে আনিয়াছি। এখানে আসিয়া যে সকল গহনা পাইয়াছি, তাহা আমার গায়ে শোভা পায় না, তাই আজ মায়ের শ্রী-অঙ্গে পরাইয়া দিয়া জন্ম সার্থক করিলাম।"

সত্যচরণ বলিল, "কমলা! ধন্য তোমার ভক্তি, ধন্য তোমার বিশ্বাস! তুমি ক্ষুদ্র বালিকা, কিন্তু তোমার ভক্তির তরঙ্গে আমার সকল শিক্ষা, সকল জ্ঞান তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছে। এস দেবি, আজ এই শুভদিনে তোমার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্মুখে আমার চির কলুষিত হৃদয়ে ভক্তির বীজ রোপণ কর! তোমার মায়ের পূজা আমাকে শিখাইয়া দাও; আজ হ'তে গর্ব্বিত—শিক্ষিত—সত্যচরণ তোমার মায়ের দাস মাত্র"—সত্যচরণের কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল।

কমলা স্বামীর মুখ মলিন ও বিশুষ্ক দেখিয়া বড় ব্যথা পাইল। পাইবারই কথা; যে প্রকৃত হিন্দুরমণী, সে স্বামীর নিকট শত সহস্রবার লাঞ্ছিত হইলেও কখনও স্বামীর ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না, ইহা হিন্দুনারীর স্বধর্ম্ম। তাই কমলা ত্বরিত হস্তে দেবীর চরণামৃত লইয়া সত্যচরণের মস্তকে দিয়া বলিল,—"আজ হ'তে মায়ের কৃপায় তোমার সকল অশান্তি দূর হইল।"

সেই দিন হইতে সত্যচরণের প্রধান কায হইল—মায়ের পূজা; বহু ব্যয় করিয়া সত্যচরণ মায়ের অঙ্গ আভরণে মণ্ডিত করিয়া দিল এবং সেই ক্ষুদ্র গৃহ হইতে মাতৃমূর্ত্তি আনিয়া এক প্রকাণ্ড মন্দিরে স্থাপিত করিল। বহুদিন পরে জমীদার-ভবনে আবার দেবতার প্রতিষ্ঠা হইল।

আর কমলা; বর্ষাশেষে শরতের শান্ত স্নিগ্ধ সূর্য্য-কিরণের মত কমলার বিম্বাধরে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল; বিবাহের পর স্বামিগৃহে এই তাহার প্রথম হাসি। যে দিন সে স্বামীর সহিত একাসনে দেবীপূজার অবকাশ পাইল, সেই দিন পূজা সমাপ্তে দেবীচরণে প্রণাম করিয়া সাশ্রুনয়নে গদ্ গদকণ্ঠে বলিল;—

মা ব্রহ্মময়ি; তুমি অন্তর্য্যামিনী, তোমাকে কি করিয়া জানাইব যে আজ আমি কত সুখী! মাগো; এতদিনে আমি পিতৃবাক্যের সাফল্য লাভ করিলাম। আমার চির সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মজুমদার।

ঠাকুর সদানন্দ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাধারাণী।

শ্রাবণ মাস, অবিশ্রান্ত বর্ষা, ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য; শৃগাল কুকুর প্রভৃতি গৃহস্থের আনাচে-কানাচে একটু শুষ্কস্থান দেখিয়া তথায় কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে; কেবল বৃষ্টির অবিরল-ধারাপাত-শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইতেছে না। মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝড়, সেও শোঁ শোঁ গোঁ গোঁ শব্দে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া গাছ-পালা ঘর-বাড়ী যেন উল্টাইয়া ফেলিয়া কোথায় ছুটিতেছে। জানালার ফাঁক দিয়া একটা দমকা বাতাস আসিয়া গৃহের প্রদীপটী সহসা নিবাইয়া দিল, চারিদিকে অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ করিতেছে, তখন রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকা; পঞ্চদশ-বর্ষীয়া একটী কিশোরী স্বামীর করযুগল ধারণ করিয়া করুণ ভাবে বলিতেছে,—"এমন সময় কি কেহ ঘরের বাহির হয়? একটু জল ধরুক, তারপর যাবেন।"

বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক নবীন যুবা কিশোরীর স্বামী বলিলেন,—"তুমিও যেমন পাগল, এ জল কি এখন ধরবে! আর জল হচ্চে তা আমার কি? ঠাকুরের কৃপায় আমার গায়ে এক ফোঁটাও জল লাগবে না।" উদ্দেশে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বধূ বলিল,—"ঠাকুরের কৃপা ত আছেই, তবে দুপুর বেলা ওপাড়া থেকে আস্‌বার সময় কাপড়-চোপড় সব ভিজে গেল কেন?"

স্বামী। কাপড়-চোপড় ভিজ্‌তেই পারে, কাপড়-চোপড় ত আর আমি নই! আমার মাথা কি ভিজেছিল দেখেছিলে?

স্ত্রী। মাথায় গামছা ছিল, তাই বোধ হয় ততটা ভিজেনি, যাই হোক্ এত জলে এই অন্ধকার রাত্রিতে হঠাৎ বেরুবেন না, সাপ-খোপ শেয়াল-টেয়াল কোথায় কি আছে কে জানে—না, আপনি বেরুবেন না।

স্বামী। তোমার কোনও ভয় নেই গো কোনও ভয় নেই, ঠাকুরের কৃপায় আমায় সাপেও কামড়াবে না বাঘেও মারবে না, তুমি নিশ্চিন্ত হও, এখন আমি যাই।

স্ত্রী। "আবার ঠাকুরের কথা!" এই বলিয়া যোড় হস্তে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস লইয়া পুনরায় বলিল,—"তবে আপনার যা ভাল হয় করুন।"

ঠক্ ঠক্ করিয়া চকমকি ঠুকিতে ঠুকিতে স্বামী বলিল,—"হাঁ দেখ দেখি কেমন লক্ষ্মীর মত কথাটী বল্‌লে, ঠাকুরের কৃপায় আমাদের কি কোনও ভয় আছে? তবে আর তাঁর দয়া কি?" কিশোরী স্ত্রী আর কোনও কথা বলিল না। ইতিমধ্যে চকমকির আগুণ হইতে গন্ধকের দিয়াশলাই দিয়া প্রদীপটী জ্বালিয়া স্বামী গৃহের বাহির হইয়া যাইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"দরজাটা না হয় বন্ধ করিয়া শোও, কোনও ভয় নেই।"

স্বামী চলিয়া যাইলেন, স্ত্রী কিয়ৎক্ষণ দরজার কপাট ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। এখনও বৃষ্টি সমভাবে হইতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, তাহাতে উঠানের মাঝে কাঁকুনি নারিকেল গাছের মাথাটা পর্য্যন্ত বেশ দেখা গেল, গাছটা যেন ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে, এখনই বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িবে! যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি "রাধারাণী" আর স্থির থাকিতে পারিল না, গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল, হাত যোড় করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাসের সহিত বলিল,—"ঠাকুর রক্ষা কর, আমি ছেলে মানুষ কিছুই জানিনি ঠাকুর, আমার কোন অপরাধ নেবেন না! মা দুর্গা রক্ষা কর মা, আমি যে কিছুই জানিনি মা!"

পঞ্চদশ-বর্ষীয়া রাধারাণী বেশ বুদ্ধিমতী; তাহার কায-কর্ম্ম ও সকলকে যত্ন আয়ত্তি দেখিয়া তাহার বড় যা মেজ যা প্রাণ অপেক্ষাও তাহাকে ভালবাসে। বাড়ীর নূতন বৌ, বিশেষতঃ সে ছেলে মানুষ বলিয়া তাঁহারা তাহাকে কোন কাযেই হাত দিতে দিবেন না, কিন্তু রাধারাণী তাহা শুনিবার পাত্র নয়। একদিন বড় যায়েদের বিনয় করিয়া সে বলিল,—"আমি কি আর কায করুচি, আপনাদের কায দেখে কোন্‌টা কেমন করে করতে হয় তাই একটু শিখ্‌চি, আপনারা শিখিয়ে না দিলে কে শিখিয়ে দেবে দিদিমণি"?

"আহা রাধারাণী ত নয়, যেন বৃন্দেরাণী"। এই বলিয়া বড় বৌ আদর করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

মেজবৌ বলিলেন,—"ঠিক্ বলেছ দিদি! রাণীর হাত দুখানিও যেমনি মুখখানিও তেমনি, যেমন নরম তেমনি মিষ্টি।"

রাধারাণীর শ্বশুরবাড়ীও যেমন, বাপের বাড়ীও তেমনি। অপূর্ব্ব সংযোগ! এখানে শ্বশুর শাশুড়ী নাই, সেখানেও মা বাপ নাই। রাধারাণী যখন পাঁচ বৎসরের, তখন তাহার দুঃখিনী মাতা পতিবিহীনা অবস্থায় এই একমাত্র কন্যা রাধারাণীকে তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার হস্তে অর্পণ করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন। রাধারাণী তখন নিতান্ত বালিকা, মাতৃহারা হইয়া মাতুল ও মাতুলানীর নিকটেই লালিত-পালিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু একদিনের তরেও সে বুঝিতে পারে নাই যে সে পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকা; অপিচ, অনেক গৃহে পিতা মাতার যত্নেও কেহ কেহ এত আদর এত যত্ন পায় কি না সন্দেহ! বিবাহের পর তাহার শ্বশুরবাড়ীতেও সে সেইরূপ স্নেহ সেইরূপ যত্নই প্রাপ্ত হইল। উভয় মা'-ই তাহাকে যেরূপ ভালবাসেন, ভাশুর দুইটীও সেইরূপ কন্যা-নির্ব্বিশেষে তাহাকে স্নেহ করেন, সুতরাং শ্বশুর বাড়ীতেও তাহার সমান আদর। স্বামী-প্রেমেও রাধারাণী কম সৌভাগ্যবতী নহে। তবে এ গভীর নিশায়—এই ভীষণ দুর্য্যোগে তাহার যুবক স্বামী তাহার কোনও বাধা না মানিয়া—কোনও আপত্তি না শুনিয়া কোথায় যাইলেন? সে স্থানের আকর্ষণ কি এতই প্রবল? যদি তাহাই হয়, তবে রাধারাণীর স্বামী-সোহাগ বা প্রণয়-সুখ কোথায়? সাধারণের মনে এরূপ প্রশ্ন সহজেই উদিত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণের অপেক্ষা রাধারাণী তাহার স্বামীকে এই বয়সেই যে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে, তাহাতে আর তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। সে বালিকা বা যৌবনোন্মুখী হইলেও প্রবীণার ন্যায় তাহা। নিজ অধিকার ও ধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এবং তাহার স্বামী যুবক হইলেও যে নিতান্ত সাধারণ পুরুষ নহেন, সে বিষয়েও তাহার দৃঢ়রূপ ধারণা হইয়াছে; বিশেষতঃ তাহার স্বামী আজ বলিয়া নহে—নিত্যই এই ভাবে যে স্থানে গমন করেন, তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। সেই কারণেই রাধারাণী ঠাকুরের নাম শুনিয়া অত্যন্ত শক্তিভাবে সেই অপ্রত্যক্ষ দেবতার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া থাকে। যাহা হউক পাঠক! এখন আর বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, রাধারাণী আমাদেরই ঠাকুরদাস-গৃহিণী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চণ্ডীপাঠ।

বর্ষার সে ঘনঘটা তিরোহিত হইয়াছে, মেঘের সে ভীষণ গর্জ্জন বা প্রবল বর্ষণ আজ আর নাই, এখন আকাশ বেশ পরিষ্কার, নির্ম্মল শারদ গগনে আবার চন্দ্র হাসিয়াছে, আবার তারার দল দল বাঁধিয়া তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, প্রকৃতি শরৎ-সমাগমে আবার হাস্যময়ী—আনন্দময়ী, সংসারের ইহাই ত বৈচিত্র্য! দুর্দ্দিনে বহু আয়াসেও কাহারও সাক্ষাৎ মিলে না, কিন্তু সুদিন ফিরিয়া আসিলে আর কাহাকেও ডাকিতে হয় না, কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না, তখন সকলে যেন আপনার আপনার পূর্ব্ব অধিকার বজায় রাখিতেই ব্যস্ত হয়। সংসারের চিরন্তন নিয়মাবলীর মধ্যে ইহাও অন্যতম! শরতের সঙ্গে সঙ্গে সব ফিরিয়া আসিয়াছে, তাই আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আনন্দোৎসব! ঘরে ঘরেই আনন্দময়ী দুর্গতিনাশিনী মা আসিবেন, সন্তানের দুঃখ-দৈন্য, শোকতাপ সব আজ দূরে যাইবে, সকলেই জগজ্জননী মহামায়ার চরণতলে তাহাদের পুঞ্জীভূত অভাব অভিযোগগুলি নিবেদন করিয়া ধন্য হইবে। সেই হেতু ঘরে ঘরে তাহার বিবিধ উদ্‌যোগ আয়োজন চলিতেছে, প্রতি চণ্ডীমণ্ডপের প্রয়োজনমত সংস্কার হইতেছে, সকলেই স্ব স্ব অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর। কেবল বাঙ্গালা বলিয়া নহে, সমগ্র ভারত আজ আনন্দে বিভোর, সকল হিন্দুগৃহেই সপ্তশতী চণ্ডীর আরাধনা হইবে, নবরাত্রির উৎসবে যেন আনন্দের নূতন প্রবাহ বহিবে। তাহাতে শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য কাহারই বাধা নাই, মাতৃচরণ দর্শনে—নানা যন্ত্রণা দুঃখের পর মায়ের শান্তিময় পবিত্র নাম স্মরণে কাহারই বা আপত্তি হইবে? তবে মার কোলের ছেলে বাঙ্গালীর আনন্দ বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাই বাঙ্গালা জুড়িয়া তাঁর বিরাট প্রতিমা গড়িতেছে। রাজা মহারাজা হইতে কুটীরবাসী ভিখারী পর্য্যন্ত তাহাতে সহায়তা করিতেছে, সে পরমানন্দে যোগদান করিতে সকলেই যেন ব্যস্ত ও উন্মত্তপ্রায়। বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকেই আপনার আপনার সামর্থ্যের অনুরূপ নূতন বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়া নূতন আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালী আজ গৃহে আসিবে, অনেক দিনের পর সকলে একত্র হইবে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-

বর্গের সহিত মিলিত হইয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিবে। বালকেরা নৃত্য করিতেছে, প্রত্যহ দিন গণিতেছে—কবে পাঠশালার ছুটী হইবে, কবে বাবুদের সাত মহলের দালানে মহামায়ার প্রতিমা সুসজ্জিত হইবে, নিত্য তাহা দেখিয়া আসিতেছে। মায়ের পূজা হইবে, কত লোকজন আসিবে, ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা কত বাজিয়া উঠিবে, ধূপ ধুনা গুগ্‌গুলের ধূমে আকাশ পাতাল ভরিয়া যাইবে, হোমাগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া পূর্ণাহুতি গ্রহণ করিবে, পূত মন্ত্রের মৃদুমন্দ গম্ভীর স্বরে চারিদিক মুখরিত হইবে, পবিত্র চণ্ডীপাঠের গভীর নিনাদে হৃদয়ের পরতে পরতে উল্লাসের বিদ্যুল্লহরী ছুটিতে থাকিবে; ওঃ সে কি আমোদ! আজ তাই বুঝি ঐ দেওয়ালে, ঐ গাছ পালার উপর পড়িয়া রৌদ্রটা পর্য্যন্তও তাহাতে আগে হইতে যোগ দিয়াছে, তাহার কেমন যেন নূতন রং কেমন নূতন ভাব, হাওয়াটাও সেই সঙ্গে যেন নূতন ধরণের বলিয়া মনে হইতেছে, গাত্রে কি এক যেন নূতন ভাব মাখাইয়া দিতেছে। তবে কি ইহারা সকলে মিলিয়া মায়ের শুভাগমন-বার্ত্তা জগতে প্রচার করিতে আসিয়াছে?

হায়! সে অতীত স্মৃতি, সে অতুল আনন্দের ভাব আমরা আজ আর ঠিক অনুভব করিতে পারি না। তখন যে বাড়ীতে মায়ের প্রতিমা-রূপে আবির্ভাব হইত, তথায় ত অতিথি অভ্যাগত দীন-দরিদ্র সকলেই অতি সমাদরে পরি-গৃহীত ও নানা উপচারে পরিসেবিত হইতই, তাহা ব্যতীত প্রতি গৃহেই অন্নপূর্ণার অনন্ত ভাণ্ডার যেন উন্মুক্ত থাকিত, যে বাড়ীতে যাইবে সেইখানেই সমাদরে অতিথি সৎকার, সকল বাড়ীতেই কি যেন এক মহাযজ্ঞ, নিতান্ত অভাবেও খই মুড়কি জলপান, নারিকেল-লাড়ু, তিলের লাড়ু প্রভৃতি বিতরণে কোনও গৃহস্থই তখন পরাঙ্মুখ ছিল না। আর আজ তাহার পরিবর্ত্তে ঘরের ছেলেদেরই দুই বেলা দুই মুঠা জলপান দিতে পারি না। ভাবিতেও প্রাণ ফাটিয়া যায়, হায়! সে সুখের দিন কোথায় গেল? মা গো সাধকবৎসলে অন্নপূর্ণে! একি আমাদেরই জন্মান্তরের কর্ম্মফল মা? শতবৎসরের মধ্যে একি ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিল মা!

যাহা হউক, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতেও ছাত্রবৃন্দ আনন্দে ভরা; যাহারা দূরদেশ হইতে অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছে তাহারা কে কে বাড়ী যাইবে, কেমন করিয়া যাইবে, তাহারই জল্পনা-কল্পনা করিতেছে। কেহ কেহ বা কোন কোন স্থান হইতে পূজাকার্য্যে ব্রতী হইবার আহ্বান-পত্র পাইয়াছে, তাহারা মাতৃ-সেবার জন্য তথায় গমন করিবে। প্রতি বৎসরেই নানা স্থান

হইতে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র আইসে। তিনি ছাত্রদিগের মধ্যে উপযুক্ত বোধে এক এক জনকে এক এক স্থানে প্রেরণ করেন। এ বৎসর চতুষ্পাঠীতে বয়স্ক ও ক্রিয়াবান্ ছাত্রের সংখ্যা অল্প, অথচ নিমন্ত্রণ অনেক। তিনি স্বয়ং বাবুদের বাড়ীতেই চণ্ডীপাঠ করিবেন, কারণ তাঁহার বাড়ীতেও প্রতি বৎসর মহামায়ার অর্চনা হয়; গ্রামে থাকিয়া উভয় স্থলেই সম্পূর্ণ তত্বাবধান করিবার অবসর হয় বলিয়া তিনি এ সময় আর অন্যত্র যাইতে পারেন না। আজ ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছেন, আর আপন মনে কত দুঃখ করিতেছেন;—"একটা ভাইও মানুষ হইল না, আজ এ দুটো মানুষ হইলে আমার ভাবনা কি? পৈত্রিক চতুষ্পাঠী, চিরকাল আমাদের একটা মান সম্ভ্রম আছে, আজ কি না নিমন্ত্রণ-আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে হইল! এখন কি আর ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়? কি যে করি ভেবে ঠিক করিতে পারিতেছি না। আর কোথাও না হউক, ওগ্রামের রায়েদের বাড়ী আর হালদারদের বাড়ীর জন্যই ভাবনা! তাইত,—'জগদীশ' আর 'গদাধরকে' রাখ্‌লেই হ'ত, তারা এতক্ষণে অনেক দূর বেরিয়ে গেছে।"

বেদান্তবাগীশ মহাশয় এইরূপ আপন মনে কত কি বলিতেছেন, তাঁহার মধ্যম সহোদর শিরোমণি মহাশয় কোন কাযেই নেই, কেবল আমোদ আহ্লাদেই চিরদিন কাটিয়ে দিচ্ছেন; আজ জ্যেষ্ঠের কথা শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইতেছেন, কিন্তু কোনও দিন কোন কার্য্যেই যোগ দেন নাই, আজ যেন কতকটা লজ্জায় কতকটা অভিমানে বলি বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না যে, 'দাদা, আমি না হয় কোথাও যাইব।' ছোটটীর ত কথাই নাই, তিনি চিরদিনই আদরের পুতুল, কোনদিন চণ্ডীমণ্ডপের দিকে পাদচারণাও করেন নাই, লেখা পড়া কাহাকে বলে সে সংবাদ কোন দিনই তাঁহার ছিল না; সুতরাং তাঁহার নিকট বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কোন আশাই নাই। তিনি নিত্য উঠিয়া পুষ্প বিল্বপত্র যেমন সংগ্রহ করেন, আজও সেইরূপ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ঠাকুর ঘরে ফুলের সাজি রাখিয়া নিজের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, রাধারাণী যেন একটু বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় তখনও সেইভাবে আপন মনে কত কথাই বলিতেছেন; তাহা শুনিয়া যুবক ঠাকুরদাসের চিত্ত যেন চঞ্চল হইল—রাধারাণীর বিষণ্ণতার কারণও যে সেই সম্পর্কীয়, তাহাও তাঁহার জানিতে বাকি

রহিল না। তিনি কোনদিন জ্যেষ্ঠের সম্মুখে সহসা উপস্থিত হইতেন না। আজও ঠাকুর ঘরে সাজী রাখিবার পর, আপনার গৃহে যেন চোরের মতই আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—জ্যেষ্ঠের কথা শুনিয়া, বিশেষ সদাপ্রফুল্লমুখী রাধারাণীর বিষণ্ণ বদন দেখিয়া তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বড়দাদা মহাশয় দাওয়ায় বসিয়া পদতলে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে আপন মনে বকিতেছেন। তিনি গৃহমধ্যে দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একখানি কপাট ধরিয়া বড় সাহস করিয়া বলিলেন—"বড়দাদা, আমি না হয় এক জায়গায় চণ্ডীপাঠ করিব।"

বেদান্তবাগীশ মহাশয় শুনিয়া বড় দুঃখে ও কষ্টে হাসিয়া ফেলিলেন, পরে বলিলেন—"তা হলে আর ভাবনা কি? 'ক' য়ে কেমন করে আঁকড়ি দিতে হয় তা কোন দিন দেখ্‌লে না, আজ কি না চণ্ডীপাঠ কর্‌বে, হা আমার অদৃষ্ট!"

ঠাকুরদাস পুনরায় বলিলেন—"না বড়দাদা, আমি চণ্ডীপাঠ কর্‌তে পারি।" বড়দাদা কি ভাবিয়া একটু বিদ্রূপভাবেই বলিলেন—"চণ্ডীখানা এনে একটু পড় দেখি।" এই কথা শুনিয়াই নিরক্ষর ঠাকুরদাস গৃহমধ্য হইতে চণ্ডী আনিয়া দাদার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও চণ্ডীর আবরণ বস্ত্র উন্মোচন করিতে করিতেই কি এক অভিনব স্বরে নাভিপদ্মোত্থিত নাদগম্ভীরে প্রণবশব্দ উচ্চারণ করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—ওঁ কালাভ্রাভাং রত্ননিবদ্ধ-নূপুরলসৎপাদাম্বুজা-মিষ্টদাং কাঞ্চী-রত্ন-দুকূল-হার-মণিগণাং নীলাং ত্রিনেত্রো-জ্জ্বলাম্। শূলাদ্যস্ত্রসহস্রমণ্ডিতভুজা-মুদ্বক্ত্র-পীনস্তনী-মাবদ্ধামৃতরশ্মি-রত্নমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্॥ ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ॥"

পুঁথি সম্পূর্ণরূপে খোলাও হইল না, ঠাকুরদাস যখন "দেবীসূক্তম্" আদি পাঠ সমাপন করিয়া, সেই অভিনব স্বরেই গদ্‌গদ কণ্ঠে চিরপবিত্র চণ্ডীর শ্লোকগুলি যেন স্তবকে স্তবকে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তখন বেদান্তবাগীশ মহাশয় অবাক হইয়া পড়িলেন; সে অভিনব স্বর শ্রবণে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, ঠাকুরদাস আবার চণ্ডীপাঠ করিবে, আবার সে পাঠ, এমন অসাধারণ বিচিত্র স্বরলহরীতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিবে। তিনি যেন আত্মবিস্মৃত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দক্ষিণ পদতলে যেমন ভাবে তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন, সেইভাবেই তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এখন আর কোন চিন্তাই নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে মুখে হুঁ দিতেছিলেন। বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রী পুরুষ যে যেখানে ছিলেন, তিনি সেই খানেই বসিয়া যেন আত্মহারা হইয়া সেই অদ্ভুত চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বাহির হইতে বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে যে ডাকিতে আসিয়াছে—সেও অবাক্ হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া আছে, ক্রমে উঠানে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে, সকলেই রৌদ্রে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাহারও মুখে টুঁ শব্দটী নাই। কাহারও স্নান আহার নাই, প্রাতঃকাল হইতে প্রায় তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইতে চলিল, সকলেই নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ—যেন মন্ত্রমুগ্ধ!

যখন পাঠ সমাপ্ত হইল, তখন বোধ হইল, যেন কয়েকখানি সুস্বর তারের যন্ত্র কতিপয় অভিজ্ঞ যন্ত্রীর করে একতানে বাজিতেছিল, সহসা তাহার কোন একটা বুঝি কাটিয়া গেল, সুর অমনি বন্ধ হইল, কিন্তু তাহার ঝঙ্কার তখনই মিলাইয়া যাইল না, সকলেরই কর্ণে সেই স্বর যেন অমৃতধারার ন্যায় বহুক্ষণ ধরিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিল। তাহার পর যখন ক্রমে সে ভাবের নিবৃত্তি হইল তখন সমস্ত ঘটনাটী যেন একটী স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বেদান্তবাগীশ মহাশয় আত্মস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল, চণ্ডীর অর্থবোধ হইয়াছে?" ঠাকুরদাস বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "সামান্য সামান্য হইয়াছে।" বেদান্তবাগীশ মহাশয় পাঠ শুনিয়াই বুঝিয়াছিলেন, তথাপি দুই একটী প্রশ্ন করিয়া বলিলেন "তা বেশ হইয়াছে, একথা আমাকে এতদিন জানাওনি কেন? কার নিকট পড়া হচ্চে?" ঠাকুরদাস সহসা সেই তাঁতিপাড়ার বুড়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নিকট একদিনও পাঠ অভ্যাস করেন নাই, আর বোধ হয় এমনভাবে চণ্ডীপাঠ করা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব কি না সন্দেহ। ঠাকুরদাসের যাহা কিছু শিক্ষা—সেই বিল্ববৃক্ষে বৃদ্ধ মহাপুরুষের নিকটেই, ইতিপূর্ব্বে তাহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি কে, সে পরিচয় ঠাকুরদাস ব্যতীত আর কেহই অবগত নহেন। তবে বোধ হয়, তাঁহারই নির্দেশমত সেই বুড়া ভট্টাচার্য্যের নাম আজ জ্যেষ্ঠের নিকট ঠাকুরদাস উল্লেখ করিলেন। যাহা হউক, বেদান্তবাগীশ মহাশয় আর অধিক কথা না বলিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে স্নানে যাইলেন। শিরোমণি মহাশয়ও কনিষ্ঠের এবম্বিধ চণ্ডীপাঠ শুনিয়া আনন্দে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন। সেইদিন হইতে কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহাদের অপরিসীম স্নেহ নিপতিত হইল এবং তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, ঠাকুরদাস

যথার্থই ঠাকুরের দাস, দেবশক্তিসম্পন্ন কোন প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ, তাঁহাদেরই বংশ ধন্য করিতে আসিয়াছেন।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় সে বার ঠাকুরদাসকে তাঁহাদের ভক্ত শিষ্য বেহালার হরগোবিন্দ হালদার মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। শিরোমণি মহাশয় বিনা বাক্যব্যয়ে স্বয়ংই রায় মহাশয়ের বাটীতে চণ্ডীপাঠে ব্রতী হইলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা।

ঊষা।

[১]

মুকুল মুঞ্জরী
ভ্রমর গুঞ্জরি,
কানন-কুঞ্জ-কবরী,
কেদারবাহিনী
মলয়-মালিনী
জাহ্নবী-বক্ষ-শিহরি।

[২]

কুমুদ-কহ্লার,
শ্বেত শতদল
আঁধার সাঁঝে নিভিল,
সাধের মল্লিকা,
শুভ্র-শেফালিকা
ঊষার আঁচলে ঝরিল।

[৩]

বকুল-বসনা,
চম্পক-বরণা
নামিল দিগ্‌বালিকা,
চরণ চুমিল,
কেতকী ফুটিল
দুলিল জয়-মালিকা।

[৪]

অধর কম্পিত
সরমে জড়িত
অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত
রমণীয় সাজে
রুনু ঝুনু বাজে,—
কলিকা-গন্ধ-মোদিত।

[৫]

পঙ্কিল জীবন,
মলিন বদন
(আমি) মুগ্ধ-নয়নে নমিত,—
সুষমার খনি
প্রেমের নিছনি
(তুমি) স্বর্ণ-স্বপনে মণ্ডিত।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি, এ।

বিদ্যা ও অবিদ্যা।

মহামায়া প্রকৃতি দেবীই অবস্থাভেদে বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন।

> সৈব মায়া চ প্রকৃতি র্যা মোহয়তি শঙ্করং।
> হরিস্তথা বিরিঞ্চিঞ্চ তথৈবান্যাংশ্চ নির্জ্জরান্॥
>
> রুদ্রযামলে।

রুদ্র যামলে কথিত হইয়াছে যে, সেই প্রকৃতি দেবীই মহামায়া, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এবং অন্যান্য দেবগণকেও মোহিত করেন। কালিকা পুরাণে কথিত আছে, যে—

> গর্ভান্তর্জ্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ।
> উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে সা নিরন্তরম্।
> পূর্ব্বাতিপূর্ব্ব-সংস্কারসম্মোহেন নিযোজ্য চ।
> আহারাদৌ ততো মোহং মমত্বং জ্ঞানসংশয়ং।
> ক্রোধাপরাধলোভেষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা পুনঃপুনঃ॥
> পশ্চাৎ কামে নিযোজ্যন্তে চিন্তাযুক্ত-মহর্নিশম্।

অর্থাৎ সেই মহামায়াকর্তৃক গর্ভস্থ প্রাণীদিগের জ্ঞান সম্পন্ন হয় এবং তিনিই সূতি বায়ু দ্বারা প্রেরিত সমুৎপন্ন জীবকে নিরন্তর জ্ঞান রহিত করিয়া থাকেন। পরে প্রাক্তন সংস্কারবশে—মুগ্ধ জীবগণ আহারাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মোহ মমতা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর মহামায়া নিরন্তর চিন্তাশীল জীবকে ক্রোধ, অপরাধ ও লোভাদিতে বারম্বার নিক্ষিপ্ত করিয়া পশ্চাৎ কামে নিযুক্ত করেন। জীবগণ এইরূপেই কর্ম্ম সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না।

> সা মহামায়া দ্বিবিধা বিদ্যাবিদ্যা-প্রভেদতঃ।
> সম্মোহায় দ্বিবিধা চ বিদ্যাবিদ্যাম্বিতা॥
> যা চ মহা মহামায়া সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

সেই মহামায়া দ্বিবিধ,বিদ্যা ও অবিদ্যা; এক মহামায়াই বিদ্যা ও অবিদ্যা যুক্ত হইয়া জীবের মোহ বিধান করেন। সুতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েই সম্মোহরূপিণী; কিন্তু অবস্থাভেদে বিদ্যা অবিদ্যা ও মহামায়া নামে কথিত।

পরন্তু মহামহামায়া সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বরীরূপে বিরাজমানা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যা বা অবিদ্যা উভয়েই মায়াশ্রিত এবং উভয়েই প্রাণীদিগকে কর্ম্ম সম্পাদনে প্রযোজিত করিয়া থাকেন।

তৎকর্ম্ম যচ্চ বন্ধায় সা বিদ্যা পরিকীর্ত্তিতা।
যন্ন বন্ধায় তৎকর্ম্ম সা বিদ্যা সমুদাহৃতা॥

যে কর্ম্মদ্বারা সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, তাহাই বিদ্যাকৃত কর্ম্ম এবং যদ্দ্বারা সংসার বন্ধন সাধিত হয়, তাদৃশ কর্ম্ম সম্পাদনই অবিদ্যার কার্য্য।

বিদ্যা চ সর্ব্বদা সেব্যা নাপবিদ্যা কথঞ্চন।
অবিদ্যা কর্ম্মবন্ধঃ স্যাদ্‌বন্ধো জ্ঞানং প্রণশ্যতি।
জ্ঞাননাশাদ্ ভবেদ্ধানি র্হানৌ সংহরণং পুনঃ।
সংহরাত্তু ভবেদ্‌ঘোরো ঘোরান্নরকমেব চ।
তস্মাদবিদ্যা কুত্রাপি ন সেব্যাপি কদাচন।
যা বিদ্যা সা মহামায়া সা তু সেব্যা সদা বুধৈঃ।

বিদ্যা সর্ব্বদা সেবনীয়, অবিদ্যা কোন প্রকারেই সেবনীয় নহে। কারণ অবিদ্যা কর্ম্ম বন্ধ সাধন করিয়া থাকে; কর্ম্মবন্ধে জ্ঞাননাশ, জ্ঞাননাশে হানি, হানিতে সংহার, সংহারে ঘোর এবং ঘোর হইতে নরক প্রাপ্তি হয়। অতএব যাহা হইতে কর্ম্ম বন্ধ হয়, এতাদৃশ অবিদ্যা কদাচ সেবনীয় নহে। পক্ষান্তরে যিনি বিদ্যা, তিনিই মহামায়া; অতএব বিদ্যা মহামায়ার উপাসনা করাই পণ্ডিতগণের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

যো বিদ্যামুপাসতে সোঽজ্ঞানতমঃ প্রণশ্যতি। শ্রুতি।

শ্রুতি বলিয়াছেন—যিনি বিদ্যাকে উপাসনা করেন, তিনি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিতে পারেন। রুদ্রযামলে কথিত আছে যে,—

সুখদা মোক্ষদা নিত্যা সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতা।
যদা স্তুত্যা ভবেন্মায়া তদাসিদ্ধি-মুপালভেৎ।

অর্থাৎ সাধক সুখ মোক্ষদায়িনী সর্ব্বভূতে সংস্থিত নিত্যা মহামায়ার উপাসনা করিলেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন।

বৃথা কালং ন গময়েদ্দ্যুতক্রীড়াদিনা বুধঃ।
গময়েদ্দেবতাপূজাজপ-যাগস্তবাদিনা।

কিমন্যৈরসদালাপৈঃ সদা তদ্ব্যগ্রতামিয়াৎ
তস্মাম্মন্ত্রাদিকং সর্ব্বং বিজ্ঞায় শ্রীগুরোর্ম্মুখাৎ।
সুখেন মুচ্যতে দেবি ঘোর-সংসারবন্ধনাৎ।

অতএব মোক্ষাভিলাষী মানব কখনও ভৌতিক ক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করিবে না; দেবপূজা জপ যজ্ঞ স্তবাদি দ্বারাই সময় অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। কারণ, অসদালাপাদি দ্বারা কদাচ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। মন্ত্রাদি সমস্তই উপদেশ-সাপেক্ষ, সুতরাং শ্রীগুরুর মুখ হইতে ঐ সকল অবগত হইয়া কার্য্য করিলে সাধক ভীষণ সংসার-বন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। গুরুর কৃপায় কি না হয়?

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সমাজদার।

মাসিক সংবাদ।

লর্ড কিচেনারের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে সর্ব্বত্রই হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই তাঁহার জন্য সমধিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কর্ণেল এইচ্ কিচেনার সেনাবিভাগে কার্য্য করিতেন বলিয়া ইনিও সেনাবিভাগে প্রবেশ করেন। লর্ড কিচেনার আপন দলবল সহ রুষরাজ্যে গমন করিতেছিলেন, ৫ই জুন সোমবার রাত্রি আট ঘটিকার সময় সমুদ্র মধ্যে অর্কনি দ্বীপ সমূহের নিকটে জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছে, ৭ই জুন বুধবার আমরা এই সংবাদ পাইয়াছি। কিচেনারের পদে কে নিযুক্ত হইবেন তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই; তবে প্রধান মন্ত্রী এস্কিথ অস্থায়িভাবে এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ তর্কতীর্থ নামক কলিকাতাবাসী জনৈক পণ্ডিত সম্প্রতি ব্যবস্থা দিয়েছেন যে, শ্রাদ্ধে জীবিত বৃষের পরিবর্ত্তে মাটির বৃষ উৎসর্গ করিলেই কার্য্য হইবে। ব্যবস্থা ত মন্দ নয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'কেতকী' বাহির হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

অবসর
মাসিক পত্র

সূচী।

অবসর—

১২শ ভাগ। } আষাঢ়। { ১১শ সংখ্যা।

সংসারে অশান্তি হয় কেন?

দ্বিতীয় খণ্ড।

(পুরুষ-চরিত্র।)

চরিত্র সমালোচনা করিতে বসিয়া কেবলমাত্র নারীগণের উপর কতকগুলি দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। পুরুষেরও চরিত্রগত দোষ গুণ নির্ণয় করা আবশ্যক। হইতে পারে স্ত্রীলোকগণ অধিক মাত্রায় স্বাধীনেচ্ছু হইয়া সংসারের অশান্তির কারণ হইতেছেন, কিন্তু তৎসহ পুরুষগণও অল্পাধিক মাত্রায় বিজড়িত আছেন কি না তাহাও নিরপেক্ষভাবে বিচার করা আবশ্যক। কেবল মাত্র একটি নির্দ্দিষ্ট জাতির উপর দোষারোপ করিয়া ক্ষান্ত থাকা সমালোচকের উচিত নহে। যদিও আমি বলিয়াছি যে অধুনা স্ত্রীলোকগণের অবনতির জন্য পুরুষগণ সম্পূর্ণ দোষী নহেন, তথাপি সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক দোষ থাকা আশ্চর্য্য নহে; এবং তাহাই নির্দ্ধারণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এখন দেখা যাউক অস্মদ্দেশীয় পুরুষগণ বর্ত্তমানে নৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারে কতদুর উন্নত বা অবনত হইয়াছেন এবং সেই উন্নতি বা অবনতির কারণ কি? আমরা পুরুষ-চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইব যে, আজ কাল পুরুষগণ যেমন কতক বিষয়ে উন্নতি করিয়াছেন, তেমনই আবার কতক বিষয়ে তাঁহারা অবনত হইয়াছেন। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, রমণীগণ আজ কাল স্বাধীনতার মাত্রা অনেক বৃদ্ধি করিয়া বসিয়াছেন এবং অভিলাষ পূর্ণ না হইলে নানারূপে অশান্তির সৃষ্টি

করেন, কিন্তু এখনকার পুরুষগণ কি তাহা দমন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন? কখনই নয়। বিশেষ দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর আব্দার সর্ব্বথা গ্রাহ্য, তাহাতে চিন্তা করিবার কিছুই নাই। অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি হইবার ভয়ে দমন করা দূরে থাক, তাঁহারা বরং নারীগণকে অনেক সময় প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। পুরুষের এই চরিত্রগত দোষ কখনই মার্জ্জনীয় নহে। ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও সহিষ্ণুতা এই তিনটী গুণ নরচরিত্রে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকা বিশেষ আবশ্যক। সামান্য বিপত্তিতে বিচলিত হওয়া পুরুষের উচিত নহে; এবং নারী-সৃজিত ক্ষণস্থায়ী অশান্তির ভয়ে প্রাণে জীবনকালব্যাপী আর একটা নূতন অশান্তির সৃষ্টি করাও তাঁহাদের উচিত নহে। ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, নারীগণ পুরুষ অপেক্ষা অধিক কুহকিনী এবং অত্যল্প আয়াসেই পুরুষকে মুগ্ধ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ জানিয়াও লোকে তাহাতে মুগ্ধ হইবে কেন? বালকে অন্যায় আব্দার করিয়া থাকে এবং আব্দার করিয়া প্রার্থিত বস্তু একবার লাভ করিলে সে পুনঃ পুনঃ আব্দার করে ও তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাহার প্রথম উদ্যমেই যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে সে পুনরায় সেরূপ অন্যায় আব্দার করিতে সাহসী হয় না। সেইরূপ একবার দুইবার বা আবশ্যক বিবেচনায় প্রত্যেকবারই যদি রমণীগণের কুহকমন্ত্র বা অন্যায় অভিমানের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে তাহারা আর সেরূপ করিতে সাহসী হয় না ও আপনা হইতেই শান্তভাব অবলম্বন করে, কিন্তু এ কার্য্যে গাম্ভীর্য্য ও সহিষ্ণুতার আবশ্যক হয়। অধুনাতন পুরুষের মন এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা অতি সামান্য কারণেই বিচলিত হইয়া পড়েন। নারী-চক্ষের জল তাহাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যেন সুতীক্ষ্ণ বাণ-বিদ্ধ করিতে থাকে; সুতরাং তাহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াও সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতিকার কল্পে যত্নবান্ হন; এবং রমণীগণও পুরুষের এই দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করতঃ স্বকার্য্য-সাধনে আরও যত্নবতী হইয়া থাকেন।

কিন্তু পুরুষের কি এরূপ করা উচিত? নিজেদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা অন্যের নিকট প্রকাশ করা কি তাহাদের কাপুরুষতা নয়? দুই এক ফোঁটা চক্ষের জলে বা বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ দু'টো ভ্রূকুটীতে বিচলিত হইয়া সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করা তাহাদের মূর্খতা নয় কি? স্ত্রীলোকেই পুরুষের মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা না হইয়া আধুনিক দুর্ব্বল-চিত্ত পুরুষগণ তাহাদের

ইঙ্গিতে ফিরিতেছে ইহা কি কম বিড়ম্বনা? কিন্তু এরূপ হইতেছে কেন? কাহাদের দোষে এরূপ ঘটিতেছে তাহা কেহ অনুধাবন করিয়াছেন কি? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে পুরুষগণ অপেক্ষা স্ত্রীলোক-দিগকেই অধিক দোষী বিবেচনা করি এবং স্ত্রীচরিত্র সমালোচনায় তাহা ব্যক্তও করিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বোপরি আমি আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী অধিক দোষাবহ বলিয়া মনে করি। আমাদের দেশে এখন প্রাচ্য-শিক্ষা অপেক্ষা পাশ্চাত্য-শিক্ষা সমধিক প্রচলিত হইয়াছে। আমরা পুত্র কন্যাগণকে পাশ্চাত্য মতে শিক্ষা প্রদান করা অধিক গৌরব-জনক বলিয়া বিবেচনা করি এবং ধরিতে গেলে উহা এখন আমাদের জীবিকার প্রধান পন্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও কেহ কেহ বাধ্য হইয়া সেই শিক্ষার অনুসরণ করেন। টোলের নাম শুনিলে আমরা এখন শিহরিয়া উঠি; এবং বলিতে কি টোলে শিক্ষিত ধর্ম্মরত, নিষ্ঠাবান্ তিলক-কেতনধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে আমরা এখন ঘৃণার চক্ষেই অবলোকন করি। একবার ভাবিয়াও দেখি না প্রাচ্য-শিক্ষা কত সারবান্ ও সমাজ-হিতকর। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ এখন অন্য জাতির নিকট দূরের কথা আমাদের নিকটেও গল্পকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের বালকগণ এখন বাইবেলের Dock trines যত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে, গীতার উপদেশ তাহার সিকি অংশও অবগত নহে। বৈদেশিক ইতিহাসে তাহাদের যে পরিমাণ ব্যুৎপত্তি আছে, দেশীয় ইতিবৃত্ত তাহার তুলনায় কিছুই জ্ঞাত নহে। ওয়াটারলু বা এণ্টোয়ার্পের যুদ্ধ যত সহজে বর্ণনা করিতে পারিবে, কুরুক্ষেত্রের বা হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের কোন পরিচয়ই পাওয়া যাইবে না। অবশ্য শিক্ষার নিন্দা আমি কিছুতেই করিতে পারি না, শিক্ষা সর্ব্বত্রই শিক্ষা, কিন্তু তাহার সারাংশ গ্রহণ করাই প্রকৃত শিক্ষালাভ। এবং প্রথমে স্বদেশ ও স্বজাতি ঘটিত ঘটনাবলী শিক্ষা করিয়া বৈদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত। অথচ আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত একাধারে সাহিত্য, ইতিবৃত্ত ও ধর্ম্মগ্রন্থ, হিন্দুর পরম আদরের জিনিষ। কথাতেই আছে—"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"; অর্থাৎ মহাভারতে যাহা নাই, সমগ্র ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করিলেও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গ্রন্থ দুখানিতে শিখিবার বিষয় অনেক আছে এবং মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করা যায়। উহার প্রত্যেক অধ্যায়ে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে,

যাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে আর অন্যের উপাসনা করিতে হয় না। কিন্তু আমরা এমনই হতভাগ্য যে আমাদের নিজেদের এরূপ বহুমূল্য বিশুদ্ধ কাঞ্চন থাকিতেও আমরা বৈদেশিক কাঁচের জন্য ঘুরিয়া বেড়াই; শ্রুতিমধুর সুললিত দেবভাষা না শিখিয়া বিদেশীভাষা পরম যত্নে কণ্ঠস্থ করি ও পুত্রকন্যা এবং আত্মীয়-স্বজনগণকে সেইরূপ করিবার উপদেশ দিই। তাহাতে আমাদের বালকবালিকাগণ বৈদেশিক রীতি নীতিই শিক্ষা করিয়া থাকে, আর্য্য মহাপুরুষগণ প্রদর্শিত পথে একপদও অগ্রসর হয় না। কিন্তু যে স্থানের যাহা তাহা না হইলে সমাজের মঙ্গল হইবে কিরূপে? যাহার ক্ষমতা একমণ ভার বহন করিবার, তাহার মস্তকে দেড় বা দুই মণ ভার চাপাইলে সে স্বতঃই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে এবং অতিরিক্ত ভার ধারণ করা হেতু অসুস্থ হইয়া পড়িবে, ইহাও সেইরূপ। আর্য্যভূমে জন্ম গ্রহণ করিয়া, আর্য্য রীতিনীতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া বালক যত শীঘ্র আর্য্য-ভাবাপন্ন হইতে পারে, তত শীঘ্র অন্যরূপ হইতে পারে না; এবং একটি আধারে পঞ্চশস্য রক্ষা করিতে যাইলেই ডাল-খিচুড়ি হইয়া পড়িবে; সুতরাং পুরুষের দোষ এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল এবং ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন কেন আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন, কেন তাঁহারা কর্ত্তব্য পথচ্যুত হইয়া অশান্তি সৃজন করিতেছেন? আমরা যদি তাঁহাদিগকে বাল্যকাল হইতে সৎশিক্ষা প্রদান করিতাম, সদুপদেশে প্রণোদিত করিতাম, তাহা হইলে এ বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না। এশিক্ষা ও উপদেশ আমাদেরই প্রদান করা উচিত; জননীগণের উপর নির্ভর করা চলে না, কেননা তাঁহারা নিজেরাই অশিক্ষিতা। তাহাদের পিতা মাতাও তাহাদিগকে সংসারে দাস্যবৃত্তি ব্যতীত আর কিছু শিক্ষা দান করেন নাই; বলিতে ভুলিয়াছি, দাস্যবৃত্তির সহিত হিংসা, কুটিলতা ও পার্থক্য ভাব ব্যতীত কিছু সৎশিক্ষা প্রদান করেন নাই। এইরূপে বংশ পরম্পরায় কেবল কুশিক্ষার স্রোতই প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; সুতরাং তাহাদের পুত্র কন্যা-গণ যখন নিজেরাই শিক্ষা প্রাপ্ত হইল না তখন আপনাপন পুত্র কন্যাগণকে শিক্ষা দিবে কি প্রকারে? হইলেও পুরুষগণ ত একেবারে অশিক্ষিত নয়! তাঁহারা ইচ্ছা করিলে একদিকে যেমন শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা নিজেদের জ্ঞানোন্নতি করিতে পারেন, অন্যদিকে সেই অধ্যয়নের মধুর পরিণাম স্বরূপ স্বীয় পুত্র কন্যাগণকে গল্পচ্ছলে শাস্ত্র বা পুরাণ-কথা আবৃত্তি করতঃ তাহাদের

চরিত্র গঠন করিতে পারেন, তাহা হইলে এই পুত্র কন্যাগণকেও আবার জনক-জননীর স্থলাভিষিক্ত হইলে স্বীয় পুত্র কন্যাগণের চরিত্র গঠন করিতে অধিক কষ্ট পাইতে হয় না। শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, রাম লক্ষ্মণ বা পঞ্চ পাণ্ডব-দিগের অসীম ভ্রাতৃস্নেহ, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি গরীয়সী প্রাচ্য মহিলাগণের প্রগাঢ় স্বামি-ভক্তি এ গুলি কি শিখিবার বা শিখাইবার বিষয় নহে ? বালক বালিকাগণকে এই সব শিক্ষা প্রদান করিলে কি সংসারের বা সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় না ? সুকলেরই সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা ইদানীং এরূপ উদাসীন হইয়াছি যে, সদসৎ ভাবিবারও একবার অবসর পাই না, কেবল নিজেদের আমোদ-প্রমোদ লইয়া ব্যস্ত থাকি। উদরের চেষ্টায় চাকুরিটুকু সর্ব্বাগ্রে বজায় রাখিয়া আমরা সভা-সমিতিতে যোগদান করিবার যথেষ্ট অবসর পাই, অবৈতনিক নাট্য-মন্দিরে যাইবার অবসর করিয়া লইতে পারি, কিন্তু পুত্র কন্যাগণকে শিক্ষা দিবার অবসর করিয়া লইতে পারি না। এটাও কি আমাদের দোষ নহে ?

হাঁ, নাট্যমন্দিরের নামে আর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইতে ইচ্ছা করি যে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন আমাদের রুচি কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আজ প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে বেতনভুক্ত বা অবৈতনিক সকল নাট্যশালাগুলিতেই পৌরাণিক গ্রন্থ অতি আদরের সহিত অভিনীত হইত। তদ্দ্বারা আমরা পুরাণ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের রুচি পরিবর্ত্তনের সহিত এখন সামাজিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি গ্রন্থগুলির আদর বাড়িয়াছে; এগুলিতেও যে জ্ঞানলাভ হয় না তাহা নহে, কিন্তু হইলেও বর্ত্তমান বা মধ্যযুগের অবস্থাই জানিতে পারা যায়। আবার নাটকগুলি সুললিত করিবার জন্য গ্রন্থকার মহাশয়গণ কল্পনার সাহায্যে এত অযৌগিক ঘটনার অবতারণা করেন যে, সেই দিকেই আমাদের মন অতিরিক্ত মাত্রায় আকৃষ্ট হয়; সুতরাং আমরা জ্ঞানপ্রদ অপেক্ষা অসার শিক্ষাই অধিক লাভ করিয়া থাকি, কিন্তু পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক লিখিত হইলে এত অধিক অযৌগিক ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইতে পারিত না; এবং আমরাও প্রাচ্য শিক্ষা যথেষ্ট লাভ করিতে পারিতাম। যাত্রাদলের অধিকারী মহাশয়গণ এ নিয়ম বজায় রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তবুও কেহ কেহ ঐতিহাসিক গ্রন্থ অবলম্বন করিতেছেন। কেন করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন ত ? শ্রোতার মনোরঞ্জনার্থই তাঁহাদের এই উদ্যোগ না

করিলে অধিক অর্থাগম হয় না। পালায় রাম বা কৃষ্ণ নামোল্লেখ থাকিলে রামযাত্রা বা কৃষ্ণযাত্রা বলিয়া উপহাসের সহিত পরিত্যক্ত হয়। তাহা হইলেই দেখুন, আমাদের রুচির কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? ভগবানের নাম আমাদের নিকট উপযাচক হইয়া আসিলেও আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছি। ইহা কি আমাদের আর একটি চরিত্রগত দোষ নহে? কিন্তু এ রুচি আমরা কোথা হইতে পাইলাম? ইহা কুরুচি কি সুরুচি তাহা আমি বলিতে চাহি না, তবে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা ইহা পাইলাম কোথা হইতে? ভগবৎ প্রেমোচ্ছ্বসিত আর্য্যভূমে এরূপ প্রেমের অবতারণা নূতন নহে কি? আরও নূতন বলিতেছি এই জন্য যে বোধ হয় পনর কি বিশবৎসর পূর্ব্বে সাধারণের এ রুচি ছিল না; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহা এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যে যুবকবৃন্দ ত মাতিয়া উঠিয়াছেই, অনেক পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিও অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার ধারণা ইহাও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের অঙ্গবিশেষ। কারণ পাশ্চাত্য রচনাবলী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তদ্দেশে এরূপ রচনাপূর্ণ গ্রন্থ বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ পার্থিব সুখকেই চরম সুখ বলিয়া মনে করেন এবং জীবনের পরপারে পরলোক বলিয়া যে কিছু আছে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই তাঁহারা যাহা কিছু করিয়াছেন, যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সমস্তই পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতা লইয়া। বিখ্যাত নাট্যকার সেক্সপিয়রের কয়খানি গ্রন্থের ভিত্তি ধর্ম্মের উপর স্থাপিত? সেই গ্রন্থগুলিই আবার আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্ব্বাচিত আছে। তবেই বুঝুন দেখি, সেই সকল অসার প্রণয়োপাসনা বা রাষ্ট্রবিপ্লব বর্ণনাপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিয়া তরলমতি বালকগণ কি সদুপদেশ লাভ করিতে পারে? তাই বলিতেছিলাম যে, এই রুচি পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি অঙ্গবিশেষ হইলেও, আমরা যদি আমাদের পুত্রকন্যাগণকে অতি শৈশবকাল হইতে শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করতঃ ভগবৎ প্রেমে দীক্ষিত করি, তাহা হইলে বোধ হয় পরিণামে এরূপ ঘটে না। প্রথম হইতে মনে ধর্ম্মভাবের উন্মেষ হইলে পরে যাহা কিছু শিক্ষা করুক না কেন তাহা আর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে পারে না; সুতরাং এই যে ভগবৎ প্রেম বা শাস্ত্রোপদেশ শিক্ষা না দেওয়া ইহাও কি আমাদের চরিত্রগত আর একটি দোষ নহে? সর্ব্ববিষয়ে শুধু স্ত্রীলোকগণকে দোষী করিলে চলিবে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের দোষ গুণ বিচার করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকগণকে প্রথমে শিক্ষিতা করিলে তবে ত তাহারা পর্য্যায়ক্রমে সন্তান সন্ততিগণকে শিক্ষা দান করিবে; নচেৎ যাহারা নিজেরাই অশিক্ষিতা তাহারা আর শিক্ষাদান করিবে কি? এ দোষ আমাদের। আমরা যদি আমোদ আহ্লাদ বা উৎসব কৌতুকে এত অধিক সময় অঙ্গ না ঢালিয়া অমূল্য সময়ের কিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করিতাম, পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাগণকে কিঞ্চিৎমাত্রায় প্রাচ্য শিক্ষাও প্রদান করিতাম, গল্পচ্ছলে প্রাচ্য নরনারীগণের জীবন-চরিত তাহাদের নিকট বর্ণনা করিতাম এবং সদনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহারা জগতে কি অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন—অনিত্য সংসারকে নিত্য করিবার জন্য শোক-তাপ-দুর্দ্দশা-ক্লিষ্ট জগতে স্বর্গসুখ সৃজন করিবার জন্য স্বর্গীয় সম্পদে ধরিত্রীকে বিভূষিত করিবার অভিপ্রায়ে, আত্মীয় স্বজন পোষ্যবর্গ ও প্রতিবেশী এমন কি সমগ্র দেশবাসিগণের সুখ শান্তি বর্দ্ধনের জন্য কি অমানুষিক আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, কি প্রাণহরকর অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজেদের সঙ্কল্প-সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা যদি সামান্য কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক বালকবালিকাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতাম;—তাহাদিগের সুকোমল প্রাণে একবার যদি ধারণা করাইতাম যে, মনুষ্যের সুখ "মনে" ও শান্তি "ত্যাগে," স্বার্থচিন্তা হৃদয় হইতে উন্মূলিত না করিলে, পরকে আপনার ন্যায় দেখিতে না শিখিলে কিছুতেই সুখ শান্তিভোগের আশা করা যায় না; তাহা হইলে বোধ হয় আজ আমাদিগকে এরূপ অভিযোগ শুনিতে হইত না। কিন্তু এ সকলের মূলে গভীর কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে। অন্য কিছু শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে শিশুগণকে কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও কর্ত্তব্য পরায়ণ হওয়া উচিত। আমরা কর্ত্তব্য পথ হইতে স্খলিত হইয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অধঃপতন ঘটিয়াছে; এরূপ অশান্তি-বহ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছি এবং চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইয়া প্রতিকারের উপায় খুঁজিয়া পাইতেছি না; অথচ উপায় আমাদের হস্তে রহিয়াছে। আমাদের এই সমস্ত চরিত্রগত দোষের জন্য রমণীগণ দায়ী নহেন। পৃথক ভাবে তাঁহাদের শত সহস্র দোষ থাকিতে পারে, তাঁহাদের কর্ত্তব্যচ্যুতির জন্য সংসারে নানারূপ অশান্তি সৃজিত হইতে পারে; কিন্তু পুরুষ আমরা,—আমরাই যে নিজেদের কর্ত্তব্যপথচ্যুত হইয়া অহোরাত্র অশান্তির সৃজন করিতেছি

সে দিকে কি আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং সময় থাকিতে প্রতিকার করা উচিত নহে ?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন।

মানুষ নই গো।

(১)

মানুষ নই গো, পাষাণ আমি, —
সত্যি আমি পাষাণ!
নৈলে তোমার দুঃখের বোঝা—
হ'ত কবে আসান।
ডালিম ফুলে পাত্‌লা ঠোঁটে
কান্নাটুকু গুমরে উঠে ;
দুগ্ধ-ডাগর আঁখির পটে—
কত ব্যথা আঁকা গো !
ও যে তোমার শিরে শিরে—
সাথী হয়ে আছে ঘিরে,
ফুটে কেবল অশ্রুনীরে ;—
যত্নে তবু ঢাকাও।

(২)

জ্যান্তে মরা ও গো সতী,
ও হতাশের ফল্গু নদী,
চিন্‌তে তোমায় পারবো যদি—
অন্ধ আঁখি ভরিয়া ;
তবে কি গো এম্‌নি করে,
জ্বালাই তোমায় দগ্ধে মেরে ;
আমিও জ্বলে মলাম যেরে
অভিমানে মরিয়া !

(৩)

মানুষরূপে দৈত্য দানা—
সর্প, শ্বাপদ, পশুগানা,—
আর যা কিছু আছে জানা—
সবি তোমার আমি।
হস্ত দিয়া যখন শুনি—
বুকের কিসে দপ্‌দপানি ;
তবু মুখে কঠোর বাণী—
ধন্য নিঠুর স্বামী !

(৪)

চুলের বোঝা এলিয়ে দিয়ে
উঠ্‌লে ভয়ে ঘামে নেয়ে
বেপন দেহে আস্তে যেয়ে
ধর যদি চরণ,
আগুন হ'তে আগুন হয় গো
এম্‌নি স্বামী তোমার ওগো
পিছন ফিরে চাইবে না কো
যদি শুনে মরণ।

(৫)

ওগো জ্যান্ত মানুষ পাষাণ হয় গো
বজ্র হ'তে নিষধ,
আবার কপালগুণে এরাই ভবে
শান্ত, সুধী বিশদ।
ওগো মানুষ নই গো পাষাণ আমি—
সত্যি আমি পাষাণ,
নৈলে তোমার দুঃখের বোঝা—
হ'ত কবে আসান।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

ঠাকুর সদানন্দ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বুড়া ভট্টাচার্য্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভসময়ে পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বরাহ-নগরে তন্তুবায় পল্লীতে আসিয়া বসবাস করিলেন। তিনি যেমন নানাশাস্ত্র-দর্শী সুপণ্ডিত, তেমনি পরম রূপবান্ পুরুষ; তাঁহার সহধর্ম্মিণীও ততোধিক পরমাসুন্দরী ও সাক্ষাৎ কমলা-সদৃশা ছিলেন। তবে তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। তিনি অনতিকালমধ্যে তথায় এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া নিত্য বহু বিদ্যার্থীর অধ্যাপনা দ্বারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে তাহা "তাঁতিপাড়ার বুড়া ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কোন স্থলে একথা বলা হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের তুলনায় সাধনার খ্যাতিও নিতান্ত কম ছিল না; তিনি যেমন কঠোর সাধন-পরায়ণ ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন, তেমনি একজন মহাবৈদান্তিক বলিয়াও পণ্ডিতসমাজে পরিচিত ছিলেন। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, আমাদিগের ঠাকুরদাসের প্রপিতামহ বৃদ্ধ রামমাণিক্য বিদ্যাসাগর ইঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাধনশক্তির পরিচয় সে কালে বিশ্ববিশ্রুত ছিল; ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারিয়া সহজেই তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন ও যথাসময়ে তাঁহার দীক্ষা ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলেন। তাহার পর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল অতীত হইয়া গিয়াছে, তুষারশুভ্র দীর্ঘ কেশ-শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদনুরূপ বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী সহ সেই তাঁতিপাড়া চতুষ্পাঠীতেই নিয়মিত অধ্যাপনা করিতেছেন। এখন কেবল বেদান্তপাঠার্থী ছাত্রবৃন্দই তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসেন। শতাধিক বয়স্ক বৃদ্ধ হইলেও তিনি নিতান্ত অথর্ব্ব হইয়া পড়েন নাই, তাঁহার নিত্য গঙ্গাস্নান, পুষ্পচয়ন, বহুক্ষণ-ব্যাপী সাধন-ক্রিয়া কোন দিনই বন্ধ হইত না। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সামান্য মাত্র হীন হইলেও তাঁহার বৃদ্ধা গৃহিণী তাহা তাঁহাকে

বিশেষ উপলব্ধি করিতে দেন নাই। সেই শঙ্খরত্নধারিণী সিন্দুর-সিমন্তিনী শুভ্রকেশা ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্ব কার্য্যের সহায়তা করিতেন, আবার গৃহে আসিয়া সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় সমস্ত গৃহকর্ম্ম ও রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বামী ও পুত্রপ্রতিম ছাত্রদিগকে অতি যত্নসহকারে পরিতোষে ভোজনাদি করাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের মুনিঋষির তপোবন সদৃশ সংসারের তুলনা দিবার কিছুই নাই। সাক্ষাৎ ঠাকুর ঠাকুরাণীর ন্যায় তাঁহারা পরমানন্দেই দিনাতিপাত করিতেন। তাঁহাদের এইরূপ পবিত্র সুখ ও স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। পল্লীবাসী সকলেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একান্ত অনুরক্ত ছিল, গৃহজাত শাক পাতা ফল মূল তাঁহাদের না দিয়া কেহ অন্য কাহাকেও দিত না এবং আপনারাও ভোজন করিত না। তবে কেবল কতিপয় ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের জনক জননী সতত বৃদ্ধকে উৎকট অভিসম্পাত করিতেন; এবং তাঁহার নিকট যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিত, তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণকে সেস্থলে তাঁহাদের সন্তানদিগকে পাঠাইতে নিষেধ করিতেন। তাহার কারণ কোন কোন ছাত্র বৃদ্ধের নিকট বেদান্তাদির পাঠ সমাপ্ত করিয়া পরিণামে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই পিতামাতা প্রাণারাম সেই পুত্রদিগকে সংসারধর্ম্মে আবদ্ধ করিতে না পারিয়া, তাঁহাদের বড় আশায় নৈরাশ্য প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে যখন প্রতিপদে তাঁহাদের নয়নমণি, জীবনের একমাত্র আশা ভরসা, অবলম্বন স্বরূপ পুত্ররত্নের অভাব অনুভব করিতেন, তখনই বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যকে তাঁহারা "চক্ষের মাথা খা" বলিয়া অভিসম্পাত করিতেন। অনেকেই বলিত বৃদ্ধ তাহাতে বৃদ্ধবয়সে হীনদৃষ্টি হইয়াছিলেন। যাহা হউক, বৃদ্ধ তাহাতে কোন দিন ক্ষুব্ধ হন নাই বা অধ্যাপনা কার্য্য বন্ধও করেন নাই। তিনি সকল সময়েই অতি আনন্দে থাকিতেন ও বেদান্তের উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার শেষ ছাত্রগণের মধ্যে কালীচরণ মৈত্র, সন্ন্যাসীচরণ মৈত্র, চিন্তামণি ও ঠাকুরদাসই প্রধান। ঠাকুরদাস প্রথম হইতে তাঁহার ছাত্র না হইলেও পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত চণ্ডীপাঠের পর হইতে তাঁহার ছাত্ররূপে নিত্য যথাসময়ে বেদান্তের উপদেশ গ্রহণ করিতে যাইতেন; কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার নিত্য-কর্ম্ম—সেই গভীর নিশায় বিল্বমূলে যাওয়া তাঁহার বন্ধ ছিল না। পত্নী শ্রীমতী রাধারাণীর নিকট তিনি কোন কথাই গোপন করিতেন না। পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহারই মুখে তাঁহার জীবন-কাহিনী শ্রুত হওয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠাকুরদাসের জন্মকাল তথা প্রথম বাক্যোচ্চারণ হইতে সকল বিষয়েই এতদিন সংবাদ রাখিতেন, তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট কোন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন, সেই কারণ এক্ষণে তাঁহাকে ছাত্ররূপে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত বেদান্তের আলাপকালে, যে সকল গভীর ও অভিনব তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা তৎপূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং ঠাকুরদাসকে পাইলে বৃদ্ধের আনন্দের আর অবধি থাকিত না। বৃদ্ধ বোধ হয় এতকাল কেবল এই ঠাকুরদাসের জন্যই লোলচর্ম্ম ও পলিতকেশ হইয়া জীবন ধারণ করিয়া আছেন। ঠাকুরদাসকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করাই তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। তিনি সেই বয়সে যেরূপ নূতন বলে ও অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। ঠাকুরদাসও এহেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পাইয়া বড় কম আনন্দিত হন নাই, তাঁহার মনের যে সকল ভাব এতদিন কেবল মনে মনেই নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইত, এখন প্রাণ পূরিয়া তিনি সেই সকল ভাব প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়াছেন; অধ্যাপক ও সতীর্থদিগের সহিত তাহার যথাযথ বিচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার সেই অদ্ভুত মেধা ও দৈবীশক্তিসম্পন্ন যুক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া সকলেই এখন মোহিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়, বেদান্তবাগীশ ও চূড়ামণি মহাশয়ও সন্ধ্যার পর একত্র উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করিয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতেন।

এই ভাব আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠাকুরদাসকে, শেষ দীক্ষা প্রদান করিয়া মহাপ্রস্থান করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল, ছাত্রেরা তাঁহাকে সজ্ঞানে তীরস্থ করিলেন। বৃদ্ধাও হৃষ্টচিত্তে হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ বৃদ্ধ অধ্যাপক মহাশয় গদ্‌গদ কণ্ঠে ছাত্রবৃন্দকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, অনন্তর ঠাকুরদাসের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া তাঁহার কর্ণে অনুচ্চস্বরে কি বলিলেন। ঠাকুরদাসও স্বীয় মস্তক অবনত করিয়া বিনীতভাবে তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী

তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুব্ধা হইলেন না, অপিচ ছাত্রগণকর্ত্তৃক বিরচিত চিতার উপর তাঁহার স্বামী শেষ শয্যায় শায়িত হইলে, তিনি অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার মুখাগ্নিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং অনতিদূরেই উপবেশন করিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন স্বামীর দেহ ভস্মীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন বৃদ্ধা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, কিন্তু অধিকক্ষণ সেভাবে দাঁড়াইতে পারিলেন না, আবার বসিয়া পড়িলেন, ক্রমে সেইস্থানেই শুইয়া পড়িলেন। ছাত্রগণ বৃদ্ধার এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া কেহ বাতাস করিতে লাগিলেন, কেহ বা মুখে জল-সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সতীলক্ষ্মী সে সকলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জীবনের চিরসঙ্গী ও ইহ পরকালের আশ্রয়স্থল প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ স্বামীর অনন্ত পথে অনুসরণ করিলেন। তাঁহার শরীর দেখিতে দেখিতে শীতল হইয়া আসিল।

ইতিপূর্ব্বেই দেশপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও সাধক-শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শেষ লীলা দেখিবার জন্য শ্মশানঘাটে বহু নরনারীর জনতা হইয়াছিল, এক্ষণে পরম সাধ্বী সাক্ষাৎ ভগবতী-প্রতিমা মাঠাকুরাণীর সহমরণ-সংবাদ পাইয়া, বহু দূরদুরান্তর গ্রাম সকল হইতেও বিপুল লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণ পূজা করিয়া তাঁহার স্বামীর জলন্ত চিতার উপর তাঁহাকে শয়ন করাইয়া দিলেন। চারিদিকে আনন্দ কোলাহল ও খোল করতাল সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। সে এক অপূর্ব্ব ভাব, মা যেন হাসিতে হাসিতে অনন্তশিখ ব্রহ্মার ক্রোড়ে স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া সগর্ব্বে উঠিয়া বসিলেন। অল্পকাল মধ্যেই দিব্য হুতাশন হুহু শব্দে শত জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার নিত্য কার্য্য সমাধা করিয়া, বাষ্পাকারে তাঁহাদিগকে অনন্তধামে প্রেরণ করিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন তদ্দেশবাসী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাদের চিতার বিভূতি লইয়া সেই নির্ব্বাণোন্মুখ চিতায় অবিরত গঙ্গার পূত সলিল সিঞ্চনে শীতল ও বিধৌত করিয়া দিলেন। অনন্তর সকলে চলিয়া যাইলে, ঠাকুরদাস ও তাঁহার সতীর্থ সন্ন্যাসীচরণ পঞ্চবটীমূলে সিদ্ধবাবার নিকট যাইয়া উপবেশন করিলেন। ভৈরবী মা দূর হইতে সকল ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিতে ছিলেন, এক্ষণে পঞ্চবটী নিকটে আসিয়া ঠাকুরদাসকে বলিলেন,—"তোরা ভাবচিস্ কি? ওরা ত সব কাজ সেরে চলে গেল, এখন তোদের কাজ তোরা কর্। আগামী মঙ্গলবার অমাবস্যা মনে আছে ত? আমার সঙ্গে

দেখা করিস্।" তারপর তিনি সিদ্ধবাবাকে নমস্কার করিয়া, গ্রামমধ্যে চলিয়া গেলেন। সিদ্ধবাবাও ভৈরবীমাকে প্রতিনমস্কার করিয়া ঠাকুরদাস ও সন্ন্যাসীচরণের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্বন্ধে কত কথাই বলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে তাঁহারা বাবাজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ছাত্রগণ সকলেই অশৌচ গ্রহণ করিলেন, কেবল ঠাকুরদাস ও সন্ন্যাসীচরণ যথাযোগ্য ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া গ্রামস্থ দেওয়ান বাবুদিগের সহায়তায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও ভিখারীদিগকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া দিলেন। অনন্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটী প্রবীণ ছাত্রকে আনাইয়া সেই চতুষ্পাঠী রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কালীচরণ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত শেষ ছাত্রগণও চতুষ্পাঠীতে মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ের অধ্যাপনা করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভৈরবী-মা।

আজ চতুর্দ্দশী সংযুক্ত অমাবস্যা মঙ্গলবার, সিদ্ধবাবা শ্মশানঘাটে ধূনী জ্বালিয়া বসিয়া আছেন, সন্ন্যাসীচরণ ও ঠাকুরদাস তাঁহার নিকট বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, অদূরে দেওয়ান বাবুর উদ্‌যোগে মহামায়ার পূজার আয়োজন হইয়াছে। দেওয়ান বাবু বরাহনগরের অন্যতর জমিদার বংশের সন্তান। ইনি স্বয়ং কোন স্থলে দেওয়ানী কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি নবাব সরকারে উক্তকার্য্য করিয়া বংশপরম্পরায় দেওয়ান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুর্গাচরণ দেওয়ান বা দাওয়ান এই বংশের মহাশক্তিশালী-পুরুষ। তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণও পিতার উপযুক্ত পুত্র। বয়স অল্প হইলেও ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন ভজনে ইঁহাদের প্রগাঢ় নিষ্ঠা, সাধু সজ্জনের প্রতি অগাধ ভক্তি, সকল সৎ কর্ম্মেই ইঁহারা বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত। আজ শ্মশানেশ্বরীর পূজায় তাই দেওয়ান বাবুরই উদ্‌যোগ আয়োজন অধিক। পূজার আয়োজন সম্পন্ন হইলে, আমাদিগের ঠাকুর দাসের মধ্যম সহোদর বীরাচার-সাধনরত ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয় মহানিশায় পূজায় বসিলেন। বীরাচারে "কারণ" ব্যবহার করার রীতি আছে,

তিনি যথাবিধি কারণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পূজা সমাধা হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। এতক্ষণ সিদ্ধবাবার ধুনীর নিকটে বসিয়া ভৈরবী মা, ঠাকুরদাস ও সন্ন্যাসীচরণকে সাধন বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। তখন সিদ্ধবাবা নয়ন মুদ্রিত করিয়া আপনার ভাবে বিভোর হইয়া সমাধি মগ্ন ছিলেন। যখন পূজা সমাপ্ত হওয়ার শঙ্খ ঘণ্টা সব বাজিয়া উঠিল, তখন সকলেই যেন চমকিত হইয়া সেইদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ ভৈরবীমার পরমভক্ত, তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"মা চূড়ামণিদাদার ত পূজা হ'ল, এখন আমার পূজা যে বাকি মা! তোমার কৃপা না হ'লে ত তা' সম্পন্ন হবে না? একবার দয়া করে উঠে এস।" ভৈরবী মা খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুই যেমন পাগল ছেলে! চূড়ামণির পূজো আর তোর পূজো কি আলাদা? এখন আমার এ ছেলেদের ভারি ক্ষিদে পেয়েছে, মায়ের প্রসাদ এনে দে দেখি।" শ্যামাচরণ স্বতন্ত্র রক্ষিত পুষ্পপাত্র আনিয়া ভৈরবী মার চরণ পূজা করিলেন, তাঁহার এবং সিদ্ধবাবার ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসীচরণ ও ঠাকুরদাস মায়ের পার্শ্বে বসিয়াই প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

ভৈরবী মা অধিকাংশ সময় শ্মশানেই থাকেন, কখন কখন পঞ্চবটী তলায়, আবার কখনও বা দেওয়ানদের দেউড়ীতেই বসিয়া থাকেন। অনেক সময় তিনি পথিপার্শ্বে ক্রীড়া-পরায়ণ বালকবালিকাদিগের সহিত নিতান্ত বালিকা কুমারীর ন্যায় মনের আনন্দে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, আবার বৃদ্ধ বৃদ্ধাদিগের সঙ্গেও অসঙ্কোচে আলাপ করিতে তিনি কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। কখন তিনি গ্রামের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, আবার কখন বা গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় যে চলিয়া যান্ কেহ তাহার সন্ধানও জানিতে পারে না। তিনি দীনের জননী, ধনীর পূজ্যা ও সাধুসন্ন্যাসীর সাধন-সঙ্গিনী। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া অসম্ভব বা নিতান্ত সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। কোন বাটীতে কাহারও শিশু সঙ্কটাপন্নভাবে পীড়িত, ভৈরবী মা তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন, বলিতেছেন—"কোন ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাক।" মা "নিশ্চিন্ত থাক" বলিলে কাহারও আর ভয় থাকে না। লোকে তাঁহাকে যথার্থই ভগবতী বলিয়া বিশ্বাস করে। শুনিতে পাওয়া যায়, যতদিন তিনি ছিলেন ভতদিন

নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির মধ্যে কেহ অকালমৃত্যু দেখিতে পায় নাই। মা অনেকদিন গ্রামে নাই, হয়ত কোন পরিবার মৃতপ্রায় শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া অবিরত ক্রন্দন করিতেছে, বলিতেছে, "হায় হায় আজ যদি মা থাকিতেন তাহা হইলে ছেলেটী নিশ্চয় রক্ষা পাইত।" আশ্চর্য্যের কথা, মা সেই দিনেই কোথা হইতে আসিয়া শিশুকে একেবারে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেন ও তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেন, আর বলিতেন "ভয় কি? তোরা মার ভক্ত, প্রাণভরে মাকে ডাক্, সব বিপদ কেটে যাবে।" দেখিতে দেখিতে শিশু দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিত।

ভৈরবীমায়ের সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা গ্রামবাসী বৃদ্ধ বৃদ্ধাদিগের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার আত্মপরিচয়ে তিনি বলিতেন, নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজপুরোহিত বংশে জনৈক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশব হইতেই পূজা অর্চ্চনা সাধন ভজনে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল; সাত আট বৎসরের সময় যখন তিনি ফুলের সাজি হাতে করিয়া ফুল তুলিয়া আনিতেন, গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে মা জগদম্বা বলিয়া প্রণাম করিত। তিনি পিতার পার্শ্বে বসিয়া যখন একাগ্রমনে পূজার অনুকরণ করিতেন, তখনই এক একদিন এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে পিতা পূজাদি সমাপন করিয়া উঠিয়া যাইলেও তিনি একভাবেই বসিয়া থাকিতেন, কেহ না ডাকিলে তাঁহার সেই ভাব সহজে ভঙ্গ হইত না। তাঁহার বয়স ক্রমে দশ বৎসর হইলে পিতা কন্যার বিবাহ দিবার মানসে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি সরল অথচ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"বাবা আমার বিয়ে দিওনা, বিয়ে দিলে আমি বাঁচে থাকতে পারবো না।" কুমারী বালিকা কন্যার মুখে এরূপ অদ্ভুত কথা শুনিয়া পিতা প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, পরে পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন ও কন্যাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন এবং কথায় আর কর্ণপাত না করিয়া সত্বর শুভলগ্নে কন্যাকে পাত্রস্থ করিলেন। কন্যা পিতার [illegible] উপর আর কোন কথা কহিলেন না, তবে তিনি কাষ্ঠের পুতুলের মত যেন [illegible] হইয়া রহিলেন। [illegible] [illegible] কন্যা যথারীতি [illegible] [illegible] করিলেন [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করিলে, [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] [illegible] দিয়া বাহিরে [illegible]

আত্মীয়া প্রদীপ হস্তে দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মেয়েটী গাছের পাশ দিয়া চুপি চুপি কোথায় সরিয়া পড়িলেন। অনেক দেরি হইতেছে. দেখিয়া আত্মীয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কোন সাড়া শব্দ না পাওয়ায় প্রদীপ ধরিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর বাটীর মধ্যে সংবাদ দিলেন। তখন সকলে ঘরে বাহিরে চতুর্দ্দিকে মশাল লইয়া অনুসন্ধান করিতে বাহির হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এতটুকু মেয়ে এই মাত্র বাহির হইল, আর দেখা নাই, সকলেই যেন অবাক্। কেহ কেহ অনুমান করিলেন, হয় বাঘে লইয়া গিয়াছে, না হয় খিড়কির পুষ্করিণীতে ডুবিয়া গিয়া থাকিবে, সেই হিসাবেও বহু অনুসন্ধান হইল, যখন কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন হতাশ হইয়া সকলে বাড়ীতে ফিরিলেন। এ দিকে বালিকা খিড়কির দ্বার পার হইয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন; কোথায় যাইবেন, কোন পথে যাইবেন, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই; আপন মনে যে দিকে দুই চক্ষে পথ বলিয়া বোধ হইতেছে, প্রাণপণে সেইদিকেই ছুটিতে ছুটিতে ক্রমে গ্রাম প্রান্তর, আবার গ্রাম, আবার প্রান্তর পার হইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তিনি এক গ্রামের প্রান্তভাগে একটী ভগ্ন মন্দিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত রাত্রি অবিরত ভীষণ পরিশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়া সেই মন্দিরের রোয়াকে একটু বিশ্রামের জন্য শুইবামাত্রই বালিকা একেবারে ঘুমাইয়া পড়িলেন। গ্রামের বাহিরে পরিত্যক্ত মন্দির, চারিদিকে জনমানবের আবাস পরিশূন্য; সুতরাং কেহই তাঁহাকে তখন দেখিতে পাইল না। বালিকা অবসন্ন দেহে নিদ্রা যাইতেছেন। মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়, গৈরিকবস্ত্রপরিহিতা ত্রিশূলধারিণী এক সন্ন্যাসিনী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও সেই বালিকাকে এতদবস্থায় নিদ্রিতা দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আদর করিয়া আপন কোলে বসাইলেন; কোথা হইতে আসিয়াছেন, কেনই বা এমন অবস্থায় আসিয়াছেন সকল কথা ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া আনিলেন; এবং ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি লইয়া সেই মন্দির-সংলগ্ন একটি কুটীর মধ্যে রন্ধনাদি সমাপন পূর্ব্বক মন্দিরস্থিত শিবের ভোগ অর্চ্চনা করিলেন, তাহার পর বালিকাকে ভোজন করাইলেন, নিজেও ভোজন করিলেন। অপরাহ্নকাল নানা কথাবার্ত্তায় অতি-

বাহিত হইলে সন্ধ্যা সমাগমে সন্ন্যাসিনী মন্দিরে প্রদীপ দিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন। বালিকা তাঁহার যত্নে যেন সব ভুলিয়া যাইলেন, সন্ন্যাসিনীও কন্যা-নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। বালিকার পূজা, পাঠ, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ঈশ্বর-তন্ময়তা দেখিয়া তিনি বস্তুতই যেন মুগ্ধ হইয়া যাইলেন। তিনি প্রাতঃকালে ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া যাইলে মেয়েটী পূজাপাঠের সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিতেন, রন্ধনাদিরও সমস্ত উদ্‌যোগ করিয়া মন্দিরমধ্যে একাগ্রভাবে ভগবচ্চিন্তা করিতেন। সন্ন্যাসিনী আসিয়া রন্ধনাদি সমাপন করিলে, ঠাকুরের ভোগ দিয়া উভয়ে ভোজন করিতেন। এই ভাবে প্রায় পাঁচ ছয় মাস অতীত হইয়া যাইল, কেহই সে স্থানে তাঁহার অনুসন্ধানে আসিল না। নিকটস্থ গ্রাম্যলোক তাঁহাকে সন্ন্যাসিনীর কন্যা বলিয়াই বুঝিল। ক্রমে এক দুই করিয়া কয়েক বৎসরও অতিবাহিত হইল, যৌবনের অলঙ্ঘ্য প্রভাব তাঁহার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার সুপ্ত দৈবী ভাব এখন পবিত্র মাতৃভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নয়নে আরও কি এক অপূর্ব্ব ভাব পরিলক্ষিত হইল, তাহা সহজে বর্ণনা করিতে পারা যায় না। বোধ হয় সতত নির্জ্জনে সমাধিমগ্ন থাকায় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় যেন স্থায়ী শিবনেত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে, চক্ষু-গোলক আর নিম্ন পল্লবপ্রান্ত স্পর্শ করে না, অথচ নিম্নমুখী না হইয়াও সকল কার্য্য অবাধে সম্পন্ন হইতে থাকে। সে অপূর্ব্ব দৃষ্টি দেখিয়া অতি বড় পাষণ্ডও তাঁহাকে ভগবতী জ্ঞানে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার আশ্রয়দাত্রী সন্ন্যাসিনী যেমন বিদুষী ও নানাশাস্ত্রজ্ঞ তেমনি সাধন-ক্রিয়াবতী ছিলেন; সুতরাং তাঁহার নিকট থাকিয়া তিনিও রীতিমত সাধন ভজনের সমস্ত ক্রিয়া-পদ্ধতি ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে তীর্থ-দর্শন করিবার অভিলাষে তাঁহারা উভয়ে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নানাদেশ ও বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা নর্ম্মদাতীরে এক অতি পবিত্র ও মনোরম তপোবনের অন্তর্গত এক ভৈরবী-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময় কয়েকটী সিদ্ধ-ভৈরবী তথায় বাস করিতেন, আমাদের ভৈরবী মা সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের নিকটেই প্রথমে ভৈরবী-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেন। এই আশ্রয়ে প্রবেশ করিবার কিছুদিন পরেই তাঁহার পূর্ব্ব-উপদেষ্ট্রী সন্ন্যাসিনী সহসা সেই নর্ম্মদাতীরে দেহরক্ষা করেন। সেই কারণ মা আর কোথাও না যাইয়া দ্বাদশ বৎসর কাল এই আশ্রয়ে

থাকিয়াই একাগ্রমনে সাধনা করিতে লাগিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধ হইলে আশ্রমাধিষ্ঠাত্রী বৃদ্ধা ভৈরবী মাতার আদেশে পুনরায় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এই সময় তিনি উদ্ধরাখণ্ডস্থিত দিগম্বরী ভৈরবীমঠে আসিয়া উপস্থিত হন। এই মঠে কোন পুরুষের সমাগম নাই, সকল ভৈরবীই মঠমধ্যে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় সতত বিচরণ করেন। তাঁহাদের বিলম্বিত দীর্ঘ কেশদাম উগ্র পিঙ্গল বর্ণ জটায় পরিণত হইয়াছে, গলে রুদ্রাক্ষ মালা, কপালে উজ্জ্বল সিন্দূরলিপ্ত, সকলেই ত্রিশূল ও কপাল-পাত্র-ধারিণী, যেন শুম্ভ-নিশুম্ভ নাশিনী রণ-রঙ্গিণী জগজ্জননী মহাকালী ; অপূর্ব্ব মাতৃভাব-পুষ্টা স্মেরাননা ও পূত-স্নেহময়ী আমাদের ভৈরবী মা এই আশ্রমে আসিয়াই আশ্রম-বিধানে অনুপ্রাণিতা ও দীক্ষিতা হইলেন এবং একাদিক্রমে আরও ছয় বৎসর কাল এই আশ্রমের সেবা করিয়া একবার হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় মঠস্থিতা ভৈরবী-দিগের সহিত স্নান করিতে আসিলেন। কুম্ভমেলায় অগণ্য সাধুসজ্জন মহাত্মা ও মহান্তদিগের এবং সাধারণ ভক্তলোকারণ্যের মধ্যে তাঁহাদের সম্মান অপরিসীম। তাঁহারা যখন বম্ বম্ শব্দে চারিদিক বিকম্পিত করিয়া স্থির গম্ভীরভাবে পবিত্র জাহ্নবীজলে অবগাহন করিতে লাগিলেন, তখন চতুর্দ্দিকে পঙ্গপালসদৃশ জনসঙ্ঘ চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহারা স্নান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর অন্য সকলে ধীরে ধীরে স্নান করি-বার অনুমতি পাইলেন। শুনা যায় বহু ধর্ম্মানুরত ভক্তমণ্ডলী প্রতি গ্রীষ্ম-ঋতুতে হরিদ্বারে স্নান করিতে আসিয়া তাঁহাদের মঠদ্বারে বৎসরোপযোগী আহার্য্য সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। ইহাদের সংখ্যা তেমন অধিক নহে এবং কুম্ভে গঙ্গাস্নান ব্যতীত লোকালয়ে ইঁহারা কখন আগমন করেন না। সেই কারণ সাধারণে ইঁহাদের বিষয় এক প্রকার অনভিজ্ঞ। আমাদের ভৈরবী মা এই হরিদ্বার হইতেই তাঁহার সঙ্গিনী ভৈরবীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার নানা তীর্থ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ৺কালীঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনেক দিন তথায় শ্মশানঘাটে থাকিয়া এক্ষণে বরাহনগরের এই শ্মশানে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। এখনও তিনি দিগম্বরীমঠের অনুরূপ সম্পূর্ণ বিবস্ত্রাভাবেই অবস্থান করেন, কেবল একখানি গৈরিক উত্তরীয় মাত্র তাঁহার স্কন্ধ হইতে সতত বিলম্বিত থাকে। তাঁহার কেশে একটীও জট্ নাই, তৈল ম্রক্ষিত না হইলেও তাহা রুক্ষ নহে, সেরূপ সুদীর্ঘ কেশ কদাচ পরিলক্ষিত হয়। মা চলিয়া যাইতেছেন তাঁহার উন্মুক্ত কেশপাশ ভূমিতলে লুটাইয়া

যাইতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে ধূলা কাদা কাটিকুটী কিছুই স্পর্শ করে না। তাঁহার ঈষৎ নীল আভা-বিশিষ্ট শ্যামবর্ণ অপূর্ব্ব দেহ কান্তির সহিত সেই গৈরিক উত্তরীয়খানি ও ভূমিতলচুম্বিত দীর্ঘ কেশদাম বাস্তবিকই তাঁহার গম্ভীর রূপে পূত শোভা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছে। তাঁহার রূপ দেখিয়া কেহই তাহার বয়স অনুমান করিতে পারিত না।

ভৈরবী মা এখানে আসিয়া অবধি আমাদের ঠাকুরদাসের প্রতি সমান লক্ষ্য রাখিয়াছেন ও তাঁহার সাধনার পথে এতদিন সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। গভীর নিশায় বিল্বমূলে বৃদ্ধ মহাপুরুষের নিকট ঠাকুরদাসের শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধেও মায়ের কিছু অবিদিত ছিল না। ঠাকুরদাস এখন অধিকাংশ সময় ভৈরবীমার নিকটেই অবস্থান করিয়া থাকেন। কোন কোন দিন মা নিশাকালে বিল্বমূলেও দেখা দিয়া থাকেন। ইতিমধ্যে একদিবস মা বিল্বমূলে আসিয়া সেই মহাপুরুষের উপদেশক্রমে সহসা কোথায় যে অন্তর্হিতা হইলেন, কেহ তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না। ঠাকুরদাসও সেকথা তখন জানিতে পারিলেন না। এদিকে মায়ের অদর্শনে গ্রামবাসী সকলেই অত্যন্ত কাতর ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা।

শিশির ও বসন্ত।

শিশিরে প্রকৃতি সতী বিকল-বসনা,
নিরানন্দ জীবলোক নিরস্ত বাসনা,
মরুমাঝে মরীচিকা জীবন-স্বপন
শূন্যে ভাসি' করে আর দিগন্ত প্রয়াণ।

বসন্তে নূতন বাসর স্বর্ণ-কবরী,
শাখী ভরা ফুল ধরে প্রকৃতি সুন্দরী,
সাজায় জগৎ-শরীর দিগ্‌বালিকা
আশা আছে—মৃত্যুপরে বিজয়-মালিকা।

শ্রীফণিভূষণ মুস্তোফী, বি, এ।

বড় কে ?

(১)

একটা খড়মের খট্ খট্ শব্দ তুলিয়া সিঁড়ি দিয়া উপর হইতে নীচে নামিতে নামিতে নলিনচন্দ্র অতি কর্কশকণ্ঠে হাঁকিল,—"গোব্রা !—ও গোব্রা !—শুয়ে !"

তখন মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছিল। গোব্রা ওরফে গোবৰ্দ্ধন বৈঠকখানায় সবে মাত্র আলোটী জ্বালিয়া পড়িতে বসিয়াছিল। হঠাৎ দাদার অশনি পতনবৎ ভীষণ চীৎকার ধ্বনিতে শিহরিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর আসিয়া সভয়ে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, কি বলছেন ?" চীৎকার করিয়া নলিনচন্দ্র বলিল,—"বাড়ীতে বলছে তুই নাকি কড়ার দুধ খাইয়া তাহাতে জল মিশাইয়া রাখিয়াছিস ? দিন দিন যে তোর বড় স্পৰ্দ্ধা বাড়িতে চলিল ? তুই মনে করেছিস কি ? আজ তোকে উচিত শিক্ষা দিব।" এই বলিয়া নলিন রাগে চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীময় ছুটাছুটী করিতে লাগিল।

ব্যাপার দেখিয়া গোবৰ্দ্ধনের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। ধমনীর ভিতর রক্ত-কণিকা চম্ চম্ করিয়া উঠিল। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। সে সেই মুহূর্ত্তে কোনও উত্তর দিতে পারিল না। কেবল এক স্থানে দাঁড়াইয়া পূজার পাঁটার মত ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পাড়ার হিতৈষী মুরুব্বী সনাতন সর্দ্দার তখন তাহার চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া পরকালের জন্য কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টায় ভাগবত গ্রন্থখানির পাতা উল্টাইতে ছিলেন। সনাতন সর্দ্দার পরম বৈষ্ণব, দাড়িগোঁফ কামান, হাঁড়ির মত গোল মুখখানিতে গঙ্গামৃত্তিকার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, নাকটীর উপর সুদীর্ঘ তিলক, কণ্ঠে স্থূল তুলসীর মালা। সনাতন বড় হিসাবী লোক, টাকায় দুই আনা হিসাবে সুদ খাইয়া তাহার উদর অযথা স্ফীত হইয়াছিল। পুঁথির উপর চক্ষু রাখিয়া সর্দ্দার মহাশয় কাহার নিকট কত সুদ বাকি আছে, কে কোন্ কিস্তী খেলাপ করিয়াছে ও পরদিন প্রভাতে উকীলের বাড়ী গিয়া কোন্ কোন্ খাতকের নামে নালিশ রুজু করিতে হইবে তাহাই ভাবিতে ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রায়েদের বাড়ী হইতে গোলমালের শব্দ শুনিয়া

উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বস্ত্রখানি পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা তাহার বিশাল উদরের বর্ত্তুল পরিধি কোনরূপে বেষ্টন করিতে পারিয়াছিল মাত্র, কাছা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই।

নলিনচন্দ্র যেই মাত্র "পাজি হারামজাদা. আজ তোকে কে রাখে দেখিব" বলিয়া পায়ের খড়ম খুলিয়া গোবর্দ্ধনকে প্রহার করিবার জন্য ধাবিত হইল, অমনি "মুক্তকচ্ছ" সর্দ্দার মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—"আহা কর কি ? কি হয়েছে ?"

উচ্চকণ্ঠে নলিন বলিল,—"এই দেখ না সনাতন দা, আমার নচ্ছার ভায়ার কাণ্ডটা। করেছে কি—না—কড়া থেকে খানিকটা দুধ খেয়ে, তাতে আবার জল মিশিয়ে রেখেছে। যেন কেউ জান্‌তে পারবে না, এমন বুদ্ধি !"

সনাতন হস্তস্থিত মালা জপিতে জপিতে মৃদুস্বরে বলিল,—"শ্রীহরি ! শ্রীহরি ! তা বটে, ওর নাম কি—কি জান, তুমি যে অনেক খরচ পাতি করিয়া ভায়াকে ইংরাজী শিখাইতেছ—ওর নামকি—তার একটা ফল পাওয়া চাইত ! শ্রীহরি ! শ্রীহরি !"

এবার গোবর্দ্ধন মনের আবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল,— "আমি দুধ খাই নাই, বৌদিদি মিথ্যা করিয়া বলিয়াছেন।" প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডে ঘৃত সংযোগ করিলে, তাহা যেরূপ ভীষণ আকার ধারণ করে. নলিন-চন্দ্রও স্ত্রীর নিন্দা শুনিয়া সেইরূপ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল, গোবর্দ্ধনের গণ্ডদেশে একটী প্রকাণ্ড চপেটাঘাত করিয়া কহিল,—"দুর হ, এখনি বাড়ী থেকে দুর হ বলছি।"

গোবর্দ্ধন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আমি দুধ খাই নাই। শুধু শুধু মার খেলাম।"

"ফের"—বলিয়া নলিন আবার এক চড় বসাইয়া দিল। তারপর সর্দ্দা-রের দিকে চাহিয়া বলিল,—"শুনলে সনাতন দা ! আমার সঙ্গে কিরূপ মুখোমুখী করে।"

সনাতন সর্দ্দার মালা ঘুরাইয়া বলিল,—"তা কি জান—ওর নাম কি— আজ কালকার ছেলেরা ঐ রকম। আরও—ওর নাম কি—ইংরাজি পড়িলে ছেলেরা—ওর নাম কি—কেমন একরূপ হইয়া যায় ;—ওর নাম কি—সত্যি কথা বল্‌তে জানে না। শ্রীহরি ! শ্রীহরি !"

অভিমানদীপ্ত ষোড়শবর্ষীয় বালক গোবর্দ্ধন আর চুপ করিয়া থাকিতে

পারিল না। ক্রোধ ক্রন্দন-কণ্ঠে কহিল—"না জেনে শুনে মারিলেই হইল আর কি—মারিবার ক্ষমতা থাকিলেই তাহার অপব্যবহার করা উচিত নয়।"

আর যায় কোথা? নলিনচন্দ্র গোবর্দ্ধনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। যত পারিল কিল, চড়, লাথি মারিতে লাগিল, অবশেষে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। বোধ করি, সনাতন সর্দ্দার বাধা না দিলে, গোবর্দ্ধনের জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইত।

(২)

যশোহর জেলায় ছয়ঘরিয়া একটী গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে উমেশচন্দ্র রায় বাস করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল। বিষয়ের আয় ১০৷১২ হাজার টাকা ব্যতীত তিনি অনেক টাকা কোম্পানী কাগজের সুদ পাইতেন। ইহার উপর ব্যবসা ও তেজারতি কারবার ছিল। শুনা যায় বিস্তর নগদ টাকার সহিত উমেশচন্দ্র দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নলিনচন্দ্রের বয়স হইয়াছিল ২২ বৎসর ও গোবর্দ্ধনের ৮ বৎসর।

বনগ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে গোবর্দ্ধন অধ্যয়ন করিত। প্রত্যেক পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শিক্ষকগণের সহানুভূতি ও ভালবাসা লাভ করিলেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ নলিনের বিদ্যালাভ হইয়াছিল, গ্রাম্যপাঠশালায় বোধোদয় পর্য্যন্ত। নলিন গোবর্দ্ধনের বিদ্যানুরাগ দেখিয়া সময়ে সময়ে হিংসায় জ্বলিয়া উঠিত। এমন কি পরোক্ষভাবে তাহার পাঠে বাধা দিতেও কুণ্ঠা বোধ করিত না। গোবর্দ্ধন বিদ্যালয় হইতে যে বৃত্তি পাইত, তাহাতেই তাহার পড়ার সকল খরচ চলিয়া যাইত। নলিনকে ঘর হইতে একটী পয়সাও খরচ করিতে হইত না। তবুও নলিন গৃহকার্য্য না করিয়া গোবর্দ্ধনের বিদ্যালয়-গমনে অনেক আপত্তি করিত। তাহার প্রধান আপত্তি ছিল, ইংরাজী শিক্ষা; কারণ তখন দেশে ইংরাজী শিক্ষিতের আদর প্রচুর, সে নিজে ইংরাজী জানিত না। সংসারে লোকাভাব না হইলেও গোবর্দ্ধনকে অনেক কাজ করিতে হইত। গো সেবা ও বাজারের ভার তাহার উপর ছিল। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। গোবর্দ্ধন সকালে বিকালে সংসারের কাজ করিয়া সন্ধ্যার পর যে একটু অবসর পাইত, সেই সময়টুকু অতি যত্নে ও পরিশ্রম সহকারে পাঠাভ্যাস করিত।

আট বৎসর বয়সে গোবর্দ্ধন পিতৃহীন হইয়াছিল। মা তাহার অনেক পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। দিদি কমলমণি শ্বশুরালয়েই থাকিত। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর বিষ নয়নে পড়িয়া গোবর্দ্ধন শৈশব হইতে একটিও মিষ্ট কথা শুনিতে পায় নাই—একখানিও স্নেহহস্ত তাহার মস্তক স্পর্শ করে নাই। একটিও মধুর কোমল সহানুভূতির স্বর একদিনের জন্যও তাহাকে আদর করিয়া "গোবর্দ্ধন" বলিয়া ডাকে নাই। সংসারে তাহার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল ছিল—তারক। তারক উমেশচন্দ্রের পিতার আমল হইতে রায় পরিবারে কার্য্য করিয়া স্থবির হইয়াছিল। ভ্রাতার প্রহারে ও ভ্রাতৃজায়ার কঠোর কর্কশবাক্যে মর্ম্মপীড়িত হইয়া যখন গোবর্দ্ধন নির্জ্জনে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত, তখন বৃদ্ধ তারকই পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কম্পিত হস্তে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিত। বাষ্পরুদ্ধ আবেগ-পূর্ণ-কণ্ঠে সহানুভূতির স্বরে কহিত,—"কেঁদ না, দাদাবাবু! চিরদিন কখনও সমান যায় না। তোমার একদিন সুদিন আসিবেই আসিবে।"

অতি তুচ্ছ কারণে অতি সামান্য ক্রটীতেই নলিন গোবর্দ্ধনকে প্রহার করিত। কথায় কথায় গালি দিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবার ভয় দেখাইত। কনিষ্ঠের উপর একটা বিকট বিদ্বেষভাব ও একটা নিতান্ত ঘৃণ্য হিংসাবৃত্তি নলিনের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। এমন কি গোবর্দ্ধনের প্রতি সহানুভূতি করায় বৃদ্ধ বিশ্বাসী ভৃত্য তারককেও অপদস্থ হইতে হইত; এবং অতি অকিঞ্চিৎকর ভুলের জন্য নলিনের নিকট প্রহার ও লাঞ্ছনার বাকি থাকিত না।

এমনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার কঠোর তাড়নার মধ্য দিয়া গোবর্দ্ধনের আট বৎসর কাল অতীত হইয়াছিল। সে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়া বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিল। কি জানি কেন আজ আর সে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না। চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথি; সে দিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেই আকাশে মেঘের সঞ্চার হইতেছিল। গোবর্দ্ধন বাড়ীর বাহিরে আসিয়া মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াইল। তারপর গ্রাম্যপথে উঠিয়া অন্ধকাররাশির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অল্প পরেই প্রবলবেগে বারিধারা নামিয়া আসিল। অট্টহাস্যে বিজলী দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দিল। জীমূতের গভীর গর্জ্জনে পথিকের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধনের সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিধারায় সিক্ত হইল, তথাপি তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। আজ তাহার হৃদয়ে একটুও ভয় বা আশঙ্কা ছিল না। তাহার অন্তরের সমস্ত শান্তিটুকু সমস্ত কোমলতাটুকু যেন কোন নিষ্ঠুর দৈত্য সবলে দূর করিয়া দিয়াছিল। জীবনের প্রতি একটা তাচ্ছিল্যের ভাব আসিয়া আজ তাহাকে উন্মত্তের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছিল। উৎপীড়িত গোবর্দ্ধনের অন্তরে ভ্রাতার প্রতি বিদ্রোহভাব আজ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাহার রুদ্ধ হৃদয়-দ্বারে আঘাতপূর্ব্বক বলিতেছিল,—"সে এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে, দাদা তাহার প্রতি এমন ঘৃণিত ব্যবহার করিতে পারেন। তাহার অপরাধ থাকুক, বা না থাকুক, তজ্জন্য তিরস্কার করেন, কটু বলেন, তাহার একটা তবু অর্থ আছে, কিন্তু পাঁচজনের সম্মুখে পাদুকা দ্বারা প্রহারপূর্ব্বক বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার নাম কি স্নেহ? এই কি ভালবাসা? নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিয়াই কি ভাইকে শাসন করিতে হয়! চরিত্র-সংশোধনের উপায় কি প্রহার? ছিঃ এতটুকু আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান কি তাহার নাই? এখন গোবর্দ্ধন নিতান্ত কচি খোকা নয় যে, শিশুর মত পড়িয়া পড়িয়া মার খাইবে! ছিঃ! ছিঃ! এমন ঘৃণিত জীবন বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে প্রার্থনীয়।"

(৩)

ছয়ঘরিয়ার তিনমাইল দূরে গরীবপুর। কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় গরীব-পুরের একজন মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ। কালীপদ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র যুগলকিশোর গোবর্দ্ধনের সহপাঠী। যুগলের সহিত গোবর্দ্ধনের খুব প্রণয় ছিল। স্কুলে উভয়ে একত্র বসিত। অন্যের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলে উভয়েই একপক্ষ লইত। অবসর মত পরস্পরের সুখ দুঃখের কথা কহিয়া বড় সুখী হইত। উভয়েই উভয়ের বাড়ীতে কয়েকবার গমনাগমনও করিয়াছিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া প্রবল ধারাপাত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য গোবর্দ্ধন কোথাও আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে অপ্রশস্ত গ্রাম্য রাস্তা ধরিয়া বরাবর গরীবপুরের দিকে চলিতে লাগিল। তাহার মাথায় আগুন জ্বলিতেছিল। অবিশ্রান্ত ধারাপাতেও আগুন নিবিল না। পূর্ব্বেই [illegible] ও মার খাইয়া গোবর্দ্ধনের দেহ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল, তাহার উপর অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার কৃশ দুর্ব্বল শরীর আরও অধিকতর শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু মানসিক উত্তেজনায় [illegible] বশতঃ

এতক্ষণ সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। এক্ষণে প্রকৃতির প্রভাব তাহার শরীরে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। তাহার শ্রান্ত মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পা' আর উঠে না—চলিতে তাহার বড় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্তভাবে গোবর্দ্ধন গরীবপুর প্রবেশ করিল। তখন বৃষ্টি থামিয়া আসিয়াছিল। অল্পদূর যাইয়াই যুগলদের বাড়ী। সে সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর চাহিয়া দেখিল, বৈঠকখানার গৃহে রুদ্ধ বাতায়ন-রন্ধ্র-পথে আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছে। সে মৃদুস্বরে ডাকিল,—যুগল! যুগল!

ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর হইল,—"কে? এত রাত্রে কে ডাকে?"

গোবর্দ্ধন কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"যুগল, আমি; দরজা খোল।"

"কে? গোবর্দ্ধন?"

তাড়াতাড়ি দ্বার মুক্ত করিয়া যুগল বাহিরে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ কণ্ঠে কহিল,—'কি সর্ব্বনাশ! জলে যে আচ্ছা ভিজেছ! ছিঃ! কোথাও একটু দাঁড়াতে পারনি?'

যুগল গোবর্দ্ধনের হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। সিক্ত বস্ত্রের পরিবর্ত্তে শুষ্ক বস্ত্র পরাইয়া সযত্নে তাহার শুশ্রূষা করিল। তারপর আহারাদি করাইয়া যুগল গোবর্দ্ধনকে লইয়া এক শয্যায় শয়ন করিল এবং তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে চোখের জলে উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল।

শেষ রাত্রে উভয় বন্ধু নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ একটা গোলমালে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কালীপদ বাবু ব্যস্তভাবে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"যুগল, গোবর্দ্ধন তাহার দাদার বাক্স হইতে ৫০০৲ টাকার দুইখানি নোট চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তাই পুলিশ তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে।"

শুনিয়া গোবর্দ্ধনের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; চিন্তামেঘে তাহার মুখচন্দ্র আচ্ছাদিত হইয়া গেল। যুগলও চমকিত হইয়া স্তব্ধভাবে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সহসা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—"তবে কি হবে বাবা? সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে কি গোবর্দ্ধন বাঁধা পড়িবে?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক গোব-

র্দ্ধনকে চোর বলিয়া ও কালীপদবাবুকে চোরের আশ্রয়দাতা বলিয়া গ্রেপ্তার করিল। ইহার পর যখন কালীপদ বাবুর সমস্ত বাড়ীটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ৫০০্ টাকার নোট পাওয়া গেল না, তখন কালীপদ বাবুকে ছাড়িয়া দিয়া পুলীশ গোবর্দ্ধনকে থানায় লইয়া গেল। যুগল কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পিতার পায়ে পড়িয়া বলিল,—"বাবা, গোবর্দ্ধনকে কি কিছুতেই বাঁচান যাইবে না?"

কালীপদ বাবু চক্ষু মুছিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—"কি করিব বাবা! আমরা যে গরীব। গোবর্দ্ধনের দাদা যে বড়লোক, তাহার সহিত বিবাদ করিয়া আমরা টিঁকিব কি করিয়া?"

(৪)

গোবর্দ্ধন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর পরামর্শদাতা সনাতন সর্দ্দার মালা ঘুরাইয়া বলিল,—"কি জান নলিনচন্দ্র—ওর নাম কি—ছোঁড়াটাত রাগ করে—ওর নাম কি—বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। এ গ্রামে তোমার ত—ওর নাম কি—শক্রর অভাব নেই। যদি কোনও দুষ্ট লোক—ওর নাম কি—ছোঁড়াটাকে হাত ক'রে ফেলে, তাহলে তোমার—ওর নাম কি—অনেক অনিষ্ট করিতে পারে। বুঝেছ ত—ওর নাম কি—এর একটা প্রতিকার করা অবশ্য দরকার হচ্ছে যে, ওর নাম কি—বেশ করে বুঝে দেখ। শ্রীহরি! শ্রীহরি!

তৎক্ষণাৎ পরামর্শ সভা বসিয়া গেল। সর্দ্দার মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত স্থির হইল যে, গোবর্দ্ধনের নামে চুরির অভিযোগ আনয়ন করিতে হইবে। নলিন কেবল এজাহার দিয়াই খালাস, আর যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা সর্দ্দার মহাশয়ই করিবেন। অভিযোগ আনিতে হইলে মামলা করিতে হইবে ত, মামলার তদবির করিতে কিছু অর্থব্যয় আছে ত, তাই সনাতন সর্দ্দার নলিনের নিকট হইতে ৫০্ টাকার একখানি নোট লইয়া, থানার দিকে চলিয়া গেলেন।

নলিন সনাতন সর্দ্দারের নিকট তাহার সহোদর গোবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে মিথ্যা এজাহার দিতে স্বীকৃত হইল বটে, কিন্তু থানার দারোগাবাবুর সম্মুখে এজাহার দিবার সময় সে বড় গোলমাল করিয়া ফেলিল। দারোগাবাবুর সামান্য সামান্য প্রশ্নেই তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটা বড় কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। মুখমণ্ডল লাল হইতে লাগিল। চক্ষু কপালে উঠিতে লাগিল, নাসিকা

বিস্ফারিত হইতে লাগিল। কথারও বড় সামঞ্জস্য রহিল না। সে যেন হৃদয়ে একপ্রকার তীব্র যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। সে যেন দেখিতে পাইল, তাহার পরলোকগত পিতৃদেব স্বর্গ হইতে রক্তচক্ষুতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ইহাতে সে বড় আত্মহারা হইয়া পড়িল, একটা কাল্পনিক ভয়ে বড় ভীত হইয়া পড়িল। তাহার ভাব দেখিয়া দারোগা বাবুর মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাহার উপর যখন তিনি গোবর্দ্ধনের প্রীতি-প্রবণ অন্তরাত্মার করুণ-কোমল সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাইলেন এবং তাহার নিষ্পাপ চির নির্ম্মল আনন্দ-উজ্জ্বল বদন নিরীক্ষণ করিলেন, তখন তাঁহার বুঝিতে আর কিছুই বাকি রহিল না। তিনি গোবর্দ্ধনকে মুক্তি দান করিলেন।

(৫)

ছয়ঘরিয়া হইতে ৮ ক্রোশ দূরে যাদবপুর। যাদবপুরে গোবর্দ্ধনের ভগ্নীর বাড়ী। বেলা তিনটার সময় যখন গোবর্দ্ধন অনাহার-ক্লিষ্ট মলিন মুখে তথায় উপস্থিত হইল, তখন তাহার ভগ্নীপতি সারদাবাবু বাহিরের রোয়াকে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া আগ্নেয়গিরির ধূমোচ্ছ্বাসের মত এক গাল ধূম উদ্গীরণ পূর্ব্বক একটা উৎকট রসিকতা করিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন তাঁহার দিকে আদৌ লক্ষ করিল না, বরাবর অন্দরে চলিয়া গেল।

অনেক দিন পরে কমলমণি কনিষ্ঠ সোদরকে পাইয়া বড় সুখী হইল। প্রাণপণে আদর যত্ন করিল, কিন্তু গোবর্দ্ধনের চিন্তা-চর্ব্বিত-বিষন্ন মুখে হাসির রেখা ফুটিতে না দেখিয়া প্রাণে কিছু ব্যথা পাইল।

সন্ধ্যার সময় যখন কমলমণি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সেই সময় সারদা বাবু একখানি পত্র হাতে করিয়া আসিয়া গম্ভীর-ভাবে বলিলেন,—"দেখ, দাদা পত্র দিয়েছেন।"

পত্র পড়িয়া কমলমণির মুখ বড় ভার হইয়া উঠিল। সে করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। সারদাবাবু উদাস স্বরে কহিলেন,—"তা দাদাকে ত আর চটাইতে পারা যায় না, সময় অসময় আছে ত; দাদার দ্বারা অনেক উপকার হইতে পারে।"

কমলমণি কোনও উত্তর করিল না, চোখের জল রুদ্ধ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রত্যূষে সারদাবাবু গোবর্দ্ধনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দাদা লিখিয়াছেন, তুমি তাঁহার টাকা চুরি করিয়া আনিয়াছ। তোমাকে এখানে স্থান দিতে নিষেধ করিয়াছেন। কি করিব ভাই, দাদার কাছে পুঁটীর বিয়ের সময় অনেকগুলি টাকা কর্জ্জ লইয়াছি। তাঁহার কথার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না ত।"

গোবর্দ্ধন সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া তদ্দণ্ডেই যাদবপুর পরিত্যাগ করিয়া গেল।

(৬)

গোবর্দ্ধন ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত বিষণ্ণহৃদয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। কোন্ পথে চলিতেছে তাহার কিছু ঠিক ছিল না—কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ক্রমে সম্মুখে যে পথ পাইল, তাহাতেই চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে এক গ্রামে গিয়া দেখিল, এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা-প্রাঙ্গণের সংলগ্ন বৃহৎ তোরণের সম্মুখে একখানি সরস্বতী প্রতিমা রাখিয়া কতকগুলি বালক নাচিয়া নাচিয়া মধুর করুণ-কণ্ঠে গাহিতে ছিল—

আবার এস গো জননী।
এম্‌নি ভাবে বরষ পরে,
মোরা সবাই হরষ ভরে,
এম্‌নি ভাবে হেরি যেন
তোমার রাঙ্গা পা'দুখানি॥
এম্‌নি ভাবে "বাণী" রবে,
ফাটে যেন গগন-গায়,
এম্‌নি করে মোরা সবে,
ডাকি যেন মা তোমায়;
এম্‌নি ভাবে উঠে যেন,
(মা) তোমার নামে জয়ধ্বনি॥
"আসিস্ আবার—আসিস্ মাগো!
বল্‌ব আর তোমায় কত;
নরেনের যদি হৃদে জাগো,
সেবিব তোমায় সাধ্যমত,
তোমারি চরণে সকলি ঢালিব,
রাখিব কেবল বক্ষখানি॥

শৈশবেই গোবর্দ্ধনের হৃদয়ে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ছিল। সে মায়ের অকপট ভক্ত। স্কুলে যখন সরস্বতী পূজার আয়োজন হইত, তখন সে আহার নিদ্রা ভুলিয়া অহর্নিশি মায়ের কার্য্যে প্রচুর পরিশ্রম করিত; ৮।১০ ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়াও মায়ের পূজার উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে আনন্দ লাভ করিত। মায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পাইলে সে যেন বড় সুখী হইত। তাই গানের সুরটী চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া প্রতি মূর্চ্ছনায় ভক্তের হৃদয়ে কি এক মধুর ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। কি এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আপনার ভবিষ্যতের সকল ভাবনা ভুলিয়া গেল— পথশ্রম অনাহার প্রভৃতি সকল কষ্ট ভুলিয়া মায়ের নামে তাহার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, গানটীও তাহাকে সেইরূপ আকর্ষণ করিয়া প্রতিমার সম্মুখে লইয়া গেল। প্রতিমার দিকে চাহিয়াই গোবর্দ্ধন পুলকে শিহরিয়া উঠিল, তাহার বিষণ্ণহৃদয়ে অকস্মাৎ উল্লাসের লহরী নাচিয়া উঠিল। তাহার উৎসুক নেত্রে আর পলক পড়িল না, কণ্ঠ হইতে একটী হর্ষধ্বনি ফুটিয়া বাহির হইল। তাহার হৃদয় মথিত করিয়া একটা আকুল অশান্ত শিশুর মত ভাষা ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম করিয়া সেই বালক-দলে যোগ দিল। করতালি দিয়া নাচিয়া নাচিয়া মায়ের গুণ-গানে বিভোর হইয়া পড়িল! অশ্রু বাধা না মানিয়া তাহার গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে একটী কৃত্রিম ফোয়ারা ছিল। তাহার ঠিক সম্মুখে একটী বিস্তৃতশাখ বকুল বৃক্ষ। বকুল বৃক্ষটীর মূলদেশ প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। বাড়ীর কর্ত্তা কৈলাসবাবু সেই বকুলবৃক্ষমূলে বসিয়া ফোয়ারা হইতে যে জলরাশি ছয়টী বিভিন্ন ধারায় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শূন্যে পুনর্ম্মিলন পূর্ব্বক নিম্নে পড়িতেছিল, তাহাই দেখিতেছিলেন। তখন অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম রশ্মি সংস্পর্শে ফোয়ারার ধারা হইতে যেন পদ্মরাগ মণি সমূহ ঝরিয়া পড়িতে-ছিল। মৃদু রবি কিরণ যেন বৃক্ষপত্রের হরিত শোভা অধিকতর দীপ্তি-শীল করিতেছিল। বালককণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতের সু-স্বর-লহরী সুধীর সমীরণের মৃদু হিল্লোলে ফোয়ারার ধারা ঈষৎ কাঁপাইয়া কর্ত্তার প্রবীণ হৃদয়েও যেন এক মধুময় মোহাবেশের সঞ্চার করিতেছিল।

হঠাৎ কর্ত্তার চক্ষু নবাগত গোবর্দ্ধনের দিকে পড়িল। গোবর্দ্ধন তখন ভাবে বিভোর হইয়া "জয় জয় জয়—বাণী মায়িকী জয়" বলিয়া নৃত্য করিতে

ছিল। তাহার স্বভাব-উজ্জ্বল বদন-মণ্ডল হইতে দুইটী ধারা গড়াইয়া বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছিল।

পশ্চাতে স্ত্রীলোকের মত খোঁপা বাঁধিয়া একটী উড়ে মালী যখন পান চিবাইতে চিবাইতে "কর্ত্তা ডাকিতেছেন" বলিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল, তখন সে একবারে চমকিয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধন নিকটে উপস্থিত হইলে, কর্ত্তা তাহাকে বসিতে বলিয়া, স্নেহ-পূর্ণ মধুর কণ্ঠে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বড় ব্যথিত হইলেন; এবং সহানুভূতির-স্বরে কহিলেন,—"তা বেশ, আমার ত সতীশ ও পানুর জন্য একজন গৃহ-শিক্ষকের দরকার। তা তুমিই আমার এখানে থাক না কেন? উহারা এই সবে পেয়ারী সরকারের "সেকেণ্ড বুক" ধরিয়াছে, তোমার দ্বারাই বেশ হবে এখন।"

গোবর্দ্ধন কোনও উত্তর দিতে পারিল না। কেবল নীরবে তাঁহার দিকে চাহিল, কেন ভাষার অক্ষমতা ও অপূর্ণতা ঢাকিবার জন্য কৃতজ্ঞ পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারাই প্রত্যুত্তর করিল।

তারপর কৈলাসবাবু সারাদিন অনাহার-ক্লিষ্ট গোবর্দ্ধনকে আহার করিবার জন্য বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিলেন। সর্ব্বেন্দ্রিয় মুগ্ধকর এই বালকরূপী মাতৃভক্ত মূর্ত্তিটীকে দেখিয়া বাড়ীর মেয়েরা বড় আনন্দ লাভ করিল। সতীশের ছোট বোন্ সুধা প্রথমেই তাহাকে কাকাবাবু বলিয়া সম্বোধন করিয়া বসিল।

গোবর্দ্ধন আহার করিতে বসিল বটে, কিন্তু বিশেষ মনঃসংযোগের সহিত নহে। একে আহারপটুতা তাহার কোনও কালেই বিশেষ ছিল না, তাহার উপর যে মধুর ভাবের নেশায় সে বিভোর হইয়াছিল, তাহাতে ক্ষুধার তীক্ষ্ণতাও বিশেষ থাকে না। কেবলই মনে হইতে লাগিল,—"আঃ মরি মরি! মায়ের অপূর্ব্বকরুণা! জমিদারের ছেলে হইয়াও আমি গ্রহের ফেরে—কর্ম্মফলে—কপালদোষে গৃহচ্যুত হইয়াছিলাম, পথের ভিখারী হইয়া উদরান্নের ভাবনায় বড় ভীত হইয়াছিলাম। এখন আবার "বাণী" মায়ের অনির্ব্বচনীয় করুণায় আশ্রয় পাইলাম। আহা! এমন অসীম অফুরন্ত করুণার খনি না হইলে আর মা! মা যে আমার ষড়ৈশ্বর্য্য-দায়িনী জননী!" ভাবিতে ভাবিতে গোবর্দ্ধনের নয়নদ্বয় অর্দ্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল। সে আহারীয় দ্রব্য হস্তে লইয়াই অস্ফুট-ধ্বনিতে বলিতে লাগিল,—

বীণাপাণি নমস্তুভ্যং নমস্তে জ্ঞানদায়িকে !
ত্বচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীন-দয়াময়ি ॥
জয় যোগেশ্বরি বাণি ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িকে !
সারদে বরদে দেবি ত্বাং শিরসা নমাম্যহং ॥
নমস্তে পরমারাধ্যে বিদ্যে ত্রিজগদর্চ্চিতে !
দেহি মে পাদপদ্মং তে বিদ্যাদেবি নমোঽস্তু তে ॥
দীনাতিদীনঃ শরণাগতোঽহং,
মাতস্ত্বমেকা সুখশান্তিদাত্রী,
সরস্বতি ত্বাং শিরসা নমামি ॥

(৭)

কালের আবর্ত্তনে ছয়টী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। গোবর্দ্ধন মহাত্মা কৈলাসবাবুর অর্থসাহায্যে বি, এ, পাস করিয়াছে। কৈলাসবাবু তাহার যাবতীয় খরচ যোগাইতেন ও নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতেন।

একদিন বৈকালে গোবর্দ্ধন কৈলাসবাবুর নিকটে যাইয়া অতি বিনীত ভাবে জানাইল যে, সে সিরাজগঞ্জের হাই স্কুলের ভার পাইয়াছে, এবং সেখানে যাইতে চাহে। কৈলাসবাবু কিছু ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন—"তা কাজ করিতে যাবে যাও, আমি কিছু বাধা দিতে চাহি না; তবে কি জান সিরাজ-গঞ্জ পদ্মাপার—অনেক দূর। আরও একটা কথা, কোথাও কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে সংসারী দেখিলে বড় সুখী হইতাম।" ইতি-পূর্ব্বে কর্ত্তা গোবর্দ্ধনকে বিবাহ করিবার জন্য অনেকবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন তাঁহার দুটী পা ধরিয়া কেবল কাঁদিত, সাহস করিয়া কোনও জবাব দিতে পারিত না। তবে বিবাহে যে তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, ইহা অবশ্য প্রকাশ করিতে ত্রুটী করে নাই। আজও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না।

তখনও সেদিনকার পূর্ণিমার রজনী সম্পূর্ণরূপে প্রভাত হয় নাই; তখনও অসীম আকাশ হইতে আলোকরাশি আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরিয়া ফিরিয়া ধরাপৃষ্ঠে নামিয়া আসে নাই; তখনও প্রভাত-ফুল্ল ফুলের মধুরগন্ধে একটীও পাখী প্রফুল্ল হইয়া বিহুগুণ গানে ধরণীবক্ষ প্লাবিত করে নাই, তখনও শান্ত-সুধীর সুরধুনী-সলিলে অনাবিল জ্যোৎস্নারেখা দেখা যাইতেছিল। গোবর্দ্ধন একটী প্যাটরায় আবশ্যক মত বস্ত্রাদি ও একটী ক্যাম্বিসের ব্যাগে পুস্তকাদি গুছাইয়া লইয়া সিরাজগঞ্জ যাত্রা করিল। কর্ত্তার চরণে প্রণাম করিয়া যখন সে বাড়ী

হইতে বাহির হইল, তখন তাহার হৃদয় বড় অপ্রসন্ন হইয়া পড়িল। ছয়টি বৎসর এই বাড়ীতে থাকিয়া সে কত কার্য্যই করিয়াছে। গ্রামের ভিতর কোথাও গৃহদাহ হইলে, গোবৰ্দ্ধন সর্ব্বাগ্রে তথায় উপস্থিত হইত; গ্রামের ভিতর কোনও অসহায় ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িলে, গোবৰ্দ্ধন দিনরাত পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিত; গ্রামের ভিতর কোন দীন দরিদ্র কোন দিন অভুক্ত আছে, তাহা গোবৰ্দ্ধনের কাণে পৌঁছিলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার নির্দ্দিষ্ট অন্ন তাহাকে দিয়া স্বয়ং অনাহারে দিন কাটাইতেও কুণ্ঠা বোধ করিত না; গ্রামের ভিতর কেহ কোনও দিন বিপদে পড়িলে, বিপন্নের সাহায্যের নিমিত্ত গোবৰ্দ্ধন আহার নিদ্রা ভুলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত। গ্রামবাসী প্রত্যেক প্রাণীই তাহার পরমাত্মীয় হইয়াছিল, তাই গ্রামটী ত্যাগ করিবার সময় তাহার প্রাণে একটা অব্যক্ত বেদনার সঞ্চার হইল।

বেলা ৪টার সময় গোবৰ্দ্ধন যখন পদ্মাতীরে পৌঁছিয়া নৌকা ভাড়া করিতে গেল, ঘাটে তখন অনেকগুলি নৌকা ছিল; কিন্তু কোনও মাঝিই সেই বৈশাখের অপরাহ্ণকালে ভাড়ায় যাইতে স্বীকৃত হইল না। সকলেই এক বাক্যে বলিল—"না কর্ত্তা, এমন অবেলায় নাও ছাড়তি পারব না।" বৈশাখ মাসের বৈকালে খুব পাক্কা মাঝিও পদ্মানদীতে নৌকা চালাইতে চায় না,—"কালবৈশাখী"র এমনি ভয়।

বাল্যকাল হইতে গোবৰ্দ্ধনের কেমন একটা অভ্যাস ছিল, কোনও কাজ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া বিশ্রাম করিতে পারিত না;—কোনও স্থলে যাইতে হইলে অৰ্দ্ধ পথে বিশ্রাম করা তাহার আদৌ আসিত না। সে দিন তাহার গন্তব্যস্থানে যাইতে হইলে নৌকাযোগে পদ্মানদী দিয়া গমন করা ব্যতীত আর অন্য উপায় ছিল না, তাই যতই সে গমনে বাধা পাইতে লাগিল, ততই সে অপচ্ছন্দ বোধ করিয়া ধীরে ধীরে নদীতীর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদূরে একখানি ছোট জেলেডিঙ্গী দেখিতে পাইয়া তাহার মাঝিকে ডাকিয়া বলিল—"ওহে মাঝি! ভাড়ায় যাবে?" নৌকার ভিতর হইতে উত্তর আসিল,—"হাঁ যাব না ক্যান্, যাব।" ডিঙ্গীতে একজন দাঁড়ী ও একজন মাঝি ছিল। যে বাহির হইয়া আসিল তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর হইবে। তাহাকে গোবৰ্দ্ধন আপন গন্তব্য স্থানের কথা বলিয়া "এখনই যে নৌকা ছাড়িতে হইবে—কালবৈশাখীর ভয় করিলে চলিবে না" একথাও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল। লোকটা একটু ভাবিয়া বলিল,—"দাঁড়ান

ভাইপোকে জিজ্ঞাসা করি।”—এই বলিয়া সে হাঁকিল—“হাবা! এদিকে আয়ত।”

কাকার আহ্বান শুনিয়া একটি অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক ডিঙ্গি হইতে বাহির হইয়া উপরে আসিল। মাঝি বলিল—“হাবা, বাবুকে নিয়ে এই অবেলায় পদ্মায় যাতি পারবি?” হাবা অকুতোভয়ে বলিল,—“পারব না ক্যান্, আসেন, বাবু আসেন।” এই বলিয়া হাবা গোবর্দ্ধনের দ্রব্যাদি নৌকায় তুলিতে লাগিল।

ভ্রাতুষ্পুত্রের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া কাকা কেদার বলিল, “চলেন বাবু, চলেন; আর দেরী কর্‌বেন না—‘ভা’টেনের মুখে লাও ধরি দিতে পারলি খুব শীগ্‌গী পৌঁছিয়ে দেবো।”

চারিটাকা ভাড়া ধার্য্য করিয়া গোবর্দ্ধন নৌকায় উঠিয়া বসিল। “বদর বদর” বলিয়া খুড়োভাইপো নৌকা খুলিয়া দিল। কেদার বলিল—“হাবা, তুই হালটা ধর, আমি দাঁড়ে বসি। শিগ্‌গীর পাড়ি জমায়ে দিয়ে,—“গুণে” নাম্‌তো।” কতকক্ষণ পরে নৌকাখানি নদীর পরপারে লাগিল। কেদার তখন গুণ ঠিক করিয়া লইয়া নৌকা হইতে নামিয়া গেল।

নৌকা তর তর বেগে চলিয়াছে। হাবা নৌকার পশ্চাতে হাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়; পশ্চিমদিকে একটু একটু লালের আভা দিতেছে, পাখীরা পদ্মার কুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরে গ্রামের দিকে চলিয়া যাইতেছে। আকাশে দলে দলে বক উড়িতেছে; মহিষের দল পার পরিত্যাগ করিয়া ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে। এমন সুন্দর সন্ধ্যায় হাবা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, মনের আবেগে গান ধরিল—

এবার এলে আর মাগো
তোমায় যেতে দেব না।
হৃদয় পূরে রাখ্‌ব ধ’রে
অমর-সেবিত অভয় চরণ দুখানা॥

হাবার কণ্ঠস্বর অতি মধুর, অতি সুন্দর। পদ্মা আপন মনে গান করিতে করিতে সাগর উদ্দেশ্যে যাইতেছে; বৃক্ষ চূড়ায় পাখীরা ভগবানের আরতি গাহিতেছে; অন্ধকার-যবনিকা পদ্মাবক্ষে অতিধীরে প্রসারিত হইতেছে, আর তাহারই মধ্যে হাবা সুধাকণ্ঠে সুধা ছড়াইয়া গাহিতেছে,—

হৃদয় পূরে রাখব ধরে
অমর-সেবিত অভয় চরণ দুখানা॥

তাহার স্বরলহরী কাঁপিয়া কাঁপিয়া নদীর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতেছে, নদী-তরঙ্গ সেই গানের সঙ্গে সঙ্গত হইতেছে ; দূরে বৃক্ষচূড়া হইতে সুকণ্ঠ বিহঙ্গগণ থাকিয়া থাকিয়া বাহবা দিতেছে ;—ইহাতে মাতৃভক্ত গোবর্দ্ধন ক্ষুদ্র নৌকার ক্ষুদ্র ছইএর মধ্যে চুপ করিয়া কি কখনও বসিয়া থাকিতে পারে ? আরও হাবা যে গান গাহিতেছিল, সে গান ত তাহাদেরই গান ; সে গান ত সে কতবার গাহিয়াছে, তবুও সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে গান গাহিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হয় নাই। গোবর্দ্ধন বাহিরে আসিয়া মাস্তুল ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাবার গানে যোগদান করিল। প্রাণ খুলিয়া গাহিল,—

এবার এলে আর মাগো !
　　　　তোমায় যেতে দেব না।
হৃদয় পুরে রাখব ধ'রে
অমর-সেবিত অভয় চরণ দুখানা॥

গানটী উভয়ের মধুর স্বরে মিশিয়া মধুময় হইয়া উঠিল। তখন যেন চারিদিক হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—

হৃদয় পূরে রাখব ধরে
　　　　অমর-সেবিত অভয় চরণ দুখানা॥

পাখীরাও যেন গাহিতে লাগিল,—

হৃদয় পূরে রাখব ধরে
অমর সেবিত অভয়চরণ দুখানা॥

নৌকার ছপ্ ছপ্ শব্দের মধ্য হইতে যেন উত্থিত হইতে লাগিল,—

হৃদয় পুরে রাখব ধ'রে
অমর সেবিত (তোমার) অভয় চরণ দুখানা॥

একস্থানে কয়েকখানা বড় বড় "মহাজনী" নৌকা মাস্তুল উচ্চ করিয়া তীর-সংলগ্ন হইয়াছিল। তাই কেদার গুণ গুটাইয়া নৌকায় উঠিয়া আসিল ; এক ছিলিম তামাক খাইয়া দাঁড় ধরিল। নৌকা তখন "বারগাড্" দিয়া চলিতে লাগিল।

হাবা কাকাকে নৌকায় উঠিতে দেখিয়া প্রথমে একটু চুপ করিয়াছিল। তারপর গোবর্দ্ধনের সঙ্গে গলা ছাড়িয়া গাহিতে লাগিল,—

বাণী বলে দুহাত তুলে
গাইব আমি প্রাণ খুলে,

মনের ময়লা যাবে জলে
(নরেনে) করলে তুমি করুণা।

তাহারা তিন জনেই গানে এমনি তন্ময় হইয়াছিল যে, পশ্চিমদিকে যে একখণ্ড কাল মেঘ উঠিয়া সমস্ত আকাশ যুড়িয়া বসিতেছে, সে দিকে আদৌ লক্ষ করে নাই। হঠাৎ একটু জোরে বাতাস বহিতেই কেদার বলিয়া উঠিল,—"ওরে হাবা, হাওয়া যে বড় জোর দিল। আঁধারে ত ঠাওর করতি পারতিছি নে। মেঘ করে নাই ত?"

হাবা উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল। তারপরই কিঞ্চিৎ ভীতস্বরে বলিল,—"ও কাকা, পশ্চিমে যে ভারি মেঘ করেছে।"

কেদার তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"নৌকা কিনারায় ধর"। এই বলিয়া সে প্রাণপণ জোরে দাঁড় টানিতে লাগিল।

হাবা বলিল,—"ঝড় যে উঠে আলো, বড়ই যে মুস্কিল হবিনি।" বলিতে বলিতেই শন্ শন্ শব্দে ঝড় উঠিয়া আসিল। কেদার কাতর স্বরে ডাকিয়া বলিল,—"কর্ত্তা, আর রক্ষে নেই, কাপড়টা আঁটিয়া লন। হাবা, জলে ঝাঁপ দে!"

মাতৃ-প্রেমে উন্মত্ত গোবর্দ্ধন তখনও আত্মহারা। কেদারের চীৎকার তাহার কর্ণে পৌঁছিল না। এই ঘোর বিপদের সময়েও সে একই অন্তরা বার বার গাহিতে ছিল,—

"বাণী" বলে দু'হাত তুলে
গাইব আমি প্রাণ খুলে,
মনের ময়লা যাবে জলে
(নরেনে) করলে তুমি করুণা॥

সেই প্রবল ঝড়, ভয়ানক ঝঞ্ঝা, ভীষণ তরঙ্গ গর্জ্জনের মধ্যে ক্ষুদ্র ডিঙ্গিখানি আর আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না, একবার উর্দ্ধমুখ হইয়া পরক্ষণেই পদ্মা-বক্ষে বিলীন হইয়া গেল।

গোবর্দ্ধন পল্লীবাসী নবীন যুবক; নদীতীরেই তাহাদের বাস; সুতরাং সন্তরণে তাহার দক্ষতা কম ছিল না। তাই আজ পদ্মার সেই ভীষণ তরঙ্গে পড়িয়াও—সেই তুমুল ঝড়ের মধ্যে থাকিয়াও দিশে হারা হইল না, মনে মনে মাকে ডাকিয়া সাঁতার কাটিতে লাগিল। তাহার মুখে চোখে জল প্রবেশ করিতে লাগিল; ক্ষণে ক্ষণে দম বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইতে লাগিল,

পেটের ভিতরও অনেকখানি জল ঢুকিয়া গেল। বহু চেষ্টার পর গোবর্দ্ধন "বাণী" মায়ের অসীম করুণার বলে প্রাণ লইয়া তীরে উঠিল। মাঝি কেদার তখন বালুকাময় চরের নিকট আজানু জলমগ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া "হাবা, হাবা" করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। অদূরে প্রলয়ঙ্করী তরঙ্গের উপর দিয়া মনুষ্যের মত কি একটা ভাসিয়া যাইতেছিল। কেদার সেইটা লক্ষ্য করিয়া আকুলি-বিকুলি করিলেও সাহস করিয়া ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিতে পারিতেছিল না। গোবর্দ্ধন তখন আপনার প্রাণের কথা ভুলিয়া গিয়া পিতৃহীন যুবক 'হাবার' প্রাণ রক্ষার জন্য পুনরায় জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল; এবং যখন সে হাবাকে লইয়া তীরের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তাহার প্রায় সংজ্ঞা ছিল না।

গোবর্দ্ধন অনেকক্ষণ পদ্মাতীরে বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে ঝড় থামিয়া গেল, তথাপি সে নিশ্চেষ্টভাবে সেই অন্ধকাররাশি-বেষ্টিত হইয়া বসিয়াই রহিল। নড়িবার শক্তি তখন তাহার ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। সে থাকিয়া থাকিয়া শুধু সেই পদ্মাবক্ষের ঘন অন্ধকার রাশির দিকে চাহিতেছিল। এবং দয়াময়ী মায়ের দয়ার কথাই তন্ময়চিত্তে ভাবিতেছিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইল; ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসিয়া পদ্মাচরে চরিতে আরম্ভ করিল। তখন গোবর্দ্ধন অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। এবং যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিল।

(৮)

গোবর্দ্ধন যাহা উপার্জ্জন করিতে লাগিল, তাহা হইতে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের মত খরচ রাখিয়া, বাকী "বাণী-পূজায়" ও অনাথ বালকগণের প্রতিপালনে ব্যয় করিতে লাগিল; বিবাহ করিল না। ছাত্রেরা তাহাকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিল। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষও তাহার দ্বারা স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি হওয়াতে, তাহার উপর বড় প্রসন্ন হইলেন। গোবর্দ্ধনের সুখ্যাতি দশদিক পূর্ণ করিয়া দিল। গোবর্দ্ধনও দেশের ও দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইল। তাহার জীবনের দিনগুলি বড় সুখে বড় শান্তিতে কাটিতে লাগিল।

একদিন প্রত্যুষে গোবর্দ্ধন খামে আঁটা একখানি পত্র পাইয়া বড়ই বিস্মিত হইল। কারণ তাহাকে খামে করিয়া পত্র দিবার কেহই ছিল না। খামখানির বিপরীত দিকে আবার সাড়ে চুয়াত্তরের অঙ্ক পাত ছিল। খামখানি খুলিয়া তাহার বিস্ময় দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সে দেখিল যে, পত্র তাহার বৌদিদির। তাহার বৌদিদি লিখিয়াছেন,—

"ঠাকুরপো!

অনেকদিন ধরিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি সিরাজগঞ্জ স্কুলে মাষ্টার হইয়াছ। তুমি রাগ করিয়া যাওয়া অবধি আমরা যে কিরূপ মনঃকষ্টে আছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমানে আমরা বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, ও বাড়ীর কর্ত্তার (সনাতন সর্দ্দারের পরামর্শে তোমার দাদা একখানি দলিল জাল করার অপরাধে আজ সতর দিন হাজতে আছেন। আমি এখন নিতান্ত একা ও অসহায়া। তুমি পত্র পাঠ আসিবে। ইতি—তোমার বৌদিদি।

গোবর্দ্ধনের হৃদয় ভক্তি ও দয়ায় পূর্ণ ছিল। তাই পত্র পাঠ করিয়া সে বড় বিচলিত হইয়া উঠিল। দাদার আকস্মিক বিপদের কথা শুনিয়া সে আর নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার চক্ষুর্দ্বয় জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নাসিকা ঘন ঘন শব্দ করিতে লাগিল। হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। বুকের ভিতর মুহুর্মুহুঃ বিজলী বিকাশ হইতে লাগিল। গোবর্দ্ধন রওনা হইবার জন্য অস্থিরভাবে জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিল। কিন্তু পদে পদে তাহার ভুল হইতে লাগিল। বহুদিন পরে বাল্যজীবনের অনেক কথাই একে একে তাহার মনে আসিয়া তাহার স্মৃতি-টুকুকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। গোবর্দ্ধন আজ তাহার দাদার সকল অহিত আচরণের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ছুটিল।

অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই বলিয়া থাকেন, তদ্‌বিরের জোরে মোকদ্দমার জয় পরাজয় নির্ণীত হইয়া থাকে। গোবর্দ্ধন নলিনকে বাঁচাইবার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মোকদ্দমার যথাসাধ্য তদ্‌বির করিল, বিস্তর অর্থব্যয় করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। নলিন অব্যাহতি পাইল না। জজসাহেব তাহার প্রতি দুই বৎসরকাল সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিলেন।

দুইজন সিপাই যখন সঙ্গিন তুলিয়া নলিনকে, আদালত হইতে জেলে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল, তখন গোবর্দ্ধন চোখভরা জল ও হৃদয়ভরা উচ্ছ্বাস লইয়া ছুটিয়া যাইয়া নলিনের পা জড়াইয়া ধরিল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

নমস্কার।

(১)

সৃষ্টির কারণ তুমি জগতের গুরু।
অনাথের নাথ তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু ॥
দীনের সহায় তুমি, ভক্তের জীবন।
জগতের আদি তুমি অনাদিকারণ ॥
পতিতপাবন তুমি দয়ার আধার :
দুর্ব্বলের বল তুমি এ মহী-মাঝার ॥
সৃজক পালক তুমি করুণা-সাগর।
ভক্তিভাবে তব পদে করি নমস্কার ॥

(২)

সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি করিয়া প্রদান।
জগতের সুমঙ্গল করিছ বিধান ॥
সৃজন করিছ জীবে চক্ষুর নিমিষে।
বিনাশ করিছ পুনঃ মৃদুমন্দ হেসে ॥
যেমতি সৃজন হয় তেমতি বিনাশ।
বিশ্বের মঙ্গল-বিধি তোমাতে প্রকাশ ॥
তুমি বিভো! দয়াময় জগতের সার।
ভক্তিভাবে তব পদে করি নমস্কার ॥

(৩)

তোমার আজ্ঞায় বিশ্ব কত মনোহর।
তোমার আজ্ঞায় বায়ু বহে নিরন্তর ॥
তোমার আজ্ঞায় নীল সাগরের জল।
তোমার আজ্ঞায় রহে জলাশয়ে জল ॥
তোমার আজ্ঞায় বৃক্ষে ফোটে কত ফুল।
সুগন্ধেতে মন প্রাণ করিছে আকুল ॥
তুমি বিভো! দয়াময় জগতের সার।
ভক্তিভাবে তব পদে করি নমস্কার ॥

(৪)

তোমার আজ্ঞায় ঐ রবি শশী তারা।
অন্ধকার বিনাশিয়া দেয় আলোধারা॥
তোমার আজ্ঞায় ঐ ক্ষেতে ফলে ধান।
তোমার আজ্ঞায় তাহে বাঁচে জীবগণ॥
তোমার আজ্ঞায় জীব পায় শান্তিধাম।
তুমিই দিয়াছ জীবে ধর্ম্ম অর্থ কাম॥
তুমি বিভো! দয়াময় জগতের সার।
ভক্তিভাবে তব পদে করি নমস্কার॥

(৫)

ঐ যে বিটপীশ্রেণী পর্ব্বত-প্রমাণ।
পথশ্রান্ত পথিকেরে করে শান্তিদান॥
ঐ যে কাননে ফোটে শত শত ফুল।
সুষমাতে সুগন্ধেতে জগতে অতুল॥
সর্ব্বজীবে সর্ব্বদ্রব্যে তোমাকেই দেখি।
কাননে তোমার গীত গাহিতেছে পাখী॥
তুমি বিভো! দয়াময় জগতের সার।
ভক্তিভাবে তব পদে করি নমস্কার॥

(৬)

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যে দিকে যা দেখি।
তোমার মহিমা বিনা কিছুই না দেখি॥
অন্নাতুর দুঃখী জনে কর শান্তি দান।
বিধবার অশ্রুজল কর নিবারণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যাঁর দিতে নারে সীমা।
ক্ষুদ্র আমি, কি বর্ণিব তাঁহার মহিমা॥
তুমি বিভো! দয়াময় জগতের সার।
ভক্তিভাবে তব পদে করি নমস্কার॥

শ্রীবিজয়গোপাল বক্সী।

অবসর।

১২শ ভাগ। } শ্রাবণ। { ১২শ সংখ্যা।

শান্তিপুরে কয়েক দিবস।

তখন হাতে কিছু কাজ ছিল না—সবে পরীক্ষা দিয়াছি। হৃদয় উৎফুল্ল, অবসাদে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যেন বহুদিনের পর পরিশ্রান্ত কর্ম্মজীবন একটু অবসর খুঁজিয়া পাইয়াছে। ঠিক গ্রীষ্মের প্রারম্ভ—দুটী ঋতুর সন্ধিস্থল—বড় রমণীয়, বড় মুগ্ধকর, বড় মাদকতাপূর্ণ। কখনও পল্লীভ্রমণের সুযোগ উপস্থিত হয় নাই; পল্লীসৌন্দর্য্য কখন উপভোগ করি নাই। ঔপন্যাসিকের মানস-তুলিকায় বহু পল্লীচিত্র নিখুঁতভাবে ফুটিতে দেখিয়াছি, কিন্তু চক্ষু কখনও বিশ্বাসে উপনীত হইতে পারে নাই, নিজেও স্ব-রচিত গল্পে অনেক স্থলে লোকের দেখাদেখি স্বভাবের বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু স্বভাবের আস্বাদন ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তাই পল্লীগ্রামে বেড়াইবার বড় সাধ হইল।

২৭শে বৈশাখ অপরাহ্নে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শান্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, দু'এক খানা জাফ্রাণ রঙের চূর্ণ মেঘখণ্ড আকাশের গায় ঘর, পুষ্করিণী, পাহাড় সমতলক্ষেত্র, পক্ষী এবং মানুষাকার প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছিল। দীর্ঘপথ বহিয়া দ্রুতগ্রামী ট্রেণ, গ্রামের পর গ্রাম পশ্চাতে ফেলিয়া সন্ধ্যার ক্ষীণ অন্ধকারে চলিয়াছে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কাহারও কথায় গ্রাহ্য নাই,' গন্তব্য পথাভিমুখে ছুটিয়াছে। দুই ধারে গাঢ় সবুজ শস্যক্ষেত্র, লাইনের পাশে কোথাও বাব্‌লার গাছ, কোথাও দু'একটী বদরীবৃক্ষ। সে দিন সন্ধ্যার পরই চাঁদ উঠিল; পৃথিবী রজত-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। বৃক্ষ, লতা, খাল, বিল, ও দীঘী শ্যামলতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া চুমকি বসান জ্যোৎস্নার রেশমী আজিয়া খানা দেহের উপর

বিছাইয়া দিল। ইহার পূর্ব্বে রাণাঘাট ষ্টেশনে আমাদের ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। সান্ধ্যভোজনটা এইখানেই সারিয়া লইয়াছিলাম। তৎপর চূর্ণীঘাটে অবতরণ করিয়া নৌকাযোগে পার হইয়া পুনরায় ট্রেণে উঠিলাম। চূর্ণী ক্ষীণাঙ্গী, স্বচ্ছসলিলা—নিথর নিস্পন্দময়ী।

শান্তিপুর ষ্টেশনের উত্তরে 'বাব্‌লা' নামক স্থানে প্রকৃতির এক নিভৃত কুঞ্জে শান্তমুনির আশ্রমটী অবস্থিত। আম্রকাননের মধ্যস্থিত চতুষ্কোণ গৃহটী বিগ্রহ বক্ষে লইয়া আজও দণ্ডায়মান। আজও ফাগোৎসবে শত গ্রামের লোক একত্র হইয়া সে পুণ্যস্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করে; সে পুণ্য মেলায় আজও বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। এই আশ্রমের নামানুসারেই গ্রামের নাম শান্তিপুর। সহরের কোলাহল বিস্মৃত হইয়া দু'একদিন প্রকৃতির সে নীরব স্বপ্নরাজ্যে ডুবিয়া গেলাম। ইহার পর একদিন প্রদোষে ৺শ্যামচাঁদের মন্দির দর্শনার্থে গমন করিলাম। প্রায় দুইশত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে তথাপি মন্দিরের কোন অংশ অদ্যাপিও ভগ্ন হয় নাই। উন্নত মন্দিরের গুম্বুজ ও খিলানগুলি প্রাচীন স্থপতিবিদ্যার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, মন্দিরের অভ্যন্তরে পাষাণময় শ্যামসুন্দর জীউ, বামে ধাতুময়ী রাসেশ্বরী। ১৬৪৮ শকাব্দে ৺রামজীবন, রামগোপাল, রামভদ্র ও রামচরণ রায় চৌধুরী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি সে দিন বাঙলার এক স্মরণীয় দিন, ব্রাহ্মণ প্রথম সে দিন শূদ্রের গৃহে পদ-প্রক্ষালন করেন। ব্রাহ্মণসমাজের অগ্রণী প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের উপস্থিতিতে ৺শ্যামচাঁদের মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। অঙ্গনে একটী বকুল বৃক্ষের গন্ধরাশি থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল।

গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে ৺জলেশ্বর ভৈরব পুণ্য-শিলা সুসংস্কৃত মন্দির; চত্বরে উপবন, বেলা, চামেলী, গোলাপ ও গন্ধরাজের বাগান। শিবলিঙ্গ শ্বেতচন্দনে ভ্রক্ষিত; পাদদেশে শত শত প্রস্ফুটিত রক্তোৎপল। হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যেন ক্ষণেকের তরে সে পুণ্যক্ষেত্রে তন্ময় হইয়া যায়; সে নগ্ন সরলতায় মদ ঐশ্বর্য্য বড় ছোট হইয়া দাঁড়ায়—আকাঙ্ক্ষা নিস্তেজ হইয়া যায়।

* আর একটী অতি প্রাচীন কীর্ত্তি শান্তিপুরের সন্নিকটবর্ত্তী রামনগর পাড়ায়

* এই মস্‌জিদটীর ফটো তুলিতে সুসাহিত্যিক মুন্সী মহম্মদ মোজাম্মেল হক্, মুন্সী মহম্মদ বেচু, মুন্সী মহম্মদ দায়েমুল্লা, সৈয়দ কাজেম হোসেন খোন্দকার প্রভৃতি বিশিষ্ট মুসলমানগণ আমায় আশাতিরিক্ত সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা একত্রে এই আনন্দের

দেখিতে পাইলাম, একটী জীর্ণ দুই তিন শতাব্দীর ভগ্নপ্রায় মস্‌জিদ স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে অবিন্যস্ত ইষ্টকরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। গুল্মলতাদি সমাচ্ছন্ন মস্‌জিদটী আজও অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি বক্ষে লইয়া, নীরব নিশ্বাসে দিগন্ত অভিশপ্ত করিয়া বিরাজিত। সে যেন কত পরিবর্ত্তন দেখিয়াছে; কত প্রভাত সন্ধ্যা তাহার বক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া গিয়াছে, কত উন্নতি অবনতির সে সাক্ষী হইয়াছে, কত পুণ্য সাম্রাজ্যের ধ্বংস দেখিয়াছে; কত পাপের প্রতিষ্ঠা হৃদয়ের নিভৃত স্থানে আঁকিয়া রাখিয়াছে। মস্‌জিদটী ইয়ার মহম্মদের মস্‌জিদ নামে কথিত। সৈয়দ মহবুব আলম্ যখন বোগ্‌দাদ হইতে হিন্দুস্থানে আগমন করেন, তখন দিল্লীর মস্‌নদে অধিষ্ঠিত মোগল সম্রাট তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও সুতরাগড় নামক জায়গীর তাঁহাকে দান করেন। তাহার কিছুদিন পরে ধনশালী ইয়ার মহম্মদ মাতৃ-অনুরোধে এই মস্‌জিদটী প্রতিষ্ঠিত করেন। †

পুণ্যশ্লোক শান্তিপুরের রেণুতে রেণুতে এরূপ বহু কীর্ত্তি লুকাইয়া আছে। বহু-সাধক-পদরেণু বক্ষে লইয়া এই গণ্ডগ্রাম অমর হইয়া গিয়াছে। যে পবিত্র পুরুষ আদি প্রেমমন্ত্রের প্রচারক, যে জাহ্নবীতটে বেদমাতা গায়ত্রীর নিত্য পূজা, যে গৌড়ের কীর্ত্তি-কাহিনী ভারতের ইতিহাসে দেদীপ্যমান—শান্তিপুর যে তাহার অনতিদূরে।

শ্রীব্রজমোহন দাস।

নিদর্শন স্বরূপ একটী গ্রুপ্ তুলিয়াছিলাম এই প্রবন্ধের সহিত তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার অসাবধানতায় তাহা নষ্ট হইয়াগিয়াছে।

† মস্‌জিদটীর সংস্কারকল্পে আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট নাকি সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শিবের স্তব।

নমি দেব মহাদেব নমি রাঙা পায়,
পোড়া হাড় ভস্ম ছাই ও চরণে পায় ঠাঁই,
আকন্দ ধুতুরা ফুল গরবে দাঁড়ায়,
ভকত-বৎসল হর,
ভক্তে দিবেন বর,
মরতে শিবত্ব মিলে শিব সাধনায়,
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়।
খুঁজিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় দেখেছি সকল
দেখেছি সে শচীপতি,
কনক অমরাবতী,
দেখেছি নন্দনবনে অমরের দল,
দেখেছি বৈকুণ্ঠধামে,
নারায়ণ লক্ষ্মীবামে,
দেখেছি কমলাসনে উজল অমল,
গণিয়া একটী দুটী
দেখেছি তেত্রিশ কোটি,
দেখেছি গন্ধর্ব্ব নাগ স্বর্গ রসাতল।
এমন আপন ভোলা,
এমন পরাণ খোলা,
এমন রজত-গিরি শ্বেত-শতদল,
পবিত্র শঙ্কর কোথা দেখিনি কেবল।
দেখিনি কে সুধা বলি কালকূট খায়,
দেখিনি কে কৃত্তিবাস,
শ্মশানে সুখের আশ,
ভূত পিশাচেরে পালে প্রীতি মমতায়,
কার বুকে এত স্নেহ,
প্রণয়িনী শব দেহ
হৃদয়ে তুলিয়া মাতে মহা তপস্যায়।
দেখিনি মড়ার হাড়,
কে করে গলার হার,
কাল-বিষধর স্নেহে হৃদয়ে দোলায়।
অমৃতান্ন পরিপূর্ণা,
কার ঘরে অন্নপূর্ণা,
সতীর গরব ভরে কেবা পড়ে পায়।

কার প্রেম হেন সাধা,
কে দেয় জায়ারে আধা,
অর্দ্ধনারীশ্বর কোথা মিলে দেবতায়।
কুবের ভাণ্ডারী তবু,
সুখ সাধ নাহি কভু,
বিশ্বপ্রেমে দিশে হারা পাগল ধরায়,
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়।
নমি দেব মহাদেব নমি ত্রিলোচন,
ভালে শোভে শশিকলা,
গলায় হাড়ের মালা,
কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিভূতি-ভূষণ,
জ্ঞানময় সদাশয়,
আত্মজয়ী মৃত্যুঞ্জয়,
পুড়ে মরে রিপুকুল খুলিলে নয়ন,
নিষ্কাম নির্ব্বাণদাতা,
বিশ্ববন্ধু বিশ্বপিতা,
অগতির গতি নাথ অনাথ-শরণ,
কাহারে পূজিব আর বিনা ও চরণ।
সদানন্দ ভোলানাথ আমি ভালবাসি,
অনাসক্ত অনুরাগী,
সংসারী সংসারত্যাগী,
শ্মশানে সুখের বাস নিত্য স্বর্গবাসী,
জ্ঞান কর্ম্ম প্রেম ভক্তি,
মিশামিশি শিব শক্তি,
উন্নতি মঙ্গল তাহে নিত্য পাশাপাশি।
অনাথ-অধম-পাতা,
সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধিদাতা
রাজ-রাজেশ্বর তবু ভিখারী উদাসী,
সহস্র প্রণাম পায়,
স্মরণে নীচত্ব যায়,
মৃত দেহে নব প্রাণ উঠে পরকাশি।
যদিও বুঝি না মর্ম্ম,
জানি না ভকতি কর্ম্ম,
তবুও পূজিব প্রভো সাজিয়া সন্ন্যাসী,
প্রেমময় মৃত্যুঞ্জয় আমি ভালবাসি।

শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী বসু।

ভবানন্দ মজুমদার।

ভবানন্দ,— বঙ্গ-কবিকেশরী, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, বঙ্গের কাব্য-কুঞ্জবন, "অন্নদামঙ্গল" মহাকাব্যের নায়ক; ভাবের অন্নদাত্রী পালনকর্ত্রী ঋদ্ধি-পুষ্টি-কান্তিদায়িনী, অন্নপূর্ণা অন্নদার দিব্য প্রসাদ-প্রসন্ন, বঙ্গের আনন্দ-পুরুষ—এই ভবানন্দ। বস্তুতঃ ভবানন্দ বঙ্গের—ভারতের রাজা প্রজার আনন্দই হইয়াছিলেন। ভবানন্দ সাধারণ গৃহস্থসন্তান হইয়াও—অবশ্য প্রকৃতি-শক্তির লীলা খেলায় অদৃষ্টকারণে, অন্নদারই প্রসন্নতায় অসামান্য সম্পদ, অতুল সম্মান-প্রতিষ্ঠা, বিপুল ও রাজ্য ঐহিক সর্ব্বস্বতার পরাকাষ্ঠাই লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং বঙ্গের আনন্দ না হইবেন কেন? যে ক্ষণ-জন্মা পুরুষ, কর্ম্মানন্দশক্তিদায়িনী, আনন্দময়ী প্রকৃতি জননীকে কর্ম্মে আনন্দ দান করেন, আনন্দময়ীর প্রিয়নন্দন হন; যাঁহাকে নিরন্তরই আনন্দময়ী ভাল বাসেন, সে জন বঙ্গ ভরিয়া আনন্দ বিতরণই বা না করিবেন কেন, তাহাতে বঙ্গের আনন্দই বা না হইবে কেন? তাঁহার ত "ভবানন্দ" নামই সার্থক বটে।

ভবানন্দের পিতার নাম রামচন্দ্র। রামচন্দ্র বালক ভবানন্দকে সংস্কৃত শিক্ষা-জন্য এক চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করিলেন। ভবানন্দ শৈশব হইতে অলোক-সামান্য স্মারকতা-শক্তি-সম্পন্ন নির্ম্মল সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা-প্রফুল্ল এবং দুর্জ্জয় সাহসী,—তাহাতে অকুতোভয় দুঃসাধ্য সাধনতৎপর ছিলেন; তাই তিনি অতি অল্পবয়সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত,দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন,—অসামান্য কৃতকার্য্যতায় জীবন-সাফল্যের দিব্য রাজমুকুটেও সুশোভিত হন। এই মুকুটবান্ রাজশ্রীসম্পন্ন নীরুজ শ্রীমান্-ভবানন্দই নদিয়া কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের আদিপুরুষ ছিলেন।

ভবানন্দের শরীর উন্নত, উন্নত শরীরে বহুল সুখ-সৌভাগ্যপ্রদ রাজশ্রী-লাভ-সূচক চিহ্ন ছিল। তাঁহার ব্রহ্মতালু সমতল প্রশস্ত, মস্তকের কেশ-কলাপ নিবিড় সূক্ষ্ম-কোমল, কপাল উন্নত বিস্তৃত,—রাজশিরা দ্বয় শোভিত, নাসিকা উন্নত, চক্ষুদ্বয় আকর্ণ-বিস্তৃত উন্নত,—ভাসমান, হস্তদ্বয় দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল উন্নত, স্তনদ্বয় একের বহু অন্তরে অন্য অবস্থিত,আজানুলম্বিত দীর্ঘ বাহুদ্বয়, নাভী

সুগভীর এবং দক্ষিণ হস্ততলে অখণ্ড সুদীর্ঘ উর্দ্ধরেখা ছিল। এই চিহ্ন-সমূহ সৌভাগ্যপ্রদ শুভ চিহ্ন, সাধারণের বিশ্বাস মনুষ্যশরীরে ইহার একটী চিহ্ন থাকিলেও মনুষ্য সৌভাগ্যবান্ হয়; ভবানন্দের শরীর এই সকল শুভ চিহ্নেই সুশোভিত ছিল; সুতরাং ভবানন্দ এই শুভ চিহ্নসমূহের স্বতঃসিদ্ধ গুণ-প্রভাবে এবং দেবানুগ্রহে লোকমণ্ডলে অতুল সম্পদ বৈভব, বিপুল সম্মান প্রতিষ্ঠা-সমন্বিত, রাজত্ব লাভ করেন।

একদিন ভবানন্দ কয়েক জন সহচর সমভিব্যাহারে নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা, প্রকৃতি শান্তি-শীতলা তাহাতে প্রাণের সন্তাপ-হরা শান্তিদায়িনী এবং নব নব শোভাময়ী, নব নব গন্ধামোদিনী,—তাহাতে ভুবন-মনোহরাই বটে; উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে শীতল বায়ু বহিতেছে, নদীতরঙ্গ সেই উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাস মিশাইয়া দীর্ঘোচ্ছ্বাস ফেলিয়া ফেলিয়া চলিতেছে; এমন সময়ে একখানি বৃহৎ জলযান সেই নদীতীরে উপনীত, নদীসৈকতে সংলগ্নীকৃত হইল। সেই জলযানে বহুল ফৌজসহ ফৌজদার অবস্থিত ছিলেন। ভবানন্দের সহচরগণ ফৌজসহ ফৌজদারের অপূর্ব্ব জলযান এবং তাহার বাহ্য সম্পদ্ঘটা,—সমুন্নত শ্বেত-ধ্বজদণ্ড,—দণ্ড সুবৃহৎ লোহিতধ্বজ, ধ্বজের অঙ্গ-বৈচিত্র্য উড্ডীন-বৈচিত্র্যদর্শন,—সঙ্গে সঙ্গে সুগভীর ডঙ্কাধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবারই শঙ্কায় চারিদিকে পলায়ন করিলেন, কিন্তু ভবানন্দ অকুতোভয়ে নদীতীরে দণ্ডায়মানরহিয়া জলযানের নির্ম্মাণ-সুষমা, শিল্প-নিপুণতার মনোহারিত্ব দর্শন, এবং তাহার সহিত নানারূপ অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব চিন্তাও করিতে লাগিলেন; নিনাদ শ্রবণ করিতেও অভিলাষী হইলেন। ফৌজদার যানমধ্যে অবস্থিত ছিলেন, সন্ধ্যাদর্শনে বাহিরে আসিলেন, নদীতীরে এক ভবানন্দকেই দর্শন করিলেন। অমনি ভবানন্দ সসম্মানে "সেলাম" করিয়া ত্বরিতপদ-সঞ্চালে যানসন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। ফৌজদার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি জাতি?" "আমি ব্রাহ্মণ" হুগ্‌লির পথ চিন? "হাঁ আমি হুগ্‌লির পথ চিনি।" "আমরা হুগ্‌লি যাইব।" "আসুন আমার সঙ্গে আসুন, আমি পথ চিনাইয়া দিব।"

ফৌজদার মহাশয়ের সঙ্গে ভবানন্দের এইরূপ আরও কত কথোপকথন হইল। কথোপকথনে ফৌজদার ভবানন্দকে বিশেষ প্রতিভাশালী সাহসী উদ্যমকুশল, উৎসাহী অথচ বিলক্ষণ শান্ত শিষ্টাচারী মধুরভাষী বিনয়ী অতিসংযমী জানিতে পারিয়া, ভবানন্দের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

ফৌজদার স্বভাবতঃ মহানুভব সহৃদয় গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। তিনি ভবানন্দকে বলিলেন,—"আমি তোমাকে খুব ভাল ছেলে বলিয়া জানিলাম, তুমি আমার সঙ্গে গেলে আমি তোমাকে লেখা পড়া শিখাইব, তুমি কালে "মানুষ" হইতে পারিবে।" ভবানন্দ স্বীকৃত হইলেন।

কর্ম্মীর "অদৃষ্ট" অনুযায়ী বুদ্ধি ও প্রকৃতি বুদ্ধি ও প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম,—কর্ম্ম অনুযায়ী সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য, কর্ম্মফল লাভ হয়;—যেরূপ মতি সেইরূপই গতি হইয়া থাকে, তাই কর্ম্মী, কেহ নন্দনবাসী হয়, ক্রমবর্দ্ধন লাভ করে; কেহ শ্মশানাভিমুখে চলিয়া যায়, ক্রমলয় পাইয়া থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে বুদ্ধিও প্রকৃতির এইরূপ লীলাখেলাই চলিয়াছে। ভবানন্দের ভবদুর্ল্লভ সুখ-সৌভাগ্যদায়িনী, জীবন-শর্ব্বরীর, এই শুভ সন্ধ্যা! সন্ধ্যায়ই, লক্ষ্মীর বাহন পেচক, লক্ষ্মীকে বহন করিয়া কোটর হইতে সংসারে বহির্গত হয়; এবং যামিনীর যামে যামে বলিতে থাকে,—"কে জাগ", যে জাগিয়া থাকে, অবশ্য সেও বলিতে থাকে "আমি জাগি"—তখন পেচক, তাহারই গৃহোপরি উঠিয়া বসে,—সন্নিকটবর্ত্তীও হয়,—লক্ষ্মীদানও করে। এই যামিনীমুখ সন্ধ্যা জাগ্রতের পক্ষে সুশোভাময়ী, সুগন্ধময়ী না হইবে কেন? শুভ সন্ধ্যার সুস্নিগ্ধ মুক্ত-বায়ু-সেবিত, নদীতীর,—নদী সৈকতই, বিলাসবতী, নিত্যনবানন্দময়ী প্রকৃতি সুন্দরীর,—প্রকৃতিসঙ্গিনী লক্ষ্মীরও আনন্দ-বিলাস-প্রফুল্ল, প্রসাদন-সাধন-মন্দির, নিরন্তরই সুশোভা সুগন্ধের উপাদানে,—নব নব উৎসাহ স্ফূর্ত্তির উপকরণে ভরপূর;—সন্ধ্যা সুশোভাময়ী, সুগন্ধময়ী; এই গন্ধামোদে, নবনব আশাদায়িনী—আশা পূরণে নব নব শক্তিদায়িনীই বা না হইবে কেন? বস্তুতঃ সন্ধ্যার জলবায়ুর সংঘর্ষণে,—স্বতঃসিদ্ধ লীলা খেলায় অবশ্য প্রকৃতির সায়ন্তন লক্ষ্মীর নিত্য নিয়মে একপ্রকার জলীয় বাষ্প উত্থিত হয়; তাহা অতি স্বাস্থ্যকর এবং তাহা হইতে একটু আধ আধ উচ্ছ্বাসপ্রদ, গন্ধও আসিয়া থাকে, সেই গন্ধও শক্তিপ্রদ। ভবানন্দের জীবন শর্ব্বরীর এই শুভ সন্ধ্যা। সৌভাগ্যরূপিণী, রাজশ্রীদায়িনী,—লক্ষ্মীর বাহন পেচক। পেচক নিরন্তরই অন্ধকারপ্রিয়, শর্ব্বরীচর, শর্ব্বরীর ঘোর অন্ধকারেই চরিয়া বেড়ায়; সুতরাং লক্ষ্মীও এই পেচকবাহনে আরোহণ করিয়া মহাশর্ব্বরীর,—জীবন-শর্ব্বরীর জ্যোৎস্নায় বড় নহেন,—অতি কম,—ঘোর অন্ধকারেই যাতায়াত করেন। ভবানন্দের শুভাদৃষ্টের মণিমন্দিরেও, মাতা, এইরূপে আসিয়াছিলেন।

ফৌজদার, ভবানন্দের পিতার অনুমতি লইয়া, ভবানন্দকে সপ্তগ্রামে লইয়া আসিলেন; এবং অতি যত্ন করিয়া রাজভাষা, উর্দ্দূ পারশী আরবী বিদ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে, রাজনীতি, রাজকার্য্যও শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

প্রখর স্মরণ-শক্তি, সূক্ষ্মদর্শিনী প্রতিভা, স্থিরমতিত্ব, অবিচলিত অধ্যবসায় অটল সহিষ্ণুতা, কর্ত্তব্য সাধিনী দুর্জ্জয় সাহসিকতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি, গুণগ্রাম-প্রভাবে, ভবানন্দ অল্পকাল মধ্যেই, বিশিষ্টরূপে লেখা পড়া এবং রাজনীতি, রাজকার্য্য শিক্ষা করিয়া,—বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। তখন ফৌজদারের অনুগ্রহে, বাঙ্গালার নবাব সরকারে "কাননগোই" পদ,—ক্রমে বাদসাহের নিকট হইতে "মজুমদার" উপাধিও লাভ করিলেন; সুতরাং সেই হইতেই, ভবানন্দ,—ভবানন্দ মজুমদার, এবং দেশ ভরিয়া মান্যগণ্যও হইলেন।

সেই সময়ে ভারতে বাদসাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্ব। মহাপুরুষ আকবরের পুত্র, মহানুভব জাহাঙ্গীর, ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাট ছিলেন। তখন বঙ্গে যশোহর অধিপতি, প্রবলপ্রতাপ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ, ছড়াইয়া পড়িতেছিল এবং সেই প্রতাপে,বঙ্গের চারিদিকে হিন্দুপ্রতাপও প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীর, সেই হিন্দুপ্রতাপ হরণ করিবার জন্য প্রবল প্রতাপ হিন্দু সেনাপতি মানসিংহকে অসংখ্য সেনাসহ, বঙ্গরাজ্যে প্রেরণ করেন,—যেন শিক্ষিত শিকারী বাজপক্ষী,কপোতপক্ষী শিকারে প্রধাবিত হইল।

যে দিন এই মোগল অভিযান, বঙ্গদেশে উপস্থিত হইল, সেইদিন হইতে প্রবল ঝড় বৃষ্টি,—ঘোরতর বন্যা হইতে লাগিল,—বন্যা, ক্রমাগত দিনমান-রাত্রিমান ভরিয়া, সপ্তদিবস, বর্ত্তমান রহিল; মানসিংহ, সসৈন্যে যারপর নাই কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন,—প্রত্যেকেরই জীবনসংশয় উপস্থিত হইল। তখন কাননগোই ভবানন্দ মজুমদার,—দৈবানুগ্রহে,—মহাদেবী অন্নপূর্ণার প্রসন্নতায়, সেই মোগল অভিযানের সহস্র সহস্র লস্কর লোককে সুন্দর সুন্দর সুপ্রশস্ত বাসস্থান, উত্তম শয্যা ও উত্তম উত্তম প্রচুর আহার্য্যাদি দান করিয়া তাহাদের জীবনরক্ষা, করিলেন। দেবভক্ত, রাজপুত বীর মানসিংহ, ভবানন্দের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দর্শন করিয়া, ভবানন্দকে দৈবানুগৃহীত, মহাপুরুষই জ্ঞান করিতে লাগিলেন; সুতরাং উপস্থিত যুদ্ধবিজয়েরও, প্রধান অবলম্বন জানে,—"নচ দৈবাৎ পরং বলম্" চিন্তা করিয়া অতি সম্মান-সহকারে, ভবানন্দকে সঙ্গে লইলেন।

প্রতাপের সহিত মানসিংহের ভীষণ যুদ্ধ হইল; যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত, মানসিংহ বিজয়ী হইলেন। মানসিংহ, বিজয় লাভ করিয়া, প্রসন্নচিত্তে কৃতজ্ঞপ্রাণে, পরম উপকারী, ভবানন্দের প্রত্যুপকার করিবার জন্য,—ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া, সম্রাট সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন; এবং ভবানন্দের অপূর্ব্ব আতিথেয়তার দিব্য কাহিনী,—সহস্র সহস্র জনকে, দিব্য আশ্রম, শয্যা ও দিব্য আহারদানের কথা বলিয়া রাজভক্ত কর্ম্মবীরের, সৎকর্ম্মের পুরস্কার দানে, অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ, সসম্মানে রক্ষিত হইল;—উদারচিত্ত, মহানুভব সম্রাট, বীরবর সহৃদয় মানসিংহের অনুরোধ রক্ষা করিলেন;—ভবানন্দ, বঙ্গদেশে চতুর্দ্দশ পরগণার "ফরমাণ"—জমিদারির সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।—রাজত্ব লাভ করিলেন!—"রাজা" উপাধিও পাইলেন!

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে, এই ঘটনা সংঘটিত হয়,—সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষে, ভবানন্দের রাজলক্ষ্মী লাভ হয়,—"আঙ্গুল ফুঁড়িয়া শালগাছ বাহির হয়,—ভবানন্দ শ্রীমন্ত হন;—সাধারণ কাননগোই, অদৃষ্টদেবতার প্রসন্নতায় অসাধারণ রাজপদ লাভ করেন; এবং বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ, নদীয়া কৃষ্ণনগরের পত্তন,—তাহাতে, রাজধানী, রাজপাটও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভবানন্দ আনন্দধাম কাশীপুর অধীশ্বরী,—বিশ্বপালিনী, অন্নপূর্ণা অন্নদার—বিশ্বপুরুষ, বিশ্বেশ্বরের অনন্ত প্রকৃতির এক প্রকৃতি,—সর্ব্বভূতের অন্নদাত্রী শক্তি, প্রাণদামূর্ত্তির পরমভক্ত, শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। পুণ্যময়, অশোকাষ্টমী দিনে,—বসন্তে, বসন্তসুন্দরী, বাসন্তীপূজার মহাঅষ্টমীতে, ভবানন্দ, অন্নদেবতা অন্নপূর্ণার পূজা করিতেন; পূজায় মহাসমারোহ হইত,—দান, ভোজনক্রিয়াও পরিপূর্ণ রূপে চলিত। পূজামন্দিরের, সুবিশাল প্রাঙ্গণের,—কোথাও অন্নমেরু, কোথাও সূপসমুদ্র, কোথাও ঘৃতকুল্যা, কোথাও পায়স-সরোবর, কোথাও দধিসাগর, কোথাও মধুহ্রদ, কোথাও শর্করা পাহাড় প্রতিষ্ঠিত হইত; অহোরাত্র সহস্র সহস্র জন আহুত অনাহুত সান্ন নিরন্ন, সমান আদর আপ্যায়নে সম পরিমাণ পান ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিত। অন্নপূর্ণার বরপ্রভাবে, ভবানন্দের রাজ্যে, অজন্মা অন্নাভাব ছিল না; প্রতি গৃহস্থ, সপরিবারে সবান্ধবে সুখস্বচ্ছন্দতায়, অবস্থান করিত। পশু পক্ষী পর্য্যন্ত অন্ন লাভ করিয়া তৃপ্ত হইত। ভবানন্দের আদেশে,—অট্টালিকা হইতে কুটীর, কোন গৃহ হইতেই অতিথি বিমুখ হইত না;—ভবানন্দের রাজ্যে

স্থানে স্থানে, অন্নপূর্ণা-ভাণ্ডার, রাজসরকারের কর্তৃত্বে, প্রতি পঞ্চগ্রাম মধ্যে একটী একটী সঞ্চিত শস্যমঞ্চ, প্রতিষ্ঠিত ছিল। অসময়ে কাহারও অন্নাভাব উপস্থিত হইলে সেই "ভাণ্ডার" শস্যমঞ্চ" হইতে, শস্য গ্রহণ করিত, এবং সময়ে সেই শস্য প্রত্যর্পণ করিত;—মঞ্চ কোন দিনও শস্যশূন্য হইত না; সুতরাং অনাহার অল্পাহার-জনিত দুর্ব্বলতা, কর্ম্মহীনতা, অকালব্যাধি, মহামারী, অকালমরণ, ভবানন্দের রাজ্যের সীমাও স্পর্শ করিতে সমর্থ হইত না; রাজ্যবাসী প্রতি নর নারী, পূর্ণ আহারই করিত;—নিরন্তর "দুধে ভাতেই" খাইত; তাই আরোগ্যপ্রসন্ন, বলীয়ান, শ্রীময়, কর্ম্মবীরও ছিল;—প্রতি গৃহেই সংযম সদাচার পূর্ণ বিরাজ করিত। তাই তখন বঙ্গদেশমধ্যে ভবানন্দের রাজ্যই, নিত্য আনন্দ বাজার নিত্য উৎসব-প্রফুল্লও হইয়া উঠিয়াছিল।—ভবানন্দ, প্রতিপ্রাণেই, আনন্দ দান করিয়া নামের সার্থকতা সাধন করিয়াছিলেন। বঙ্গের বর্ত্তমান "ভবানন্দ"" জমিদার প্রমুখও,—যাঁহার যেমন সাধ্য, সেই পরিমাণ,—ইচ্ছা করিলেই (ইচ্ছা সুপথে পরিচালিত হইলেই),—বঙ্গেও "অন্নপূর্ণাভাণ্ডার" সঞ্চিত-শস্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তবে হয় না কেন? মন্ত্রী বলিলেন "মহারাজ! ঐটী-ইত রোগ!"—হাহা মন্ত্রিন্! যেন ঘোড়ার "শৃঙ্গ উঠা"—রোগই বটে; কিন্তু ঘোড়ার "শৃঙ্গউঠাত" অস্বাভাবিক,—পরস্বাক্রান্ত হইয়া, পরস্ব গ্রহণ!"—হাহা মহারাজ! পরপ্রভাবাচ্ছন্নতা, তাহাতে পরস্ব গ্রহণই বটে! মনে রাখিবেন, এই গ্রহণই "রোগ"—"রোগই"—অস্বাভাবিক!—স্বাভাবিক রোগ আশু আরোগ্য হয়; কিন্তু সেই রোগ, বিকার পাইলেই—অস্বাভাবিক হইলেই, দুরারোগ্য, অনারোগ্য, শেষে মৃত্যুকেই আহ্বান করে। মহারাজ! এও সেই রোগ!

মোগল অধিকারে, বঙ্গের মুক্ত শক্তিশালী কর্ম্মবীর রাজভক্ত প্রজা, সৎকর্ম্মের পুরস্কার "জায়গীর" নিষ্কর ভূমিখণ্ড, অথবা নামমাত্র রাজকর দিয়া জমিদারী লাভ করিতেন; সুতরাং তাঁহারা, কি তাহাদের বংশধর প্রমুখ, সাম্ন অবস্থাপন্ন,—তাহাতে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রহিয়াই দেশহিতকর নানাকার্য্য, সুভাবে প্রজাপালন, জ্ঞাতিবান্ধব স্বজাতি পোষণ. দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবেন; প্রসন্নপ্রাণে রাজ্যের মঙ্গলে, রাজার মঙ্গলে সর্ব্বস্ব অর্পণ, অথবা আত্মত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তখন বঙ্গের জমিদারবর্গ, রাজ্যের ভার-সহিষ্ণু, স্তম্ভ স্বরূপই বিরাজ করিতেন; নিরন্তরই, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষক রহিয়া, রাজমুকুট, রাজছত্র, রাজসিংহাসন,—রাজলক্ষ্মীর স্থিরত্বের

রক্ষাকারী রূপেই, দণ্ডায়মান থাকিতেন; রাজ্যের প্রকৃত স্বাস্থ্য শক্তিই রক্ষা করিতেন। বস্তুতঃ তখন বঙ্গের জমিদারবর্গ ই দেশের স্বাস্থ্যরক্ষক শান্তিরক্ষক,—যথার্থ শান্তিপুরুষ ছিলেন।

জমিদার প্রমুখ এই শান্তিপুরুষগণ যে যে পল্লীতে অবস্থান করিতেন, সেই সেই পল্লী কি তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহও দস্যুতা, চৌর্য্য, প্রবলের অত্যাচার, দুর্ব্বলের অন্তরবিক্ষোভ,—সর্ব্ববিধ বিপ্লবশূন্য, শান্তিময়, ধনধান্যে পরিপূর্ণ, তাহাতে স্বভাবসৌন্দর্য্যপ্রভাবে সমৃদ্ধি সম্পদে বড় বড় ক্রিয়া কার্য্যে, উৎসব-স্বচ্ছন্দতায়, শিক্ষাদীক্ষায়, সভ্যতা-ভব্যতায়, সদাচারে, দান ধ্যানে, অশন-বসনে বিলাস-বিহারে ও উচ্চ সামাজিকতায় রাজ্যের আদর্শরূপে গণ্যমান্য হইত;—পল্লীবাসী জানপদবর্গ, নিয়ত সান্ন-অবস্থাপন্ন সন্তুষ্টচিত্ত, ক্রিয়াকার্য্যে মুক্তপ্রাণ, দানধ্যান-প্রফুল্ল, নিত্যকর্ম্মে স্ফূর্ত্তিময়, আনন্দ সম্পন্নই রহিত; তাই অহোরাত্র, প্রতিগ্রাম, প্রতিপাড়া, কর্ম্মধ্বনিতে উল্লাসফুল্ল,—কোলাহলময়ই থাকিত; কিন্তু ইংরাজ অধিকার হইতে, সেই বঙ্গের পল্লীগুলির অবস্থান্তর আরম্ভ হয়; পল্লীবাসী শিক্ষিতগণ, নগরবাসী হইতে থাকেন,—প্রবাসী একেবারে বাসীই হইল,—বর্ত্তমানেত গ্রামের পর গ্রাম, প্রায় জনশূন্য;—শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সান্ন-অবস্থাপন্নগণ প্রায়ই নগরবাসী,—নাগর হইয়া নগর বিহারেই, আত্মপাত করিতেছেন।—পল্লীগ্রাম, পৈতৃকস্থান জন্মভূমি একেবারে বিস্মৃত হইয়াই পড়িয়াছেন; সুতরাং অবশিষ্ট নিঃস্ব গ্রামবাসিগণ, পৈতৃকস্থানসর্ব্বস্ব—জন্মভূমিপ্রিয়,—অবশ্য কাপুরুষগণ অর্থাভাবে, অন্নকষ্টে, রোগে-শোকে, অকালে পঞ্চভূতে মিলিত,—ভূতরূপে অবস্থিত হইতেছে এবং ইহার সহিত প্রায় বর্ষ ভরিয়া মহামারীর ভৌতিক লীলাও চলিয়াছে; সুতরাং অধিকাংশ পল্লী, প্রায় জনশূন্য, জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং হিংস্র জন্তুর সহিত, নিত্য রোগ-শোকেরও আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে। পল্লীবাসী ধনহীন জনহীন,—একটী গৃহস্থেরও বল নাই, উৎসাহ নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, আনন্দ নাই, ক্রিয়া নাই, কর্ম্ম নাই, আশাও নাই;—প্রায় পল্লীগুলি শূন্যময়,—নীরব! ম্রিয়মানতায় সমাচ্ছন্ন! উদাসতায় পরিপূর্ণ। দেবালয়ের সান্ধ্য আরাত্রিক ক্রিয়া,—সাধারণ "নারায়ণ-সেবা" পর্য্যন্ত সংবদ্ধ হইয়া-গিয়াছে;—আর ঘণ্টা কাঁসর করতাল মৃদঙ্গ বাজে না,—মধুর আরতি-সঙ্গীত, আর গীত হয় না, হুলুধ্বনিটীও উঠে না,—নীরব! বাঙ্গালীর শিক্ষোন্নতি পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, চিরন্তন কুলধর্ম্মকর্ম্ম,—পূজা পার্ব্বণ, সমাজ নিমন্ত্রণ,

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বার্ষিক বৃত্তিদান, অতিথিকে অন্নজল দান, ভিখারীকে ভিক্ষা-দান, অনেক সমাজে রহিত হইয়া পড়িয়াছে। দারুণ দুঃখের বিষয়ই বটে।

সেই কালের, সেই সেই পল্লীবাসীর সেই সেই সুপ্রসিদ্ধ,—বিশিষ্ট চরিত্র-বান্ সুষ্ঠুক্রিয়ান্বিত, সদাচারী, সহৃদয়, ভৌমিকসম্প্রদায়ের বংশধরগণ,—পল্লীর সর্ব্বরঞ্জনকর্ত্তা রাজা,—সুখ-সৌভাগ্য-বিধাতা,—অবশ্য আত্মবোধ-হীনতায়, অপরিণামদর্শিতায় ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকায়, আত্মবিস্মৃত হইয়া বিদেশী নব নব বিলাস-ব্যসনের মোহন বাসন্ত-তরঙ্গরঙ্গে, ভাসিতে ভাসিতে,—কালমাহাত্ম্যে সর্ব্বস্বান্ত,—অপরিশোধ্য ঋণদায়গ্রস্ত—সুতরাং ভূসম্পত্তি শূন্য,—সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রভ্রষ্ট হইয়া, হাহাকার করিতেছেন! কেহ কেহ অন্নাভাবে "ছন্নমতি" হইয়া দুরাকাঙ্ক্ষার ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরিয়া জন্মস্থান,—স্বগ্রাম, পিতৃপিতামহাদির ভদ্রাসন সহ সম্পদ সম্মান-গৌরব সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, কোথাও গিয়া সাধারণের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন,—কেহ কেহ বা "ভবঘুরে" হইয়া, ভূমণ্ডল ঘুরিয়া ঘুরিয়াই বেড়াইতেছেন,—এবং ক্রমশঃ বিবেকশূন্য, চারিত্র্যবলহীন, স্বেচ্ছাচারী,—তাহাতে চিরন্তন কৌলিক পবিত্র খ্যাতি ক্রিয়া, আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, কুবুদ্ধি, কুক্রিয়াসক্ত, কদাচারী, হৃদয়হীন হইয়া নীচাদপি নীচ হইতেও অধমরূপে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং পল্লীগুলিও প্রায় মস্তকবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে গ্রামেও, শ্রীহীনতা,—তাহাতে শিক্ষাহীনতা,—সঙ্গে সঙ্গে, মিথ্যা, কাপট্য, আত্মগ্রাহিতা দলাদলী উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অন্নাভাব, হাহাকার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! দেশ হইতে যেন শান্তি-সন্তোষ, সুখস্বচ্ছন্দতা পলায়ন করিয়াছে!—"সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি, অন্নহীনা, ক্রিয়াহীনা পথের ভিখারিণী!

বঙ্গ-কবিকেশরী, ভারতচন্দ্রের চৌষট্টিকলাপূর্ণ, অপূর্ব্ব পূর্ণচন্দ্র, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র,—ভবানন্দেরই সুপ্রসিদ্ধ বংশধর। বঙ্গ-কবিকেশরীর, অমর কবিত্ব-প্রভাবে, ভবানন্দ অমর! আজও ভব-বঙ্গরঙ্গমঞ্চে, তাঁহার জীবনলীলার মহানাটক অভিনীত,—বাঙ্গালীর রসনায় রসনায়, লীলান্বিত। বিশেষতঃ তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠ, গোষ্ঠীপতি, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ত, নিত্য স্মরণীয়,—তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠার শীতল কিরণ সম্পাতে,—জ্যোৎস্না প্রভায়,—ক্রিয়াকর্ম্মে, দান-ধ্যানে, বাঙ্গালীর প্রাণ মন, অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার সুপ্রফুল্ল রহিয়াছে। ধন্য কবি, ধন্য রাজা,—তখন বাঙ্গালীও ধন্য ছিল।

———

শ্রীজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঠাকুর সদানন্দ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তীর্থযাত্রা।

অনন্তকালস্রোতের মধ্যে অনেক সময় এমন এক একটী তরঙ্গ আসে, যাহার সহিত বিশ্বনাথ মহাকাল সংসারতপ্ত জীবের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য কত অপূর্ব্ব রত্ন তীরে উঠাইয়া দেন, যাঁহার সন্দর্শনে বাস্তবিক তদানীন্তন জীব আবার কিয়দ্দিবসের জন্য সাধু সঙ্গে সৎপথে ভগবচ্চিন্তায় পরিচালিত হয়। আরও বিচিত্র কথা এই যে, সেই রত্নের পুষ্টি, পরিচয় রক্ষা ও সৌন্দর্য্য বিধানের জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বা তাহার পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি অভিজ্ঞ রত্নজীবী বা বহুদর্শী জহুরীর ও আবির্ভাব হইয়া থাকে। বাস্তবিক তাঁহারা না থাকিলে সেই অভিনব রত্নের যথার্থ পরিচয় পাওয়া সকলের পক্ষে অসম্ভব হইত। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি জগতের মহারত্ন স্বরূপ মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনায় তাহা অতি সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সিদ্ধবাবা, ভৈরবী মা প্রভৃতি মহাত্মাগণ বোধ হয় সেই কারণে পূর্ব্বাহ্লেই বরাহনগরে আসিয়া আসন পাতিয়াছিলেন, ক্রমে সাধকরত্ন ঠাকুরদাসের শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনার সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা ও সহায়তা করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহারা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইতেছেন।

বুড়াভট্টাচার্য্য মহাশয় কালের গতিকে সশক্তি অনন্ত ধামে চলিয়া যাইলেন বটে, কিন্তু ভৈরবী মা প্রভৃতি সে পথে না চলিয়া সহসা কি উদ্দেশ্যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইলেন, সিদ্ধবাবাও কোন সময়ে কোথায় চলিয়া যাইবেন কে জানে! এখন ঠাকুরদাসের একমাত্র আশ্রয়স্থল সিদ্ধবাবা, তিনি তাঁহার নিকট হঠযোগের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিদ্ধবাবা হঠযোগসিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি আজ কাল বড় কোথাও যাওয়া আসা করিতেন না, যে স্থলে বসিয়া থাকিতেন সেই স্থলেই আপন ভাবে বিভোর হইয়া সমাধিমগ্ন হইয়া যাইতেন। গ্রামবাসী ভক্তগণ যে যাহা আনিয়া দিত, তাহাই আনন্দ সহকারে তিনি সেবা করিতেন।

সন্ন্যাসীচরণ ঠাকুরদাসের অতি প্রিয় সহচর, সেই কারণ সিদ্ধবাবার নিকট উভয়কেই অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যাইত। কালীচরণ ও চিন্তামণি ঠাকুরদাসের বিশেষ বন্ধু হইলেও তাঁহারা সকল সময় ঠাকুরদাসের সঙ্গে থাকিতেন না। তবে সময় সময় তাঁহারাও সিদ্ধবাবার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ঠাকুরদাসের অসাক্ষাতে সিদ্ধবাবা তাঁহাদের সকলকেই বারবার বলিতেন যে, "ঠাকুরদাস দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ, এমন রত্নকে এখনও কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু ও বেশী দিন আর সংসারে থাকিবে না। ও মনে মনে সংসার ত্যাগের অবসর খুঁজিতেছে। তোমরা তাহাকে সাধ্যমত যত্ন করিও।" অন্য কেহ ঠাকুরদাসকে ঠিক বুঝিতে না পারিলেও সন্ন্যাসীচরণ কিন্তু বেশ বুঝিয়াছিলেন। সেই কারণ তিনি তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিতেন ও সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। ঠাকুরদাস সততই অচঞ্চল ধীর স্থির গম্ভীর; সকলের সঙ্গেই তাঁহার অমায়িক ভাব, কিন্তু কাহারও অসদাচরণ তিনি আদৌ দেখিতে পারিতেন না; এমন কি প্রতিবাসী বৌ ঝি দিগের ও নির্লজ্জ ভাব দেখিলে তিনি যথেষ্ঠ তিরস্কার করিতেন। এ বিষয়ে তিনি পরিচিত বা অপরিচিত কিছুই মানিতেন না। আবশ্যক হইলে তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষদিগকেও সে সম্বন্ধে উপদেশও সাবধান করিয়া দিতে ক্রটী করিতেন না। সেই কারণ গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, সকলেই তাঁহাকে যেমন ভয় তেমনি ভক্তি করিতেন। প্রতিবাসী বৌ ঝিরা সময় সময় রাধা-রাণীর নিকট তাঁহার স্বামীর অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য ও লোকশিক্ষা সম্বন্ধে প্রশংসা করিতেন। বাস্তবিক ঠাকুরদাসের তিরস্কারও এমন মধুর ছিল যে, তাহাতে কেহই অসন্তুষ্ট হইত না। তাঁহাকে দেখিলে সকলেই যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া কিরূপে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবেন, তাহার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। তিনিও সে সময় সকলকে সস্নেহে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। রাধারাণীও তাঁহারই গৃহিণী—তাঁহাকে ভালবাসে না এমন লোক নাই; তাঁহাকে একবার না দেখিয়া, তাঁহার সহিত দুটা কথা না কহিলে কাহারও যেন তৃপ্তি হয় না, দিন কাটে না। তিনি এখন ত আর বালিকাটী নাই, তিনিই এখন বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা দুই জাই ক্রমে ক্রমে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কাজেই সংসারের সমস্তই তাঁহার হাতে। তিনি যাহা না করিবেন তাহা না হইবে। ঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁহার সংসারও এখন বড় হইয়াছে। এখন তিনি তিনটী কন্যার জননী।

বড়টীর বয়স প্রায় সাত আট বৎসর, মেজটী পাঁচ বৎসরের এবং ছোটটী সবে মাত্র ভূমিষ্ঠা হইয়াছে। তিনটীই পরমা সুন্দরী লক্ষ্মীসদৃশী। ইহা ব্যতীত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের আর একটী কন্যা আছে, এসকলগুলিই রাধারাণীর যত্নে ক্রমে বড় হইতেছে।

ঠাকুরদাস কোন দিনই সংসারের প্রতি সেরূপ আসক্ত নহেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠদ্বয় সংসারে যাহা করিতেন তাহাই হইত। তিনি দিবসে সিদ্ধবাবার নিকট এবং নিশীথে বিল্বমূলে সেই বৃদ্ধ মহাপুরুষের নিকটেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু আজ তিন দিবস হইল সিদ্ধবাবা পঞ্চবটীমূল হইতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। গ্রামবাসী ভক্তগণ চারিদিকে তাঁহার কতই অনুসন্ধান করিতেছেন। কোথাও বাবার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ঠাকুরদাসও তাঁহার অভাবে একয় দিন দিবসে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়া আছেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধব সন্ন্যাসীচরণ প্রভৃতি সকলেই সেই স্থানে বসিয়া সিদ্ধবাবার সম্বন্ধে কত কথাই আলোচনা করিতেছেন, সকলেরই যেন বিমর্ষ ভাব। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ভৈরবী মা, শেষ সিদ্ধবাবার এরূপ অদর্শনে তাঁহাদের চিত্ত বিচলিত হইল। বিশেষ ঠাকুরদাস যেন নিতান্তই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। এতদিন সংসারের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রাখিয়াও তাঁহাদের সহবাসে তিনি যে আনন্দ্য যে সাচ্ছন্দ উপভোগ করিতেন, এখন অকস্মাৎ তাঁহার যেন সে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি গভীর নিদ্রার পর যেন সহসা জাগিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসীচরণকে গোপনে বলিলেন—"আমি কিছু দিনের জন্য তীর্থ যাত্রা করিব মনে করিতেছি, কি বল?" সন্ন্যাসীচরণ সে কথা শুনিয়া আনন্দে একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। যে কথা সেই কাজ, তখনই দিনস্থির হইয়া গেল, কালই প্রত্যুষে বাহির হওয়া যাইবে। ক্রমে কালীচরণ, চিন্তামণিও একথা জানিতে পারিলেন। তাঁহারাও সহযাত্রী হইতে চাহিলেন। তাঁহাদের এ পরামর্শ অবশ্য গোপনেই হইয়াছিল, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ তাহা জানিতে পারেন নাই। সন্ধ্যার পর ঠাকুরদাস বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, সমস্ত রাত্রিই তিনি বিল্বমূলে সেই মহাপুরুষের নিকট কাটাইয়াছিলেন। তীর্থ-যাত্রা সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ গ্রহণকরাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শেষ রাত্রিতে যখন বাটীতে ফিরিলেন তখন একবার মনে করিলেন, রাধারাণীকে যাইবার কথা বলিয়া যাইবেন। কিন্তু রাধারাণী সে সময় বরাহনগরের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না।

প্রায় তিন মাস হইল তিনি তাহার মাতুলালয়ে প্রসব হইতে গিয়াছেন। বেদান্তবাগীশ ও চূড়ামণিমহাশয়ের একান্ত অনুরোধে ঠাকুরদাস শীঘ্রই একবার নবপ্রসূতা কন্যাকে দেখিতে যাইবেন বলিয়াছিলেন। আজ সেই কথা বলিয়াই তিনি জ্যেষ্ঠদ্বয়ের চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং পূর্ব্ব পরামর্শ মত প্রত্যুষে চারিজনে ঘাটে আসিয়া নৌকারোহণ করিলেন ও দুর্গা দুর্গা বলিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সকলে মনে করিলেন, সন্ন্যাসীচরণ প্রভৃতি ঠাকুরদাসের পরম বন্ধু, সেই কারণ সকলে একত্রই বেড়াইতে গিয়াছেন। কিন্তু সত্য কখনই ত গোপন থাকে না! ক্রমে সংবাদ চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল, ঠাকুরদাস বন্ধুবান্ধব সহ কন্যা দর্শনে যান নাই, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাদের এরূপ আচরণে একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। কারণ একথা ঘুণাক্ষরেও কেহ ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই।

যথাসময়ে শ্রীমতী রাধারাণীর নিকটও এ সংবাদ পৌঁছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে বিস্মিত হইলেন না, তবে একটু দুঃখিত হইলেন—যাইবার পূর্ব্বে তিনি কোন সংবাদ দিয়া যাইলেন না। তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পাইলেন না। রাধারাণী বিলক্ষণরূপেই জানিতেন যে, তাঁহার স্বামী এ মায়ার শিকলে চিরদিন আবদ্ধ থাকিবার পাত্র নহেন। পাখী এবার অবসর বুঝিয়া শিকলী কাটিয়া পলাইয়াছে। আবার কতদিন পরে দেখা হইবে, কবে তিনি ফিরিয়া আসিবেন, এই সব কথাই তিনি আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন। কখন কখন তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষে এ সম্বন্ধে যে কোন কথা হইত না তাহা নহে। ঠাকুরদাস তাঁহার স্ত্রীকে প্রায় বলিতেন—"তোমার আর বৃথা চিন্তা করা উচিত নহে, তোমার খেলার ঘর কন্নাত পাতিয়া দিয়াছি, তুমি এদের লইয়া আনন্দে থাক, আর ঠাকুরের অর্চ্চনা কর, ঠাকুর তোমার সকল আশা পূর্ণ করিবেন।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া রাধারাণী তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন, কিন্তু তাঁহার মনে মনে কি হইত তা ঠাকুরই জানেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

নিরুদ্দেশ।

ঠাকুরদাস প্রভৃতি তীর্থদর্শনে বহির্গত হইয়া প্রথমেই কালীঘাটে আসিয়া আদিগঙ্গায় স্নান ও শ্রীশ্রীকালীমাতার দর্শন করিলেন। তথায় ভট্টপল্লীনিবাসী একটী ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়, তিনিও তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইলেন। পাঁচজনের পাঁচটী প্রাণ যেন এক করিয়া তাঁহারা এখন বেশপরিবর্ত্তন করিতে বসিলেন। তাঁহাদের বস্ত্র ও উত্তরীয়াদি গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লইলেন, কপাল বিভূতি চর্চ্চিত করিয়া তাহার মধ্যে সিন্দূরের তিলক দিলেন, স্কন্ধে এক একটী গৈরিক ঝুলি, তাহাতে স্ব স্ব পাঠ্য পুথী ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি রাখিলেন, হস্তে যষ্টি ও কমণ্ডলু ধারণ করিলেন। সকলেই নবীন সন্ন্যাসী, সে এক অপূর্ব্ব রূপ! পথের লোক তাঁহাদের দেখিয়া কেহই সহজে নয়ন ফিরাইতে পারেন না, সকলেই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল।

তাঁহারা কলিকাতার পারঘাটায় গঙ্গা পার হইয়া বারাণসীর পথে পশ্চিমাভিমুখে পদব্রজে রওনা হইলেন। ক্রমে নানা তীর্থ দেবালয় ও সাধু-মুনির আশ্রম প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে করিতে প্রায় আটমাস পরে চৈত্রমাসে তাঁহারা হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ স্থানের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া তাঁহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইলেন; পাঁচজনেই একমত হইয়া স্থির করিলেন, এখানে কিছুদিন অবস্থান করিতে হইবে। তাঁহারা গঙ্গার ধারে একটী মন্দিরের পার্শ্বে কুটীর বাঁধিয়া তথায় ধুনি জ্বালাইয়া বসিলেন। এখন হরিদ্বার যেরূপ সহরের মত হইয়াছে তখন ঠিক এরূপ ছিল না, অধিকাংশ স্থলেই পার্ব্বত্যতরুলতায় বনাকীর্ণ ছিল, মধ্যে মধ্যে সাধুসজ্জনের আশ্রম ও দুই একটী প্রাচীন মঠ এবং মন্দির হরিদ্বারের সেই নির্জ্জন তপোবন-শোভা রক্ষা করিত। সাধুসন্ন্যাসীরা চারিদিক হইতে অরণ্যের শুষ্ক কাঠ কুটা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ধুনি জ্বালিয়া বসিতেন, তাহাতে তাঁহাদের অনেক সুবিধা ছিল,—পাককার্য্য, ধূমপান, শীতে অগ্নি সেবা এবং নিশায় হিংস্রজন্তুদিগের উপদ্রব হইতে নির্ব্বিঘ্নে সাধন, ভজন, বিশ্রাম ও নিদ্রা যাইতে পাইতেন। ঠাকুরদাস প্রভৃতিও সেইরূপ ধুনির পার্শ্বে বসিয়া পরস্পর

শাস্ত্রালোচনা করিতেন, কখন ভজন-সংগীত গাহিতেন, কখন বা কাষ্ঠাহরণে বনের মধ্যে বিচরণ করিতেন, আর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন।

গঙ্গার উভয় পারেই অত্যুচ্চ হরিদ্বর্ণ তরুলতাসমাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার মধ্যে মধ্যে সূর্য্য, শিব, কালী চণ্ডী ও অঞ্জনাদি নানা দেবদেবীর পবিত্র প্রাচীন মন্দির, পর্ব্বতগাত্রে যাতায়াতের আঁকা বাঁকা বিচিত্র পথ, যথার্থই নয়ন-মন-তৃপ্তিকর। পূতপ্রবাহিনী গঙ্গা যেন শঙ্কর জটাজূট ভেদ করিয়া সপ্ত ধারায় সপ্তমুখী হইয়া কল্ কল্ রবে ভূতলে অবতরণ করিতেছেন। আহা, সে কি অপূর্ব্ব শোভা! নির্ম্মল-সলিলা পতিত-পাবনী মা আমার পাপতাপক্লিষ্ট মানবের সকল পাপ-কালিমা ধৌত করিয়া অমল শান্তি প্রদানের জন্যই বুঝি কত বাধা কত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই ধরাধামে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই কোমল পাদস্পর্শে বসুমতী চিরতরে ধন্যা হইয়াছেন। সেই কোন্ অতীত যুগে মা তাঁর পিতৃরাজ্যের এই দ্বার দিয়াই ধরায় প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তের চিরবরেণ্য ঋষিমুনিগণ তাঁহার স্মৃতি-গৌরব রক্ষার মানসে সেই প্রাচীন কাল হইতেই এই পবিত্রভূমিকে "গঙ্গাদ্বার" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পুরাণাদির মধ্যে গঙ্গাদ্বার শব্দই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হরদ্বার বা হরিদ্বার শব্দ পরবর্ত্তী সময়ে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শুনা যায় মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দ্বারা "মায়াপুর" নাম, প্রদত্ত হইয়াছিল, মুসলমান আধিপত্য সময়েও নাম পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তীর্থ পুরোহিত পাণ্ডাগণের কৃপায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। নিতান্ত লোভী, নিরক্ষর ও পতিত হইলেও তাঁহাদের গোত্র প্রবর-কর্ত্তা ঋষিমুনি-প্রদত্ত গঙ্গাদ্বার নাম এখনও তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, এখনও তাঁহারা তীর্থযাত্রীদিগের স্নানাদি সঙ্কল্প মন্ত্রে সেই প্রাচীন নামই উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক ঠাকুরদাস প্রভৃতি এখানে নিত্য গঙ্গাস্নান ও সাধন ভজনে বেশ আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এখানে থাকিবার সময় তাঁহারা নিকটবর্ত্তী বহুতীর্থ ও দেবালয় সমুদায় দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রসিদ্ধ কন্‌খল তীর্থ সেই প্রাচীন দক্ষযজ্ঞ-ক্ষেত্র দর্শন করিলেন, তথা হইতে গঙ্গার পর পারে গভীর অরণ্য মধ্যে একটী গুপ্ত তপোবনের সন্ধান পাইয়া তথায় গমন করিলেন। সাধারণ যাত্রীগণ সেস্থলে কিছুতেই যাইতে সাহস করেন না। তাঁহারা সেই তপোবনের

অপূর্ব্ব শান্তি ও পবিত্রতা দর্শনে এতই বিমোহিত হইলেন যে, সেস্থানে কিয়দ্দিবস বাস না করিয়া তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না। আরও আনন্দের কথা, সে সময় সেই পূত তপোবনে কতিপয় সিদ্ধসাধক তাঁহাদের শিষ্যবর্গকে রীতিমত শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করিতেন। ঠাকুরদাস প্রভৃতি তাঁহাদের দেবোপম আচরণ ও নির্জ্জন তপোবন-বাস দেখিয়া ক্রমেই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। বাস্তবিক সে অনুপম পবিত্রতা একালে কদাচ পরিলক্ষিত হয়। এখানে বন্য পশু পক্ষী সতত নির্ভয়ে বিচরণ করে, হিংসা, দ্বেষ বা শঙ্কা তাহাদের যেন কিছুই নাই! বনচারী মৃগকুল যখন তখন অসঙ্কোচে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তাঁহারা আদর যত্ন করিলে কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া আবার আপন মনে অন্যত্র চলিয়া যায়। কতশত বিচিত্র বিহঙ্গম চারিদিকে আপন মনে গান করে, পার্শ্বে পার্শ্বে নির্ভয়ে বিচরণ করে, খাবার দিলে হস্ত হইতেই খাইয়া যায়, যেন সব তাঁহাদেরই যত্নে লালিত পালিত, তাঁহাদের নিতান্ত পরিচিত। তাঁহারা এই কয়মাস অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এমনটী কোথাও দেখেন নাই, কাজেই এমন পবিত্রভূমি তাঁহারা কি সহসা পরিত্যাগ করিতে পারেন? সেই তপোবনের সাধুদিগের সহিত তাঁহারা বেশ মিলিয়া যাইলেন, তাঁহাদের যত্নে ও উপদেশে বেশ আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বৈশাখ মাস যায় যায়, এখন উত্তরাখণ্ডে পরিভ্রমণের উপযুক্ত সময়, তপোবনের কয়েকটী সন্ন্যাসী সেই উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। ঠাকুরদাস প্রভৃতিও তাঁহাদের সহযাত্রী হইলেন। পথে আরও অনেক যাত্রী যুটিয়া গেল, বেশ আনন্দে হিমালয়ের নিত্য নব নব শোভা দেখিতে দেখিতে কত উচ্চ অনুচ্চ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিতে করিতে তাঁহারা চলিলেন। কতক আগে কতক পশ্চাতে যাত্রীগণ দলে দলে চলিতেছেন, একটী পাহাড়ের বাঁকের মুখে সহসা কে যেন পশ্চাৎ হইতে অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন— "ঠাকুরদাস"। ডাক শুনিয়াই ঠাকুরদাস মুখ ফিরাইলেন, আর সকলে সে কথায় বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে চলিতে লাগিলেন। তিনি ফিরিয়া যাঁহাকে দেখিলেন, তাঁহার হস্ত সঞ্চালন আহ্বান ও আর কি এক গুপ্ত সঙ্কেত দর্শনে নীরবে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে সন্ন্যাসী-চরণ প্রভৃতি কিয়দ্দূর যাইবার পর ফিরিয়া দেখিলেন, ঠাকুরদাস তাঁহাদের সঙ্গে নাই, তাঁহারা এদিক ওদিক দেখিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া পুনঃ পুনঃ

ডাকিলেন, কিন্তু কোনও সাড়া শব্দ পাইলেন না, তাহাতে তাঁহারা একটু বিস্মিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ও পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, নিকটে কোন আশ্রয় স্থল না দেখিয়া সকলেই একটু দ্রুতভাবে পথ চলিতেছিলেন, সেই কারণ ঠাকুরদাসের প্রতি সে আহ্বানবাণী শুনিয়াও কেহ তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, সঙ্গীদের মধ্যেই কেহ হয়ত তাঁহাকে ডাকিয়া থাকিবেন। সন্ন্যাসীচরণ প্রভৃতি বহু অনুসন্ধানেও যখন তাঁহার কোনরূপ সন্ধান পাইলেন না, তখন তাঁহারা যথার্থই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। এদিকে অন্যান্য যাত্রী সকলেই তাঁহাদিগকে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কি যে করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া যেন হতভম্ব হইয়া এক যায়গায় বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, তাঁহারা অগত্যা পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য হইতে কাঠ কুঠা কিছু সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালিয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন, ঠাকুরদাস কোথায় গেলেন কেবল এই ভাবনা ও আলোচনাতেই মনের দুঃখে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাত হইলে সকলে পরামর্শ করিয়া এক এক জন এক এক দিকে তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। সমস্ত দিবস তাঁহারা নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত, অরণ্য তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে ক্লান্ত দেহে একে একে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কাহারই মুখে কথা নাই, সকলেরই মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, হতাশ প্রাণে কেবল পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন,নয়নধারায় সন্ন্যাসীচরণের বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কালীচরণ ও চিন্তামণি ত পাগলের মত হইয়া-গিয়াছে, আর সেই ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণযুবক, নবপরিচিত হইলেও, কয়েক মাসের একত্র সহবাসে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন ; ঠাকুরদাসের সহসা এরূপ অন্তর্দ্ধানে তিনিও যে ভীষণ মর্ম্মাহত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত দিবস কাহারও আহার নাই, পূর্ব্বরাত্রি হইতে নিদ্রাত নাই-ই, সকলেই নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কয়েকটী যাত্রী সন্ন্যাসী তাঁহাদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেইস্থানে বসিলেন ও তাঁহাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, পরে নানা কথায় প্রবোধ দিয়া তাঁহারা বলিলেন—"আহা, কাল হইতে আপনাদের আহার নিদ্রা নাই, এমনভাবে বসিয়া থাকিয়া কি করিবেন বলুন, আপনারা

মুখে হাতে একটু জল দিন। তাঁহাদের নিকট কমণ্ডলুতে জল ছিল, এক জনের নিকট কিছু ভেলি গুড় ছিল, দিলেন। সকলের যত্ন ও অনুরোধে তাঁহারা বাধ্য হইয়া মুখে একটু একটু জল দিলেন, কিন্তু ঠাকুরদাস-বিহনে তাহাদের যে অবস্থা তাহাতে কি আর মুখে হাত উঠে, তাহাদের মেরুদণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী যাত্রীগণ আরও কত বুঝাইলেন, বলিলেন—"আপনাদের মুখে যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে তিনিত মহাপুরুষ; নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কর্ম্মানুরোধে তিনি স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার কোনই অমঙ্গল হইবে না, সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন আপনাদের সহিত পুনরায় তাহার সাক্ষাৎ হইবে। আপনারা ত নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, তিনি এ প্রদেশে নাই, সুতরাং এখানে এমনভাবে আর বসিয়া থাকিয়া কি করিবেন? আমাদের সঙ্গে চলুন, এখনও একটু দ্রুতভাবে না চলিলে আশ্রয় পাইবেন না, সকল যাত্রীই চলিয়া গিয়াছে, দেখিতেছেন না, আমাদের পিছনে আর কেহই নাই।

সাধুদিগের পুনঃ পুনঃ প্রবোধবাক্যে ও অনুরোধে তাঁহারা আর কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অতি কাতর প্রাণে উঠিলেন, কিন্তু পা যেন আর চলিতে চায় না, ঠাকুরদাসকে ফেলিয়া তাঁহারা কোথায় যাইবেন? অবশেষে ঠিক কলের পুতুলের মত তাঁহাদের আহ্বানে তাঁহাদের সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদা ঠাকুরদাসের অন্তর্দ্ধানের ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

অবরোধ।

তখন সন্ধ্যা তেমন ঘনাইয়া আসে নাই, দূরের মানুষ তখনও বেশ চেনা যায়; ঠাকুরদাস দেখিলেন,—একটী অতিবৃদ্ধ অপরিচিত সাধু তাঁহার নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন। "এমন স্থানে কে ইনি, আমার নামই বা কেমন করিয়া জানিলেন?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ইঙ্গিত মত পার্শ্বের একটি "পাক দণ্ডী" পাহাড়ী পথ দিয়া নামিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অনতিদূরে বৃদ্ধ একটী পর্ব্বতগুহার সঙ্কীর্ণ পথ দেখাইয়া তাহার মধ্যে

প্রবেশ করিতে বলিলেন, ঠাকুরদাসও বিনা বাক্যব্যয়ে অসঙ্কোচে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধও একবার এদিক ওদিক দেখিয়া আবার বলিলেন "দাঁড়াও, আলো আলি, ভিতরে ভারি অন্ধকার।" পার্শ্বেই আলো আলিবার সব সাজ সরঞ্জাম ঠিক ছিল, তিনি চকমকি ঠুকিয়া আলো জ্বালিলেন, অনন্তর প্রদীপহস্তে অগ্রসর হইয়া ঠাকুরদাসকে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন ও বলিলেন,—"ঠাকুরদাস, তুমি হয়ত একটু বিস্মিত হইয়াছ, আমাকে অপরিচিত ভাবিয়া এরূপ স্থলে বোধ হয় একটু ভীতও হইয়াছ। কিন্তু কোনও ভয় নাই, ভাই! আমিও তোমার মত সেই ঠাকুরেরই দাস; তাঁহারই আদেশে আমি এখানে বহুকাল অবস্থান করিতেছি, পরে সব কথা জানিতে পারিবে; চল, একটু বিশ্রাম করিবে চল।"

ঠাকুরদাস বহুকাল পরে এমন নিভৃত স্থানে তাঁহার ঠাকুরের কথা শুনিয়া একাধারে যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হইলেন ও মনে মনে ঠাকুরকে ধ্যান করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃই অত্যন্ত সাহসী ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সুতরাং সাধারণের ন্যায় ভীতি-পরায়ণ নহেন। তিনি বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া একটী বিস্তৃত গৃহের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই তথায় দীপ জ্বলিতেছিল, তিনি দেখিলেন সম্মুখে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে আর একখানি আসন জড়ান রহিয়াছে, বৃদ্ধের আদেশ মত সেই আসনখানি পাতিয়া তাহাতেই উপবেশন করিলেন, বৃদ্ধ সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। গুহার মধ্যের এমন গভীর নিস্তব্ধতা ঠাকুরদাস ইতিপূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করেন নাই, এমন পার্ব্বত্য গুহাও কখন পরিদর্শন করিবার সুযোগ পান নাই, তিনি এই সব বিষয় ভাবিতেছেন, আর ঠাকুরকে স্মরণ করিতেছেন। বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখ, ঐখানে কমণ্ডলুতে জল আছে, বাহিরে মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া এই স্থানেই একটু বিশ্রাম কর, আমি ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি ভিন্ন পথে অন্যত্র চলিয়া যাইলেন।

গুহা গৃহটী বেশ প্রশস্ত, বোধ হয় প্রায় বাঁর হাত দীর্ঘ হইবে, প্রস্থও প্রায় আট হাত হইবে। উহার তিন দিকে তিনটী দ্বার আছে, পিছনের দিকে কোন দ্বার নাই, সে দিকে কয়েকটা আলমারির মত তাক্, সে সমস্তই পর্ব্বতের গাত্রে খুদিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। দেওয়াল, ছাদ সমস্তই পাথর। তাকের মধ্যে বহু সংখ্যক পুথী পুস্তক রহিয়াছে, এক কোণে কতকগুলি শুষ্ক ফুল

বিল্বপত্র রহিয়াছে, আর এক পার্শ্বে কয়েকখানি গৈরিক উত্তরীয় ও কম্বল রহিয়াছে, ঠাকুরদাস চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন, আর কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, বৃদ্ধেরও দেখা নাই, কাজেই একা বসিয়া বসিয়া নানা ভাবনাই ভাবিতেছেন, সঙ্গীদের বিষয়ও ভাবিতেছেন, "তাহারা সব এখন কোথায়? আমাকে দেখিতে না পাইয়া না জানি তাহারা এতক্ষণ কতই ভাবিতেছে, আমি ত তাহাদের কোন কথাই বলিয়া আসি নাই; হয়ত তাহারা এখনও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; যদি তাহারা যাত্রীদের সঙ্গে চলিয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী কোন আশ্রয়ে পৌঁছিয়া থাকে, তাহা হইলেই ভাল, নচেৎ তাহাদের ভারি কষ্ট হইবে!" এমন সময় বৃদ্ধ একখানি পাত্রে কিছু আহার্য্য সামগ্রী ও একটী কমণ্ডলুতে দুগ্ধ লইয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন "আমার একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, তুমি হয়ত এতক্ষণ কত কি ভাবিতেছিলে।" ঠাকুরদাস বলিলেন—"না, সঙ্গীদের ত কোন কথা বলিয়া আসি নাই, তাহারা এতক্ষণ কতদূর যাইল, আমার অদর্শনে হয়ত তাহারা খুব চিন্তিত হইয়া থাকিবে, এই সবই ভাবিতেছিলাম।"

বৃদ্ধ—"তাহারা ত একটু চিন্তিত হইবেই, সে জন্য তুমি কোনও ভাবনা করিও না, তাহারা আজ না হউক কাল নিশ্চয়ই যাত্রীদিগের সঙ্গে চলিয়া যাইবে, এ পথে এমন ঘটনা প্রায়ই হয়। আমি ঠাকুরের আদেশ পাইয়াই তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সমস্তই পরে জানিতে পারিবে, এখন একটু দুধ খাও আর ঐ পাত্রে যাহা আছে একটু মুখে দাও।"

পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের আদেশ শুনিয়া ঠাকুরদাস আর কোনও কথা না বলিয়া বৃদ্ধের সকল আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিতে লাগিলেন। উভয়ে জলযোগের পর সেই গৃহেই শয়নের ব্যবস্থা করিয়া শয়ন করিলেন। সে রাত্রি আর বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তা হইল না।

প্রাতঃকালে ঠাকুরদাস দেখিলেন, গুহার মধ্যে প্রভাতী আলোকপ্রভা দেখা দিয়াছে, বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—"চল স্নান করিয়া আসি।" ঠাকুরদাস তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ভিন্ন পথে গুহার বাহিরে পাকদণ্ডী পথে নিম্নে কিয়দ্দূর যাইয়া গঙ্গা-স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন, আসিবার সময় অরণ্য হইতে প্রয়োজনমত ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। পুনরায় গুহার প্রবেশপথে দেখিলেন, একটী অপরিচিত পাহাড়ীলোক একটী

লাউএর তুম্বায় কিছু সিধা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, বৃদ্ধকে দেখিয়াই প্রণাম করিল ও গুহাদ্বারে তাহা রাখিয়া হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ গুহামধ্য হইতে আর একটী সেইরূপ লাউএর খোলা আনিয়া সেগুলি ঢালিয়া লইলেন। সেই অপরিচিত লোকটী তাহার খালি পাত্র লইয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুরদাস বৃদ্ধের সহিত পুনরায় গুহার পথে প্রবেশ করিলেন। এখন গুহার মধ্যেও বেশ আলোক আসিয়াছে। তিনি দেখিলেন, স্থানটী অত্যন্ত মনোরম, কাল সন্ধ্যার সময় যে পথ দিয়া এখানে আসিয়াছিলেন এটী সে পথ নহে, এখান হইতে গঙ্গায় নামিবার পথ বেশ সরল ও অল্প, উপর হইতে গঙ্গার খরতর প্রবাহ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরে চতুর্দ্দিকে নানা ফল ফুলের গাছ, নানা জাতীয় বিহঙ্গগণ তাহাতে বসিয়া সর্ব্বদা কলরব করিতেছে। ভিতরে সম্মুখেই একটী মন্দির, সিন্দূরলিপ্ত কয়েকটী দেবমূর্ত্তি তাহার মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলি এত প্রাচীন ও সিন্দূর চন্দনে এমনভাবে ঢাকিয়া গিয়াছে যে, তাঁহাদের চোখ, মুখ, হাত, পা, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ঠাকুরদাস কাল এ গৃহে আসেন নাই, ইহার দুই পার্শ্বে এইরূপ আর দুইটী গুহা আছে, তাহার মধ্যে বাম পার্শ্বের গুহাটীতেই তাঁহারা রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, দক্ষিণদিকের গুহাটী পাককার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। সকল গুহার মধ্য হইতেই স্বতন্ত্র পথে বাহিরে যাইতে পারা যায়। বৃদ্ধ ঠাকুরদাসকে পূজা করিতে বলিলেন। সেই সঙ্গে দেবমূর্ত্তিগুলির পরিচয় দিয়া বলিলেন—"দেখ, এই সম্মুখের মূর্ত্তিটী গুহ্যকালী দেবী, পার্শ্বে ইনি শিব, আর এদিকে বদ্রিনারায়ণ রহিয়াছেন। মন্দিরটী অতি প্রাচীন তাহা দেখিতেই পাইতেছ; আমি এখানে অনেকদিন আছি, আমারও সময় হইয়াছে, ঠাকুরের আদেশ না পাইলে ত যাইতে পারি না! সে দিন ঠাকুর তোমার নাম করিয়া বলিলেন—সে আসিবে, তুমি তাহাকে ডাকিয়া লইও, আমার না আসা পর্য্যন্ত সে যেন এখানেই থাকে। যাহা হউক ভাই, ক্রমে বেলা হইতেছে, তুমি এখন পূজা কর।"

ঠাকুরদাস বৃদ্ধের আদেশ মত পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া পূজা করিতে বসিলেন। দেবমূর্ত্তিগুলির পুরাতন সিন্দূর চন্দন তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন; তাহাতে মূর্ত্তিগুলির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জীর্ণ হইলেও অনেকটা বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পূজার ব্যবস্থা ও রীতি নীতি দেখিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ

করিলেন। পরে পাকাদি সমাপন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিলেন ও উভয়ে আশীর্ব্বাদ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাসকে নিকটে বসাইয়া তিনি মন্দিরের পরিচালনা সম্বন্ধে বলিলেন—"প্রত্যহ প্রাতঃকালে এখানে রাজার প্রদত্ত সিধা আসে, তাহাত তুমি দেখিয়াছ, সন্ধ্যার সময় দুধ ও অন্যান্য জল খাবার যেদিন যেমন হয় আসে। রাজা অত্যন্ত ভক্তিমান্ পুরুষ, সাধু সন্ন্যাসীদিগের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, কোথায় নির্জ্জনে কোন্ গুহার মধ্যে কোন্ সাধু যোগরত,প্রত্যহ তাহার অনুসন্ধান করিয়া তিনি তাঁহাদের আহার্য্য পাঠাইয়া দেন। এদেশের প্রত্যেক পাহাড়ের মধ্যে এমন গুপ্তগুহা অনেক আছে, সাধুরা আসিয়া তথায় নির্ব্বিঘ্নে সাধন ভজন করিয়া থাকেন। দেশের লোকও এত সরল ও ধর্ম্মপরায়ণ যে তাহারা সাধুসন্ন্যাসীকে যেন সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়াই মনে করে। তাহারাও মাঝে মাঝে সাধুদের জন্য কত কি পাঠাইয়া দেয়। অধিক হইলে আমি সাধুসন্ন্যাসী যাত্রীদের ডাকিয়া আনিয়া তাহা বিতরণ করিয়া দিই। ঠাকুর বলিয়াছেন—"তুমি এখন কিছুদিন এখানেই থাক, তাঁহার না আসা পর্য্যন্ত তুমি কোথাও যাইও না। এই দেখ, এখানে কত গুপ্ত সাধন শাস্ত্র আছে অবসর মত এই সকল বেশ আলোচনা করিতে পারিবে।"

অপরাহ্ণ সময়ে বৃদ্ধ বাহিরে যাইলেন, ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল, ঠাকুরদাস সায়ংসন্ধ্যা করিবার মানসে মুখ হাত ধুইবার জন্য গুহার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সেই পাহাড়ী লোকটী একটী ঘটীতে দুধ ও ভিন্ন পাত্রে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে ব্যক্তি প্রণাম করিল, ঠাকুরদাস ভিতর হইতে কমণ্ডলু ও একখানি পাত্র আনিয়া সেগুলি আজাড় করিয়া লইলে, লোকটী প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তিনি মন্দিরে আসিয়া দেবতার উদ্দেশে তাহা উৎসর্গ করিয়া দিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, বৃদ্ধের আর দেখা নাই, এই আসেন এই আসেন করিয়া তিনি মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার অপেক্ষা করিলেন, পরে নিজে জলযোগ করিয়া শয়ন করিলেন। বৃদ্ধ আর আসিলেন না, তিনি অবসর বুঝিয়া প্রকারান্তরে ঠাকুরদাসের উপর মন্দির ও গুহার ভার দিয়া বোধ হয় একবারে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরদাস বৃদ্ধের প্রমুখাৎ তাঁহার ঠাকুরের আদেশবাণী শুনিয়া সেই স্থানেই এখন আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার এ অবরোধ কবে যে মুক্ত হইবে, তাহা পূজ্যপাদ ঠাকুরই জানেন!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

সন্ন্যাসীচরণ প্রভৃতি ঠাকুরদাসের অভাবে কাতর ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া যাত্রীদিগের অনুরোধে পরবর্ত্তী চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও যৎসামান্য জলযোগ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা আর বাহির হইলেন না, সেই চটীতেই পাকশাক করিয়া আহারাদি করিলেন, বিশ্রামান্তে অপরাহ্নে যাত্রীদিগের সহিত পুনরায় যাত্রা করিলেন; কিন্তু ঠাকুরদাসের অভাবে তাঁহাদের আর সুখ বোধ হইল না। তাঁহারা যথাসময়ে উত্তরাখণ্ড হিমগিরি পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় সমতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বর্ষা ঋতু আরম্ভ হইয়াছে, হিমালয়ের তরাইভূমি এসময় আদৌ স্বাস্থ্যকর থাকে না। কালীচরণ সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায়, চিন্তামণি প্রভৃতি তাহাতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ও তাঁহারা যত সত্বর পারেন তথা হইতে চলিয়া অসিলেন। কালীচরণ সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে না হইতেই চিন্তামণিও রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীচরণ প্রাণপণে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাদিগকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন ও ভট্টপল্লীর সেই ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত তাঁহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারাও কয়েকদিন বিদেশে রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য একটু ব্যস্তও হইয়াছিলেন; সুতরাং সন্ন্যাসীচরণের প্রস্তাবে তাঁহারা অমত না করিয়া আনন্দিতচিত্তে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সন্ন্যাসীচরণ এখন একাই তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ, ঠাকুরদাসের অনুসন্ধানে পুনরায় বাহির হইলেন। এদিকে কালীচরণ প্রভৃতি যথাসময়ে দেশে ফিরিয়া আসিলে গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাদের বিষয় অবগত হইলেন, কিন্তু ঠাকুরদাস ও সন্ন্যাসীচরণকে না দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, বিশেষ ঠাকুরদাসের সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বেদান্তবাগীশ মহাশয় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীচরণ সবেমাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সংসারে জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ভগিনীপতি ও একটী ছোট ভাগিনেয় ব্যতীত আর কেহই ছিল না, স্ত্রী তখন তাহার পিত্রালয়েই ছিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বামী-পুত্রসহ তাঁহার ভাইয়ের অভিভাবক রূপে ভাইয়ের সংসারেই থাকিতেন, তাঁহার স্বামীর অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। সন্ন্যাসীচরণ আর আসিবেন না

শুনিয়া তিনি বাহ্যিক একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেও মনে মনে খুবই আনন্দিত হইলেন, ভাবিলেন সন্ন্যাসীর বিষয়টা তিনিই সম্পূর্ণ ভোগদখল করিতে পারিবেন। স্ত্রী অল্পবয়স্কা হইলেও স্বামীর বৈরাগ্য সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইলেন, মুখে কিছু প্রকাশ করিতে না পারিলেও মনের কষ্ট মনে চাপিয়া রাখিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীচরণ সঙ্গীদের দেশে পাঠাইয়া দিয়া যেখানে তাঁহার প্রাণের বন্ধু ঠাকুরদাসের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়াছিল, সেইস্থানে আবার আসিলেন, মনের দুঃখে সেই পাহাড়ের ধারে পাগলের মত "ঠাকুরদাস ঠাকুরদাস" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এখন তাঁহার আর কোনও চিন্তা নাই, সময়ে আহার নাই, নিদ্রা নাই, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধুর বিরহে তিনি সমস্তই শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। বাস্তবিক প্রকৃত বন্ধুর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা যে কতদূর কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহই অনুভব করিতে পারে না।

ঠাকুরদাস সেই নিভৃত গুপ্তগুহাতে একাই বাস করিতেছেন, কোথাও বেড়াইবার উদ্দেশে বা কোন কারণে গুহার বাহির হন না, কেবল প্রত্যহ প্রাতঃকালে একবার মাত্র সেই পাহাড়ের পিছন দিকে পাকদণ্ডী পথে যাইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসেন ও কমণ্ডলুপরিপূর্ণ জল লইয়া, আসিবার পথে বনজাত ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া আনেন। গুহার মধ্যেই নিত্য পূজাপাঠ ও সাধন ভজন লইয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন। সুতরাং সন্ন্যাসীচরণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা এখন যে কোথায়, কি করিতেছেন, কোন সংবাদই তিনি জানেন না, আর জানিবার উপায় ও নাই, কখন কখনও তিনি তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন মাত্র। এইভাবে প্রায় চারিমাস কাল অতীত হইয়া গেল। তখন বর্ষাকাল, ভাদ্রমাসের অবিশ্রান্ত বর্ষা—সাধুসন্ন্যাসীরা আর কেহ বড় বাহিরে নাই, সকলেই মঠে মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছে, গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুদিগকে লইয়া পার্ব্বত্য বালক বালিকারা আর তেমন বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় না; পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই মধ্যে গো-মহিষাদি সহ বসিয়া থাকে ও আপন মনে গান করে, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে বা বাদলা-বৃষ্টি না হইলে কখন কখনও নিকটস্থ বন্য ফল মূল আহরণ করিয়া আনে ও পশুদিগকে চরিতে দেয়। এই সময়কে পাহাড়ীরা

চাতুর্মাস্য বলে। সন্ন্যাসীচরণ তাহাদেরই নিকট সেই কুটীর মধ্যেই আজ কাল আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাদেরই যত্নে কোনরূপে দিনাতিপাত করেন ও সুবিধা মত বন্ধুর অনুসন্ধান করেন। একদিবস প্রাতে পথিপার্শ্বে তিনি সেইরূপ একটী কুটীরের ধারে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একজন পাহাড়ী কতকগুলি কি জিনিষ লইয়া কোথায় যাইতেছিল, সন্ন্যাসীচরণকে দেখিবামাত্র দাঁড়াইয়া পরিচিত বোধে প্রণাম করিল, কিন্তু পরক্ষণেই বোধ হয় তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সে আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসীচরণের কি মনে হইল, তিনি লোকটার পিছু পিছু কিছুদুর গিয়া দুর হইতে দেখিলেন, সে এক পাকদণ্ডী পথে নামিতেছে, তিনিও তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সেই পথে নামিতে লাগিলেন। লোকটা অনেক দুর যাইয়া এক স্থানে হাতের সেই জিনিষগুলি নামাইয়া যেন কাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। তিনিও কৌতুহল-পরবশ হইয়া অলক্ষ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে অধিকক্ষণ অতীত হইল না, দেখিলেন দুরে তাঁহারই মত এক নবীন সাধু আসিতেছেন, সেই পাহাড়ী লোকটী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিল, সাধু পাহাড়ের গাত্রে এক গুহার পথে চলিয়া যাইলেন। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীচরণ সেই গুহাদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন. সে ব্যক্তি তখনও দাঁড়াইয়া ছিল, তাঁহাকে দেখিয়া আবার প্রণাম করিল। তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে সেই সাধু এক পাত্র-হস্তে বাহিরে আসিলেন। সন্ন্যাসীচরণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, উভয়ে আনন্দে বিস্ময়ে যেন লাফাইয়া উঠিলেন, উভয়ে উভয়কে দৃঢ় আলিঙ্গন সহ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই বার্ত্তা নাই, সে এক অপূর্ব্বভাবে তাঁহারা যেন আত্মহারা! সে ব্যক্তিও তাহাদের এই অপ্রত্যাশিত মিলন-আনন্দে আনন্দিত হইয়া এক পার্শ্বে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাধু ঠাকুরদাস তখন আর কোন কথা না বলিয়া তাহার পাত্র খালি করিয়া দিয়া সন্ন্যাসীচরণের হাত ধরিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে ব্যক্তি প্রণাম করিয়া তাহার শূন্য পাত্র লইয়া চলিয়া গেল। ঠাকুরদাস সন্ন্যাসীকে পাইয়া যেন পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর উভয়ে উভয়পক্ষের সকল ঘটনা বলিতে লাগিলেন। চিন্তামণি প্রভৃতির দেশে প্রতিগমনের সংবাদ পাইয়া ঠাকুরদাস বলিলেন "ভালই হইয়াছে, তাহাদিগের সংসারাশ্রমের আশা পূর্ণ হয় নাই, তাহাদিগকে পাঠাইয়া

দিয়া ভালই করিয়াছ। অনন্তর সন্ন্যাসীচরণের বন্ধু-প্রীতি, এতাধিক কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা শুনিয়া একাধারে আনন্দ ও কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন; সন্ন্যাসীচরণও তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত অবরোধবিবরণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল, সন্ন্যাসীচরণ স্নান করিয়া আসিলেন, পূজাপাঠাদি সমাপন করিয়া উভয়ে আহার করিলেন। মধ্যাহ্নে উভয়ের আবার নানা বিষয়ক আলোচনা হইতে লাগিল। অনেক দিন পরে দুই বন্ধুতে একত্র বাস করিয়া বেশ সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। গুহার মধ্যে বহু গুপ্ত সাধন-গ্রন্থ ছিল, তাঁহারা তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীচরণ কোন কোন গ্রন্থের প্রতিলিপিও করিয়া লইলেন।

এক দিবস গভীর নিশায় সন্ন্যাসীচরণ নিদ্রিত, এমন সময়ে কে ডাকিলেন— "ঠাকুরদাস!" সহসা সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঠাকুরদাস একেবারে ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন--"এদিকে এস।" ঠাকুরদাস বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া যন্ত্র-চালিতের ন্যায় চলিলেন; কোথায় চলিলেন, তাহার ঠিকানা নাই। সেই গভীর রজনীর ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার আবার অন্তর্দ্ধান হইল। প্রভাতে সন্ন্যাসীচরণ উঠিয়া দেখেন— ঠাকুরদাস নাই, ভাবিলেন—"হয়ত শৌচাদি সম্পন্ন করিতে গিয়াছেন।" তিনিও যথারীতি স্নানাদি সম্পাদনের জন্য বাহির হইলেন। গুহাদ্বারে আসিয়া দেখিলেন—একটী সুকুমার বালক সাধুবেশে যেন তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছেন। বালক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একখানি পত্র দিলেন। তিনি সেই পত্র পাঠ করিয়া একবারে অবাক হইয়া যাইলেন। পত্রখানি ঠাকুরদাসের লেখা, তাহাতে লিখিত ছিল,—"ভাই সন্ন্যাসী, আমি পূজ্যপাদ ষট্ শ্রীমৎ ঠাকুরের আহ্বানে চলিলাম, তুমি ইচ্ছা করিলে এখানে থাকিতে পার, অথবা এই বালকের উপর পূজার ভার দিয়া যথা ইচ্ছা এখন যাইতেও পার। ঠাকুরের আদেশে আবার সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত বলিব। তোমার স্নেহাভিলাষী ঠাকুরদাস।"

সন্ন্যাসীচরণ বালককে গুহারমধ্যে লইয়া যাইলেন, ঠাকুরদাস সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু সে বালক বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না। কেবল এইমাত্র বলিলেন—"আমি লাহোরে আমার গুরুদেবের আশ্রমে ছিলাম, সম্প্রতি তাঁহারই সঙ্গে এখানে আসিয়াছি, আজ প্রাতে গুরুদেব এই পত্র দিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সহিত এখন আর

আমার দেখা হইবে না। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার সুবিধা মত এখানে আসিয়া আমায় লইয়া যাইবেন। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আপনি আদেশ করুন।" বালকটী বাঙ্গালী নহে, কথাবার্ত্তায় পঞ্জাববাসী বলিয়াই বোধ হইল। সন্ন্যাসীচরণ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্নান করাইয়া আনিলেন ও পূজা পাঠের সমস্ত ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। কয়েক দিবস এখানে থাকিবার পর তিনি বালককে বলিলেন, "তুমি এখানে একা থাকিতে পারিবে?" বালক বলিলেন—"কেন পারিব না! গুরুজীর আদেশ—এখানে মরিয়া যাইলেও স্থান পরিত্যাগ করিব না জানিবেন।" সন্ন্যাসীচরণ তাহার গুরু-ভক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি তাঁহার উপর গুহা ও মন্দিরের ভার দিয়া পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরদাস ও সন্ন্যাসীচরণ এই স্থান হইতে স্ব স্ব বাটীতে পত্র দিয়াছিলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় সেই পত্র পাইয়া ভ্রাতার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। কিন্তু তখন এমন রেলগাড়ী হয় নাই যে, দুইদিনে পত্র পৌঁছিবে, বা দুই চারিদিনের মধ্যে বাঙ্গালাদেশ হইতে উত্তরাখণ্ডে পৌঁছান যাইবে। সুতরাং পত্র প্রাপ্তির পর বেদান্তবাগীশ মহাশয় যখন দেশ দেশান্তর প্রদক্ষিণ করিয়া বহু অনুসন্ধানে সেই গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের কাহাকেই দেখিতে পাইলেন না। তাহার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ঠাকুরদাস শ্রীশ্রীঠাকুরের আহ্বানে এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সন্ন্যাসীচরণও আজ তিনদিন হইল পুনরায় তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সেই বালকটীই বৃদ্ধ বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে এই সকলকথা বলিলেন ও তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বিদায় দিলেন। বৃদ্ধ এত পরিশ্রম করিয়া এই সুদূর হিমতীর্থে আসিয়াও স্নেহের পুত্তলী কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাক্ষাৎ না পাইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। তখন শীতঋতু সমাগত প্রায়, এ অবস্থায় তিনি বাধ্য হইয়া হিম-প্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রাতার অন্বেষণে নানা দেশ ও তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অতি কাতর দেহে দেশে ফিরিলেন। ভ্রাতৃশোকে তাঁহার শরীর মন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল, তিনি ঘরে ফিরিয়াও আর সুস্থ হইতে পারিলেন না। অল্পকালের মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করিলেন। এখন তাঁহার সংসারে একমাত্র পুরুষ অভিভাবক তাঁহার মধ্যম সহোদর শিরোমণি মহাশয় আর স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবল মাত্র রাধারাণীই রহিলেন। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরদাসের কন্যাগুলির সব বিবাহ

হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা এখন আপন আপন শ্বশুর-গৃহেই বাস করিতেছেন। সুতরাং রাধারাণীর সংসারবন্ধন এখন আর তেমন দৃঢ় নাই। তিনি তাঁহার মেজ বড় ঠাকুরের আদেশ লইয়া স্বামী অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তীর্থে তীর্থে যে স্থানে সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম সংবাদ পাইলেন, রাধারাণী তথায় তাঁহার হৃদয়-দেবতার অনুসন্ধান করিতে ছুটিলেন—কিন্তু চারিধামের কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। হায় রাধারাণী, তিনি কি সাধারণ নাগা সন্ন্যাসী যে, যথায় তথায় তাঁহার অনুসন্ধান পাইবেন? রাধারাণী উপর্য্যুপরি তিনবার তাঁহার অন্বেষণ করিয়া হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। এই সময় ভৈরবী মা সহসা কি জানি কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে সান্ত্বনা এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাধারাণী মহাপুরুষের উপযুক্ত গৃহিণী, তিনি ভৈরবীমার উপদেশ পাইয়া পরমানন্দে সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হৃদয় দেবতাকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি তিনি আর গৃহ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি বলিতেন—"শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ ঠাকুরের আদেশেই ভৈরবী মা তাঁহাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন।" ভৈরবী মা তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিতা হইয়াছেন, কেহই তাহা বলিতে পারে না।

শ্রীকবিরঞ্জন শর্ম্মা।

লীলা।

সর্ব্বময়!
যদি তুমি দূরে থাক,
কেমনে নিকটে যাব?
কি ক'রে তোমার কাছে
প্রাণ খুলে কথা কব?
আর কে শুনিবে কথা,—
গভীর মরম গান?
থাক দূরে শুনে মম,
ভয়েতে কাঁপিছে প্রাণ॥
কে বুঝিবে মনব্যথা;
কে দিবে সান্ত্বনা বুকে?
পরাণের দুঃখ-গীতি,
কে আছে শুনাব তা'কে?
তবে কি শ্রবণে তব,
পশে না করুণ-গীতি?
তবে কি আমার হৃদে,
ফোটে না তোমার জ্যোতিঃ?
তবে কি দূরেই আছ,
আমার নিকটে নাই?
কেমনে তবে গো সখা,
তোমার 'নাগাল' পাই?

ও দুটি চরণ যদি,—
নাহি পাব মনে হয়।
জীবন ভারের সম,
মরিতে বাসনা হয়।
এ জীবনে নাহি পাই,
জীবনের পরপারে।
পাবত' তোমাকে নাথ?
বল তুমি কৃপা ক'রে?
না, না, তুমি আছ কাছে;
কে বলে দূরেতে থাক?
ঐ যে মধুর স্বরে—
জগত ভরিয়া ডাক্॥
ঐ যে গাহিছ গান,
হৃদয় শুনিতে পায়।
'তুমি আছ দূরে' তবে—
কেমনে বিশ্বাস হয়॥
ওই যে হৃদয় মাঝে,
বসিয়া বাজাও বাঁশী।
হাসি ভরা চাঁদ মুখে,
ডাকিছ আমাকে হাসি॥
লুকোচুরি খেল তুমি,
কেহ না দেখিতে পায়।
বারেক সাড়াটি দিয়া
কোথা তুমি সরে যাও?
চপলার মত তুমি,
কর চিদাকাশে খেলা।
ক্ষণেকে আবৃত কর,
আঁধারে আলোক মেলা॥
কভু হৃদি-বৃন্দাবনে,
বংশী করে শোভা পাও।
জীব-আত্মা গোপিকার,—
পরাণ কাড়িয়া লও॥
কখন প্রকাশে তব,
শুভ্রজ্যোতি মনোহর।
কভু দুঃখ শোক রূপে,
কভু মৃত্যু ভয়ঙ্কর॥
প্রকাশ ও অপ্রকাশ,
সকলি তোমার রূপ।
তুমি বিশ্ব মাঝে একা,
অনাদি অব্যয় ভূপ॥
তুমি ত' নিকটে থাক,
তবু নাহি দেখি কেন?
আমার কি আঁখি নাই,
দেখিতে পাই না যেন?
না, না, তুমি আছ কাছে,
হৃদয়ে বুঝিতে পারি।
ধরিতে জানিনা 'বলে',
তাই যে ধরিতে নারি॥
ছোট ছেলে কাণা হ'য়ে,
'কাণামাছি' খেলা করে।
বিফল প্রয়াস তার,
কাহারে ধরিতে নারে॥
দয়াদ্র থাকিলে কেহ,
সেই খেলা সাথী মাঝে।
দেখিয়ে যাতনা তার,
এসে ধরা দেয় নিজে॥
হে সখা! এ ভবমাঝে,
পেতেছ মধুর খেলা।
কতদিন কত খেলি,
ফুরায়ে এলো যে বেলা॥

শেষ বেলা হ'য়ে এল;
দাও ধরা এই বার।
তুমি যে দীনের বন্ধু
কৃপা-সিন্ধু দয়াধার॥
তোমার মহিমা গায়,—
অনন্ত জগৎ জুড়ে।
শুধু কি ভবের মাঝে
আমিই মরিব ঘুরে?
অখিল জুড়িয়ে সবে
করিছে তোমার গান;
খালি কি আমার হৃদে,
বাজিছে বেসুরা তান?
এ দীনতা জীবনের,
ঘুচিবে কভু কি মোর?
গাহিতে তোমার নাম,
হবে এ জীবন ভোর?
জীবনের দীর্ঘ দিবা
অপরাহ্নের প্রায়;
ভরিছে জীবন-প্রান্ত,
ঘন অন্ধকার-ছায়।
এইবার এস নাথ!
এখন কি অসময়?
হৃদয়-কমল মম,
পরশ কমল-পায়।
বারেক দাঁড়াও এসে,
মোহন মধুর ঠামে?
বারেক পূজিব পদ,
বিকচ কুসুম-দামে।
নমিয়া চরণে তব,
নামাব হৃদয় ভার,
এস নাথ! এস বন্ধু!
সময় এসেছে তার!
ক্ষণেকের তরে শুধু,
প্রকাশ হৃদয়ে নাথ!
মন-সাধ মিটে যাক্,
করি পদে প্রণিপাত।
পরে চলে যেয়ো তুমি;
'থাক' বলিব না আর।
এ সাধ এ জীবনের,
পূরাও একটি বার।
আছ তুমি নিকটেতে,
শুনিতে পাও ত কথা।
তবে কেন দয়াময়!
বোঝ না হৃদয়-ব্যথা?
কঠিন বেদনা যদি,
দিতে হয় দিয়ে নাও।
শুদ্ধ ক'রে যোগ্য ক'রে,
পদেতে আশ্রয় দাও॥
"তুমি নিকটেতে নাই,
শোন না দিনের কথা।
অটল—কঠোর তুমি,—"
শুনিয়ে পাই যে ব্যথা।
যদি কেহ বলে, নাথ!
আছ তুমি কত দূরে।
অমনি নিরাশে প্রাণ,
ডুবে যায় একেবারে॥
মনে হয় কারে তবে,
বলিব প্রাণের ভাবে।
তুমি ত নিকটে নাই,
আছ কোন দূরদেশে?
তখনি শুনিতে পাই,
বসিয়া হৃদয়ে গাও;—
"আছি আমি সব স্থানে,
কেন বৃথা ভয় পাও"?
সত্য তবে আছ তুমি,—
সত্য তবে আছ নাথ?
লও তবে অভাগার
হৃদি-ভরা প্রণিপাত!

শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী বসু।

অবসর।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

দ্বাদশ খণ্ড।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ এটর্ণি-য়্যাট্-ল

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর পুস্তকালয়" হইতে

শ্রীহরিপদ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী পত্র।

বিদায়।

প্রায় এক বৎসর পরে আজ আমি "অবসরের" সম্পাদকীয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি।

"অবসরের" স্বত্বাধিকারিণী স্বর্গীয় সুরেণচণ্ডী দত্তের নাবালিকা পত্নী শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন বর্গের বিশেষ অনুরোধে এই মাসিকপত্র খানির সমুদয় ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই যাঁহার জিনিষ তাঁহাকে ফেরৎ দিয়া আমি গ্রাহকগণের নিকট বিদায় লইতেছি।

"অবসরের" জীবন মরণ আজ হইতে অন্যের উপর নির্ভর করিবে। নূতন বৎসরের প্রবন্ধাদি বা টাকাকড়ি লেখক ও গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া আর আমার নামে পাঠাইবেন না।

মাসিকপত্রের সম্পাদকের কার্য্য যে কত কঠিন, তাহা পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন। একদিকে তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থে সুপাঠ্য প্রবন্ধ গল্প ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে হয়, অপরদিকে পত্রিকাখানির ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা চাই, আজিকার কালে দুইটী কার্য্যই দুঃসাধ্য ও সুকঠিন।

প্রথমটীতে কতদূর সফল হইয়াছি তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন। দ্বিতীয়টী সম্বন্ধে বক্তব্য এই, হিসাব নিকাশ করিয়া দেখিলাম লাভ ও লোকসান উভয়দিকেই শূন্য, এ দুর্দ্দিনে তাহাই যথেষ্ট লাভ বলিয়া বিবেচনা করি।

সম্পর্ক এক দিনের হউক আর এক বৎসরেরই হউক, বিচ্ছিন্ন করিতে হইলে মনে স্বতঃই কষ্ট অনুভব হয়, কিন্তু নিরুপায় হইয়াই আমাকে এ বন্ধন ছিন্ন করিতে হইতেছে।

একমাত্র ভরসা, যোগ্যতর হস্তে এই ভার অর্পণ করিতেছি। আশা করি,—দেবতার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি "অবসর" নূতন জীবন ও নূতন শক্তি লইয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহই তাহার জীবন-পথের একমাত্র সম্বল।

এক বৎসর ধরিয়া আমি "অবসরকে" সযত্নে লালন-পালন করিয়া আসিয়াছি। আজ তাহাকে পাঠকগণের চরণে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইতেছি। আশা করি, তাঁহারাও ইহাকে পূর্ব্ববৎ স্নেহের চক্ষে দেখিবেন।

বিদায়কালে আমি গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট আমার কৃত জ্ঞানতই হউক আর অজ্ঞানতই হউক, সকল অপরাধের জন্ত ক্ষমা চাহিতেছি। তাঁহা-দের অনুগ্রহই আমার এই গুরুতর কার্য্যের প্রধান সহায় ছিল। সেই সাহায্য না পাইলে "অবসর" এতদিন সাহিত্যক্ষেত্র হইতে কোথায় অবসৃত হইয়া যাইত!

তাঁহারা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

সহযোগী সাহিত্যের নিকট আমি চিরঋণী থাকিব। সহযোগীর উৎসাহ ও আশ্বাস, সহানুভূতি ও দয়া "অবসরের" পক্ষে অপরিশোধনীয়।

প্রেসের কর্ম্মচারিগণের নিকটও আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, তাঁহারাও আন্তরিক যত্নে অবসরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে সাহিত্যদেবতার চরণে সহস্র প্রণিপাত করিয়া আজ আমি সকলকার নিকট হইতে অবসর চাহিতেছি।

যিনি বিশ্বনিয়ন্তা ও বিশ্বদেবতা তিনি "অবসরকে" অক্ষয় জীবন দান করুন—সাহিত্যের কার্য্যে—বিশ্বের কার্য্যে—তাঁহার কার্য্যে "অবসর" যেন সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে।

মাসিক সংবাদ।

প্রতিবৎসরই রথযাত্রার সময়ে মাহেশে একটী মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় দেশবিদেশ হইতে অনেক লোকের সমাগম হয়। রাধাবিনোদ নামে কোনও ব্যক্তি ফেলারাম নামক জনৈক দোকানদারের দোকান হইতে চারিটি রসগোল্লা চুরি করিয়া সাময়িক জঠর-জ্বালা নিবারণ করে। দোকান-দার ছাড়িবার পাত্র নহে, পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করে। সম্প্রতি তাহার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। বিচারক আসামীর প্রতি ছয় সপ্তাহ কারাবাসের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ———

জমীদার নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ই শ্রাবণ শুক্রবার রাত্রিকালে ১৬১নং বলরাম দের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন। অনেক দরিদ্র সন্তান ইঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইত। আমরা তদীয় শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সান্ত্বনার জন্ত ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি।